

চিরভাস্বর মহানবী (সা.)

দ্বিতীয় খণ্ড

আয়াতুল্লাহ্ জা' ফার সুবহানী
অনুবাদ : মোহাম্মদ মুনির হোসেন খান

চিরভাস্বর মহানবী (সা.)

মূল: আয়াতুল্লাহ জাফার সুবহানী

অনুবাদ: মোহাম্মদ মুনির হোসেন খান

সম্পাদনা: অধ্যাপক সিরাজুল হক

তত্ত্বাবধানে: শাহাবুদ্দীন দারায়ী

কালচারাল কাউন্সেলর

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা

প্রকাশকাল : সফর- ১৪২৭, চৈত্র- ১৪১২, মার্চ- ২০০৬

প্রকাশনায় :

কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস

বাড়ী নং ৫৪, সড়ক নং ৮/এ,

ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা- ১২০৯, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ:রফিকউল্লাহ গায়ালী

মুদ্রণে:চৌকস প্রিন্টার্স লিঃ

১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা- ১০০০

Chirobhashwor Mahanabi (Sm.),Bengali translation of 'Forugh-e-Abadiyyat' Written by: Ayatollah Jafar Sobhani;Translated by: Mohammad Munir Hossain Khan;Edited by: Abdul Muqit Chowdhury;Supervised by: Dr. Reza Hashemi,Cultural Counsellor,Embassy of the Islamic Republic of Iran,Dhaka,Bangladesh;Published on: Rabi-al-Awwal 1427,Chaitra 1412,April 2006.

ভূমিকা

ধর্মীয় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

মহানবী (সা.)- এর ব্যক্তিত্বের পূর্ণতার বিশেষত্ব

মহানবী (সা.)- এর জীবনী লেখার মৌলিক ও প্রাথমিক উৎস

মানব জাতিকে কল্পকাহিনী ও কুসংস্কার এবং শক্তি মদমত্তদের ক্ষমতার দাপট থেকে মুক্তিদানের জন্য মহান নবী- রাসূলগণ যে খোদায়ী আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন, তা হচ্ছে সাগর তরঙ্গের মতো, যা শুরুতে একটি ছোট গোলকের আকৃতিতে সৃষ্টি হয়; এরপর ঐ গোলকের কোণ থেকে যতই দূরে সরে যায়, ততই তার ব্যাস ও পরিধি ব্যাপকতর এবং তার শক্তি তীব্রতর ও প্রচণ্ডতর হতে থাকে এবং শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করে।

পবিত্র মাদানগরীতে মহানবী (সা.)- এর হাতে যে ধর্মীয় আন্দোলন ও আধ্যাত্মিক বিপ্লবের গোড়াপত্তন হয়, তা প্রথমেই হেরা হা, খাদীজার বাড়ি ও মাদানগরী জীর্ণ কুটির লোকেই আলোকিত করে। সময় যত বয়ে যায়, সে আন্দোলন ততই ব্যাপকতা লাভ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত ছেয়ে ফেলে। ফলে বিশ্বের বিশাল অঞ্চল জুড়ে (ফ্রান্স থেকে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত) তাওহীদের বাণী ধ্বনিত- প্রতিধ্বনিত হয়।

এ ধরনের ধর্মীয় আন্দোলনের যাঁরা গোড়াপত্তন করেন, তাঁরা শ্রেষ্ঠ নৈতিক চরিত্র ও মানবীয় গাভলীর অধিকারী হন। ফলে সাগরের তরঙ্গমালার মতো তাঁদের ওপর যতই সময়ের প্রবাহ বয়ে যায়, তাঁদের ব্যক্তিত্ব ততই বিকশিত ও ব্যাপকতর হয়।

নবী- রাসূল অর্থাৎ ওহীর ধারক ও বাহকগণ যেন বিশ্বপ্রকৃতিরই ছবছ প্রতিলিপি। তার মানে প্রকৃতি নিয়ে যত বেশি গবেষণা ও অধ্যয়ন করা যাবে, তার রহস্য ও রহস্য তত বেশি প্রকাশিত হবে এবং প্রকৃত অবস্থা ও বাস্তবতা অধিক অধিক আবিষ্কৃত হবে; ঠিক একইভাবে মহান ধর্মীয়

নেতৃত্বের জীবন নিয়ে যতই গবেষণা ও পর্যালোচনা করা হবে এবং তাঁদের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি যতই গভীর হবে, তাঁদের জীবনের নিত্য-নতুন দিকও তত বেশি উদঘাটিত হবে।

আমাদের এ বক্তব্যের সাক্ষী হচ্ছে সেই অগণিত রচনাসম্ভার, যা জীবনী লেখক, ইতিহাসবেত্তা ও ইলমে রিজালের গবেষকগণ ইসলামের মহান নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও যতই দিন গত হচ্ছে, মানুষের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি যতই প্রসারিত হচ্ছে, গবেষকগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এই মহামানবের জীবন সংক্রান্ত নতুন নতুন দিগন্তের সন্ধান পাচ্ছেন।

শুরুতে মহানবীর জীবন ও জীবনী তাঁর সাহাবিগণের স্মৃতি ও শ্রুতির উপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁর ওফাতের পর যখন ইতিহাসে ‘তাবেঈন’ নামে পরিচিত নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে, তাঁদের সময় মহানবীর হাদীস, সুন্নাহ ও তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং তাঁর সময়ের যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস নতুন দীপ্তি লাভ করে। এই নতুন প্রজন্ম মহানবীর হাদীস এবং তাঁর জীবনের ঘটনাপ্রবাহ রফত করার ব্যাপারে প্রবল আগ্রহ ও আবেগ অনুভব করেন। অনুরূপভাবে এ জাতীয় ইসলামী জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস সাহাবা ও তাবেঈন যখন একের পর এক মৃত্যুবরণ করতে থাকেন, তাঁদের মৃত্যুর সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পায়, ততই মহানবীর হাদীস ও তাঁর জীবনের সকল বৈশিষ্ট্য শিক্ষা লাভের জন্য মুসলমানদের মধ্যে তীব্র পিপাসার সৃষ্টি হয় এবং তা অনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে একদল সাহাবী মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে যেসব^১ হাদীস শুনেছিলেন, হাদীস^২ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে দ্বিতীয় খলীফার প্রচণ্ড বাধা ও কঠোর নিষেধাজ্ঞার কারণে সেসব তাঁদের মৃত্যুর সাথে সাথে হারিয়ে যায়। দ্বিতীয় খলীফার মৃত্যুর পরও এ নিষেধাজ্ঞা বেশ কিছুদিন বলবৎ ছিল।^৩ অবশেষে মধ্যপন্থী উমাইয়্যা খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজীজ মদীনার প্রশাসক ও কাযী আবু বকর ইবনে হাযমকে একখানা পত্র লিখে মহানবীর হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। কারণ তিনি (খলীফা) জ্ঞান লোপ পাওয়া ও হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন।^৪

সীরাত রচনায় অগ্রণীগণ

সৌভাগ্যবশত খলীফা শুধু মহানবী (সা.)-এর হাদীস লিখতে নিষেধ করেন। মহানবীর নবুওয়াতের সময়কালের ঘটনাবলী লেখার ব্যাপারে তত বেশি সীমাবদ্ধতা ছিল না। এ কারণে সেই সীমাবদ্ধতা থাকা অবস্থায়ই মহানবীর জীবন সম্পর্কে গ্রন্থাদি রচনা করা হয়। রিসালতের সময়ের ঘটনাবলী লেখকদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী যুবাইর ইবনে আওয়ামের পুত্র উরওয়া। তিনি হিজরী ৯২ বা ৯৬ সালে ইন্তেকাল করেন।^৬ তারপর একদল মদীনায় এবং আরো কিছুসংখ্যক ব্যক্তি বসরায় মহানবীর সীরাত এবং সশস্ত্র জিহাদের ঘটনাবলী সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত হন। তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব বর্ণনা আমাদের এ আলোচনার গণ্ডির বাইরে।

এসব গ্রন্থ পরবর্তীকালে মহানবী (সা.)-এর সীরাত বা ইসলামের ইতিহাস আকারে লেখা গ্রন্থাবলীর প্রাথমিক উৎসস্বরূপ। হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধ থেকে মহানবীর জীবনী রচনার কাজটি খুব সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে শিয়া মনীষী^৭ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (ওফাত ১৫১ হিজরী) ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব, যিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও রেওয়ায়েতসমূহ অবলম্বনে মহানবীর জীবনের ঘটনাবলী ও ইসলামের ইতিহাস এক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বা সমগ্র আকারে লিপিবদ্ধ করেন।

ইসলামের যুদ্ধসমূহ তথা সশস্ত্র জিহাদের বর্ণনা বিস্তারিত আকারে প্রথম লিপিবদ্ধ করেন ‘মাগাযী’ ও ‘ফুতুহুশ্ শাম’ - এর লেখক ওয়াকিদী। তিনি ২০৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ইবনে ইসহাকের সীরাহর সারসংক্ষেপ করেন ইবনে হিশাম আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক (ওফাত ২১৮ হিজরী)। এ গ্রন্থ ‘সীরাতে ইবনে হিশাম’ নামে বিখ্যাত। এ গ্রন্থ এখনো মহানবী (সা.)-এর জীবনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত। এসব মনীষীর কথা বাদ দিলেও অপর দু’জন মনীষীর নাম উল্লেখ করা যায়, যাঁরা মহানবীর জীবনী রচনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

১. মুহাম্মদ ইবনে সা’ দ কাতিব- ই- ওয়াকিদী (আল ওয়াকিদীর সচিব)। তিনি ২৩০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ‘তাবাকাতুল কুবরা’ র রচয়িতা। এ গ্রন্থে মহানবী (সা.) ও তাঁর সম্মানিত

সাহাবিগণের জীবনী সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ গ্রন্থ অতীতে লন্ডনে এবং সম্প্রতি লেবাননে নয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

২. মুহাম্মদ ইবনে জরীর তাবারী (ওফাত ৩১০ হিজরী)। তিনি বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ ‘তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক’ - এর রচয়িতা।

তাঁদের পরিশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের অর্থ এই নয় যে, তাঁরা যা কিছু লিখেছেন, তা (সবই) সঠিক ও যথার্থ। বরং তাঁদের রচনাও অন্যান্য গ্রন্থের মতো বেশ সূক্ষ্ম বিচার- বিশ্লেষণের দাবী রাখে। তাঁদের পর প্রতি শতকেই মহানবী (সা.)- এর জীবনী লেখার কাজটি অব্যাহত থাকে। বর্তমান শতকেও বিভিন্ন আঙ্গিকে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে মহানবীর জীবন নিয়ে বই রচনার কাজ ব্যাপকভাবে চলছে। ইসলামের মহান নবীর জীবনের যে পূর্ণাঙ্গতা, সেই বৈশিষ্ট্যের কারণেই এ কাজ অব্যাহত থাকবে।

এ গ্রন্থের লেখক তাঁর সীমিত সামর্থ্য নিয়ে চেষ্টা করেছেন যাতে মহানবীর জীবনের একটি বিশদ ব্যাখ্যা পেশ করা যায়। এক্ষেত্রে দুই পক্ষের অর্থাৎ শিয়া ও সুন্নী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য সূত্রসমূহের শরণাপন্ন হতে কুণ্ঠিত হন নি, যদিও সূত্র উল্লেখের সময় মা’ী সূত্রসমূহের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং প্রথম খণ্ডের শুরুতে তার কৈফিয়ত দিয়েছেন।

এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মহানবী (সা.)- এর তের বছরের মার জীবন এবং হিজরত- পরবর্তী দু’বছরের ঘটনাবলী সম্পর্কিত। এখন হিজরতের পর বাকী আট বছরের ঘটনাবলী শ্রদ্ধেয় পাঠকবর্গের খেদমতে পেশ করা হলো।

জাফর সুবহানী

হাওয়া- ই- এলমীয়াহ, কোম

বত্রিশতম অধ্যায় : তৃতীয় হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

উহুদ যুদ্ধ

দৃষ্টিকাড়া ঘটনাবলীর দিক থেকে হিজরতের তৃতীয় বছরটি দ্বিতীয় বছরের তুলনায় কম রক্তপূর্ণ নয়। হিজরী দ্বিতীয় সালে যদি বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে থাকে, তৃতীয় হিজরীতে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। দু’টি যুদ্ধই ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত রক্তপূর্ণ। উহুদ যুদ্ধই তৃতীয় হিজরীর একমাত্র যুদ্ধ নয়; বরং ঐ বছর কতক লো সারিয়াসহ বাহরান ও হামরাউল আসাদের মতো আরো কিছু গায্‌ওয়ান্‌ (যুদ্ধ) সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে আমরা এখানে একটি সারিয়া ও দু’টি গায্‌ওয়ান্‌র বিবরণ পেশ করব।

মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার সারিয়া

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের খবর দু’জন মুসলমান সৈনিকের মাধ্যমে মদীনায় পৌঁছে। তখনও বিজয়ী মুসলিম বাহিনী মদীনায় ফিরে আসেনি, ইত্যবসরে মায়ের দিক থেকে ইহুদী এবং কবিতা ও বাগ্মিতায় পারদর্শী কা’ব আশরাফ মুসলমানদের এ বিজয়ে দারুণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। সে জব রটনায় নেমে পড়ে এবং মদীনায় নানা অপ্রীতিকর সংবাদ ছড়ায়। সে সবসময়, এমনকি বদর যুদ্ধের আগেও তার কবিতায় মহানবী (সা.)-এর নিন্দা করত এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুদের উত্তেজিত করত। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ শুনে সে মন্তব্য করে : “ভূ-গর্ভ বা মাটির তলদেশ ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা উত্তম।” এরপর সে মার পথে রওয়ানা হয়। মায় সে কবিতা রচনা করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের উত্তেজিত করে। সে মদীনায় ফিরে আসার সময় মুসলমানদের অবমাননা করার ক্ষেত্রে এতখানি বেড়ে গিয়েছিল যে, তার কবিতায় মুসলিম মহিলাদের নাম উল্লেখ করে তাঁদের ব্যাপারে অবমাননাকর মন্তব্য করে। এ ধরনের লোক সত্যিকার অর্থেই পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের বাস্তব নমুনা ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত মহানবী (সা.) সিদ্ধান্ত নেন, তিনি তার অনিষ্টতা থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করবেন। তাই তার দফা রফা করার দায়িত্ব তিনি মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার হাতে অর্পণ করেন। তিনি কা’বকে হত্যা করার জন্য একটি চমৎকার পরিকল্পনা নেন। এর জন্য তিনি একটি দল গঠন করেন।

ঐ দলে কা' ব- এর দুধ- ভাই আবু নায়েলাকেও শামিল করেন যাতে করে তিনি এভাবে তাঁর পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হন। কা' ব- এর দুধ- ভাই আবু নায়েলা কা' ব- এর কাছে গেলেন। তাঁরা দু'জন বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন এবং কবিতাও পাঠ করলেন। এক সময় আবু নায়েলা কা' বের উদ্দেশে বললেন : “আমার একটি গোপন কথা আছে, যা তোমার কাছে বলতে চাই; কিন্তু তোমাকে অবশ্যই তা গোপন রাখতে হবে। সেই গোপন কথাটি হচ্ছে এ লোকটি (রাসূল) আমাদের শহরটিকে বিপদ- আপদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। গোটা আরব জাতি আমাদের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছে। সবাই আমাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে। এখন আমাদের পরিবার কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে অত্যন্ত অসহায় হয়ে গেছে।”

এ সময়ে কা' ব আবু নায়েলার বক্তব্যের সমর্থনে বলে : “আমি এ কথাটি তোমাকে আগেও বলেছিলাম। এখন আমার কাছে কী চাও?” আবু নায়েলা জবাব দিলেন : “আমি কিছু খাদ্য- দ্রব্য কিনতে এসেছি। আমার যেহেতু নগদ টাকা- পয়সা নেই, আমার কাছ থেকে কিছু জিনিস বন্ধক নাও। তোমার কাছ থেকে আমি সদ্যবহারই আশা করি।” কা' ব বলল : “তুমি কি তোমার স্ত্রীদের বন্ধক রাখতে পার?” আবু নায়েলা বললেন : “এটা কি ঠিক হবে যে, আমার স্ত্রীদেরকে তোমার কাছে বন্ধক রাখব। অথচ তুমি হলে ইয়াসরিবের (মদীনা) একজন সুদর্শন তরুণ।” তখন কা' ব বলল : “তা হলে তোমার ছেলেকে আমার কাছে বন্ধক রেখে যাও।” নায়েলা বলল : “তুমি কি আমাকে অপমানিত করতে চাও?”^৭ তখন তিনি বললেন : “আমি তো একা নই যে, তোমার কাছ থেকে খাদ্য- শস্য কিনতে চাই। আরো একদল লোক আমার সাথে আছে, তারাও এভাবে বন্ধক রেখে খাদ্য- শস্য কিনতে চায়। তারা তোমার কাছ থেকে খাদ্য- শস্য কিনে এর মূল্যের বিপরীতে তাদের যুদ্ধাস্ত্র বন্ধক রাখতে চায়।” কা' ব বলল : “অসুবিধা নেই।” অবশ্য যুদ্ধাস্ত্র বন্ধক রাখার প্রস্তাব ওঠানোর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তী বৈঠকে সশস্ত্র লোকদের দেখে সে যেন ঘাবড়ে না যায়; বরং ভাবে যে, এরা যুদ্ধাস্ত্র বন্ধক রাখার জন্য তার কাছে এসেছে।

আবু নায়েলা এরপর সেখান থেকে চলে গেলেন এবং এমন একটি দলের সাথে মিলিত হলেন যাদের সাথে কা' ব- এর বাড়িতে গিয়ে খাদ্য- সামগ্রী কেনা ও অস্ত্র বন্ধক রাখার নামে উপরিউক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা ছিল।

রাতের বেলা এ দলটি কা' ব- এর বাড়িতে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। তার বাড়ি ছিল একটি দুর্গের মাঝখানে। সেখানেই সে বসবাস করত। আবু নায়েলা কেবলার দরজার বাইরে থেকে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল। কা' ব দরজা খুলে দেয়ার জন্যে কক্ষের বাইরে গেল। সে সময় তার অল্পবয়স্কা স্ত্রী তাকে বাইরে যেতে বারণ করার চেষ্টা করছিল। সে বলছিল : “আমি এই ডাকের মধ্যে বিপদের আশংকা করছি।” কিন্তু কা' ব দরজা খুলে দিল এবং বাহ্যত খাদ্য- শস্য কেনার জন্য আসা দলটির সাথে কথা- বার্তায় মশ ল হলো। কথা- বার্তা নানা দিক থেকে জমে উঠল এবং বেশ অন্তরঙ্গ আসরের পরিবেশ সৃষ্টি হলো। তখন আবু নায়েলা আনুরোধ করলেন, বাদবাকী রাত ‘শেবুল আজয’ অর্থাৎ ‘বৃদ্ধাদের গিরিপথে’ গিয়ে সেখানেই খোশগল্পের আসরটা চালিয়ে যাওয়া হোক। সবাই প্রস্তাব মতো ঐ দিকে পথ চলতে লাগল। পথিমধ্যে আবু নায়েলা কা' ব- এর কানের লতির চুলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে নিয়ে নাকে ঝুঁকে বললেন : “আজ রাত পর্যন্ত এমন সুঘ্রাণ আমি কোনদিন ঝুঁকি নি।” তিনি আরো একবার এ কাজটি করলেন। তৃতীয় বারে তিনি তাঁর হাতটি কানের লতি বরাবর চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে শক্ত মুঠি করে চুল টেনে ধরলেন এবং সঙ্গীদের বললেন : “হত্যা কর। আল্লাহর দুষমনকে হত্যা কর।” সাথে সাথে এই ফিতনাসৃষ্টিকারীর দেহের ওপর তরবারি লো পতিত হলো। তার চিৎকারে কোন লাভ হলো না। আবু নায়েলাও তাঁর হাতের ছুরিটি কা' ব- এর নাভির নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে তার দফা রফা করে দিলেন। কা' ব- এর লাশ মাটিতে ফেলে রেখে তাঁরা চলে এলেন। মদীনার জান্নাতুল বাকী গোরস্তানে পৌঁছে সবাই তাকবীর ধ্বনি দিলেন এবং এর মাধ্যমে তাঁরা জানিয়ে দিলেন যে, তাঁদের অভিযান সফল হয়েছে। এভাবে মুসলমানদের সম্মুখ- পথ থেকে এক বিপজ্জনক উপাদান অপসারিত হলো।^৮

আরেক দুষ্ট নিধন

ইহুদী আবু রাফেও কা' ব- এর ভূমিকাই পালন করত। তার গোয়েন্দাগিরি আর উত্তেজনার বিষ ছড়ানোর মাত্রা কা' ব- এর চেয়ে কম ছিল না। কা' বকে হত্যার অল্প দিনের ব্যবধানেই সে নিহত হয়। এর বিবরণ ঐতিহাসিক ইবনে আসীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।^{১০}

যুদ্ধের ব্যয়ভার কুরাইশদের গ্রহণ

বহুদিন আগে থেকেই মায় বিব ও বিদ্রোহের বীজ বপন করা হয়েছিল। কান্নাকাটিতে বাধাদান কুরাইশদের মাঝে প্রতিশোধের স্পৃহা তীব্রতর করেছিল। মদীনা ও ইরাকের মধ্য দিয়ে মাবাসীদের বাণিজ্যপথ বন্ধ হয়ে যাওয়া তাদের সাংঘাতিকভাবে অসন্তুষ্ট ও উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। কা' ব আশরাফ অসন্তুষ্টির এ আনে ইন্ধন যুগিয়ে আরো প্রজ্বলিত করেছিল। এসব কারণে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ ও আবু জাহলের পুত্র ইকরামাহ আবু সুফিয়ানের কাছে প্রস্তাব দিল, যেহেতু কুরাইশ গোত্রপতি ও নেতারা এবং আমাদের বীরেরা মায়র বাণিজ্য কাফেলার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিহত হয়, কাজেই ঐ কাফেলায় যে ব্যক্তিরই ব্যবসায়িক পণ্য-সামগ্রী থাকুক, তাকে যুদ্ধের খরচ বাবদ কিছু পরিমাণ অর্থ দিতে হবে। এই প্রস্তাব আবু সুফিয়ান কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা বাস্তবায়ন করা হয়। কুরাইশ নেতারা মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং নিকট থেকে তাদের বীরত্ব ও আত্যাগের প্রমাণ বদরের প্রান্তরে দেখেছিল। কাজেই তারা সিদ্ধান্ত নিল, আরবের অধিকাংশ গোত্রের দক্ষ বীরদের নিয়ে গঠিত একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীর সাহায্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।

আমর ইবনুল আস এবং আরো কয়েকজনকে দায়িত্ব দেয়া হয় যাতে তারা কিনানাহ ও সাকীফ গোত্রে গিয়ে যোগাযোগ করে এবং তাদের কাছ থেকে সাহায্য সংগ্রহ করে। আর সেসব গোত্রের বীরদের মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নানাভাবে আহ্বান জানায় এবং তারা প্রতিশ্রুতি দেয়, যুদ্ধ এবং যাবতীয় সামরিক সাজ-সরঞ্জামের ব্যয়ভার কুরাইশরা বহন করবে। তারা ব্যাপক তৎপরতার মাধ্যমে কিনানাহ ও তিহামাহ গোত্র থেকে বেশ কিছুসংখ্যক বীর যোদ্ধা যোগাড় করতে এবং চার হাজার যোদ্ধার এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।^{১১}

যা কিছু বলা হলো, তা ঐসব লোকের সংখ্যা যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের যদি গণনায় নেয়া হয়, তা হলে সংখ্যা অনেক বেশি হবে। আরবদের মধ্যে এ প্রথার প্রচলন ছিল না যে, তারা মহিলাদের যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাবে। কিন্তু এবার কুরাইশদের মূর্তিপূজারী মহিলারাও পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধের ময়দানে আসে।

যুদ্ধে তাদের ভূমিকা ছিল এই যে, সৈন্যদের সারি লোর মাঝে তারা ঢোল- তবলা বাজাবে আর কবিতা পাঠ করবে এবং উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে পুরুষদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উৎসাহ যোগাবে।

মহিলাদের যুদ্ধের ময়দানে আনার আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল (সৈনিকদের) যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবার পথ বন্ধ করা। কেননা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানোর অর্থ ছিল তাদের স্ত্রী ও মেয়েদের বন্দী হবার ব্যবস্থা করা, আর আরবদের যে সাহসিকতা ও জাত্যাভিমানবোধ ছিল, তা কিছুতেই এমন কাজ করার প্রশয় দিত না।

বহু ক্রীতদাস নানা ধরনের উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিশ্রুতি পেয়ে কুরাইশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। হাবশী গোলাম ওয়াহশী ইবনে হারব ছিল মুত্ইমের ক্রীতদাস। যুদ্ধান্ত্র ‘যুবীন’ ব্যবহারে সে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। তাকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল, যদি সে ইসলামের প্রধান তিন ব্যক্তির (মুহাম্মদ- আলী- হামযা) মধ্য হতে কোন একজনকে হত্যা করতে পারে, তা হলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে। মোটকথা অনেক কষ্টে তারা একটি সেনাবাহিনী গঠন করে যেখানে সাত শ’ বর্মধারী সৈনিক, তিন হাজার উট, দু’শ অশ্বারোহী ও একদল পদাতিক সৈন্য অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মহানবী (সা.)- এর গোপন গোয়েন্দা

তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.)- এর চাচা হযরত আব্বাস ছিলেন একজন সত্যিকারের মুসলমান। কিন্তু তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেন। তিনি কুরাইশদের যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্পর্কে মহানবীকে অবহিত করেন। আব্বাস তাঁর স্বাক্ষর ও মোহরযুক্ত একখানা পত্র স্বহস্তে লিখে তা বনী গিফার গোত্রের এক ব্যক্তির হাতে অর্পণ করে প্রতিশ্রুতি নেন, তিন দিনের মধ্যে পত্রটি মহানবীর হাতে পৌঁছে দেবে। পত্রবাহক এমন সময় পত্রটি পৌঁছে দেয় যখন মহানবী

শহরের বাইরে এক বাগানে অবস্থান করছিলেন। লোকটি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে খামে বন্ধ পত্রটি মহানবীর হাতে অর্পণ করে। মহানবী পত্রটি পড়লেন; কিন্তু পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাহাবীগণকে কিছুই বললেন না।^{১১}

আল্লামা মাজলিসী^{১২} ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) পত্র লিখতেন না; কিন্তু পাঠ করতেন। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, মহানবী অবিলম্বে শত্রুদের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর সঙ্গীদের অবহিত করার তাকীদ অনুভব করেন। কাজেই মদীনা নগরীতে ফিরে আসার পর সবার উদ্দেশে পত্রটি পাঠ করা হয়।

কুরাইশ বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা

কুরাইশ বাহিনী যাত্রা করে কিছু দূর অতিক্রম করার পর ‘আবওয়া’ নামক স্থানে পৌঁছে, যেখানে মহানবীর মা হযরত আমেনাকে দাফন করা হয়েছিল। কুরাইশ বাহিনীর অস্ত্র- মস্তিষ্ক যুবকরা চাচ্ছিল, মহানবীর মায়ের কবর খনন করবে এবং তাঁর লাশ বের করে আনবে। কিন্তু তাদের মধ্যকার দূরদর্শী লোকেরা এই কাজের তীব্র নিন্দা করে। তারা বলল, এমন কাজ করলে তা পরবর্তীতে প্রথায় পরিণত হতে পারে, আর তখন বনী বকর ও বনী খোজাআ গোত্রভুক্ত আমাদের শত্রুরা আমাদের মৃত লোকদের কবর খুঁড়ে লাশ বের করতে পারে।

মহানবী (সা.) হিজরী তৃতীয় সালের ৫ শাওয়াল বৃহস্পতিবার রাতে ফুজালার পুত্র আনাস ও মুনিসকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য মদীনার বাইরে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, কুরাইশদের গতিবিধি সম্পর্কে খবরাখবর নিয়ে আসা। ঐ দু’জন যুবক সংবাদ নিয়ে এল, কুরাইশ বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেছে এবং তাদের বাহন লোকে মদীনার কৃষিভূমিতে চরার জন্য ছেড়ে দিয়েছে। হাব্বাব ইবনে মুনযির সংবাদ নিয়ে এল, কুরাইশ বাহিনীর অগ্রবর্তী দল মদীনার নিকটবর্তী হয়েছে। বৃহস্পতিবার এ কথার আরো সমর্থন পাওয়া গেল যে, মদীনার দিকে কুরাইশ বাহিনী আরো এগিয়ে এসেছে এবং উহুদ পর্বতের পাদদেশে তারা সেনা মোতায়েন করেছে। মুসলমানরা আশংকা করছিল, কুরাইশ বাহিনী রাতের বেলা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ক্ষতিসাধন করবে। এ কারণে আউস ও খায়রাজ গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকেরা যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে মসজিদে অবস্থান করে। রাত কেটে দিনের আলো বের হওয়া এবং যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত তারা মহানবীর বাসগৃহ এবং মদীনা নগরীর প্রবেশদ্বার লো পাহারা দিচ্ছিল।

উহুদ প্রান্তর

যে দীর্ঘ ও বিশাল উপত্যকা শামের বাণিজ্য-পথকে ইয়েমেনের সাথে যুক্ত করেছিল, সেই উপত্যকাকে ‘ওয়াদিউল কুরা’ নামে অভিহিত করা হতো। এখানকার যেখানেই বসতি স্থাপন করা সম্ভবপর ছিল, সেখানেই বিভিন্ন আরব ও ইহুদী গোত্র বসতি স্থাপন করেছিল। এদিক থেকে উপত্যকা জুড়ে বিভিন্ন জনপদ ও গ্রাম গড়ে উঠেছিল, যে লোর চতুর্দিক পাথর দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। এসব জনপদের কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিবেচিত হতো ইয়াসরিব যা ‘মদীনাতুর রাসূল’ বা সংক্ষেপে ‘মদীনা’ নামে অভিহিত হয়। ম া থেকে মদীনায় কেউ এলে তাকে অবশ্যই দক্ষিণ দিক থেকে এই কেন্দ্রীয় জনপদে প্রবেশ করতে হতো। কিন্তু এলাকাটি পাথুরে ও কংকরময় ছিল বলে সেখানে সৈন্য পরিচালনার কাজটি কষ্টকর ছিল। কুরাইশ বাহিনী যখন মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে, তখন যাত্রাপথ থেকে সরে এসে মদীনার উত্তর দিকে ‘আকীক’ উপত্যকায় উহুদ পর্বতের পাদদেশে সেনা মোতায়েন করে। খেজুর বাগান এবং সমতলভূমি না থাকায় জায়গাটি সব ধরনের সামরিক তৎপরতার জন্য উপযোগী ছিল। এদিক থেকেই মদীনা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল। কেননা এই এলাকায় প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা অপেক্ষাকৃত কমই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।

কুরাইশ বাহিনী তৃতীয় হিজরীর ৫ শাওয়াল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উহুদ পর্বতের পাদদেশে শিবির স্থাপন করে। মহানবী (সা.) সেই দিন এবং শুক্রবার রাত (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) মদীনায় অবস্থান করেন এবং শুক্রবার সামরিক পরামর্শ সভা ডাকেন। তিনি প্রতিরক্ষার কৌশল ও ধরন সম্পর্কে দূরদর্শী ব্যক্তি ও সমরবিশেষজ্ঞগণের সাথে পরামর্শ করেন।

প্রতিরক্ষা কৌশল সম্পর্কে পরামর্শ

মহানবী (সা.)- এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ- সামরিক ও এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গিগণের সাথে পরামর্শ করতে হবে এবং নিজের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাঁদের মতামতকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে করে তিনি এ কাজের মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদের জন্য একটি মহান আদর্শ ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন এবং সাহাবিগণের মাঝে গণমতসহ সত্যান্বেষণ এবং বাস্তবদর্শিতার মনোবৃত্তির উন্মেষ ঘটান। তবে এ ধরনের পরামর্শের দ্বারা কি মহানবী লাভবান হতেন? তাঁদের (সঙ্গী- সাথীদের) পরামর্শে তাঁর কি কোন উপকার হতো? ইলমে কালাম- এর মহীক্বহ হিসেবে স্বীকৃত মনীষীগণ এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এ বিষয়ে বিশদভাবে জানতে হলে সম্মানিত পাঠকদের ধর্মতত্ত্ববিদগণের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের শরণাপন্ন হতে হবে।^{১৩}

এসব পরামর্শ একটি জীবন্ত প্রক্রিয়া যা মহানবী (সা.)- এর সুন্নাত হিসেবে আজও বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর এ পদ্ধতি এতটা শিক্ষণীয় ও প্রভাবশালী ছিল যে, তাঁর ইত্তিকালের পর ইসলামের খলীফাগণ এ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তাঁরা সামরিক বিষয় ও সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে আমীরুল মুমিনীনের সমুল্লত চিন্তা ও মতামতকে পুরোপুরি স্বাগত জানিয়েছেন।^{১৪}

সামরিক পরিষদ

সেখানে সমবেত ইসলামী বাহিনীর বীর সৈনিক ও সেনাপতিগণের এক বিরাট সমাবেশে মহানবী (সা.) বলিষ্ঠ কণ্ঠে আহ্বান জানানলেন : “সেনাপতি ও সৈনিকরা! তাওহীদের চৌহদ্দির মধ্যে কুরাইশ বাহিনীর পক্ষ থেকে যে হুমকির সৃষ্টি হয়েছে, তা প্রতিরোধ পদ্ধতি কী হতে পারে, সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত কর।”

মদীনার মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই দুর্গ রক্ষার প্রস্তাব উত্থাপন করল। দুর্গ রক্ষার প্রস্তাব দানের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মুসলমানরা যেন মদীনার বাইরে না যায়; দালান- কোঠা ও বাড়ির

ছাদ ব্যবহার করে যেন তারা যুদ্ধ করে। মহিলারা ঘরের ছাদ ও উঁচু দালান থেকে দুশমনের ওপর পাথর নিক্ষেপ করবে, আর পুরুষরা রাস্তায় রাস্তায় হাতাহাতি যুদ্ধ করবে।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার কথা এভাবে শুরু করে : “আমরা অতীতে দুর্গ রক্ষার কৌশল ব্যবহার করতাম। মহিলারা ঘরের ছাদ থেকে আমাদের সাহায্য করত। এ কারণেই ইয়াসরিব নগরী এখনো অক্ষত রয়েছে। শত্রুরা এ পর্যন্ত এ নগরী দখল করতে পারে নি। যখনই প্রতিরক্ষার জন্য আমরা এ পস্থা গ্রহণ করেছি, বিজয়ী হয়েছি। আর যখনই শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করেছি, ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি।”

মুজাহিদ ও আনসারগণের মধ্যকার বয়স্ক ব্যক্তির এ প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু তরুণরা, বিশেষ করে যারা বদরের যুদ্ধে অংশ নেয় নি এবং যাদের মাথায় যুদ্ধের চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল, তারা এ প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধিতা করছিল এবং বলছিল : “প্রতিরক্ষার এ কৌশল শত্রুদের সাহস বাড়িয়ে দেবে। বদর যুদ্ধে মুসলমানরা যে গৌরবের অধিকারী হয়েছিল, তা হাতছাড়া হয়ে যাবে। এটা কি দূষণীয় নয় যে, আমাদের বীর সেনানী এবং আত্মসর্গকারী যোদ্ধারা ঘরে বসে থেকে শত্রুকে নিজেদের ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দেবে? আমরা বহুদিন থেকে এমন দিনের অপেক্ষায় ছিলাম। এখন সে সুযোগ আমাদের সামনে উপস্থিত। ইসলামের সাহসী বীর সেনাধ্যক্ষ হামযাহ বললেন : “সেই মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। শহরের বাইরে গিয়ে শত্রুর সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত আজ খাদ্য গ্রহণ করব না।” শেষ কথা হলো ইসলামী সেনাবাহিনীকে নগরীর বাইরে যেতে এবং নগরীর বাইরে গিয়েই শত্রুর সাথে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে হবে।^{১৫}

শাহাদাতের জন্য লটারী

জাগ্রত ও প্রাণবন্ত হৃদয়ের অধিকারী বৃদ্ধ খুসাইমাহ্ দাঁড়িয়ে বললেন : “হে রাসূলুল্লাহ! কুরাইশরা পুরো একটি বছর চেষ্টা করে আরব গোত্র লোকে নিজেদের দলে ভেড়াতে সক্ষম হয়েছে। যদি আমরা এ নগরী রক্ষার জন্য বাইরে না যাই, তা হলে তারা মদীনা অবরোধ করবে। তারা অবরোধ প্রত্যাহার করে মায় ফিরে যেতেও পারে। কিন্তু এ কাজই তাদের স্পর্ধার কারণ হবে। আমরা ভবিষ্যতে তাদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকতে পারব না। আমি এজন্য আফসোস করছি, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য আমার হয় নি, যদিও আমি এবং আমার সন্তান আন্তরিকভাবেই যুদ্ধে অংশগ্রহণে আগ্রহী ছিলাম। আমরা উভয়ে এ সৌভাগ্যের ব্যাপারে পরস্পর প্রতিযোগিতা করছিলাম।

শেষ পর্যন্ত সে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এবং আমি সফল হই নি। আমি বদর যুদ্ধে আমার ছেলেকে বলেছিলাম, তুমি তরণ, তোমার বহু চাওয়া- পাওয়া আছে। তুমি তোমার যৌবনকালকে এমন পথে ব্যয় করতে পার যে পথে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে। কিন্তু আমার জীবন তো ফুরিয়ে এসেছে। আমার ভবিষ্যত পরিষ্কার নয়। আমার এই পবিত্র জিহাদে (বদর যুদ্ধে) অংশগ্রহণ করতে হবে। তুমি আমার স্থানে থেকে আমার পরিবার- পরিজনের দেখাশুনার দায়িত্ব পালন কর। কিন্তু এ ব্যাপারে তার প্রচণ্ড আগ্রহ ও প্রচেষ্টা এত অধিক ছিল যে, দু’পক্ষ লটারী করতে বাধ্য হলাম। লটারীতে তার নাম ওঠে। সে বদর যুদ্ধে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে। গত রাতে এ দুর্গের সর্বত্র কুরাইশদের অবরোধ নিয়েই আলোচনা হয়েছে। সে চিন্তা নিয়েই আমি ঘুমিয়েছিলাম। আমার প্রিয় সন্তানকে স্বপ্নে দেখতে পেলাম। সে বেহেশতের বাগানসমূহে পায়চারী করছে। সে সেখানকার ফলমূল খাচ্ছে। সে ভালোবাসায় ভরা ব্যাকুল কণ্ঠে আমার দিকে তাকিয়ে বলল : আব্বাজান! আমি তোমার অপেক্ষায় আছি। হে রাসূলুল্লাহ! আমার দাঁড়ি সাদা এবং আমার হাঁড় লো দুর্বল হয়ে গেছে। আমার একান্ত অনুরোধ, আমার জন্য আপনি আল্লাহর দরবারে শাহাদাত লাভের দুআ করুন।” ১৬

ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের আত্যাগী ও শাহাদাত পিপাসু বহু ব্যক্তিত্বকেই দেখতে পাওয়া যায়। যে আদর্শ অস্তিত্বশীল জগতের উৎসমূল ও পরকালের আদর্শে বিশ্বাসী নয়, সে আদর্শের পক্ষে খাইসামার মতো আত্যাগী বীর যোদ্ধা সৃষ্টি করা সহজ কাজ নয়।

এ বীরত্ব ও আত্যাগের মনোবল, এ ত্যাগ ও প্রাণপণ সংগ্রাম- যা একজন যোদ্ধা মহান আল্লাহর বাণী ও তাওহীদী ধর্মকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং শাহাদাত লাভের পথে ক্রন্দন করার মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষা করে, তা মহান নবিগণের আদর্শ ছাড়া দ্বিতীয় কোন আদর্শে পাওয়া সম্ভব নয়।

আজকের বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশ লোতে প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা ও অধিনায়কদের জীবন-মানের প্রতি অত্যধিক রুত্ব দেয়া হয়। এ সত্ত্বেও যুদ্ধ লোয় যেহেতু তাদের লক্ষ্য থাকে বিদ্যমান অবস্থা বহাল রাখা বা আরো উন্নত জীবনের অধিকারী হওয়া, সেহেতু তাদের কাছে নিজের জীবনের নিরাপত্তা সর্বাধিক রুত্বপূর্ণ ও মূল লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু মহান নবিগণের আদর্শে লড়াই করতে হয় আল্লাহর সম্ভ্রুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য শাহাদাতই একমাত্র পথ। তাই আল্লাহর সৈনিকরা কোন ভয়-ভীতি ছাড়াই প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে নিজেদের সব ধরনের বিপদের মুখে সঁপে দেয়।

শূরা বা পরামর্শ সভার ফলাফল

মহানবী (সা.) অধিকাংশের মতামতকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করেন। তিনি নগরীর বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করাকে দুর্গ রক্ষা এবং হাতাহাতি লড়াই বা মল্লযুদ্ধের ওপর স্থান দেন। আসলে হামযাহ্ ও সা' দ ইবনে উবাদার মতো সেনাধ্যক্ষগণের পক্ষ হতে জোর দাবি ওঠার পর মদীনার চিহ্নিত মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের মতামত গ্রহণ ও অগ্রাধিকার প্রদান করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এসব ছাড়াও মদীনার সরু অলি- গলিতে বিশৃঙ্খল হাতাহাতি লড়াই, নারীদের প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োগ, নিজেরা ঘরে বসে থেকে শত্রুর জন্য প্রবেশপথ খুলে দেয়া মুসলমানদের দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের পরিচায়ক ছিল।

বদর যুদ্ধে যেভাবে শক্তির মহড়া দেয়া হয়েছে, তার সাথে কোনভাবেই এ লো তুলনীয় ও সংগতিশীল ছিল না। মদীনা অবরোধ, শহরের প্রবেশপথে শত্রুসেনা মোতায়েন হওয়া ও তাদের মুকাবিলায় ইসলামের সৈনিকদের নির্বিকার থাকা ইসলামের মুজাহিদগণের শৌর্য- বীর্যের চেতনা ও মনোবল ধ্বংস করে দিত।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর প্রতি দুরভিসন্ধি এঁটেছিল। হয় তো তার উদ্দেশ্য ছিল মহানবীর ওপর একটি মারা ক আঘাত হানা। মহানবী যুদ্ধের পোশাক পরিধান করলেন এবং প্রতিরক্ষার কৌশল নির্ধারণের পর বাড়ির ভেতর গেলেন। তিনি বর্ম পরলেন এবং তরবারী ঝুলিয়ে নিলেন। পিঠের উপর একখানা ঢাল, কাঁধে একটি ধনুক ঝুলিয়ে এবং হাতে বল্লম নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

এ দৃশ্য দেখে মুসলমানরা প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হলেন। কেউ কেউ ধারণা করলেন, নগরীর বাইরে যাবার জন্য তারা যে পীড়াপীড়ি করেছেন, তাতে তাঁর সম্মতি ছিল না। তাঁরা অনর্থক তাঁকে মদীনার বাইরে যেতে বাধ্য করেছেন। এ কারণে তাঁরা দোষ স্বীকারের উদ্দেশ্যে আরজ করলেন : “আমরা প্রতিরক্ষার কৌশলের ক্ষেত্রে আপনার মতামতের অধীন। বাইরে যাওয়া যদি কল্যাণকর না হয়, তা হলে আমরা এখানেই অবস্থান করব।” মহানবী বললেন :

ما ينبغي لني إذا لبس لامته أن يضعها حيي يُقاتل

“কোন নবী যখন বর্ম পরিধান করেন, তখন শত্রুর সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত তা খুলে ফেলা উচিত নয়।” ১৭

মহানবী (সা.)- এর মদীনার বাইরে গমন

মহানবী (সা.) জুমআর নামায আদায় করেন এবং এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী সাথে নিয়ে উহুদের উদ্দেশে মদীনা ত্যাগ করেন। তিনি উসামাহ্, যাইদ ইবনে হারিসাহ্ ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের মতো যারা অল্পবয়স্ক ছিল, তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অনুমতি দিলেন না; কিন্তু ‘সুমরা’ ও ‘রাফে’ নামের অনূর্ধ্ব ১৫ বছরের দুই কিশোরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন। কেননা তারা ছোট হলেও তীর নিক্ষেপ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষ ছিল।

ইতোমধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের সাথে চুক্তিবদ্ধ একদল ইহুদী এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু মহানবী বিশেষ বিবেচনার কারণে তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন নি। মাঝপথে ইসলামী বাহিনী যখন মদীনা ও উহুদের মধ্যবর্তী ‘শওত’ নামক স্থানে পৌঁছল, তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই- মহানবী (সা.) যুবকদের মতামত গ্রহণ করেছেন, তার মতামতকে রুত্ব দেন নি- এ অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে। শুধু তা-ই নয়, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের স্বগোত্রীয় আউস গোত্রের তিন শ’ ব্যক্তি মাঝপথ থেকে ফিরে যায়। কাজেই এ যুদ্ধে না ইহুদীরা অংশগ্রহণ করেছে, না মুনাফিক গোষ্ঠী অংশগ্রহণ করেছে।

মহানবী (সা.)- এর সাহাবীগণ চেয়েছিলেন, নিকটতম পথ অতিক্রম করে নিজস্ব সেনাশিবিরে গিয়ে পৌঁছবেন। কিন্তু ঐ মুহূর্তে তিনি ‘মুরাব্বা’ নামক এক মুনাফিকের বাগান অতিক্রম করে যেতে বাধ্য হন। তার ভূ- সম্পত্তিতে ইসলামী বাহিনী প্রবেশ করায় এক ঐমিবশত সে ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়। এমনকি সে মহানবীর প্রতি বেয়াদবীপূর্ণ উক্তিও করে। মহানবীর সাহাবীগণ তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বললেন : “এই অন্ধ হৃদয়ের অধিকারী গোঁয়ার লোকটিকে বাদ দাও।” ১৮

দু'জন আত্মোৎসর্গী সৈনিক

মহানবী (সা.) এক জায়গায় তাঁর সৈনিকদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন। তাদের আবে ১৭সর্গী অবয়ব ও উজ্জ্বল চেহারা তরবারির ঝলকানির মাঝে আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে চমকাচ্ছিল। মহানবী ইসলাম ধর্মের প্রতিরক্ষার জন্য যে সেনাবাহিনী উল্হদ প্রান্তরে নিয়ে এসেছেন, বয়সের দিক থেকে তাদের মধ্যে অনেক তারতম্য ছিল। অনেকেই ছিলেন বয়স্ক, আবার একদল ছিলেন আবে ১৭সর্গী যুবক, যাদের বয়স ১৫ বছর অতিক্রম করে নি।

তাদের প্রেরণার একমাত্র উৎস পূর্ণতা অর্জনের প্রেম ও আগ্রহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যা তাওহীদী আদর্শ রক্ষা করার আলোকে তাদের মধ্যে অস্তিত্ব লাভ করেছিল ও বিদ্যমান ছিল। বিষয়টি প্রমাণের জন্য আমরা এক বৃদ্ধ ও এক তরুণের কাহিনী তুলে ধরব, যার সদ্য বিয়ের পর একটি মাত্র রাত অতিক্রান্ত হয়েছিল।

১. আমার ইবনে জমূহ: বয়সের ভারে ন্যূজ বৃদ্ধ; দৈহিক শক্তি বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। একটি ঘটনায় তাঁর এক পায়ে আঘাত লেগেছিল। তিনি তাঁর সাহসী চার পুত্রসন্তানকে ইসলাম ধর্ম রক্ষা করার জন্য যুদ্ধের ময়দানে প্রেরণ করেন। তাঁর হৃদয় শুধু এ কারণে আলোকিত হয়েছিল যে, তাঁর সন্তানরা সত্যের পথে তরবারি চালনা করছে।

তিনি চিন্তা করে দেখলেন, যুদ্ধ থেকে তাঁর দূরে থাকা অন্যায় হবে। কেন তিনি এমন সৌভাগ্য হাতছাড়া করবেন? তাঁর আ'ীয়- স্বজনরা তাঁকে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখছিল। তারা জোরালো ভাষায় বলছিল : “ইসলামের বিধি- বিধান আপনার কাঁধ থেকে সব ধরনের দায়িত্ব তুলে নিয়েছে অর্থাৎ আপনাকে অব্যাহতি দিয়েছে।” তাদের কথা এ বৃদ্ধকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। তিনি নিজেই মহানবীর নিকট উপস্থিত হন এবং বলেন : “আমার আ'ীয়- স্বজন আমাকে জিহাদের ময়দানে যেতে বাধা দিচ্ছে। আপনার মত কী? আমার মনে শাহাদাত লাভ করার আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমি বেহেশতের দিকে উড়ে যেতে চাই।” মহানবী (সা.) তাঁকে বললেন :

اما انت فقد عذرك الله و لا جهاد عليك

“মহান আল্লাহ্ আপনাকে অপারগ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার কোন দায়িত্ব নেই।”^{১৯}

তিনি অনুরোধের পর অনুরোধ করেন; কাকুতি- মিনতি করতে থাকেন। আ'ীয়- স্বজনরা তাঁকে বেষ্টন করে রেখেছিল। মহানবী তাঁর আ'ীয়- স্বজনের উদ্দেশে বললেন : “যে ইসলামের রাস্তায় শাহাদাতের শরবত পান করতে চায়, তাকে তোমরা বাধা দিও না।” অতঃপর তিনি বাড়ি ত্যাগ করে রওয়ানা হন এবং রওয়ানা হওয়ার সময়ে বলেন :

اللهم ارزقني الشهادة و لا تردني إلى أهلي

“হে আল্লাহ! আমাকে তোমার রাস্তায় শহীদ হবার তওফীক দাও। আমাকে আর ঘরে ফিরিয়ে এনো না।”

উহুদ যুদ্ধের উত্তেজনাকর মুহূর্ত লোর অন্যতম ছিল এই বৃদ্ধ খোঁড়া লোকটির বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ। তিনি খোঁড়া পায়ে আক্রমণ করছিলেন এবং বলছিলেন : “আমার প্রত্যাশা বেহেশত।” তাঁর এক ছেলেও পিতার পেছনে পেছনে চলছিল। দু'জনই এত প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করেন যে, উভয়ে শাহাদাত লাভ করেন। তাঁর অপর ভাই আবদুল্লাহ্ও এ যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন।^{২০}

২. হানযালা : তিনি ছিলেন এমন এক যুবক যাঁর জীবন- বসন্ত থেকে ২৪ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয় নি। তিনি يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ ‘তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন অর্থাৎ অপবিত্র পিতাদের থেকে পবিত্র সন্তানদের সৃষ্টি করেন- এ আয়াতের বাস্তব নমুনা ছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)- এর শত্রু আবু আমীরের সন্তান ছিলেন। সে ছিল ঐ সব ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত, যারা ইসলাম ধর্মের অনিষ্ট কামনা করত। সে মহানবীর বিরুদ্ধে কুরাইশদের যুদ্ধের উস্কানিদাতাদের মধ্যে গণ্য ছিল। সে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা করার ব্যাপারে অবহেলা করে নি। সে মসজিদে যেরার ঘটনার অন্যতম নায়ক ছিল। (আমরা নবম হিজরীর ঘটনাবলীর বিবরণে সে সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পেশ করব।)

সন্তানের পিতার প্রতি যে আবেগ, তা কিন্তু পিতার বিরুদ্ধে উহুদের ময়দানে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হানযালাকে বাধা দেয় নি। উহুদ যুদ্ধের আগের রাতটি ছিল তাঁর বিয়ের রাত। আউস গোত্রের

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বাধ্য হয়ে ঐ রাতেই তাঁকে বাসর রাতের অনুষ্ঠান লো সম্পন্ন করতে হয়েছিল।

যুদ্ধের ডাক তাঁর কানে এসে বাজলে তিনি অনেকটা দিশেহারা হয়ে পড়েন। সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের সামনে উপস্থিত হয়ে একটি রাত মদীনায় অবস্থান করা এবং পরের দিনই যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাওয়া ছাড়া তিনি আর কোন উপায় দেখতে পেলেন না। মরহুম মাজলিসীর বর্ণনা অনুযায়ী নিম্নের আয়াত তাঁর শানেই নাযিল হয়েছে^{১১} :

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأُذِنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ)

“ঐ লোকেরাই মুমিন যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর যখন কোন সাধারণ জনগণের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কাজের জন্য তাঁর কাছে সবাই উপস্থিত হয়, তখন তাঁর অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত তারা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। যারা আপনার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে। যদি তারা তাদের কোন বিশেষ বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আপনার কাছ থেকে অনুমতি নেয়, তা হলে তাদের মধ্যে যাকে আপনার ইচ্ছা তাকে অনুমতি দিন।”^{১২}

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য রাসূল তাঁকে এক রাতের অনুমতি দান করেন। পরদিন সকালে হানযালা জানাবতের (যৌন কারণে অপবিত্রতার) গোসল না করাই ময়দানে ছুটে যান। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে নববধূ- যার সাথে দাম্পত্য জীবনের মাত্র একটি রাত অতিবাহিত হয়েছিল- তাঁর দু’চোখ অশ্রুতে ভরে যায়। স্বামীর কাঁধে হাত রেখে অনুরোধ করলেন- ‘আর কিছুক্ষণ থাক’। তিনি যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত চার জন পুরুষকে সাক্ষী করলেন যে, বিগত রাতে তাঁর ও তাঁর স্বামীর মধ্যে মিলন হয়েছে।

হানযালা বাড়ী থেকে রওনা হন। নববধূ ঐ চার ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন : “গতকাল আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, আকাশ ফেটে গেছে এবং আমার স্বামী তাতে প্রবেশ করছেন। এরপর ফাটলটি বন্ধ

হয়ে যায়। এ স্বপ্ন দেখে আমি মনে করছি যে, আমার স্বামীর রুহ উর্ধ্ব আকাশ পানে পাড়ি জমাবে এবং তিনি শাহাদাতের শরবত পান করবেন।”

হানযালা সেনাদলে শামিল হন। তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ হলো আবু সুফিয়ানের প্রতি, যে দুই সেনাবাহিনীর মাঝখানে টহল দিচ্ছিল। তিনি বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়ে আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে তরবারির আঘাত হনলেন। কিন্তু তরবারি আঘাত করল আবু সুফিয়ানের ঘোড়ার পিঠে। আর আবু সুফিয়ান মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার হৈ চৈ শুনে কুরাইশ বাহিনীর একদল সৈন্য তাকে ঘিরে ধরল। শাদ্দাদ লাইসী হানযালার ওপর হামলা করল। এ হামলার ফলে হানযালার হাত থেকে আবু সুফিয়ান রেহাই পেল। কুরাইশ বাহিনীর মধ্য থেকে বর্শাধারী এক সৈনিক হানযালার ওপর হামলা করল এবং তাঁর দেহে বর্শা ঢুকিয়ে দিল। হানযালা সেই যখম নিয়েই বর্শাধারীকে ধাওয়া করলেন এবং হাতের তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করলেন। তিনি নিজেও আঘাতের কারণে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

মহানবী (সা.) বলেছেন : “আমি দেখতে পেলাম, ফেরেশতারা হানযালাকে গোসল দিচ্ছে।” এ কারণে তাঁকে *غسيل الملائكة* ‘গাসীলুল মালাইকাহ’ (ফেরেশতারা যাঁর লাশের গোসল দিয়েছে এমন ব্যক্তি) নামে আখ্যায়িত করা হয়। আউস গোত্র তাদের গৌরব কীর্তির কথা স্মরণ করলে এভাবে বলত : *و منّا حنظلة غسيل الملائكة* “আমাদের মাঝে আছেন হানযালা, যাঁকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছিলেন।”

আবু সুফিয়ান বলত : “তারা যেহেতু বদর যুদ্ধে আমার ছেলে হানযালাকে হত্যা করেছে, সেহেতু আমিও উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের হানযালাকে হত্যা করেছি।”

এই বর ও নববধূর ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক। কেননা তাঁরা ছিলেন সত্যের পথে কুরবান; অথচ নববধূ ও বর উভয়ের পিতারা ছিল ইসলামের চরম শত্রু। নববধূর পিতা ছিল মদীনার মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে আবী সালল। আর হানযালা ছিলেন জাহিলী যুগের পুরোহিত আবু আমীরের সন্তান। ইসলামের (চূড়ান্তভাবে) আবির্ভাবের পরে আবু আমীর

মার মুশরিকদের দলে যোগ দেয় এবং হিরাক্লিয়াসকে তরণ ইসলামী হুকুমতকে ধ্বংস করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

দুই বাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতি

তৃতীয় হিজরীর ৭ শাওয়াল ভোরে ইসলামী সেনাবাহিনী কুরাইশদের আগ্রাসী বাহিনীর মুকাবিলায় নিজেদের সারিবদ্ধ করে। ইসলামী সেনাবাহিনী এমন স্থানে মোতায়েন করা হয়, যার পশ্চাতে একটি প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিরক্ষা ব্যূহ অর্থাৎ উহুদ পর্বত ছিল। কিন্তু পাহাড়ের মাঝখানে একটি বিশেষ ফাটল ছিল। তাতে আশংকা ছিল, শত্রুবাহিনী উহুদ পর্বতের পেছন দিক থেকে এসে পাহাড়ের ঐ ফাটল বা গিরিপথ দিয়ে পেছন থেকে মুসলিম বাহিনীর ওপর হামলা করে বসতে পারে।

মহানবী (সা.) এ আশংকা দূর করার জন্য টিলার উপরে দুই দল তীর নিষ্ক্ষেপকারী সেনা মোতায়েন করেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে তাদের অধিনায়ক নিযুক্ত করে নির্দেশ দেন : “তোমরা তীর নিষ্ক্ষেপ করে শত্রুদের তাড়িয়ে দেবে। পেছন থেকে তোমাদের ওপর আক্রমণ করার সুযোগ দেবে না। আমাদের ওপর যেন তারা অতর্কিতে আক্রমণ করতে না পারে। আমরা যুদ্ধে জয়ী হই বা পরাজিত হই, তোমরা এ স্থান ছেড়ে চলে আসবে না।” ২৩

উহুদ যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে, এই গিরিপথটি কতখানি রুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর ছিল। জয় লাভের পর মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটেছিল এ কারণে যে, (গিরিপথে মোতায়েন) তীর নিষ্ক্ষেপকারী সৈন্যরা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছিল এবং স্পর্শকাতর বাস্কারটি তারা ছেড়ে দিয়েছিল। এর ফলে পরাজিত পলাতক শত্রুবাহিনী সেই গিরিপথের পেছন দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে সবাইকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলে।

মহানবী (সা.) যে তীর নিষ্ক্ষেপকারী মুসলিম সেনাদের কোন অবস্থায়ই গিরিপথের মুখের অবস্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন, তা প্রমাণ করে যে, তিনি সামরিক কৌশল সম্পর্কে পূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিলেন। এ থেকে আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, সেনাধিনায়কের সামরিক মেধা, দক্ষতা ও বিচক্ষণতাই বিজয়ের একমাত্র গ্যারান্টি নয়, যদি অধীন সৈনিকরা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে।

সেনা মনোবল শক্তিশালী করণ

মহানবী (সা.) যুদ্ধে সৈনিকদের মনোবল চাঙ্গা রাখার ব্যাপারে সবসময় মনোযোগী ছিলেন। এবারও যখন (মাব্বপথ থেকে তিন শ' লোকের মুনাফিক দলটি মুসলমানদের ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর) কেবল সাত শ' মুসলিম যোদ্ধা তিন হাজার শত্রু-সৈন্যের মোকাবেলায় দাঁড়ালো তখন মহানবী এক ভাষণ প্রদান করে তাদের মনোবল দৃঢ় করেন। ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আল ওয়াকিদী বলেন :

মহানবী (সা.) 'আইনাইন' গিরিপথে ৫০ জন তীর নিষ্ক্ষেপকারী সৈন্য মোতায়ন করেন; উহুদ পর্বত পেছনে এবং মদীনা সামনে রেখে অবস্থান নেন। তিনি হেঁটে হেঁটে সৈন্যদের সারি লো বিন্যস্ত করছিলেন এবং প্রত্যেক অধিনায়কের অবস্থান নির্দিষ্ট করে দিচ্ছিলেন। একদলকে সামনে এবং একদলকে পেছনে রাখছিলেন। সৈন্যদের সারি সুবিন্যস্ত করার ব্যাপারে তিনি এতই সতর্কতা দেখিয়েছিলেন যে, কোন সৈনিকের কাঁধ সামনের দিকে এগিয়ে আসলে সাথে সাথে তাকে পেছনে সরিয়ে দিচ্ছিলেন।

মহানবী সৈন্যদের সারি বিন্যস্ত করার পর মুসলমানদের উদ্দেশে বললেন : “মহান আল্লাহ আমাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি তা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি : তোমরা মহান আল্লাহর আদেশের আনুগত্য কর। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকবে।” এরপর তিনি বলেন : “শত্রুর মুকাবেলা করা অনেক কঠিন ও কষ্টকর। এই শত্রুর মুকাবেলায় দৃঢ় পদ ও অবিচল থাকার লোকের সংখ্যা খুবই কম। কেবল তারাই শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে সক্ষম, যাদের আল্লাহ হিদায়েত করেছেন এবং শক্তি যুগিয়েছেন। কেননা মহান আল্লাহর আদেশ পালনকারীদের সাথেই তিনি আছেন। শয়তান ঐ লোকদের সাথে আছে যারা মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করে। সবকিছুর আগে জিহাদের ময়দানে অবিচল থাকবে। এর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুত সৌভাগ্যের অধিকারী হবে।^{২৪} ওহী আনয়নকারী ফেরেশতা জিবরীল আমাকে বলেছেন : এ জগতে কোন ব্যক্তিই তার (জন্য বরাদ্দ) রিয়কের সর্বশেষ দানাটি আহর না করা পর্যন্ত

মৃত্যুবরণ করে না। যতক্ষণ যুদ্ধের নির্দেশ জারি না হয়, কেউ যেন আক্রমণ পরিচালনা না করে।”

২৫

যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ শত্রুবাহিনী

আবু সুফিয়ান তার বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করে মাঝখানে বর্ম পরিহিত পদাতিক বাহিনী মোতায়ন করে। খালিদ ইবনে ওয়ালীদের অধিনায়কত্বে একদলকে মোতায়ন করে ডান পাশে।

অপর এক দলকে ইকরামার অধিনায়কত্বে মোতায়ন করে বাম দিকে।

এছাড়া সে অগ্রবর্তী দলরূপে একটি বিশেষ দলকে সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগে মোতায়ন করে যার মধ্যে পতাকাবাহীও ছিল। এরপর বনী আবদুদদার গোত্রভুক্ত পতাকাবাহীদের সম্বোধন করে আবু সুফিয়ান বলল : “সেনাবাহিনীর বিজয় তোমাদের দৃঢ়পদ থাকার ওপর নির্ভরশীল এবং আমরা বদরের দিন এ অংশের দিক থেকেই আক্রান্ত হয়ে পরাজয় বরণ করেছি। যদি বনী আবদুদদার গোত্র পতাকা বহন ও রক্ষার ব্যাপারে যোগ্যতার প্রমাণ না দেয়, তা হলে পতাকা বহনের দায়িত্ব অন্য কোন গোত্রের কাঁধে চলে যাবে।” কুরাইশ বাহিনীর প্রথম পতাকাবাহী বীর যোদ্ধা তালহা ইবনে আবি তালহার কাছে কথাটি মারা ক বলে মনে হলো। তাই সে তৎক্ষণাৎ ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে প্রতিপক্ষের মল্লযোদ্ধাদের আহবান জানাল।

মনস্তাত্ত্বিক উৎসাহ

যুদ্ধ শুরু হবার আগে মহানবী একখানা তরবারি হাতে নিলেন। স্বীয় সেনাবাহিনীর বীর যোদ্ধাদের উৎসাহ যোগাতে তাদের লক্ষ্য করে বললেন : “কোন ব্যক্তি এ তরবারি ধারণ করে তার হক আদায় করবে?”^{২৬} কিছু লোক সাড়া দিলেন। কিন্তু মহানবী তাদেরকে তরবারি দিতে সম্মত হলেন না। এর মধ্যে অকুতোভয় সৈনিক আবু দুজানাহ সাড়া দিয়ে বললেন, “এই তরবারীর হক বলতে কি বুঝায়? কিভাবে এর হক আদায় করা যাবে?” মহানবী বললেন : “এটা নিয়ে এমনভাবে যুদ্ধ করবে যাতে তা বাঁকা হয়ে যায়।” আবু দুজানাহ বললেন : “আমি এর হক আদায় করতে প্রস্তুত আছি।” এরপর ‘মৃত্যুর রুমাল’ নামে বিখ্যাত একটি লাল রঙের রুমাল মাথায় বেঁধে মহানবীর হাত থেকে ঐ তরবারি তুলে নেন। আবু দুজানাহ যখনই এ রুমালটি মাথায় বাঁধতেন, তখনই বোঝা যেত, যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ তিনি লড়াই করে যাবেন।

তিনি এক গর্বিত চিতাবাঘের মতো পথ চলছিলেন। আজ তাঁর সৌভাগ্যের জন্য তিনি অতিশয় আনন্দিত। মাথায় লাল রঙের পিঁ তাঁর মর্যাদা ও গৌরব আরো বৃদ্ধি করছিল।^{২৭}

সত্যিই যে সেনাবাহিনী একমাত্র সত্য ও নৈতিকতার জন্য যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়, যাদের সামনে নিজ বিশ্বাসের স্বাধীনতা ও পূর্ণতা অর্জনের প্রেম ছাড়া আর কোন লক্ষ্য নেই, তাদের জন্যে এ ধরনের মহড়া হচ্ছে সর্বোত্তম উদ্দীপক। মহানবীর লক্ষ্য কেবল আবু দুজানাকে উৎসাহিত করাই ছিল না; বরং তিনি এ কাজের দ্বারা সাহাবীগণের আবেগকেও শাণিত করেন। তাঁদেরকে একথা বুঝিয়ে দেন যে, তাঁদের সিদ্ধান্ত ও বীরত্ব এমন পর্যায়ে হতে হবে যে, এর ফলে তাঁরাও এ ধরনের সামরিক পদক পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন।

যুবাইর ইবনে আওয়াম ছিলেন এক বীর যোদ্ধা। মহানবী (সা.) হাতের তরবারিখানা তাঁকে না দেওয়ায় তিনি মনে দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি মনে মনে বললেন : “আবু দুজানার বীরত্ব ও সাহসের মাত্রা স্বচক্ষে দেখার জন্য আমি তাঁর পিছু নেব।” তিনি বললেন : “আমি যুদ্ধের ময়দানে তাঁর পেছনে পেছনে ছিলাম। দেখেছিলাম, যে বীর যোদ্ধাই তাঁর সামনে আসছিল, তিনি সাথে

সাথে তাকে খতম করে দিচ্ছিলেন। কুরাইশ বাহিনীর মধ্যে এক বীর ছিল, যে মুসলমানদের মধ্যকার আহতদের মাথা ত দ্বিখণ্ডিত করছিল। এ কাজ দেখে আমি ভীষণ দুঃখিত হয়েছিলাম। ঘটনাক্রমে লোকটি আবু দুজানার মুখোমুখি হলো। উভয়ের মধ্যে কয়েকটি আঘাত- পা ১ আঘাত বিনিময় হলো। শেষ পর্যন্ত কুরাইশ বীরটি আবু দুজানার হাতে নিহত হলো।” আর স্বয়ং আবু দুজানাহুও বর্ণনা করেছেন : “একজনকে দেখলাম, যে কুরাইশ বাহিনীকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্যে উৎসাহিত করছে। আমি তার কাছে গেলাম। সে যখন দেখল, তার মাথার উপর তরবারি, তখন ভীষণভাবে কেঁদে উঠল। হঠাৎ দেখলাম এ হচ্ছে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ। আমি মনে করলাম, হিন্দ- এর মতো মহিলাকে হত্যা করে মহানবীর তরবারি অপবিত্র করা উচিত হবে না।” ২৮

যুদ্ধের সূচনা

মদীনা হতে পলাতক আউস গোত্রের লোক আবু আমেরকে দিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইসলামের বিরোধিতা করার কারণে সে মদীনা থেকে পালিয়ে গিয়ে মায় আশ্রয় নিয়েছিল। আউস গোত্রের পনের ব্যক্তিও তার সাথে ছিল। আবু আমেরের ধারণা ছিল, আউস গোত্রের লোকেরা যখন তাকে দেখবে, তখন মহানবীকে সহায়তা করা থেকে বিরত থাকবে। এজন্যে সে যুদ্ধক্ষেত্রে সামনের দিকে এগিয়ে আসে। কিন্তু যখন সে মুসলমানদের মুখোমুখি হয়, তখন সে তাদের তিরস্কারের সম্মুখীন হয়। কাজেই অল্প কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর সে রণাঙ্গন থেকে সরে পড়ে।^{১৯}

উহুদের ময়দানে কয়েকজন যোদ্ধার লড়াই ঐতিহাসিকদের কাছে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। তাদের মনে আলী (আ.)-এর আত্যাগ সর্বাধিক প্রশংসার দাবীদার। ইবনে আব্বাস বলেন : “হযরত আলী সকল যুদ্ধেই মুসলমানদের পতাকাবাহী ছিলেন। সর্বদা দক্ষ, পরীক্ষিত ও অবিচল যোদ্ধাদের মধ্য থেকেই পতাকাধারী নির্বাচন করা হতো। উহুদের যুদ্ধে মুহাজিরদের পতাকা হযরত আলীর হাতে ছিল।”

অনেক ঐতিহাসিকের বর্ণনা অনুযায়ী, মুসলমানদের পতাকাবাহী মুসআব ইবনে ওমাইর নিহত হবার পর মহানবী (সা.) আলীর হাতে পতাকা তুলে দেন। মুসআব প্রথম পতাকাবাহী হবার কারণ সম্ভবত এটাই ছিল যে, তিনি আবদুদার গোত্রের লোক ছিলেন। কুরাইশ বাহিনীর পতাকাধারীরাও এই গোত্রের লোক ছিল।^{২০}

তালহা ইবনে আবি তালহা, যাকে *كيش الكتيبة* ‘কাবশুল কাতিবাহ্’ বলা হতো, হুংকার দিয়ে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হলো এবং চিৎকার দিয়ে বলল : “হে মুহাম্মদের সাথীরা! তোমরা বল যে, আমাদের নিহত ব্যক্তির দোযখে আছে, আর তোমাদের নিহত ব্যক্তির বেহেশতে। এই অবস্থায় তোমাদের মধ্যে কেউ কি আছে যে, আমি তাকে বেহেশতে পাঠিয়ে দিই অথবা সে আমাকে দোযখে পাঠিয়ে দিক?” তার কণ্ঠস্বর যুদ্ধের ময়দানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আলী

(আ.) সামনে এগিয়ে গেলেন। কয়েকটি ঘাত- প্রতিঘাতের পর আলীর তরবারির আঘাতে তালহা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তালহা নিহত হলে পতাকা বহনের পালা আসে পর্যায়ক্রমে তার দু'ভাইয়ের ওপরে। উভয়ে আসেম ইবনে সাবিতের নিষ্কিণ্ড তীরের আঘাতে ধরাশায়ী হয়।

দ্বিতীয় খলীফার মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত শূরার (পরামর্শ) সভায় আমীরুল মুমিনীনের (আলী) প্রদত্ত ভাষণ থেকে বোঝা যায় যে, কুরাইশ বাহিনী নয় জনকে পতাকা বহনের জন্য রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে রেখেছিল। কথা ছিল, পর্যায়ক্রমে তারা সেনাবাহিনীর পতাকা বহনের দায়িত্ব পালন করবে। পর্যায়ক্রমটি ছিল প্রথম ব্যক্তি নিহত হলে পরের ব্যক্তি- এভাবে সর্বশেষ ব্যক্তি পতাকা বহন করবে। এসব পতাকাবাহীর সবাই ছিল বনী আবদুদদার গোত্রের লোক। তারা সবাই উহুদ যুদ্ধের দিবসে হযরত আলীর তরবারীর আঘাতে প্রাণ হারায়। এদের পর 'সাওআব' নামক এক হাবশী ক্রীতদাস, যার দেহ- কাঠামো ছিল খুবই ভয়ানক এবং মুখমণ্ডল ছিল বীভৎস, সে কুরাইশ বাহিনীর পতাকা ধারণ করেছিল। সেও ময়দানে এসে প্রতিপক্ষকে যুদ্ধের আহ্বান করেছিল। সেই ক্রীতদাসও হযরত আলীর তরবারীর আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে গিয়েছিল।

আলী (আ.) মহানবী (সা.)- এর সাহাবীগণের বিরাট পরামর্শসভায় তাঁদের উদ্দেশে বলেছিলেন : “তোমাদের কি মনে আছে যে, আমি বনী আবদুদদার গোত্রের নয় জনের অনিষ্টতা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছিলাম, যাদের প্রত্যেকেই যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষ আহ্বান করেছিল এবং পর্যায়ক্রমে পতাকা হাতে নিয়ে চিৎকার করছিল।” উপস্থিত ব্যক্তিদের সবাই হযরত আলীর বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন।^{৩১}

তিনি আবারো বললেন : “তোমাদের কি মনে আছে যে, ঐ নয় ব্যক্তির পরে হাবশী ক্রীতদাস সাওআব রণাঙ্গনে এসেছিল। তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল মহানবীকে হত্যা করা। সে এতখানি ক্রোধান্বিত ছিল যে, তার মুখ ফেনায় ভরে গিয়েছিল। তার চোখ দু'টি লাল হয়ে গিয়েছিল। তোমরা এই ভয়ঙ্কর যোদ্ধাকে দেখে ভয়ে পিছু হটে গিয়েছিলে। কিন্তু আমি সামনে এগিয়ে যাই, তার কোমরের উপর আঘাত হানি এবং তাকে ধরাশায়ী করি।” এবারও উপস্থিত সবাই হযরত আলীর বক্তব্যকে সমর্থন করলেন।

প্রবৃত্তির কামনা চরিতার্থ করতে লড়ছিল যে জাতি

হিন্দ এবং অন্যান্য নারীরা কুরাইশ সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টির জন্য যেসব কবিতা আবৃত্তি করছিল ও গান গাইছিল, তাতে দফ ও খঞ্জনা বাজিয়ে তাদেরকে রক্তপাত ঘটানো ও বিদ্রোহ চরিতার্থ করার আহ্বান জানাচ্ছিল। তাতে বোঝাই যাচ্ছিল যে, এই জাতি নৈতিক চেতনা, পবিত্রতা, স্বাধীনতা ও সচ্চরিত্রের উন্মেষ ঘটানোর জন্যে লড়ছিল না; বরং তাদের জন্যে উত্তেজক ছিল বস্তুগত কামনা- বাসনা চরিতার্থ করা ও যৌন সম্ভোগ। দফ ও তবলাবাদক নারীরা কুরাইশ বাহিনীর মাঝখানে এক বিশেষ সুর মুচ্ছনায় গান গাইছিল :

نَحْنُ بَنَاتُ طَمَارِقَ نَمَشِي عَلَى التَّمَارِقِ

إِنْ تَقْبَلُوا نَعَانِقَ أَوْ تَدْبُرُوا نَفَارِقَ

“আমরা বালিকা পথের

গালিচার উপর দিয়ে করি পদচারণ।

যদি মুখোমুখি হও শত্রুর, করবো আলিঙ্গন

(আর) যদি শত্রু থেকে কর পৃষ্ঠ প্রদর্শন,

তা হলে ছেড়ে যাবো তোমাদের।”

নিঃসন্দেহে, যে জাতির যুদ্ধ যৌন বিষয়াদির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বস্তুগত কামনা- বাসনা চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কোন লক্ষ্য না থাকে; অন্যদিকে যে জাতি স্বাধীনতার প্রসার, চিন্তার উৎকর্ষতা, কাঠ ও মাটির মূর্তির উপাসনা ও দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তির জন্যে লড়াই করে, - উভয়ের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য ও অতুলনীয় ব্যবধান রয়েছে। এ দু’দলের মধ্যে ভিন্ন- ধর্মী দু’ধরনের মনোবলের কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। ইসলামের বীর সমরনায়কগণ, যেমন আলী, হামযাহ, আবু দুজানাহ, যুবাইর ও অন্যান্যের

বীরত্বপূর্ণ আ ত্যাগী লড়াইয়ের ফলে কুরাইশ বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্রশস্ত্র ও গনীমতের সম্পদ ফেলে রেখে অত্যন্ত শোচনীয় পরাজয় বরণ করে পালাতে থাকে। আর এর মধ্য দিয়ে ইসলামের সৈনিকদের গৌরব একের পর এক বৃদ্ধি পেতে থাকে।^{৩২}

বিজয়ের পর পরাজয়

ইসলামের সৈনিকরা এ কারণে বিজয়ী হয়েছিল যে, বিজয়ের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মহান আল্লাহর পথে জিহাদ, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন, তাওহীদী ধর্ম ও আদর্শের প্রচার এবং এ পথে যে সব প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান ছিল, সে লো অপসারণ ছাড়া তাদের আর কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল না। বিজয় লাভের পরে পরাজয় এজন্য হয়েছিল যে, অধিকাংশ মুসলমানের নির্যাত ও লক্ষ্য পরিবর্তন এসে যায়। কুরাইশ বাহিনী যেসব গনীমতের মাল ফেলে পালিয়েছিল, সেসবের প্রতি মনোযোগ তাদের ইখলাস (নিষ্ঠা) কলুষিত করেছিল এবং তারা মহানবীর নির্দেশ ভুলে গিয়েছিল।

ঘটনার বিবরণ

আমরা উহুদ প্রান্তরের ভৌগোলিক অবস্থানের বর্ণনায় এ বিষয় উল্লেখ করেছি যে, উহুদ পর্বতের মাঝখানে একটি বিশেষ ধরনের ফাটল ছিল। মহানবী (সা.) আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের অধিনায়কত্বে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজের ওপর রণাঙ্গনের পশ্চা গের এ গিরি প্রহরার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তাদের অধিনায়ক নির্দেশ দিয়েছিলেন, তীর নিক্ষেপ করে পাহাড়ের ফাটলের ভেতর দিয়ে শত্রু সৈন্যদের আগমন ও চলাচল প্রতিরোধ করবে। যুদ্ধে জয়- পরাজয় যেটাই হোক না কেন, তারা কোন অবস্থায়ই তাদের অবস্থান ত্যাগ করবে না।

যুদ্ধের তীব্রতা ও ভয়াবহতার মধ্যে শত্রু সৈন্যরা যখনই এই গিরিপথ অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে, তীর নিক্ষেপকারী সৈন্যরা তাদেরকে পিছু হটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যখন কুরাইশ বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্র ও মালপত্র মাটিতে ফেলে রেখে প্রাণ বাঁচানোর জন্য পলায়ন শুরু করে, তখন প্রাণপণ লড়াই করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ইসলামের মুষ্টিমেয় বীর সেনানী যুদ্ধের ময়দানের বাইরে গিয়ে শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানই শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত থাকে। তারা (শত্রুবাহিনীর) ফেলে যাওয়া অস্ত্র- শস্ত্র ও সম্পদ সংগ্রহে তৎপর হয়ে যায়। তারা ধরে নিয়েছিল, যুদ্ধ পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে। রণাঙ্গনের পশ্চা গের গিরিপথের

পাহারায় নিযুক্ত সৈনিকরা সুবর্ণ সুযোগ ভেবে মনে মনে বলে : “আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকা অনর্থক। আমাদেরও গণীমত সংগ্রহে অংশগ্রহণ করা উচিত।” তাদের অধিনায়ক বললেন : “মহানবী (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন ইসলামী বাহিনী জয়ী হোক বা পরাজিত হোক, আমরা যেন এ স্থান ত্যাগ না করি।” অধিকাংশ তীর নিষ্ক্ষেপকারী রক্ষী সেনা তাদের অধিনায়কের নির্দেশের বিপরীতে রুখে দাঁড়িয়ে বলে : “এখানে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। মহানবীর উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধ চলাকালে আমরা যেন এ গিরিপথটি পাহারা দিই। এখন তো যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে” । এর ভিত্তিতে চল্লিশ জন সৈন্য প্রহরার স্থান থেকে নিচে নেমে আসে। সেখানে কেবল দশ ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ রইল না।

খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ছিল দক্ষ ও সাহসী যোদ্ধা। শুরু থেকেই সে জানত, গিরিপথের মুখটি হচ্ছে যুদ্ধ জয়ের চাবিকাঠি এবং সে বেশ কয়েক বার ঐ পথ দিয়ে রণাঙ্গনের পেছন দিকে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বারবার প্রহরীদের তীর নিষ্ক্ষেপের মুখোমুখি হয়েছিল। এবার সে তীর নিষ্ক্ষেপকারী সৈন্যদের সংখ্যাস্বল্পতার সুযোগ গ্রহণ করে। সে কুরাইশ সৈন্যদের মুসলিম বাহিনীর পশ্চাৎ আক্রমণ করতে নেতৃত্ব দেয়। সে এক দফায় অতর্কিতে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানদের পশ্চাৎ উপস্থিত হয়। টিলার উপর মোতায়েন মুষ্টিমেয় তীর নিষ্ক্ষেপকারী সৈন্যের প্রতিরোধে কোন লাভ হলো না। ঐ দশ ব্যক্তি প্রাণপণ লড়াই করে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও ইকরামাহ ইবনে আবি জাহলের সৈন্যদের হাতে প্রাণ হারান। কিছুক্ষণের মধ্যেই অসতর্ক ও নিরস্ত্র মুসলমানরা পেছন দিক থেকে সশস্ত্র শত্রু বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের শিকার হয়। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ স্পর্শকাতর স্থানটি দখল করে নেয়ার পর পরাজিত কুরাইশ বাহিনীর পলায়নপর সৈন্যদের পুনরায় সংঘবদ্ধ হবার আহ্বান জানায়। সে চিৎকার করে ও শ্লোগান দিয়ে কুরাইশ বাহিনীর প্রতিরোধ স্পৃহা এবং অবিচল থাকার মনোবৃত্তি চাঙ্গা করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলমানদের যুদ্ধের সারি ছত্রভঙ্গ থাকার সুযোগে কুরাইশ বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে ফিরে আসে। তারা পেছন ও সামনের দিক থেকে ইসলামী বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। পুনরায় উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

এ পরাজয়ের কারণ ছিল, ঐ দলটির ত্রুটি- বিচ্যুতি, যারা বস্তুগত লক্ষ্যের জন্য বাস্কার বা অবস্থানগুলি ছেড়ে এসেছিল এবং নিজেদের অজান্তেই শত্রুবাহিনীর আক্রমণের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। এর ফলে কুরাইশ বাহিনীর অশ্বারোহী দল খালিদ ইবনে ওয়ালীদেদের নেতৃত্বে পেছন দিক থেকে রণাঙ্গনে ঢুকে পড়ে।

আবু জাহলের ছেলে ইকরামার হামলায় খালিদেদের আক্রমণ অভিযান শক্তিশালী হয়। এ সময় ইসলামী বাহিনীতে এক অভূতপূর্ব ও অভাবনীয় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মুসলমানরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিরোধ করা ছাড়া উপায়সূত্র দেখলেন না। কিন্তু চেইন অব কমান্ড যেহেতু ভেঙে পড়েছিল, সেহেতু ইসলামের সৈনিকরা সাফল্যজনক প্রতিরোধ দেখাতে সক্ষম হলেন না। বরং তাঁরা বড় ধরনের প্রাণহানি ও ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হলেন। কয়েকজন মুসলমান সৈনিকও অসর্তকতার কারণে অন্য মুসলিম সৈনিকদের হাতে নিহত হলেন। খালিদ ও ইকরামার আক্রমণ অভিযান কুরাইশ বাহিনীর মনোবল পুরোপুরি চাঙ্গা করে। পলাতক কুরাইশ সৈন্যরা পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং তাদের শক্তি ও সমর্থন যোগাতে থাকে। এ অবস্থায় তারা মুসলমানদের চারদিক থেকে ঘেরাও করে তাদের একদলকে হত্যা করে।

মহানবী (সা.)- এর নিহত হবার সংবাদ

কুরাইশ বাহিনীর সাহসী যোদ্ধা লাইসী ইসলামী বাহিনীর বীর পতাকাবাহী মুসআব ইবনে উমাইরের ওপর হামলা করে। তাদের মাঝে ঘাত-প্রতিঘাতের পর শেষ পর্যন্ত ইসলামী বাহিনীর পতাকাধারী শাহাদাত লাভ করেন। ইসলামী যোদ্ধাদের চেহারা ঢাকা ছিল। সে ভাবল, নিহত ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হবেন। তখনই সে চিৎকার দিল এবং সেনা অধিনায়কদের উদ্দেশ্যে বলল : “ভাইসব! মুহাম্মদ নিহত হয়েছে।” এ মিথ্যা সংবাদটি কুরাইশ বাহিনীর মুখে মুখে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

কুরাইশ নেতারা এমন আনন্দিত হলো যে, তাদের আওয়াজ সমগ্র রণাঙ্গনে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। তারা সবাই বলছিল : *ألا قد قُتِلَ مُحَمَّدٌ، ألا قد قُتِلَ مُحَمَّدٌ* “মুহাম্মদ নিহত হয়েছে, মুহাম্মদ নিহত হয়েছে।” এ মিথ্যা সংবাদ রটে যাওয়ায় দুশমনদের সাহস বেড়ে যায়। কুরাইশ বাহিনী তখন তরঙ্গমালার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রত্যেকের চেষ্টা ছিল, মুহাম্মদ (সা.)- এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটায় অংশ নেবে এবং এর মাধ্যমে শিরক ও পৌত্তলিকতার জগতে খ্যাতি অর্জন করবে।

এ জব দুশমন সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধিতে যতখানি প্রভাব বিস্তার করে, ইসলামের মুজাহিদদের মনোবল ভেঙে দেয়াতেও ততখানি প্রভাব বিস্তার করে। ফলে মুসলমানদের বহু লোক যুদ্ধ থেকে হাত টিয়ে নেয়। তারা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং মাত্র কয়েক মুজাহিদ যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকেন।

কিছুসংখ্যক লোকের পলায়ন কি অস্বীকার্য?

(উহুদের রণাঙ্গন থেকে) সাহাবীদের পলায়ন এবং তাঁদের সাহাবী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা অনুচিত। অথবা যেহেতু এ ব্যক্তিবর্গ পরবর্তীকালে মুসলমানদের মাঝে সুখ্যাতি এবং উচ্চ মর্যাদা

ও পদের অধিকারী হয়েছিলেন, সেহেতু তা আমাদের এ তিক্ত সত্য মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়েও দাঁড়াবে না।

বিখ্যাত মুসলিম সীরাত রচয়িতা ইবনে হিশাম লিখেছেন, মুসলিম বাহিনী যখন চাপের মুখে পড়ে এবং মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ রণাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে, তখন অধিকাংশ মুসলমান নিজেদের জীবন রক্ষার চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে যায় এবং সবাই যে যার মতো একেক দিকে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আনাস ইবনে মালিকের চাচা আনাস আনাস ইবনে নযর একদল মুজাহির ও আনসার, যাঁদের মধ্যে উমর ইবনে খাত্তাব ও তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহও ছিলেন, তাঁদেরকে দেখতে পেলেন যে, তাঁরা এক কোণায় বসে আছেন এবং নিজেদের নিয়ে চিন্তা করছেন। তিনি প্রতিবাদের কণ্ঠে তাঁদেরকে বললেন : “আপনারা কেন এখানে বসে আছেন?” তাঁরা জবাবে বললেন : “মহানবী (সা.) নিহত হয়েছেন; তাই এখন দ্বু করে কোন লাভ নেই।” তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন : “যদি মহানবী নিহত হয়ে থাকেন, তা হলে আমাদের এ জীবনের কোন লাভ নেই। আপনারাও সবাই উঠে যে পথে তিনি শহীদ হয়েছেন, সে পথে শহীদ হোন।”^{৩৩} অনেক ঐতিহাসিকই বলেছেন, আনাস ইবনে নযর ঐ সময় বললেন : “মুহাম্মদ যদি নিহত হয়েও থাকেন, মুহাম্মদের আল্লাহ তো জীবিত আছেন।” এরপর তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর কথা তাঁদের উপর কোন প্রভাব রাখছে না। তখন তিনি হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। ইবনে হিশাম বলেন, এ যুদ্ধে আনাসের দেহে ৭০টি ক্ষত বা আঘাত ছিল এবং তাঁর বোন ব্যতীত আর কেউই তাঁর লাশ শনাক্ত করতে পারেন নি।

একদল মুসলমান এতটা বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা তাদের নিজেদের মুক্তির জন্য আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর দ্বারস্থ হতে চেয়েছিল যাতে সে আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে তাদের জন্য নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পারে।^{৩৪}

কুরআনের আয়াতে সত্যের উন্মোচন

কুরআনের আয়াতসমূহ অজ্ঞতা ও গোঁড়ামির এ পর্দা উন্মোচন করে দেয় যে, একদল সাহাবী মনে করেছিলেন, সাহায্য ও বিজয়ের ব্যাপারে মহানবীর দেয়া প্রতিশ্রুতিসমূহ ভিত্তিহীন। মহান আল্লাহ এ দল সম্পর্কে বলেন :

(و طائفة قد أهتمهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء)

“সাহাবীদের মধ্যে একদল নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য এতখানি চিন্তায় মগ্ন ছিল যে, তারা আল্লাহর সম্পর্কে জাহিলীয়াতের সময়কার ধারণা ও অনুমানের মতো বাতিল ধারণা পোষণ করছিল। তারা বলছিল, আমাদের কি মুক্তির কোন উপায় আছে।” ৩৫

আপনারা সূরা আলে ইমরানের কিছু আয়াত^{৩৬} পর্যালোচনা করে এ যুদ্ধের কিছু গোপন বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। এসব আয়াত সাহাবীদের সম্পর্কে শিয়াদের আকীদাকে পুরোপুরি পরিষ্কার করে দেয়। শিয়ারা আকীদা পোষণ করে যে, মহানবী (সা.)- এর সকল সাহাবী তাওহীদী ধর্মের জন্য সত্যিকারভাবে ত্যাগী ও নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন না। তাদের মধ্যে দুর্বল আকীদাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মুনাফিকও ছিল। এ অবস্থায় তাদের মধ্যে স্বচ্ছ ও পবিত্র অন্তরের মুমিন- মুক্তাকী লোকও অনেক ছিলেন। আজ আহলে সুন্নাতের একদল লেখক এ জাতীয় অনেক অন্যায় কাজ ধামাচাপা দিতে চান, যার নমুনা উহুদ যুদ্ধের বর্ণনায় আপনারা শুনলেন। তারা বাস্তবতা বহির্ভূত ব্যাখ্যা দিয়ে সকল সাহাবীর মর্যাদা রক্ষা করতে চান অথচ এসব ব্যাখ্যা অপরিপ ও অপরিপূর্ণ এবং গোঁড়ামি ও পক্ষপাতদুষ্টতার পর্দা সত্যের প্রকৃত চেহারা দর্শনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কোন্ লেখক নিচের আয়াতের প্রতিপাদ্য অস্বীকার করতে পারবে? সেখানে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে : “তোমরা সেই সময়ের কথা স্মরণ কর যখন পাহাড়ের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিলে এবং কারো দিকে তাকাচ্ছিলে না; অথচ নবী পেছন থেকে তোমাদের ডাকছিলেন; তোমরা তাঁর কথায় কর্ণপাত কর নি; বরং তোমাদের পলায়ন অব্যাহত রেখেছিলে।”

এ আয়াত সে সব লোক এবং তাদের মতো লোকদের সম্পর্কে, যাদেরকে আনাস ইবনে নযর নিজের চোখে দেখেছেন, তারা এক কোণায় বসে আছে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় মগ্ন রয়েছে। এর চেয়েও স্পষ্ট হচ্ছে নিচের এ আয়াত : “যারা দু’দলের মুখোমুখি হবার দিন পালিয়ে গিয়েছিল, শয়তান তাদেরকে তাদের কতিপয় কাজের ফলে পদ লিত করে দিল। তবে মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর আল্লাহও ক্ষমাকারী ও সহনশীল।” ৩৮

যারা নবীর নিহত হবার জবকে নিজেদের বাহানা হিসেবে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছিল এবং এ ফন্দি আঁটছিল যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সহায়তায় আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে, তাদেরকে তিরস্কার করে পবিত্র কুরআন বলেছে :

(و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتم علي أعقابكم و من ينقلب علي عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين)

“মুহাম্মদ (আল্লাহর পক্ষ হতে) একজন রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। সুতরাং তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন- তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনোই আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না; বরং আল্লাহ কৃতজ্ঞদের শীঘ্রই পুরস্কার দান করবেন।” ৩৯

তিক্ত অভিজ্ঞতা

উহুদের ঘটনাবলী পর্যালোচনার দ্বারা তিক্ত ও মধুর অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। একদলের দৃঢ় ও অবিচল থাকার শক্তি ও ক্ষমতা এবং আরেক দলের দৃঢ়পদ ও অবিচল না থাকার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের দিকে তাকালে এ তথ্য হস্তগত হয় যে, মহানবী (সা.)-এর সাহাবী হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মুসলমানকে ন্যায়পরায়ণ ও মুত্তাকী সাব্যস্ত করা যায় না বা সম্ভবপর নয়। কেননা যে টিলা তীর নিষ্ক্ষেপকারী সৈন্যদের অবস্থানস্থল ছিল, যারা তা ত্যাগ করেছে অথবা স্পর্শকাতর মুহূর্তে (রণাঙ্গন ত্যাগ করে) পাহাড় বেয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে এবং মহানবীর আহবানের প্রতি তোয়া ৷ করে নি, তারাও মহানবীর সাহাবী ছিল।

বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক ওয়াকিদী লিখেছেন, উহুদের দিন আট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মহানবী (সা.)- এর সাথে থাকার বাইয়াত করেন। তাঁরা ছিলেন মুজাহিরগণের মধ্য থেকে তিনজন- আলী, তালহা, যুবাইর এবং আমাদের মধ্য থেকে পাঁচজন। এই আটজন ছাড়া সবাই বিপজ্জনক মুহূর্তে পলায়ন করে।

ইবনে আবিল হাদীদ^{৪০} লিখেছেন, ৬০৮ সালে বাগদাদে এক অনুষ্ঠানে মজলিসে ওয়াকিদীর ‘মাগাযী’ গ্রন্থটি একজন বড় মুসলিম মনীষী মুহাম্মদ ইবনে মাদাদ আলাভীর কাছে পাঠ করছিলাম। বিষয়টি যখন এ পর্যন্ত পৌঁছল যে, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন : আমি উহুদের দিন নিজের চোখে দেখেছি, মুসলমানরা পাহাড়ের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল, আর মহানবী (সা.) তাদেরকে নাম ধরে ধরে ডাকছিলেন এবং বলছিলেন : ‘হে অমুক! আমার কাছে এসো; হে অমুক! আমার কাছে এসো’ (اَللّٰهُمَّ يَا فُلَانُ! اَللّٰهُمَّ يَا فُلَانُ) , কেউই রাসুলের ডাকে অনু ল সাড়া দিচ্ছিল না। উস্তাদ (মুহাম্মদ ইবনে মাদাদ) আমাকে বললেন যে, ‘অমুক, ‘অমুক’ বলতে ঐ লোকদেরই বুঝানো হয়েছে, যাঁরা মহানবী (সা.)- এর পরে (রাণী) পদমর্যাদা অর্জন করেছিলেন। তাঁদের নাম স্পষ্টভাবে বললে বর্ণনাকারীর আশংকা এবং তাঁদের প্রতি সম্মান দেখাতে বাধ্য থাকার কারণে স্পষ্টভাবে তাঁদের নাম উল্লেখ করতে চান নি।

অনুরূপভাবে তিনি (ইবনে আবিল হাদীদ) তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, প্রায় সকল বর্ণনাকারীই এ কথায় ঐকমত্য পোষণ করেন যে, তৃতীয় খলীফা ঐসব লোকদের মধ্যে ছিলেন, যারা সেই স্পর্শকাতর মুহূর্তে রণাঙ্গনে অবিচল ও দৃঢ়পদ ছিলেন না। আপনারা সামনে ইসলামের একজন মহীয়সী নারী ‘নাসীবা’ সম্পর্কে মহানবী (সা.)- এর এক উক্তি পড়বেন। উল্লেখ্য, এ মহীয়সী নারী উহুদের ময়দানে মহানবীর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করছিলেন। ঐ বাণীতে পরোক্ষভাবে পলাতক দলটির মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বকে খাটো করা হয়েছে। আমরা মহানবীর সঙ্গীগণের কারো ব্যাপারেই কখনো মন্দ ধারণা রাখি না। উদ্দেশ্য সত্য উদঘাটন এবং বাস্তবতা প্রকাশ করা। তাদের পলায়নকে যে পরিমাণ নিন্দা করি, ঠিক তেমনি যুদ্ধের ময়দানে আরেক

দল, যাঁদের কাহিনী আপনারা পরে পাঠ করবেন, তাঁদের (রণাঙ্গনে) দৃঢ়পদ থাকারও প্রশংসা করি
এবং তাঁদের কাজের মর্যাদা দিই।

মহানবী (সা.)- কে হত্যার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পাঁচ ব্যক্তি

যে মুহূর্তে ইসলামী বাহিনী বিক্ষিপ্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল, তখন চতুর্দিক থেকে মহানবীকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালানো হচ্ছিল। এ সত্ত্বেও কুরাইশ বাহিনীর নামকরা পাঁচজন যোদ্ধা সিদ্ধান্ত নেয়, যে কোন কিছুই বিনিময়েই হোক, মহানবীর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে ফেলবে। এই লোকেরা ছিল :

১. আবদুল্লাহ ইবনে শিহাব, যে মহানবীর কপালে আঘাত করে।
২. আবু ওয়াসের পুত্র উতবা; সে চারটি পাথর নিক্ষেপ করে হযরতের ডান পাশের ‘রুবাঈ’ দাঁত মুবারক^{৪১} ভেঙে দেয়।
৩. ইবনে কুমিআহ লাইসী, যে মহানবীর মুখমণ্ডলে আঘাত করে ক্ষত সৃষ্টি করে। এ আঘাত এত প্রচণ্ড ছিল যে, শিরস্ত্রাণের আংটা লো তাঁর মুখমণ্ডলের উপরিভাগ ছিদ্র হয়ে ঢুকে গিয়েছিল। আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ এ লো দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে বের করে আনেন। এর ফলে তাঁর নিজের চারটি দাঁত ভেঙে যায়।
৪. আবদুল্লাহ ইবনে হামীদ, যে হামলা চালানো অবস্থায়ই মুসলিম বাহিনীর বীর যোদ্ধা আবু দুজানার আক্রমণে নিহত হয়।
৫. উবাই ইবনে খালফ, সে ঐ ব্যক্তি যে মহানবীর হাতে নিহত হয়। সে এমন সময় মহানবীর মুখোমুখি হয়, যখন তিনি কোনমতে গিরি উপত্যকায় পৌঁছেছিলেন এবং কয়েকজন সাহাবী তাঁকে চিনতে পেরে চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে রয়েছিলেন। সে মহানবীর দিকে এলে তিনি হারেস ইবনে সিম্মার কাছ থেকে একটি বর্শা নেন এবং তা তার ঘাড়ে বসিয়ে দেন। তাতে সে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। উবাই ইবনে খালফের জখম যদিও খুব সামান্য ছিল, কিন্তু ভয় তাকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে, তার বন্ধুরা যতই তাকে সা না দিচ্ছিল, সে শান্ত হচ্ছিল না। সে বারবার বলছিল : “মুহাম্মদকে মায় আমি বলেছিলাম, আমি তোমাকে হত্যা করব। তার উত্তরে

সে আমাকে বলেছিল; বরং আমিই তোমাকে হত্যা করব। সে কখনো মিথ্যা বলে না।” এ ভয় ও ক্ষতই তার দফা রফা করে। কয়েক দিন পরে (মায়) ফেরার পথে সে মারা যায়।^{৪২}

সত্যই এ বিষয়টি প্রমাণ করে, কুরাইশরা কতখানি হীনমন্য ও ঘৃণ্য মানসিকতার অধিকারী ছিল। তারা এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত এবং স্বীকার করত যে, মহানবী (সা.) সত্যবাদী; তিনি কখনো মিথ্যা বলেন না। এ সত্ত্বেও তারা চরম শত্রুতার বশবর্তী হয়ে তাঁর রক্ত ঝরানোর জন্য এতসব চেষ্টা করেছে।

মহানবী পর্বতের মতো দৃঢ়তা ও অবিচলতা সহকারে নিজের ও ইসলামের প্রতিরক্ষা বিধান করেন। যদিও মৃত্যুর সাথে তাঁর তেমন একটা দূরত্ব ছিল না এবং তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে শত্রুবাহিনী ঢেউয়ের মতো তাঁর ওপর হামলে পড়ছে, এ সত্ত্বেও তাঁর এমন কোন কথা ও আচরণ পরিলক্ষিত হয় নি যার মধ্যে ভয় ও আতঙ্কের সামান্যতম আভাস থাকতে পারে। কেবল কপালের রক্ত পরিষ্কার করার সময় এটুকু কথা তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়েছিল, “যে জনগোষ্ঠী নিজেদের নবীর মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত করেছে, এমন অবস্থায় যে, তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন, তারা কিভাবে সফলকাম হবে?”^{৪৩}

এ উক্তি মানুষের প্রতি, এমনকি নিজের শত্রুদের প্রতি তাঁর অতিশয় দয়া ও সহৃদয়তার প্রমাণ বহন করে।

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) বলেন : “মহানবী (সা.) যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যুদ্ধ ঘোরতর রূপ নিলেই তিনি আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। কাজেই মহানবী যে নিরাপদ ছিলেন তার অন্যতম কারণ ছিল, তাঁর সেই রক্তপূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক সংগ্রাম, যা তিনি নিজের ও ইসলামের চৌহদ্দির প্রতিরক্ষার জন্য করেছিলেন।”

অবশ্য নবীর জীবন রক্ষার পেছনে অন্য কারণও সক্রিয় ছিল। আর তা ছিল স্বল্পসংখ্যক জান কুরবান সাহাবীর আত্যাগ, যাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে তাঁকে রক্ষা করার এবং হেদায়েতের এই আলোকবর্তিকাকে নির্বাপিত হবার হাত থেকে সমুজ্জ্বল রাখার ব্যবস্থা করেন। উহুদ যুদ্ধের দিন

মহানবী প্রচণ্ড যুদ্ধ করেন। তাঁর তুণে যত তীর ছিল সবই তিনি নিক্ষেপ করেন। তাঁর ধনুক ভেঙে গিয়েছিল এবং ধনুকের রশি ছিঁড়ে গিয়েছিল।^{৪৪}

মহানবীর প্রতিরক্ষায় যাঁরা নিয়োজিত ছিলেন, তাঁরা মাত্র কয়েকজন ছিলেন^{৪৫} যাঁদের সবার অবিচলতার বিষয়টি ঐতিহাসিক বিচারে নিশ্চিত নয়। ঐতিহাসিকদের মাঝে যে সত্যটি নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত, তা হচ্ছে, স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিত্বের দৃঢ়পদ ও অবিচল থাকা, যাঁদের যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষামূলক প্রচেষ্টার বিবরণ আমরা এখন পেশ করব।

সাফল্যজনক প্রতিরক্ষা লড়াই ও পুনঃ বিজয়

ইসলামের ইতিহাসের এ অধ্যায়কে যদি পুনঃবিজয় বলে আখ্যায়িত করি, তা হলে অতিরঞ্জিত কিছু বলা হবে না। এ বিজয় বলতে আমরা এ কথাই বুঝাতে চাই যে, মুসলমানরা শত্রুর প্রত্যাশার বিপরীতে মহানবীর জীবনকে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছেন। মুসলিম বাহিনীর ভাগ্যে জুটে যাওয়া এটিই ছিল পুনঃবিজয়।

যদি এ বিজয়ে মুসলিম বাহিনীর সবাই অংশীদার বলে আখ্যায়িত করি, তা হলে মুসলিম বাহিনীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হিসেবে তা যথার্থই হবে। কিন্তু এ বিজয়ের আসল দায়িত্ব বহন করেছেন টিকতক মুসলমান, যাঁরা জীবনের মায়া ত্যাগ করে মহানবী (সা.)-এর জীবন রক্ষা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মহাসম্পদ অক্ষত থাকা এবং হেদায়েতের এই আলোকবর্তিকা নির্বাপিত না হওয়া এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ত্যাগের ফল ছিল।

এখন এই আ ত্যাগী মহান ব্যক্তিগণের সম্পর্কে কিছু বর্ণনা উপস্থাপন করছি :

১. (উহুদের রণাঙ্গনে) প্রথম ব্যক্তি যিনি অবিচল ও দৃঢ়পদ ছিলেন তিনি ছিলেন সেই তরুণ, যাঁর জীবনের মাত্র ২৪টি বসন্ত অতিক্রম হয়েছিল এবং জীবনের শুরু থেকে মহানবীর ওফাতের দিন পর্যন্ত তাঁর পাশেই ছিলেন এবং এক মুহূর্তও তাঁর সাহচর্য ও তাঁর জন্য আ ত্যাগ থেকে বিরত হন নি।

এই বীর সেনাপতি, এই প্রকৃত আ ত্যাগী ছিলেন মুত্তাকীদের মওলা আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)। ইতিহাসের পাতায় পাতায় ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় তাঁর আ ত্যাগ ও অবদানের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মূলত এই পুনর্বীর বিজয় সেই প্রথম বিজয়ের মতোই এই জান-নিসার বীর যোদ্ধার ত্যাগ ও বীরত্বের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। কেননা যুদ্ধের শুরুতে কুরাইশদের পলায়নের কারণ ছিল এই যে, তাদের পতাকাবাহীরা একের পর এক আলীর তরবারির আঘাতে নিহত হয়েছিল। ফলে

কুরাইশ বাহিনীর অন্তরে প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার হয়েছিল এবং তাদের অটল থাকার শক্তি লোপ পেয়েছিল।

ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে বিচার- বিশ্লেষণকারী সমসাময়িক মিশরীয় লেখকগণ, হযরত আলী (আ.)-এর মর্যাদা যতখানি প্রাপ্য বা অন্ততপক্ষে ইতিহাসে যতখানি লিপিবদ্ধ হয়েছে, ততখানি হক আদায় করেন নি। তাঁরা আমীরুল মুমিনীনের আ ত্যাগকে অন্যদের ত্যাগের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। এ কারণে হযরত আলীর আ ত্যাগের বিবরণ এখানে দেয়া সমীচীন মনে করছি।

১. ইবনে আসীর তাঁর ইতিহাসে^{৪৬} লিখেছেন : মহানবী (সা.) সবদিক থেকে কুরাইশ বাহিনীর বিভিন্ন দলের আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিলেন। যে দলই হযরতের ওপর আক্রমণ চালাতো, হযরত আলী মহানবীর নির্দেশে তাদের ওপর আক্রমণ চালাতেন এবং তাদের কতিপয় লোককে হত্যা করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিতেন। উহুদ যুদ্ধে এ ঘটনার কয়েকবার পুনরাবৃত্তি হয়। এ আ ত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে ওহীর ফেরেশতা আগমন করেন এবং মহানবীর কাছে হযরত আলীর আ ত্যাগের প্রশংসা করেন এবং বলেন : “এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত আ ত্যাগ যা এ বীর সেনানায়ক তাঁর নিজ থেকে প্রদর্শন করেছেন।” মহানবীও ওহীর বাহক ফেরেশতার উক্তি সত্যায়ন করে বলেন : “আমি আলী হতে এবং সে আমা হতে।” এরপর রণাঙ্গনে একটি আহবান-ধ্বনি শোনা গেল, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে এ দু’টি বাক্য :

لا سيف إلا ذو الفقار لا فتى إلا علي

অর্থাৎ একমাত্র যে তরবারী যুদ্ধে অবদান রাখতে পারে, তা হচ্ছে আলী ইবনে আবি তালিবের তরবারী, আর আলীই হচ্ছে একমাত্র বীর জোয়ান।

ইবনে আবীল হাদীদ ঘটনাপ্রবাহের আরো বিশদ বিবরণ দিয়েছেন এবং বলেছেন : যারা মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার জন্য আক্রমণ করছিল, তাদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ। আলী বাহন পশুর উপর সওয়ার না হয়ে পায়ের উপর দাঁড়িয়েই তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করছিলেন। এরপর হযরত জিবরীলের অবতরণের ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন : এ বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হওয়া

ছাড়াও আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রচিত ‘গায্‌ওয়া’ (দ্বু) সম্পর্কিত গ্রন্থের কয়েকটি হস্তলিখিত অনুলিপিতে জিবরীলের অবতরণের বিষয়টি দেখতে পেয়েছি। এমনকি একদিন আমার শিক্ষক আবদুল ওয়াহাব সাকীনার কাছে এ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, “এ ঘটনা সঠিক।” আমি তাঁকে বললাম : “এ সত্য ঘটনা সিহাহ্‌ সিভার^{৪৭} গ্রন্থকারগণ কেন লিখেন নি?” তিনি উত্তরে বলেছিলেন : “অনেক সহীহ্‌ রেওয়ায়েত আছে যেসব উল্লেখ করার ব্যাপারে সিহাহ্‌- এর গ্রন্থকারগণ অবহেলা করেছেন।”^{৪৮}

২. আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) তাঁর একদল অনুসারীর উপস্থিতিতে রা’ স- উল ইয়াহুদে যে দীর্ঘ ভাষণ পেশ করেন, তাতে নিজের আ ত্যাগের বিষয়ে উল্লেখ করে বলেছিলেন : “কুরাইশ বাহিনী আমাদের ওপর আক্রমণ করলে আনসার ও মুহাজিররা তাদের বাড়ির পথ ধরে ছুটে পালিয়েছিল। আর তখন আমি সত্তরটি জখম নিয়ে মহানবী (সা.)- এর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছি। এরপর তিনি আমার জামা উঠিয়ে ক্ষতস্থান লোর উপর হাত বুলিয়ে দেন যে লোর চিহ্ন (তখনও) বিদ্যমান ছিল।^{৪৯}

এমনকি ‘এলালুশ শারায়ে’ গ্রন্থে শেখ সাদুক- এর বর্ণনা অনুযায়ী আলী (আ.) মহানবীর (সা.) জীবন রক্ষা করার সময় এতটা ত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন যে, তাঁর তরবারী ভেঙে যায় এবং মহানবী (সা.) তাঁর তরবারি ‘যুলফিকার’ তাঁকে দান করেন। সেই তরবারি নিয়েই তিনি মহান আল্লাহর পথে জিহাদ চালিয়ে যান।

ইবনে হিশাম তাঁর স্বনামধন্য সীরাত গ্রন্থে^{৫০} মুশরিক বাহিনীর নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা বাইশ বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের নাম ও গোত্র- পরিচয় ইত্যাদি লিখেছেন। এদের মধ্যে বারো জন আলীর হাতে নিহত হয়েছিল। বাকীরা অন্যান্য মুসমানদের হাতে নিহত হয়েছিল। উল্লিখিত সীরাত লেখক নিহতদের নাম ও পরিচয় বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। আমরা সংক্ষিপ্ততার জন্য আর বেশি লিখছি না।

আমরা স্বীকার করছি, আহলে সুন্নাহ্‌ ও শিয়াদের গ্রন্থসমূহে, বিশেষ করে ‘বিহারুল আনওয়ার’ গ্রন্থে^{৫১} হযরত আলী (আ.)- এর অবদান সংক্রান্ত যে বর্ণনা রয়েছে, এখানে তা উল্লেখ করতে

পারি নি। এ ব্যাপারে যে সব বিক্ষিপ্ত রেওয়াজে ও বর্ণনা রয়েছে, সেসব পর্যালোচনা করার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, উহুদ যুদ্ধে তাঁর মতো কেউ দৃঢ়পদ থাকেন নি।

২. আবু দুজানাহ : তিনি হচ্ছেন আমীরুল মুমিনীনের পর দ্বিতীয় সৈনিক, যিনি মহানবীর প্রতিরক্ষায় এমন ভূমিকা পালন করেন যে, তিনি নিজেকে মহানবীর ঢালে পরিণত করেন। তাঁর পিঠের উপর তীর বিদ্ধ হচ্ছিল। এভাবে তিনি মহানবীকে তীরের লক্ষ্যবস্তু হওয়া থেকে রক্ষা করেন। মরহুম সেপেহের প্রণীত ‘নাসিখুত্ তারিখ’ গ্রন্থে আবু দুজানাহ সম্পর্কে একটি বাক্য আছে। এ কথার সূত্র ও প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয় নি। তিনি লিখেছেন^{৫২} :

মহানবী (সা.) ও আলী যখন মুশরিকদের অবরোধের মধ্যে পড়েছিলেন, তখন আবু দুজানাহ প্রতি মহানবীর দৃষ্টি পড়ে এবং তিনি তাঁকে বলেন : আবু দুজানাহ! আমি তোমার কাছ থেকে আমার বাইয়াত ফেরৎ নিলাম; তবে আলী আমা হতে আর আমি আলী হতে। আবু দুজানাহ তীব্রভাবে কাঁদলেন এবং বললেন : আমি কোথায় যাব, আমার স্ত্রীর কাছে যাব, সে তো মৃত্যুবরণ করবে; আমি কি আমার বাড়িতে ফিরে যাব; তা তো বিরান হয়ে যাবে; আমার ধন-সম্পদের দিকে যাব, তা তো ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মৃত্যুর দিকেই ছুটে যাব, যা আমার দিকে এসে পৌঁছবে।

আবু দুজানাহ চোখ বেয়ে অশ্রু বারে পড়ছিল। তাঁর প্রতি মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টি পড়লে তিনি তাঁকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেন আর তিনি ও আলী কুরাইশদের একের পর এক আক্রমণ থেকে মহানবীকে হেফায়ত করেন।

ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে আসিম ইবনে সাবিত, সাহাল ইবনে হুнайফ, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ প্রমুখের নামের উল্লেখ দেখা যায়। এমনকি কেউ কেউ, যে সব ব্যক্তিত্ব যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়পদ ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ছত্রিশ জন বলে উল্লেখ করেছেন। যা হোক, ইতিহাসের আলোকে যা নিশ্চিত, তা হচ্ছে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.), আবু দুজানাহ, হামযাহ এবং উম্মে আমের নামক একজন মহিলার দৃঢ়তা। এ চারজন ছাড়া বাকীদের দৃঢ়পদ থাকার বিষয়টি অনুমাননির্ভর। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে তা মূল থেকেই সন্দেহযুক্ত।

৩. হামযাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিব : মহানবী (সা.)- এর চাচা হামযাহ্ ছিলেন আরবের বীরকেশরী এবং ইসলামের একজন বিখ্যাত সেনানায়ক। তিনি সেই ব্যক্তিগণের অন্যতম, যাঁরা মদীনার বাইরে গিয়ে কুরাইশ বাহিনীর মোকাবেলার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন। তিনি তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে মায় অত্যন্ত নায়ক পরিস্থিতিতে মহানবীকে মূর্তিপূজারীদের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করেন। কুরাইশদের সভায় আবু জাহল মহানবীর অবমাননা করেছিল এবং তাঁকে যে কষ্ট দিয়েছিল, তার প্রতিশোধস্বরূপ তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন এবং ঐ সময় তাঁকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো ছিল না।

তিনি ছিলেন সেই বীরকেশরী, বদরের যুদ্ধে যিনি কুরাইশ বাহিনীর বীর অধিনায়ক শাইবাকে হত্যা করেন। এছাড়া অপর একদলকে হত্যা ও আরো কতককে আহত করেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল সত্যকে রক্ষা এবং মানব জীবনে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী, ওতবার মেয়ে হিন্দ মনে মনে হামযাহ্‌র প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করত। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যে কোন মূল্যেই হোক, মুসলমানদের কাছ থেকে তার পিতার প্রতিশোধ নেবে।

ওয়াহশী ছিল এক হাবশী বীর যোদ্ধা। সে যুবাইর ইবনে মুতয়েমের ক্রীতদাস ছিল। যুবাইরের চাচাও বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। হিন্দের পক্ষ থেকে সে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিল যে, সে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তার মনের আশা পূরণ করবে। হিন্দ ওয়াহিশকে প্রস্তাব দিয়েছিল, আমার পিতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য তোমাকে তিনজনের (মুহাম্মদ, আলী ও হামযাহ্) মধ্যে যে কোন একজনকে হত্যা করতে হবে। বীর ওয়াহশী জবাবে বলেছিল : আমি কখনোই মুহাম্মদের নাগাল পাব না। কেন না তার সাহাবীরা যে কারো চাইতে তার নিকটবর্তী। আলীও যুদ্ধের ময়দানে অসম্ভব রকমের সজাগ। কিন্তু যুদ্ধের সময় হামযাহ্‌র ক্রোধ ও উত্তেজনা এত প্রবল থাকে যে, লড়াই চলাকালীন তার আশপাশে কি হচ্ছে, সে তা বুঝতে পারে না। হয় তো আমি তাকেই ধোঁকায় ফেলে হত্যা করতে পারব। হিন্দ ঐটুকুতেই রাজি হয়ে যায়। তাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, এক্ষেত্রে যদি সে সফল হয়, তা হলে তাকে মুক্তি দান করবে।

একদল মনে করেন, যুবাইর নিজেই তার গোলামের সাথে এ চুক্তি সম্পাদন করে। কেননা, বদর যুদ্ধে তার চাচা নিহত হয়েছিল। হাবশী গোলাম ওয়াহশী নিজেই বলেছে : “উহুদের দিন আমি কুরাইশের বিজয় লাভের সময়টিতে হামযার খোঁজে ছিলাম। তিনি ক্রুদ্ধ সিংহের মতো প্রতিপক্ষের ব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং তাঁর সামনে যে- ই আসছিল, তাকেই তিনি ধরাশায়ী করছিলেন। আমি এমনভাবে গাছ ও পাথরের পেছনে লুকিয়ে রইলাম যে, এর ফলে তিনি আমাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি তুমুল লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলেন। আমি আমার গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে আসলাম। আমি হাবশী ছিলাম বিধায় হাবশীদের মতোই বর্শা নিক্ষেপ করতাম। এজন্য তা খুব কমই লক্ষ্য ষ্ট হতো। এ কারণে আমি একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে বিশেষ এক ভঙ্গিতে দুলিয়ে তাঁর দিকে আমার দুই ফলা বিশিষ্ট বর্শা নিক্ষেপ করলাম। বর্শা তাঁর পাঁজর ও জ ার মধ্যবর্তী পার্শ্বদেশে আঘাত করল এবং তাঁর দু’পায়ের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তিনি আমার ওপর আক্রমণ করতে চাইলেন; কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথা তাঁকে এই সুযোগ দেয় নি। ঐ অবস্থায় তিনি পড়ে রইলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর প্রাণ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এরপর আমি খুব সতর্কতার সাথে তাঁর দিকে গেলাম। আমার বর্শাটি বের করে এনে কুরাইশ বাহিনীর শিবিরে ফিরে গেলাম; আর নিজের মুক্তির জন্য দিন গতে লাগলাম।

উহুদ যুদ্ধের পর বহু দিন আমি ম ায় ছিলাম। অতঃপর মুসলমানরা ম া জয় করলে আমি তায়েফে পালিয়ে গেলাম। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ইসলামের কর্তৃত্ব সেখান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। আমি শুনতে পেয়েছিলাম, যে যত মারা ক অপরাধীই হোক না কেন, যদি ইসলাম গ্রহণ করে, মহানবী (সা.) তার অপরাধ ক্ষমা করে দেন। আমি মুখে কালেমায়ে শাহাদাত পড়তে পড়তে মহানবী সকাশে উপস্থিত হলাম। মহানবীর দৃষ্টি আমার উপর পড়ল। তিনি বললেন : তুমি কি সেই হাবশী ওয়াহশী? আমি বললাম : জ্বি হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কিভাবে হামযাহকে হত্যা করেছ? আমি হুবহু ঘটনাটি বললাম। মহানবী খুবই মর্মান্বিত হলেন এবং বললেন : যতদিন জীবিত আছ, ততদিন আমি যেন তোমার চেহারা না দেখি। কেননা আমার চাচাকে হত্যার হৃদয়বিদারক ঘটনা তোমার দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে।” ৫৩

এ হচ্ছে নবুওয়াতের সেই মহান আ ۱ এবং অন্তরের সীমাহীন প্রশস্ততা, যা স্বয়ং মহান আল্লাহ ইসলামের সুমহান নেতাকে দান করেছেন। তিনি বহু অজুহাত দাঁড় করিয়ে আপন চাচার হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড দিতে পারতেন। কিন্তু এরপরও তাকে মুক্ত করে দেন। ওয়াহশী বলেছে : “মহানবী (সা.) যতদিন জীবিত ছিলেন, আমি তাঁর সামনে থেকে আমার চেহারা লুকিয়ে রাখতাম। মহানবীর ইন্তেকালের পর নবুওয়াতের দাবীদার ভণ্ড মুসাইলিমা কায্যাব- এর সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আমি ইসলামী সেনাবাহিনীতে যোগদান করলাম। আমি মুসাইলিমাকে হত্যার জন্য সেই যুদ্ধাঙ্গটি ব্যবহার করলাম। একজন আনসারের সহায়তায় তাকে হত্যা করতে সক্ষম হলাম। আমি যদি এ অস্ত্র দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি ‘হামযাহ্’ কে হত্যা করে থাকি, নিকৃষ্টতম ব্যক্তি মুসাইলিমাও তো এ অস্ত্রের বিপদ থেকে রক্ষা পায় নি।”

মুসাইলিমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ওয়াহশীর অংশগ্রহণের বিষয়টি তার নিজের দাবীমাত্র। তবে ইবনে হিশাম বলেন, ওয়াহশী জীবনের শেষপ্রান্তে একটি কালো কাকের মতো হয়ে গিয়েছিল। মদ পানের কারণে সে মুসলমানদের ঘণার পাত্রে পরিণত হয়েছিল এবং তাকে প্রায় সময়ে মদ পানের দায়ে বেত্রাঘাত করা হতো। বারবার মন্দ কাজের জন্য সেনাবাহিনীর তালিকা থেকে তার নাম কেটে দেয়া হয়। উমর ইবনে খাত্তাব বলতেন, হামযাহ হত্যাকারী আখেরাতে অবশ্যই সফলকাম হবে না।^{৫৪}

৪. উম্মে আমের : এ ব্যাপারে আলোচনার কোন অবকাশ নেই যে, ইসলামে মহিলাদের জন্য জিহাদ নিষিদ্ধ। এ কারণে যখন মদীনার মহিলাদের প্রতিনিধি মহানবীর নিকট উপস্থিত হন, তখন তাঁরা এই বঞ্চনার ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলেন এবং অভিযোগ করেন : “আমরা সাংসারিক জীবনে স্বামীদের জন্য সকল কাজ সম্পাদন করি। আর তারা নিশ্চিন্তে জিহাদে অংশগ্রহণ করে; অথচ আমরা নারী সমাজ এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত।”

মহানবী (সা.) তাঁর মাধ্যমে মদীনার নারী সমাজের প্রতি বার্তা পাঠান : “তোমরা যদিও কতক সৃষ্টিগত ও সামাজিক কারণে এই মহা সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়েছ; কিন্তু তোমরা সাংসারিক ও বৈবাহিক জীবনের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে জিহাদের সৌভাগ্য লাভ করতে সক্ষম।” অতঃপর

তিনি এই ঐতিহাসিক উক্তি করেন : *وإنَّ حُسْنَ التَّبَعْلِ يَعدِلُ ذلِكَ كُلَّهُ* “সুচারুরূপে ঘর- সংসারের দায়িত্ব পালনই জিহাদের সমকক্ষ।” তবে কখনো কখনো কিছু অভিজ্ঞ নারী ইসলামের যোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য তাঁদের সাথে মদীনার বাইরে আসতেন। তাঁরা পিপাসার্তদের পানি পান করানো, সৈনিকদের কাপড় ধোয়া ও আহতদের সেবা করার মাধ্যমে মুসলমানদের বিজয় লাভে সাহায্য করতেন।

উম্মে আমেরের নাম ছিল নাসীবা। তিনি বলেন : “আমি ইসলামের মুজাহিদগণের পানি সরবরাহের জন্য উহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। আমি দেখতে পেলাম, বিজয়ের হাওয়া মুসলমানদের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে হঠাৎ মোড় ঘুরে গেল। মুসলমানরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে লাগল। মহানবী (সা.)- এর প্রাণ নিয়ে আশংকা দেখা দিল। আমি নিজ দায়িত্ব মনে করলাম যে, জীবন যতক্ষণ আছে, মহানবীর প্রাণ রক্ষা করব। পানির মশক মাটিতে নামিয়ে রাখলাম। একটি তরবারি সংগ্রহ করে নিয়ে শত্রুদের আক্রমণের তীব্রতা কমানোর চেষ্টা করলাম। কখনো কখনো তীর নিক্ষেপ করছিলাম।” এ ঘটনা ঘটার সময় তাঁর কাঁধে যে ক্ষত হয়েছিল, তা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন : “লোকেরা যখন শত্রুবাহিনীর বিপরীত দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন পলায়নরত এক ব্যক্তির উপর মহানবীর দৃষ্টি পড়ে। তিনি বললেন : এখন যে পালিয়ে যাচ্ছ, অন্তত তোমার ঢালটি ফেলে যাও। সে ঢালটি মাটিতে ফেলে দিল। আমি সেই ঢালটি নিয়ে ব্যবহার করতে লাগলাম। হঠাৎ বুঝতে পারলাম, ‘ইবনে কুমিআ’ নামক এক ব্যক্তি সজোরে চিৎকার দিয়ে বলছে, মুহাম্মদ কোথায় আছে? সে মহানবীকে চিনতে পেরে নাজা তলোয়ার নিয়ে তাঁর ওপর আক্রমণ করতে আসে। আমি ও মুসআব তাকে তার লক্ষ্যের দিকে যেতে বাধা দিলাম। সে আমাকে পেছনে তাড়ানোর জন্য আমার কাঁধের উপর একটি আঘাত করে। আমি যদিও তাকে কয়েক বার আঘাত করেছি; কিন্তু তার আঘাত আমার ওপর প্রভাব ফেলেছিল, যা এক বছর পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তার শরীরে দু’টি বর্ম ছিল। এজন্য আমার আঘাত তার ওপর কার্যকর প্রভাব রাখে নি।

আমার কাঁধের ওপর যে আঘাত লাগে, তা খুবই মারাক ছিল। মহানবী (সা.) আমার আঘাতের কথা বুঝতে পারেন। তিনি দেখতে পেলেন, তা থেকে রক্তের ফোয়ারা ছুটছে। তৎক্ষণাৎ তিনি আমার এক ছেলেকে ডেকে বললেন : তোমার মায়ের ক্ষতস্থানটা বেঁধে দাও। সে আমার ক্ষতস্থান বেঁধে দিল। আমি আবার প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত হলাম।

এর মধ্যে আমি দেখতে পেলাম, আমার এক ছেলে আহত হয়েছে। তৎক্ষণাৎ আহতদের পিঁ বাঁধার জন্য যে কাপড় সাথে এনেছিলাম, তা দিয়ে আমার ছেলের ক্ষতস্থান বেঁধে দিলাম। এ সময় মহানবীর নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার বিষয়টির দিকে আমার ছেলের মনোযোগ আকর্ষণ করে

বললাম : قم فضا رب القوم هه بৎস! ওঠ, যুদ্ধে অবতীর্ণ হও।”

মহানবী (সা.) এই আত্মসর্গকারী নারীর সাহস ও বীরত্বের জন্য বিস্ময়বোধ করলেন। যখনই তাঁর সন্তানের আঘাতকারীকে দেখতে পেলেন, তখনই নাসীবাকে সম্বোধন করে বললেন : “তোমার সন্তানের আঘাতকারী হচ্ছে এই লোক।” প্রিয়জনের বিয়োগে বেদনাবিধুর এই নারী, যে এতক্ষণ পতঙ্গের ন্যায় হযরতের চারপাশে ঘূর্ণায়মান ছিল, এ কথা শোনার সাথে সাথে সিংহের মতো লোকটির ওপর আক্রমণ করল এবং তার পায়ের নলি বরাবর এমন আঘাত করল যে, তাতে লোকটি ধরাশায়ী হয়ে গেল। এবার মহিলার বীরত্বের ব্যাপারে মহানবীর বিস্ময় আরো বৃদ্ধি পেল। তিনি বিস্ময়ে হেসে ফেললেন এমনভাবে যে, তাঁর পেছনের সারির দাঁত লো প্রকাশিত হয়ে পড়ল। তিনি বললেন : “তোমার সন্তানের যথার্থ প্রতিশোধ নিয়েছ।” ৫৫

পরের দিন যখন মহানবী (সা.) তাঁর সেনাদলকে ‘হামরাউল আসাদ’ - এর দিকে পরিচালিত করলেন, নাসীবাও সেনাবাহিনীর সাথে যেতে চাইলেন। কিন্তু মারাক কভাবে আহত হবার কারণে তাঁকে যাবার অনুমতি দেয়া হয় নি। মহানবী হামরাউল আসাদ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে এক ব্যক্তিকে নাসীবার ঘরে পাঠান যাতে তিনি নাসীবার অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবগত করেন। মহানবী তাঁর সুস্থতার সংবাদ পেয়ে খুশী হন।

এই নারী এত ত্যাগের বিনিময়ে মহানবীর কাছে আবেদন করেন, যাতে তিনি তাঁর জন্য প্রার্থনা করেন, মহান আল্লাহ্ যেন তাঁকে বেহেশতে মহানবীর নিত্য সহচর করেন। মহানবীও তাঁর জন্য দুআ করেন এবং বলেন : “হে আল্লাহ্! এদেরকে বেহেশতে আমার সাথী করে দিন।” ^{৫৬}

এই মহিয়সী নারীর বীরত্বের দৃশ্য মহানবীকে এতখানি আনন্দিত করে যে, তিনি এই মহিলা সম্পর্কে বলেছিলেন : *لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من فلان و فلان* “আজ নাসীবা বিনতে কা’ ব-
এর মর্যাদা অমুক অমুকের চাইতে শ্রেষ্ঠ।”

ইবনে আবীল হাদীদ লিখেছেন, হাদীস বর্ণনাকারী মহানবীর প্রতি খেয়ানত করেছেন। কেননা এ দু’ব্যক্তির নাম পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন নি।^{৫৭} তবে আমি মনে করি, অমুক অমুক বলতে ঐ লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাঁরা রাসূলের পরে মুসলমানদের মধ্যে বড় বড় পদমর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন; বর্ণনাকারী তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের সামাজিক ও রাণীয় পদমর্যাদাজনিত ভীতির কারণেই কথাটি অস্পষ্ট রেখে দিয়েছেন।

উদ্ভদ যুদ্ধ- পরবর্তী ঘটনাবলী

একটি সংখ্যাস্বল্প শ্রেণীর প্রাণ বাজি রেখে লড়াইয়ের কারণে মহানবীর জীবন নিশ্চিত বিপদ থেকে রক্ষা পায়। সৌভাগ্যবশত, অধিকাংশ শত্রুই মনে করেছিল মহানবী (সা.) নিহত হয়েছেন এবং তারা নিহতদের সারিতে মহানবীকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। অন্যদিকে যে স্বল্প সংখ্যক লোক মহানবী নিরাপদে আছেন জেনে আক্রমণ করেছিল, তাদেরকে আলী, আবু দুজানাহ ও (সম্ভবত) আরও কয়েকজন প্রতিহত করেছিলেন। এ সময় মহানবীর নিহত হবার জব যেন অস্বীকার না করাটাই ভালো মনে করা হয়েছিল। মহানবী তখন তাঁর সাথীদের নিয়ে গিরিপথের দিকে গমন করেন।

পশ্চিমধ্যে মহানবী একটি গর্তে পড়ে যান যা মুসলমানদের জন্য আবু আমের খনন করেছিল। তৎক্ষণাৎ আলী মহানবীর হাত ধরে ফেলেন এবং তাঁকে গর্ত থেকে উঠিয়ে ফেলেন। মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম মহানবীকে চিনতে পেরেছিলেন, তিনি ছিলেন কা' ব ইবনে মালিক। তিনি দেখলেন, শিরস্ত্রাণের নিচে মহানবীর চোখ জ্বলজ্বল করছে। তিনি তৎক্ষণাৎ চিৎকার দিয়ে বললেন: “হে মুসলমানরা! মহানবী এখানে। তিনি জীবিত আছেন। আল্লাহ্ তাঁকে শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছেন!”

‘মহানবী জীবিত আছেন’ - এ সংবাদের কারণে যখন পা' আক্রমণ জোরদার হচ্ছিল, তখন মহানবী আদেশ দিলেন : “কা' ব! এ তথ্য তুমি গোপন রাখ।” আর তিনিও তাতে নিশ্চুপ হয়ে যান।

শেষ পর্যন্ত মহানবী (সা.) গিরিপথের মুখে পৌঁছেন। এ সময় আশেপাশে যেসব মুসলমান ছিলেন, মহানবী জীবিত আছেন দেখে তাঁরা খুশী হলেন। তাঁরা মহানবীর সম্মুখে লজ্জিত ও অনুতপ্তভাবে উপস্থিত হন। আবু উবাইদা জাররাহ মহানবীর মুখের ভেতর ঢুকে যাওয়া শিরস্ত্রাণের দু'টি বলয় টেনে বের করেন। আমীরুল মুমিনীন তাঁর ঢালে পানি ভর্তি করে আনেন। মহানবী তাঁর মুখমণ্ডল ও মাথা ধৌত করেন এবং এ বাক্য বলেন :

أشد غضب الله علي من أدمي وجه نبيّه

“যে জাতি তার নবীর মুখমণ্ডলকে রক্তাক্ত করেছে, তার ওপর আল্লাহর ক্রোধ বৃদ্ধি পেয়েছে।”

সুযোগের সন্ধানে দুশমন

যে মুহূর্তে মুসলমানরা বিরাট বিপর্যয় ও পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিল, সে সময় সুযোগ সন্ধানী শত্রুরা তাদের মিথ্যা আকীদা- বিশ্বাসের মোক্ষম সুযোগ নেয়। তারা সরলপ্রাণ মানুষকে প্রতারিত করতে পারে এমন গোণান তাওহীদী বিশ্বাস ও ধর্মের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করে। সাম্প্রতিককালের একজন লেখকের বক্তব্য অনুসারে মানুষের চিন্তা, মন ও বিশ্বাসে অনুপ্রবেশ ও প্রভাব বিস্তার করার জন্য সংশ্লিষ্ট জনগণ বা জাতির বড় বড় বিপদে পতিত হওয়া বা পরাজয় বরণের চাইতে অন্য কোন পরিবেশ ও সুযোগ অধিকতর অনু ল নয়। প্রচণ্ড বিপদকালে অত্যাচারিত জাতির মনোবল এতই দুর্বল ও নড়বড়ে হয়ে যায় যে, ঐ জাতির বিবেক- বুদ্ধি নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মূল্যায়ন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এ সুযোগেই পরাজিত জাতির মন- মগজে অপপ্রচার অতি সহজে অনুপ্রবেশ করতে বা প্রভাব- প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

আবু সুফিয়ান ও ইকরামাহ তখন বড় বড় মূর্তি লো হাতের উপর নিয়ে বিজয়োল্লাসে মত্ত হয়ে পড়ল; তারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে গোণান দিল : “উলু হুবল, উলু হুবল (জয় হুবল, জয় হুবল) অর্থাৎ আমাদের বিজয় মূর্তিপূজার সাথে সংশ্লিষ্ট। ‘হুবল’ ছাড়া যদি কোন খোদা থাকত এবং তাওহীদবাদের বাস্তবতা থাকত, তা হলে তোমরাই (মুসলমানেরা) বিজয়ী হতে।”

মহানবী বুঝতে পারলেন, প্রতিপক্ষ অত্যন্ত স্পর্শকাতর সময়ে এক জঘন্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। সুযোগের সদ্ব্যবহারে তারা মেতে উঠেছে। ফলে তিনি যাবতীয় দুঃখ- বেদনার কথা ভুলে যান। তৎক্ষণাৎ তিনি আলী এবং সব মুসলমানকে নির্দেশ দেন, শিরকের এ আহ্বানকারীদের জয়ধ্বনির জবাবে তোমরা পা গোণান দাও : الله أعلي و أجلّ، الله أعلي و أجلّ “আল্লাহ অতি উচ্চ, অতি মহান। আল্লাহ অতি উচ্চ, অতি মহান।”

অর্থাৎ আমাদের এ পরাজয় মহান আল্লাহর বন্দেগীর কারণে নয়, বরং অধিনায়কের আদেশ লনের ফলে এ (সাময়িক) পরাজয়।

আবু সুফিয়ান এবারও তার বিষাক্ত চিন্তাধারা প্রচার করা থেকে বিরত হলো না এবং বলল :

نحن لنا العزّي و لا عزّي لكم “আমাদের আছে উজ্জা দেবতা। তোমাদের কোন উজ্জা নেই।” মহানবী শত্রুর কাছ থেকে সুযোগ কেড়ে নেন। তিনি মুসলমানদের উপত্যকার মাঝে বলিষ্ঠ গোপান দেবার নির্দেশ দেন যা ছন্দগত দিক থেকে ছিল মুশরিকদের গোপানের পাঁজবাব। মুসলমানরা উহুদ প্রান্তর কাঁপিয়ে সমস্বরে বলে উঠলেন : الله مولانا و لا مولى لكم “আল্লাহ আমাদের প্রভু এবং তোমাদের কোন প্রভু নেই।” অর্থাৎ তোমরা মূর্তি- যা পাথর বা কাঠের তৈরি ভাস্কর্য ছাড়া আর কিছু নয়- এর ওপর নির্ভরশীল; আর আমাদের ভরসা ও আশ্রয়স্থল স্বয়ং আল্লাহ।

শিরকের প্রবক্তারা তৃতীয় বার বলল : “আজকের দিন, বদরের দিনের বদলা।” মুসলমানরাও মহানবীর নির্দেশে বললেন : “এই দু’দিন কখনো সমান নয়; আমাদের নিহতরা বেহেশতে আর তোমাদের নিহতরা দোযখে।”

আবু সুফিয়ান এসব বজ্রকঠিন জবাবের মোকাবেলায়- যা শত শত মুসলমানের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছিল, ভীষণভাবে বিচলিত হয় এবং একটি বাক্য উচ্চারণের মধ্য দিয়ে মার উদ্দেশে ময়দান ত্যাগ করে- “আগামী বছর তোমাদের আর আমাদের মধ্যে আবার দেখা হবে।” ৫৮

এখন মুসলমানরা কয়েক শ’ আহত এবং সত্তর জন শহীদকে নিয়ে ক্লান্ত। এরপরও খোদায়ী দায়িত্ব পালন (যুহর ও আসর নামায আদায়) করতে হবে। মহানবী (সা.) ভীষণ দুর্বলতার কারণে বসা অবস্থায় জামাআত সহকারে নামায আদায় করেন। এরপর তিনি উহুদের শহীদগণের দাফন-কাফনের কাজে নিয়োজিত হন।

যুদ্ধ শেষ

যুদ্ধের আন নিভে গেলো। উভয়পক্ষ পরস্পর থেকে দূরে সরে গেল। মুসলমানদের নিহতের সংখ্যা ছিল কুরাইশদের নিহতের সংখ্যার তিন গুণ। কাজেই এ প্রিয়জনদের তাড়াতাড়ি দাফনের ব্যবস্থা করা জরুরী হয়ে পড়েছিল।

কুরাইশ মহিলারা তাদের বিজয়কালে দেখতে পেয়েছিল, যে কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য ময়দান একেবারে উন্মুক্ত। মুসলমানরা শহীদদের কাফন- দাফনের ব্যবস্থার আগে এ মহিলারা এক জঘন্য পৈশাচিকতায় লিপ্ত হয়। এ ধরনের অপরাধ ইতিহাসে বলতে গেলে বিরল ঘটনা। তারা তাদের বাহ্যিক বিজয়ের ওপর সন্তুষ্ট হয় নি, বরং আরো অধিক প্রতিশোধ নেবার জন্য মাটিতে পড়ে থাকা (শহীদ) মুসলমানদের নাক- কান ও অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ কেটে নেয়। আসলে এর মাধ্যমে তারা নিজেদের গায়ে জঘন্য কালিমা লেপন করে। বিশ্বের সকল জাতির কাছেই শত্রুপক্ষের নিহতরা অসহায় এবং তারা সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু আবু সুফিয়ানের স্ত্রী মুসলমান শহীদগণের অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ গায়ে গলার মালা তৈরি করে। ইসলামের আত্মত্যাগী বীর সেনাপতি হযরত হামযাহর পেট চিরে ফেলে। তাঁর কলিজা বের করে নিয়ে তা চিবায় এবং খাওয়ার জন্য বহু চেষ্টা করার পরও সে তা খেতে পারে নি। এ কাজটি এত জঘন্য ও ন্যায্যবিহীন ছিল যে, স্বয়ং আবু সুফিয়ানও বলেছিল : “এ কাজের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি এ ধরনের নির্দেশ দিই নি। তবে এ ব্যাপারে আমি খুব বেশি অসন্তুষ্টও নই।”

এ জঘন্য কাজটির কারণে হিন্দ মুসলমানদের মাঝে **هند آكلة الكباد** ‘কলিজা ভক্ষণকারিণী হিন্দ’ নামে কুখ্যাত হয়। পরবর্তীতে হিন্দ- এর সন্তান- সন্ততিরা ‘কলিজা ভক্ষণকারিণীর সন্তান’ হিসেবে পরিচিত হয়। মুসলমানরা মহানবীর সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে যান। তাঁরা ঐ সত্তর জন শহীদদের লাশ দাফনের প্রস্তুতি নেন। হঠাৎ রাসূলের নযর পড়ে হামযাহর লাশের উপর। হামযাহর মৃতদেহের করুণ অবস্থা দেখে তিনি ভীষণভাবে মর্মান্বিত হন। ক্রোধের প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায় তাঁর অন্তরে। তিনি

মন্তব্য করেন : “আমার মধ্যে এখন যে ক্রোধের উদ্বেক ঘটেছে, আমার জীবনে এর আগে কখনো তা হয় নি।”

ইতিহাসবেত্তা ও মুফাসসিরগণ সর্বসম্মতভাবে বলেন, মুসলমানরা প্রতিজ্ঞা করল যে (কেউ কেউ মহানবীকেও এই প্রতিজ্ঞায় शामिल বলে উল্লেখ করেন), যদি তারা মুশরিকদের ওপর জয়ী হতে পারে, তা হলে তাদের নিহতদের সাথেও এমন আচরণ করবে। তারা একজনের বদলা ওদের ত্রিশ জনের লাশ বিকৃত করবে (অর্থাৎ লাশ লোর হাত, পা, নাক, কান কেটে ফেলবে)। তাদের এ সিদ্ধান্তের পর সময় অতিবাহিত না হতেই হযরত জিবরীল এ আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হন :

(وإن عاقبتكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصّابرين)

“তোমরা যদি তাদের শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে, যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তা-ই উত্তম।” ৫৯

এ আয়াত হচ্ছে ইসলামী আইনের সুনিশ্চিত ও সর্বগৃহীত মূলনীতি। পুনরায় এর মাধ্যমে ইসলাম তার আবেগ-অনুভূতিসম্পন্ন আধ্যাতিক চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। সে চরিত্র হচ্ছে, ইসলামের আসমানী আদর্শ ও বিধান প্রতিশোধ গ্রহণের ধর্ম বা বিধান নয়। যে কঠিনতম পরিস্থিতিতে মানুষের গোটা অস্তিত্ব জুড়ে ক্রোধের আন বইতে থাকে এবং প্রাধান্য বিস্তার করে রাখে, তখনও ইসলাম ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দানের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করে না। আর এর মাধ্যমে ইসলাম সর্বাবস্থায় ন্যায়বিচারের মূলনীতি বিবেচনায় এনেছে এবং তা প্রতিষ্ঠিত করেছে। হামযার বোন সাদিয়া ভাইয়ের লাশ দেখার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন; কিন্তু মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে তাঁর ছেলে যুবাইর মাকে ভাইয়ের লাশের কাছে যেতে বাধা দিচ্ছিল। তখন সাদিয়া তাঁর সন্তানকে বলেছিলেন : “আমি শুনেছি, আমার ভাইকে তারা বিকৃত করেছে। আল্লাহর শপথ! আমি যদি তাঁর শিয়রে যাই, আমি অস্থিরতা প্রকাশ করব না। আমি আল্লাহর রাস্তায় এই মুসিবতকে মাথা পেতে নেব।”

এই প্রশিক্ষিত নারী যথাযথ সংযম সহকারে ভাইয়ের মৃতদেহের শিয়রে যান। তাঁর জন্য নামায পড়েন এবং তাঁর মাগফিরাত কামনা করে ফিরে যান। সত্যই ঈমানের শক্তি হচ্ছে সর্বোচ্চ। কঠিনতম ঝড়- তুফান ও উত্তেজনাকে এ শক্তি প্রশমিত করে। বিপদগ্রস্ত মানুষকে তা প্রশান্তি ও মর্যাদা দান করে।

এরপর মহানবী (সা.) উহুদের শহীদগণের জানাযার নামায পড়েন। এরপর তাঁদেরকে কবরে একজন একজন করে বা দু'জন দু'জন করে দাফন করা হয়। মহানবী (সা.) আমর ইবনে জমূহ ও আবদুল্লাহ আমরকে এক কবরে দাফন করার নির্দেশ দেন। তাঁরা পূর্বেও পরস্পর বন্ধু ছিলেন। তাই মৃতাবস্থায়ও তাঁদের পরস্পরের একত্রে থাকা কতই না উত্তম!^{৬০}

সা' দ ইবনে রবীর শেষ কথা

সা' দ ইবনে রবী ছিলেন মহানবী (সা.)- এর আঞ্জাভাজন ও বিশ্বস্ত সাহাবী। বিশ্বাস ও নির্ণায় পরিপূর্ণ ছিল তাঁর হৃদয়। বারোটি আঘাতে জর্জরিত হয়ে যখন তিনি মাটিতে পড়েছিলেন, তখন তাঁর পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল। সে তাঁকে বলল : “মুহাম্মদ (সা.) নিহত হয়েছেন।” সা' দ তাকে বললেন : “মুহাম্মদের খোদা তো জীবিত আছেন। আমরা মহান আল্লাহর দীনের প্রচার-প্রসারের জন্য জিহাদ করছি এবং তাওহীদের সীমানা রক্ষায় তৎপর রয়েছি।”

যুদ্ধের লেলিহান শিখা নির্বাপিত হলে সা' দের কথা মহানবী (সা.)- এর মনে পড়লো। তিনি বললেন :

“আমার কাছে কে সা' দের সংবাদ নিয়ে আসতে পারে?” যাইদ ইবনে সাবিত সা' দের মৃত বা জীবিত থাকার ব্যাপারে সঠিক সংবাদ মহানবী (সা.)- এর কাছে নিয়ে আসার ব্যাপারে নিজেই উদ্যোগী হলেন। তিনি সা' দকে নিহতদের মাঝে পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি তাঁকে বললেন : “মহানবী (সা.) আমাকে তোমার অবস্থা অনুসন্ধান করে দেখার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন। তোমার সঠিক খবর যেন তাঁর কাছে নিয়ে যাই।” সা' দ বললেন : “মহানবী (সা.)- কে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে : সা' দের জীবনের কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র বাকী আছে। হে রাসূলুল্লাহ! মহান

আল্লাহ আপনাকে একজন নবীর জন্য উপযুক্ত সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন।” তিনি আরো বললেন : “মহানবীর সাথীগণ এবং আনসারগণের কাছে আমার সালাম পৌঁছাবে এবং বলবে : যদি মহানবীর কোন ক্ষতি হয় আর তোমরা জীবিত থাক, তা হলে কখনোই তোমরা আল্লাহর দরবারে কৈফিয়ত দিতে পারবে না।”

সা’ দেব পাশ থেকে মহানবী (সা.)- এর দূত তখনো দূরে চলে যান নি, সা’ দেব প্রাণ অপর জগতের দিকে উড়ে চলে যায়।^{৬১}

মানুষের নিজের প্রতি আগ্রহ তথা পণ্ডিতদের ভাষায় আ প্রেম এতই শক্তিশালী, মৌলিক ও দৃঢ় প্রোথিত যে, মানুষ কখনো নিজেকে ভোলে না। নিজের সবকিছুকে তার নিজের জন্য কুরবানী করে। কিন্তু ঈমানী শক্তি, আধ্যাতিকতার প্রতি আকর্ষণ ও প্রেম আ প্রীতির চাইতেও শক্তিশালী। কেননা ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী ইসলামের এই বীর সৈনিক মৃত্যুর সাথে ব্যবধান কয়েক মুহূর্তের বেশি নয় এমন সময়ও নিজেকে ভুলে যান। তখনও প্রিয়নবীর জীবন নিয়ে তাঁর চিন্তা ছিল। কেননা তিনি মনে করতেন, যে পবিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি জীবন বিসর্জন দিচ্ছেন, তা পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখতে হলে মহানবী (সা.)- এর বেঁচে থাকার রুত্বই সর্বাধিক। যাইদ ইবনে সাবেতের মাধ্যমে তিনি একমাত্র যে বার্তাটি পাঠান, তা ছিল সাহাবীগণ এক মুহূর্তও যেন মহানবীর প্রতিরক্ষার ব্যাপারে গাফিলতি প্রদর্শন না করেন।

মহানবী (সা.)- এর মদীনায় প্রত্যাবর্তন

সূর্য পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছিল। তার সোনালী আভা ছড়িয়ে দিচ্ছিল অপর গোলার্ধে। উহুদ প্রান্তর জুড়ে সুমসাম নীরবতা বিরাজ করছিল। ঐ সময়ই প্রচুর হতাহত নিয়ে রণক্লান্ত মুসলমানদের নতুন করে শক্তি সঞ্চয় এবং আহতদের সেবা- শুশ্রূষার জন্য তাদের ঘরে ফেরার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সর্বাধিনায়কের পক্ষ থেকে মদীনা ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়।

আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের সাথে নিয়ে মহানবী মদীনায় প্রবেশ করেন। মদীনায় তখন অধিকাংশ ঘর থেকে পুত্রহারা মা ও স্বামীহারা স্ত্রীদের কান্না ও আহাজারি শোনা যাচ্ছিল।

মহানবী (সা.) বনী আবদুল আশহালের মহল্লায় পৌঁছেন। সেখানকার নারীদের কান্নাকাটি মহানবীকে মর্মান্বিত করে। তাঁর পবিত্র উজ্জ্বল গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি মৃদুস্বরে বললেন : *و لكن حمزة لا يواكي له* : “কিন্তু কেউ হামযার জন্য কাঁদছে না।” ৬২

সা’ দ ইবনে মাআয ও আরো কতিপয় ব্যক্তি মহানবীর উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। তাঁরা একদল নারীকে ইসলামের বীর সেনানায়ক হামযাহর বিয়োগান্ত শাহাদাত সম্পর্কে অবহিত করেন ও ক্রন্দনের আহ্বান জানান। মহানবী এ ব্যাপারে জানার পর ঐ নারীদের জন্য দুআ করেন এবং বলেন : “আমি সব সময়ই আনাসারদের বস্তুগত ও নৈতিক সাহায্য পেয়েছি।” অতঃপর তিনি বললেন : “ক্রন্দনকারী নারীরা তাদের ঘরে ফিরে যাক।”

ঈমানদার মহিলার বিস্ময়কর স্মৃতি

ইসলামের ইতিহাসের পাতায় ঈমানদার নারীগণের আত্মত্যাগের ইতিহাস বিস্ময়কর। বিস্ময়কর বলছি এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, আমরা এর দৃষ্টান্ত বা নবীর সমকালীন নারীদের মাঝে কদাচিৎ দেখতে পাই।^{৬০}

স্বামী, পিতা ও ভাইকে এ যুদ্ধে হারানো বনী দীনার গোত্রের এক মহিলা, একদল মহিলার মাঝে বসে অশ্রুপাত করছিলেন। অন্য মহিলারাও শোকগাথা গেয়ে কান্নাকাটি করছিলেন। হঠাৎ মহানবী (সা.) ঐ মহিলাদের পাশ দিয়ে গমন করেন। শোকে কাতর এ মহিলা তাঁর চারপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে মহানবীর খবর জিজ্ঞেস করেন। সবাই বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রাসূল সুস্থ আছেন। তিনি বলেন : “আমার বড় আগ্রহ নিকট থেকে আমি মহানবীকে দেখব।” যে স্থানে মহানবী দাঁড়িয়েছিলেন, তা নারীদের বসার জায়গা থেকে বেশি দূরে ছিল না। তারা তাঁকে দেখিয়ে বলল : “ঐ যে রাসূলুল্লাহ।”

মহিলার দৃষ্টি যখন রাসূল (সা.)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলের উপর পড়ল, মুহূর্তে তিনি সব শোক, দুঃখ-বেদনা ভুলে গেলেন। তাঁর অন্তরের অন্তস্থল থেকে এমন এক ধ্বনি বের হয়ে এল, যা একটি বিব ঘটিয়ে দিল। ঐ মহিলা বললেন : “হে রাসূলুল্লাহ! আপনার পথে সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ আমার জন্য অতি সহজ। আপনি জীবিত থাকলে আমাদের ওপর যত বড় বিপদই আসুক না কেন, তা অত্যন্ত তুচ্ছ; তার প্রতি আমরা মোটেই ভ্রঞ্জেপ করি না।”

সাবাশ এই দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রতি! মুবারকবাদ সেই ঈমানের জন্য যা মহাসাগরগামী বিশাল জাহাজের নোঙরের মতো মানুষের অস্তিত্বের তরীকে ভয়ঙ্কর ঝড়-তুফানের মোকাবেলায় অস্থিরতা ও পদলন থেকে রক্ষা করে!^{৬৪}

আত্মত্যাগী নারীগণের আরেক দৃষ্টান্ত

ইতোপূর্বে আমরা আমরা ইবনে জামূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তিনি খোঁড়া এবং জিহাদ তাঁর ওপর ফরয না হলেও অনেক পীড়াপীড়ি করে মহানবীর কাছ থেকে অনুমতি আদায় করেন এবং

মুজাহিদদের প্রথম সারিতে গিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর ছেলে খাল্লাদ এবং তাঁর শ্যালক আবদুল্লাহ ইবনে আমরও এ পবিত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা তিনজনই শাহাদাত লাভ করেন। তাঁর স্ত্রী হিন্দ ছিলেন আমর ইবনে হাযামের মেয়ে এবং জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারীর ফুফু। তিনি উহুদ প্রান্তরে যান। তিনি তাঁর প্রিয়ভাজন শহীদগণকে মাটির উপর থেকে তুলে একটি উটের ওপর রাখেন এবং মদীনায় চলে যান।

মদীনার জব রটেছিল, মহানবী (সা.) যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়েছেন। নারীরা মহানবীর ব্যাপারে সঠিক খবর পাওয়ার জন্য উহুদের দিকে রওয়ানা হন। তিনি পশ্চিমমধ্যে মহানবীর স্ত্রীগণের সাক্ষাৎ পান। তাঁরা তাঁর কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবস্থা জানতে চান। এই নারী তাঁর স্বামী, ভাই ও সন্তানদের লাশ উটের উপর বেঁধে মদীনা নিয়ে যাচ্ছিলেন। এহেন অবস্থায়ও মনে হলো তাঁর যেন কোন বিপদই হয় নি! অত্যন্ত উৎফুল্ল কণ্ঠে তিনি বললেন : “আমার কাছে আনন্দের খবর আছে। আল্লাহর রাসূল জীবিত আছেন। এই বিরাট নেয়ামতের মুকাবেলায় সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ নগণ্য ও তুচ্ছ।”

অপর খবর হলো, মহান আল্লাহ কাফেরদেরকে ক্ষুদ্র ও ক্ষিণ্ত অবস্থার মধ্যে ফিরিয়ে দিয়েছেন।^{৬৫} এরপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো : “এই লাশ লো কার?” তিনি বললেন : “সবই আমার নিজের লোক। একজন আমার স্বামী, অপর আমার সন্তান, তৃতীয় আমার ভাই; মদীনায় দাফন করার জন্য তাদের নিয়ে যাচ্ছি।”

আমরা পুনরায় ইসলামের ইতিহাসের এ অধ্যায়ে ঈমানের আরেক দৃষ্টান্ত পাই। অর্থাৎ দুঃখ ও বিপদাপদ তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং পবিত্র লক্ষ্যের জন্য সকল দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করা। এ ঘটনা তারই জ্বলন্ত সাক্ষী। বস্তুবাদী আদর্শ কখনো এ ধরনের আত্যাগী নারী ও পুরুষকে প্রশিক্ষিত করতে পারে নি। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এই ব্যক্তির লক্ষ্য ও আদর্শের জন্য লড়াই করেন; পার্থিব ভোগ-লিপ্সা বা পদমর্যাদার জন্য নয়।

এ ঘটনার পর আরো ঘটনা আছে, যা আরো বিস্ময়কর, যা বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ও যারা ঐতিহাসিক বিষয়াদি বিশ্লেষণ করার জন্য প্রণয়ন করেছে, সে লোর আলোকে কখনোই

ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কেবল মহান আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ এবং উর্ধ্ব জগতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার প্রতি যাঁদের অটুট ঈমান রয়েছে এবং অলৌকিকত্ব ও কারামাতের বিষয় লো যাদের কাছে স্পষ্ট, কেবল তাঁরাই এসব ঘটনা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম এবং সবদিক থেকে সঠিক ও বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করতে পারবেন।

ঘটনার বিবরণ

উটের লাগাম তাঁর হাতে ছিল। মদীনার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু উটটি খুব কষ্টে পথ চলছিল। মহানবী (সা.)- এর স্ত্রীগণের মধ্যে একজন বললেন : “নিশ্চয়ই উটের বোঝা খুব ভারী হয়েছে।” জবাবে হিন্দ বললেন : “এই উট খুব শক্তিশালী। একাই দুই উটের বোঝা বহন করতে পারে। বরং এর অন্য কারণ আছে। তা হচ্ছে, যখনই আমি উটটি উহুদের দিকে নিয়ে যাই, উটটি খুব স্বচ্ছন্দে পথ চলে। আবার যখন মদীনার দিকে নিতে চাই, তখন খুব কষ্টে টেনে নিতে হয় বা হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ে। হিন্দ সিদ্ধান্ত নিলেন, উহুদে ফিরে যাবেন এবং মহানবী (সা.)- এর কাছে এ ঘটনা জানাবেন। তিনি সেই উটটি ও লাশ লো নিয়ে উহুদ প্রান্তরে যান। উটের পথ চলার বৃত্তান্ত মহানবীকে শোনান। মহানবী বললেন : “তোমার স্বামী যখন উহুদ আসছিল, তখন আল্লাহর কাছে কী দুআ করেছিল?” তিনি জবাব দিলেন : “আমার স্বামী আল্লাহর কাছে হাত তুলে মুনাযাত করেছিলেন : হে আল্লাহ! আমাকে আমার ঘরে ফিরিয়ে আনবেন না।”

মহানবী বললেন : “তোমার স্বামীর দুআ কবুল হয়েছে। আল্লাহ্ চান না, এ লাশ আমার ঘরে ফিরে যাক। তোমার এখন কর্তব্য, এই তিনটি লাশই উহুদ প্রান্তরে দাফন করা। জেনে রেখ, পরকালে তারা তিনজনই একত্রে থাকবে।”

হিন্দ অশ্রুসিক্ত নয়নে মহানবীর কাছে একটি আবেদন করেন। তা হলো, তিনি যেন দুআ করেন যাতে তিনিও (হিন্দ) তাঁদের সাথে থাকতে পারেন।^{৬৬}

মহানবী (সা.) তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করেন। তাঁর প্রিয় কন্যা ফাতিমার দৃষ্টি পিতার বিমর্ষ চেহারার উপর পড়ল। তাঁর দু’চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। মহানবী তাঁর নিজের তরবারিখানা ধোয়ার জন্য হযরত ফাতিমা যাহরাকে দিলেন।

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর দিকে ঐতিহাসিক আরবালী বলেন : মহানবী (সা.)- এর কন্যা ফাতিমা পানি আনলেন, যাতে পিতার পবিত্র মুখমণ্ডলের রক্ত ধুয়ে ফেলেন। আমীরুল মুমিনীন পানি ঢালছিলেন। কিন্তু আঘাতজনিত ক্ষত গভীর ছিল বলে রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে তিনি মাদুরের একটি টুকরো জ্বালিয়ে সেটির ছাই মুখমণ্ডলের ক্ষতস্থানসমূহের উপর লাগিয়ে দেন। ফলে মুখমণ্ডলের ক্ষতস্থানের রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়।^{৬৭}

প্রয়োজন শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন

উহুদের ঘটনার পর মুসলমানরা যে রাতে নিজ নিজ ঘরে ফিরে গিয়ে ঘুমিয়েছিলেন, তা খুবই স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল রাত ছিল। মুনাফিকরা, ইহুদীরা এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের অনুসারীরা এ পরিস্থিতির জন্য দারুণ খুশী হয়েছিল। অধিকাংশ ঘর থেকে শহীদগণের আঁয়-স্বজনের কান্নাকাটি ও বিলাপের আওয়ায শোনা যাচ্ছিল।

সবচেয়ে বড় কথা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে মদীনার মুনাফিক ও ইহুদীদের বিদ্রোহের আশংকা ছিল। অন্ততপক্ষে তারা মতবিরোধ ও অনৈক্য সৃষ্টি করে ইসলামের প্রাণকেন্দ্রের রাজনৈতিক সংহতি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করতে পারত।

অভ্যন্তরীণ মতবিরোধজনিত ক্ষয়-ক্ষতি বহিঃশত্রুর আক্রমণের চেয়েও অনেক বেশি। এসব কারণে অভ্যন্তরীণ শত্রুদের মাঝে ভীতি সঞ্চার করা মহানবী (সা.)- এর অন্যতম কর্তব্য ছিল। তাদেরকে এ কথা বুঝিয়ে দেয়া প্রয়োজন ছিল যে, তাওহীদী বাহিনীতে কোনরূপ বিশৃংখলা বা দুর্বলতা প্রবেশ করে নি। বরং অনৈক্য সৃষ্টির যে কোন পায়তারা এবং ইসলামের শক্তিমূলে আঘাত হানার যে কোন তৎপরতা সর্বশক্তি দিয়ে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেয়া হবে।

মহানবীর ওপর আল্লাহর তরফ থেকে দায়িত্ব অর্পিত হয় যে, ঐ রাতের পরের দিনই শত্রুবাহিনীকে ধাওয়া করতে হবে। মহানবী এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেন তিনি যেন সারা শহরে এ কথা ঘোষণা করে দেন যে, গতকাল যারা উহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তারা যেন আগামীকাল শত্রুবাহিনীকে ধাওয়া করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। যারা উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি, (আগামীকালের) এ জিহাদে আমাদের সাথে তাদের অংশগ্রহণের অধিকার নেই।

অবশ্য এ অভিযানে যাওয়ার ব্যাপারে উহুদ যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করে নি, তাদের বাধা দেয়া বা সীমাবদ্ধতা আরোপের পেছনে কতক লো হিকমতপূর্ণ কারণ বিদ্যমান ছিল, যা আলোকিত হৃদয়ের রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিদের কাছে মোটেই অজ্ঞাত নয়।

প্রথমত এই নিষেধাজ্ঞা এক ধরনের আঘাত ছিল ঐ লোকদের উপর, যারা উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিল। অন্য অর্থে তাদের থেকে যোগ্যতা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল এবং প্রকারান্তরে বলা হচ্ছিল যে, প্রতিরক্ষার যুদ্ধে অংশগ্রহণের যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলেছে।

দ্বিতীয়ত যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের জন্যও একটি শাস্তিমূলক শিক্ষা ছিল। কেননা তাদের শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণেই ইসলাম ও মুসলমানদের এত বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কাজেই তাদেরকেই এই বিপর্যয়ের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, একে পুষিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা ভবিষ্যতে আর কখনো এমন শৃঙ্খলা ভঙ্গের কাজ না করেন।

মহানবী (সা.)- এর পক্ষ হতে ঘোষণা দানকারীর আওয়ায বনী আবদুল আশহালের এক তরুণ শুনতে পায়। ঐ সময় সে তার ভাই সহ আহত শরীরে বিছানায় শুয়েছিল। এই আহবান তাদের এমনভাবে আলোড়িত করে যে, তাদের একটি মাত্র ঘোড়া এবং নানা কারণে তাদের জন্য যুদ্ধযাত্রা সমস্যাপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তারা পরস্পরকে বলল : “আমাদের জন্য কিছুতেই উচিত হবে না যে, মহানবী (সা.) জিহাদের ময়দানে গমন করবেন, আর আমরা তাঁর পেছনে পড়ে থাকব।” এই দু’যুবক পালাক্রমে ঘোড়ায় চড়ে পরদিন ইসলামী বাহিনীর সাথে মিলিত হয়।^{৬৮}

হামরাউল আসাদ^{৬৯}

মহানবী (সা.) ইবনে উম্মে মাকতুমকে মদীনায় স্থলবর্তী রূপে রেখে যান। তিনি মদীনা থেকে আট মাইল দূরে হামরাউল আসাদে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। খুযাআহ গোত্রপ্রধানের নাম ছিল মা’ বাদ খুযায়ী। তিনি মুশরিক হলেও মহানবীকে সমবেদনা জানান। খুযাআহ গোত্রের সকল লোকই ইসলামী সেনাবাহিনীর সহায়তা করে। মা’ বাদ মহানবীকে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে ‘হামরাউল আসাদ’ থেকে কুরাইশ বাহিনীর অবস্থানকেন্দ্র ‘রওহা’ গমন করেন এবং আবু সুফিয়ানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বুঝতে পারেন, আবু সুফিয়ান মদীনায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মুসলমানদের অবশিষ্ট শক্তি ঝুঁয়ে দেয়া তার উদ্দেশ্য। মা' বাদ আবু সুফিয়ানকে মদীনা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য করেন এবং বলেন :

“হে আবু সুফিয়ান! মুহাম্মাদ এখন ‘হামরাউল আসাদে’ আছেন। তিনি মদীনা থেকে অনেক বেশি সেনাশক্তি নিয়ে এসেছেন। গতকাল যারা যুদ্ধে অংশ নেয় নি, তারাও আজ তাঁর সাথে যোগ দিয়েছে।

আবু সুফিয়ান! আমি এমন কতক চেহারা দেখেছি যা ক্রোধে, ক্ষোভে জ্বলজ্বল করছিল। আমি জীবনে এমন ক্রোধান্বিত লোক দেখি নি। মুসলমানরা গতকালের বিশৃঙ্খলার জন্য খুবই অনুতপ্ত।” তিনি মুসলমানদের বাহ্যিক ও মানসিক শক্তি ও শৌর্য-বীর্য সম্পর্কে কথা বলে আবু সুফিয়ানকে তার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য করেন।

মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীগণ সহ সারা রাত হামরাউল আসাদে অবস্থান করেন। তিনি গোটা প্রান্তর জুড়ে আনন্দ জ্বালানোর নির্দেশ দিলেন যাতে শত্রুবাহিনী মনে করে, মুসলমানদের যোদ্ধা ও সমরশক্তি গতকাল উল্লেখ প্রান্তরে যা ছিল, তার চেয়ে বহু বেশি। সাফওয়ান উমাইয়্যা আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে বলে : “মুসলমানরা আঘাতে জর্জরিত, ক্ষত-বিক্ষত ও ক্ষুব্ধ। আমার মনে হয়, এতটুকুই যথেষ্ট; বরং আমাদের উচিত মায় ফিরে যাওয়া।”^{৭০}

একবারের বেশি প্রতারণিত হয় না ঈমানদার

এ উপশিরোনাম মহানবী (সা.)- এর এক বিখ্যাত উক্তির সার কথা। তিনি বলেছেন :

لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين

মহানবী (সা.) এ উক্তি তখনই করেন, যখন আবু আররা জামহী তাঁর কাছে মুক্তির আবেদন জানায়। লোকটি ইতোপূর্বে বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল। বদর যুদ্ধে মহানবী তার কাছ থেকে এই শর্তে প্রতিশ্রুতি নেন যে, তাকে মুক্তি দেন এবং, ইসলামের বিরোধিতায় সে মুশরিকদের সহায়তা করবে না। সেও শর্তটি মেনে নেয়। কিন্তু উল্লেখ যুদ্ধে অংশ নিয়ে সে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। ঘটনাচক্রে হামরাউল আসাদ থেকে ফেরার পথে মুসলমানরা তাকে বন্দী করে। এবারও সে মহানবীর কাছে মুক্তির জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু মহানবী তার অনুরোধের প্রতি কর্ণপাত করেন

নি। তিনি এ মন্তব্য করে তার প্রাণদণ্ড কার্যকর করার হুকুম দেন। আর এভাবে উহুদ যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহের সমাপ্তি ঘটে।^{৭১}

অবশেষে সত্তরজন বা চুয়ান্তরজন বা বর্ণনান্তরে একাশি জন শহীদের বিনিময়ে উহুদ যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। অন্যদিকে কুরাইশ বাহিনীর নিহতের সংখ্যা ছিল মাত্র বাইশ জন। এ পরাজয়ের কারণ ছিল গিরিপথের প্রহরীদের শৃঙ্খলা ভঙ্গ। এর বিবরণ ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছে। এভাবেই উহুদ যুদ্ধ তৃতীয় হিজরীর ৭ শাওয়াল শনিবার সংঘটিত হয় এবং একই সপ্তাহের শুক্রবার হামরাউল আসাদের ঘটনাপ্রবাহ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। ১৪ শাওয়াল এ যুদ্ধের পূর্ণ সমাপ্তি ঘটে।

হিজরী তৃতীয় সালের অন্যতম রত্নপূর্ণ ঘটনা ছিল ইমামতের উজ্জ্বল রত্ন ইমাম মুজতাবা হাসান ইবনে আলীর জন্ম। তিনি হিজরী তৃতীয় সালের রমযান মাসের মধ্যভাগে (১৫ রমযান) মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর জন্মগ্রহণের দিন তাঁর ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হয়। তাঁর জন্মের সময় এমন আনুষ্ঠানিকতা উদ্যাপন করা হয়, যার বিবরণ শিয়াদের মহান ইমামগণের জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

তেত্রিশতম অধ্যায় : চতুর্থ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

প্রচার- সৈনিকদের ট্রাজেডী

যুদ্ধ শেষ হবার পর উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের রাজনৈতিক প্রভাব সুস্পষ্ট ছিল। মুসলমানরা যদিও বিজয়ী বাহিনীর সম্মুখে দৃঢ়তা দেখায় এবং শত্রুবাহিনীর পুনরায় ফিরে এসে আঘাত হানার চেষ্টা প্রতিরোধ করে, কিন্তু উহুদের ঘটনার পর ইসলাম উৎখাত করার লক্ষ্যে ভেতরের ও বাইরের চক্রান্ত ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। মদীনার মুনাফিক ও ইহুদীদের, শহরের বাইরের মুশরিকদের এবং দূর-দূরান্তের মুশরিক গোত্র লোর সাহস বেশ বেড়ে যায়। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং সৈন্য সমাবেশ করা থেকে বিরত হচ্ছিল না।

মহানবী (সা.) পূর্ণ দক্ষতার সাথে অভ্যন্তরীণ চক্রান্ত লো নস্যাত করে দেন এবং মদীনার বাইরের যে সব গোত্র মদীনা নগরী আক্রমণের ইচ্ছা পোষণ করছিল, মুজাহিদ যোদ্ধাদের পাঠিয়ে তাদের দমন করেন। এ সময়ই তিনি গোপন সংবাদ পান, বনী আসাদ গোত্র মদীনা দখল করে মুসলমানদের হত্যা ও ধন-সম্পদ লুটপাট করার ষড়যন্ত্র করছে। মহানবী (সা.) তৎক্ষণাত্ একশ পঞ্চাশ সৈন্যের একটি দলকে আবু সালামার অধিনায়কত্বে চক্রান্তকারীদের এলাকায় প্রেরণ করেন। মহানবী অধিনায়ককে নির্দেশ দেন : “এ অভিযানের আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখবে এবং ভিন্ন পথ ধরে গমন করবে। দিনের বেলা বিশ্রাম নেবে আর রাতের বেলা পথ চলবে।” তিনি মহানবীর আদেশ মান্য করেন এবং রাতের বেলা বনী আসাদ গোত্রকে ঘেরাও করে ষড়যন্ত্র অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেন। তিনি বিজয়ী বেশে বেশ কিছু গনীমতের সম্পদ নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। এ ঘটনা হিজরতের পঁয়ত্রিশতম মাসে সংঘটিত হয়।^{৭২}

ধর্ম প্রচারকগণের হত্যার গভীর ষড়যন্ত্রে র নীল নকশা

মহানবী (সা.) ছোট ছোট সেনাদল পাঠিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা নস্যাত্ন করে দিচ্ছিলেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের কাছে ধর্মপ্রচারক দল পাঠিয়ে নিরপেক্ষ গোত্র লোর লোকদের মনকে ইসলামের মহান শিক্ষার দিকে আহ্বান করেছিলেন।

পবিত্র কুরআন, ধর্মীয় বিধানাবলী ও মহানবী (সা.)-এর হাদীস কঠিন ও হৃদয়ঙ্গমকারী দক্ষ মুবাঞ্জিগণ (ধর্মপ্রচারক) একান্তই প্রস্তুত ছিলেন, নিজ নিজ জীবন বিপন্ন করেও ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে বর্ণনা ও সবচেয়ে স্বচ্ছ পদ্ধতিতে মানুষের কর্ণকুহরে পৌঁছে দেবেন।

মহানবী (সা.) সামরিক বাহিনী ও ধর্মপ্রচারকগণের বিভিন্ন দল প্রেরণ করে মহান নবুওয়াত ও রিসালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট দু'টি রুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে সেনাদলসমূহ প্রেরণ ছিল মাথা চাড়া দেয়ার উপক্রম ঐ সব ফিতনা ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে, যাতে নিরাপদ ও মুক্ত পরিবেশে ধর্ম প্রচারকারীগণ তাঁদের অতি রুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আর সে দায়িত্ব ছিল মানুষের চিন্তা ও মনকে আলোকিত করা ও তাদের হৃদয় জয় করা।

কিন্তু কতিপয় বর্বর ও নীচ গোত্র ইসলামের আধ্যাত্মিক শক্তিরূপ ধর্ম প্রচারক দল-যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল এক আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর প্রসার এবং কুফর ও মূর্তিপূজার উচ্ছেদ-তাঁদের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্তের জাল বিস্তার করে নির্মমভাবে হত্যা করে। এখানে এই নিবেদিতপ্রাণ ধর্ম প্রচারকারী দলের কাহিনী উপস্থাপন করছি যাঁদের সংখ্যা ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী ছয়^{৭৩} এবং ইবনে সা'দের বর্ণনা মোতাবেক দশ জন।^{৭৪}

ইসলামের মুবািল্লিগগণের নিরু হত্যাकाणु

आदाल (عضل) ऒ कारा (قار) गौद्रेर अकदल प्रतिनिधि प्रतारणार आश्रय निरुे महानवी (सा.)-
एर निकट उपस्थित हुरे बले : “हे रासूलान्नाह! आमारुदर अन्तर इसलामेर दिके बूँकेछे एबं
आमारुदर सम्प्रदाय इसलाम ग्रहण करार जन्य तैरि हुरे आछे। आपनि दया करे आपनार
अकदल साहबीके प्रेरण करुन ताँरा आमारुदर मारुे धरुम प्रचार करबेन, आमारुदरुके पबित्र
कुरआन शिक्का देबेन एबं महान आल्लाहर पक्क हते निर्धारित हालाल ऒ हाराम सम्पर्के आमारुदर
अबहित करबेन।” १५

महानवी (सा.)- एर दायितु छिल अई ये, कतिपय बड़ गौद्रेर प्रतिनिधि अ दलटिर आहवाने
साड़ा देबेन। आर मुसलमानदरुे दायितु छिल ये कौन किछुर विनिमये अ सुयुगेर सदु्यबहार
करा। अ कारणे महानवी (सा.) ‘मुरसेद’ नामक अक साहबीर अधिनायकते अकटि दलके
गौद्रे लौर प्रतिनिधिरुदर साथे उल्लिखित अणुले प्रेरण करेन। ताँरा गौद्रेीय प्रतिनिधिरुदर
साथे मदीना एबं मुसलमानदरु शक्ति ऒ कर्तृतेर आगतार बाहुरे चले यान एबं ‘रायी’ नामक
अक पानिर उँसेर ज्ञाने पौँछेन। सेथाने गुरे गौद्रेीय प्रतिनिधिरा तारुदर असं उदुदेश्येर
प्रकाश घटाय। तारा हुरज्जैल गौद्रेर साहाय्य निरुे मदीना थेके प्रेरित लौकदरु बन्दी ऒ हत्या
करार सिद्धान्त नेय।

अणुले मुसलमानरा (मदीना थेके प्रेरित मुवािल्लिग) यखन शत्रुदरु द्वारा परिवुष्टित हन, तखन
तरवारि छाड़ा ताँदरु आर कौन आश्रयञ्जल छिल ना। अ कारणे तरवारिर बाँट शक्त करे हाते
धरे आ रक्कामूलक युद्धेर जन्य ताँरा तैरि हुरे यान। किन्तु शत्रुपक्क शपथ करे बले :
“तुमारुदर बन्दी करा छाड़ा आमारुदर अन्य कौन उदुदेश्य नेई। आमारुदर लक्क्य हलौ तुमारुदरु
जीवित अबस्थाय पाकड़ा ऒ करे कुराईश नेतारुदर हाते तुले देया एबं तारु विनिमये किछु अर्थ
लाभ करा।”

মুসলিম মুবাঞ্জিগগণ একে অপরের দিকে তাকালেন এবং তাঁদের অধিকাংশই সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁরা লড়াই করবেন। তাঁরা বললেন : “আমরা মূর্তিপূজারী ও মুশরিকদের কোন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করব না।” অতঃপর তাঁরা তরবারি কোষমুক্ত করেন এবং ইসলামের প্রতিরক্ষায় ও মহানবী (সা.)-কে উর্ধ্বে তুলে ধরার লক্ষ্যে বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদাত লাভ করেন। কিন্তু যাইদ ইবনে দাসিনাহ, খুবাইব ইবনে আদী ও আবদুল্লাহ তরবারি কোষবদ্ধ করে তাদের কাছে আ সমর্পণ করেন। অর্ধেক পথে এসে আবদুল্লাহ আ সমর্পণ করার কারণে অন্ততঃ হন। তিনি হাতের বাঁধন খুলে ফেলেন এবং তরবারি কোষমুক্ত করে শত্রুর ওপর আক্রমণ করেন। শত্রুরা পশ্চাদপসরণ করে এবং পাথর নিক্ষেপ করে তাঁকে ধরাশায়ী করে। তারা তাঁর দিকে এত বেশি পাথর নিক্ষেপ করে যে, তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং সেখানেই প্রাণ হারান। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। কিন্তু অপর দুই বন্দীকে মার কাফেরদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তার বিনিময়ে মুসলমানদের যারা বন্দী করেছিল তাদের দুই বন্দীকে কুরাইশরা মুক্তি দেয়।

সায়ফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা, যার পিতা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, বন্দী যাইদকে ক্রয় করে যাতে একজন ইসলাম প্রচারককে হত্যার মাধ্যমে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, এক বিশাল জনতার সামনে যাইদকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে। তানঈমে^{৭৬} ফাঁসিকাঠ টানানো হয়।

কুরাইশরা ও তাদের মিত্ররা নির্দিষ্ট তারিখে সেখানে সমবেত হয়। তার মৃত্যুর জন্য কয়েক মুহূর্তের বেশি বাকী ছিল না।

মার ফিরআউন আবু সুফিয়ান সকল ঘটনায় নিজে দূরে থেকে নেপথ্যে সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করত। আবু সুফিয়ান এবার যাইদকে লক্ষ্য করে বলে : “তুমি যে আল্লাহকে বিশ্বাস করো, তার শপথ দিয়ে বলছি- আমাকে বলো, তুমি কি চাও যে, মুহাম্মদ তোমার পরিবর্তে নিহত হোক? তা হলে তুমি মুক্তি পাবে এবং নিজ ঘরে ফিরে যাবে।”

যাইদ পূর্ণ সাহসিকতার সাথে বললেন : “আমি কখনো রাজি হব না যে, মহানবী (সা.)-এর পায়ে কোন কাঁটা বিদ্ধ হোক, যদিও তার বিনিময়ে আমার মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়।”

যাইদের বলিষ্ঠ জবাব আবু সুফিয়ানকে বিব্রত করে। মহানবী (সা.)- এর প্রতি সাহাবীগণের ভালোবাসার আধিক্য দেখে বিস্মিত হয়ে সে মন্তব্য করে : “আমার দীর্ঘ জীবনে মুহাম্মদের সাথীদের মতো আর কারো সাথী দেখি নি, যারা এত বেশি ত্যাগী হতে পারে, এত অধিক ভালোবাসা পোষণ করতে পারে!”

কিছুক্ষণের মধ্যেই যাইদকে ফাঁসিকাঠে ঝুলানো হয়। তাঁর প্রাণপাখি উড়ে যায় উর্ধ্বলোকের পানে। সত্য ও ন্যায়ের সীমান্ত রক্ষায়, ইসলামের সত্য বাণী প্রচারের লক্ষ্যে এঁরা শিরকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে নিজেদের জীবন বিসর্জন দেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি খুবাইব দীর্ঘদিন বন্দী অবস্থায় কাটান। মার পরামর্শসভা সিদ্ধান্ত নেয়, তাঁকেও তানঈম- এ ফাঁসিকাঠে চড়ানো হবে।^{৭৭}

খুবাইব ফাঁসিকাঠের পাশে মার নেতা ও কর্মকর্তাদের কাছ থেকে দু’রাকাত নামায আদায়ের অনুমতি গ্রহণ করেন। এরপর অতি সংক্ষেপে দু’রাকাত নামায আদায় করেন এবং কুরাইশ নেতাদের লক্ষ্য করে বলেন : “আমি মৃত্যুকে ভয় করি বলে তোমাদের ধারণা হতে পারে- এ সন্দেহ যদি না হতো, তা হলে এর চেয়ে বেশি নামায পড়তাম।^{৭৮} নামাযের রুকু ও সিজদা দীর্ঘ করতাম।” এরপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন : “হে আল্লাহ! আপনার নবীর পক্ষ হতে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তা আমরা পালন করেছি।” ঐ মুহূর্তে হত্যার আদেশ জারি করা হয়। খুবাইবকে ফাঁসিকাঠে চড়ানো হয়। খুবাইব ফাঁসিকাঠের ওপর বলতে লাগলেন : “হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমার একজন বন্ধুও আশেপাশে নেই, যে আমার সালাম মহানবী (সা.)- এর কাছে পৌঁছে দেবে। হে আল্লাহ! আপনিই আমার সালাম তাঁর কাছে পৌঁছিয়ে দিন।”

হয় তো এই আধ্যাতিক পুরুষের ধর্মীয় আবেগ আবু উকবার সহ্য হচ্ছিল না। সে দাঁড়িয়ে খুবাইবের ওপর এক শক্ত আঘাত হানে এবং তাঁকে শহীদ করে।

ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী^{৭৯} খুবাইব প্রাণত্যাগের পূর্বক্ষণে শূলির উপর এ কয়েক পঙ্ক্তি আবৃত্তি করেন :

فوالله ما أرجو اذا مت مسلماً علي اي جنب كان في الله مصرعي

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَ إِنْ يَشَاءُ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصِيَاءِ شُلُومِ مَزَع

“মহান আল্লাহর শপথ! যদি মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করি,
তা হলে কোন্ এলাকায় আমাকে দাফন করা হবে, তা নিয়ে চিন্তা করি না।

আমার এই হৃদয়বিদারক মৃত্যু আল্লাহর পথে, তিনি যদি চান,
এ শাহাদাত আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গের জন্য মুবারক করে দেবেন।”

এ হৃদয়বিদারক ঘটনা মহানবী (সা.)- কে দারুণভাবে মর্মান্বিত করে এবং মুসলমানদের গভীর শোকে নিমজ্জিত করে। মুসলমানদের মহান কবি হাঙ্গান ইবনে সাবিত এ উপলক্ষে মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা করেন যা ইবনে হিশাম তাঁর ‘সীরাত’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

রাসূল (সা.) এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন, এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। এর ফলে বহু কষ্টে প্রশিক্ষিত ইসলাম প্রচারের বীর সেনানীর উপর অপূরণীয় আঘাত আসতে পারে। কুৎসিত অন্তরের ইতর লোকেরা পূত চরিত্রের ধর্মপ্রচারকগণের উপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে যেতে পারে।

এই বীর মুজাহিদের লাশ বহু দিন ফাঁসিকাঠে ঝুলন্ত ছিল। একদল লোক লাশ পাহারা দিত। অবশেষে মহানবী (সা.)- এর নির্দেশে দু’জন দুঃসাহসী মুসলমান রাতের বেলা ফাঁসিকাঠ থেকে তাঁর লাশ নামিয়ে আনেন এবং দাফন করেন।^{৮০}

বীরে মাউনার ঘটনা

হিজরী চতুর্থ সালের সফর মাসে ‘রাযী’ নামক স্থানে ইসলামের কৃতি সন্তানদের শাহাদাতের খবর মহানবী (সা.)- এর কাছে পৌঁছার আগে আবু বাররা আমেরী মদীনায় আগমন করে। মহানবী (সা.) তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। সে দাওয়াত কবুল করল না। তবে মহানবী (সা.)- এর খেদমতে আরয় করল, যদি তিনি শক্তিশালী কোন ধর্ম প্রচারকারী দলকে নাজদ এলাকায় প্রেরণ করেন, তা হলে তাদের ঈমান আনার আশা করা যায়। কেননা তাওহীদের প্রতি তাদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। মহানবী (সা.) বললেন : ‘নাজদবাসীদের প্রতারণা ও শত্রুতাকে

আমি ভয় পাই।’ আবু বাররা বলল : “আপনার প্রেরিত ব্যক্তিবর্গ আমার আশ্রয়ে থাকবেন। আমিই নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমি তাদেরকে যে কোন দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করব।”

মহানবী (সা.)- এর নির্দেশে চল্লিশ জন ইসলাম ধর্ম বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, মুনযির- এর নেতৃত্বে নাজদের উদ্দেশে রওয়ানা হন। তাঁদের সবাই ছিলেন পবিত্র কুরআনের হাফেয ও ধর্মীয় বিধানে পারদর্শী। তাঁরা বীরে মাউনার (মাউনার প) কাছে গিয়ে যাত্রা বিরতি করেন। মহানবী (সা.) ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত একখানা পত্র নাজদ গোত্রীয় নেতা আমর ইবনে তুফাইলের উদ্দেশে লিখেছিলেন। তাঁর পত্র আমেরের কাছে পৌঁছানোর জন্য একজন মুসলমানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। আমের শুধু যে মহানবী (সা.)- এর চিঠিখানা পড়ে নি, তা নয়; বরং পত্রবাহককেও হত্যা করে। এরপর সে তার গোত্রের লোকদের ইসলাম প্রচারকগণকে হত্যা করার আহ্বান জানায়। গোত্রের লোকেরা এ ব্যাপারে সহযোগিতা থেকে বিরত থাকে এবং বলে, গোত্রের মুরব্বী আবু বাররা তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত নিজ গোত্রের লোকদের সাহায্যের ব্যাপারে সে নিরাশ হয় এবং আশেপাশের গোত্র ও সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্য চায়। এভাবে ইসলামের মুবাঞ্জিগগণের অবস্থানস্থলটি আমেরের লোকদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়।

ইসলামের প্রচারকারীরা শুধু যে বড় জ্ঞানী ও ধর্ম প্রচারক ছিলেন, তা- ই নয়; বরং বীর যোদ্ধাও ছিলেন। তাঁরা আ সমর্পণকে নিজেদের জন্য অবমাননাকর মনে করেন এবং তরবারি হাতে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। শুধু কা’ ব ইবনে যাইদ আহত শরীর নিয়ে কোনমতে মদীনা পৌঁছেন এবং ঘটনাটি মহানবীকে অবহিত করেন।

এ হৃদয়বিদারক ঘটনা গোটা ইসলামী বিশ্ব ও মুসলমানদের দারুণভাবে মর্মান্বিত করে। মহানবী (সা.) বহু দিন ধরে বীরে মাউনার স্মরণ করতেন।^{৮১}

এ দু’টি ঘটনাই ছিল উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া। কেননা এর ফলে মুসলমানদের হত্যার জন্য আশেপাশের গোত্র লোকের সাহস বেড়ে গিয়েছিল।

প্রাচ্যবিদদের উে প্রণোদিত অব ান

প্রাচ্যবিদরা যেখানে কোন মুশরিকের মুখে সামান্য আঁচড় লাগলেই সমালোচনামুখর হয়ে উঠেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের উপর মারমুখী হয়ে যান, আর জোর করে এ কথা বলার চেষ্টা করেন যে, ইসলাম তরবারির জোরে প্রচারিত হয়েছে, তাঁরা এই বেদনাদায়ক দু'টি ঘটনার ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছেন এবং এ ব্যাপারে একটা কথাও বলেন নি।

বিশ্বের কোথায় আছে যে, জ্ঞানের ঝাণ্ডাবাহীদের হত্যা করা হয়? ইসলাম তরবারির জোরে প্রচারিত হয়ে থাকলে এই মিশনারী দল লো কেন প্রাণকে হাতের তালুতে রেখে ইসলামের প্রচার- প্রসারের জন্য চেষ্টা চালিয়েছেন এবং শাহাদাতকে আলিঙ্গন করেছেন?

এ দু'টি ঘটনার অনেক শিক্ষণীয় দিক আছে। তাঁদের ঈমানের শক্তি, আ ত্যাগ, জান বাজি রেখে যুদ্ধ ও সাহসিকতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়, বিস্ময়কর এবং মুসলমানদের জন্য প্রেরণার উৎস।

মুমিন কখনো একবারের বেশি প্রতারিত হয় না

রাযী ও বীরে মাউনার হৃদয়বিদারক ঘটনায় ইসলামের বহু মুবাল্লিগ শহীদ হওয়ার কারণে মুসলমানদের মধ্যে দারুণ মর্মবেদনার সৃষ্টি হয়। এক অস্বাভাবিক ধরনের বিষাদ মুসলমানদের আচ্ছন্ন করে ফেলে। এখানে এসে পাঠকদের মনে হয় তো প্রশ্ন জাগবে, মহানবী (সা.) কেন এহেন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন? প্রথম ঘটনায় অর্থাৎ রাযীর নিকটে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারপরও অপর চল্লিশ ব্যক্তিকে তিনি কেন বীরে মাউনায় পাঠালেন? মহানবী (সা.) কি নিজেই বলেন নি : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين “মুমিন (সর্পের) এক গর্ত হতে দু'বার দংশিত হয় না।”

এ প্রশ্নের জবাব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কেননা ইসলাম প্রচারকারী দলটি আবু বাররার গোত্রের হাতে শহীদ হন নি। যদিও তার ভাতিজা আমের ইবনে তুফাইল আবু বাররার গোত্র- যা তার নিজেরও গোত্র- ইসলাম প্রচারকদের হত্যার জন্য প্ররোচিত করছিল, কিন্তু

ঐ গোত্রের একজনও তার কথায় সায দেয় নি। সবাই বলেছিল : “তোমার চাচা তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন।” শেষ পর্যন্ত আমের ইবনে তুফাইল পার্শ্ববর্তী ভিন্ন গোত্র ‘সালীম’ ও ‘যাকওয়ান’ - এর কাছ থেকে সহায়তা নেয় এবং ইসলাম প্রচারকগণকে নির্মমভাবে শহীদ করে। ইসলামের প্রচার সৈনিকরা আবু বাররার এলাকার উদ্দেশে গমনকালে নিজেদের মধ্য থেকে আমর ইবনে উমাইয়্যা ও হারিস ইবনে সিম্মাহকে^{৮২} তাঁদের উট লো চরানো ও দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত করেন। তাঁরা তাঁদের কাজে নিয়োজিত অবস্থায় হঠাৎ আমের ইবনে তুফাইল তাঁদের ওপর চড়াও হয়। ফলে হারিস ইবনে সিম্মাহ নিহত হন এবং আমর ইবনে উমাইয়্যাকে মুক্তি দেয়া হয়। আমর ইবনে উমাইয়্যা মদীনায় ফিরে আসার সময় দু’জন লোকের সাক্ষাৎ পান। তিনি নিশ্চিত হন, তারা সেই গোত্রের লোক যারা দীনের মুবািল্লিগগণকে হত্যা করেছে। এ কারণে তিনি উভয়কে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে মদীনায় ফিরে আসেন।

তাঁর এ কাজটি ভুল ধারণার কারণে হয়েছিল। কেননা তারা আবু বাররার (বনী আমের) গোত্রের লোক ছিল, যারা আপন গোত্রপতির প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের দলের ওপর হামলা চালাতে রাযী হয় নি।

এ ঘটনার ফলেও মহানবী (সা.)- এর মর্মবেদনা বৃদ্ধি পায়। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, ঐ দু’জনের রক্তমূল্য তিনি পরিশোধ করবেন।

তবে এ ব্যাপারে তাবাকাতে ইবনে সা’ দ- এর^{৮৩} প্রণেতা স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, উভয় দলের পরিণতির খবর একই রাতে মহানবী (সা.)- এর কাছে পৌঁছায়। দ্বিতীয় দলটি পাঠানোর সময় মহানবী (সা.) রাযীর শহীদদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা জানতেন না।

চৌত্রিশতম অধ্যায় : চতুর্থ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

বনী নাযীরের যুদ্ধ

মদীনার মুনাফিক ও ইহুদীরা উহুদে মুসলমানদের পরাজয় এবং ধর্মীয় বিশেষজ্ঞগণের নিহত হবার ঘটনায় দারুণ খুশী হয়েছিল। তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, মদীনায় কোন বিদ্রোহ ঘটাবে। এর মাধ্যমে মদীনার বাইরের গোত্র লোকে বোঝাবে যে, মদীনায় ন্যূনতম ঐক্য ও সংহতি বিদ্যমান নেই। কাজেই বহিঃশক্তি এসে ইসলামের নব্য প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করতে পারবে।

মহানবী (সা.) বনী নাযীর গোত্রের ইহুদীদের উদ্দেশ্য ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য একদল সৈনিকসহ তাদের দুর্গের দিকে গমন করেন। কিন্তু বনী নাযীরের সাথে যোগাযোগের পেছনে মহানবীর দৃশ্যমান উদ্দেশ্য ছিল আমার ইবনে উমাইয়্যার হাতে নিহত বনী আমের গোত্রের দুই আরবের রক্তমূল্য পরিশোধে তাদের সহায়তা নেয়া। কেননা বনী নাযীর গোত্র মুসলমানদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। ওদিকে বনী আমেরের সাথেও তাদের মৈত্রীচুক্তি ছিল। চুক্তিবদ্ধ গোত্র লো সাধারণত এ ধরনের পরিস্থিতিতে সহায়তা দিয়ে থাকে।

মহানবী (সা.) দুর্গের প্রবেশদ্বারে অবতরণ করেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যের কথা গোত্রীয় প্রধানদের কাছে তুলে ধরেন। তারা দৃশ্যত খোলা মনে মহানবীকে অভ্যর্থনা জানায় এবং কথা দেয়, রক্তমূল্য পরিশোধের ব্যাপারে তারা তাঁকে সাহায্য করবে। তারা মহানবীকে তাঁর ডাকনাম ‘আবুল কাসেম’ - এ সম্বোধন করে অনুরোধ করতে থাকে : “আপনি আমাদের দুর্গে প্রবেশ করুন এবং একটি দিন এখানে অবস্থান করুন।” রাসূল তাদের অনুরোধ গ্রহণ করলেন না; বরং দুর্গের দেয়ালের ছায়ায় সাথী ও সৈনিকগণ সহ বসেন এবং বনী নাযীর গোত্রের সর্দারদের সাথে কথাবার্তা বলতে থাকেন।^{b8}

মহানবী (সা.) উপলব্ধি করেন, তাদের মিষ্টি মিষ্টি কথার সাথে এক ধরনের সংশয়পূর্ণ রহস্যজনক তৎপরতা মিশে আছে। অন্যদিকে তিনি যেখানে বসে ছিলেন, সেখানে লোকজনের আনাগোনা বেশি করে পরিলক্ষিত হচ্ছিল। কানে কানে কথাবার্তা বেশি হচ্ছিল, যা থেকে সহজেই সন্দেহ

জাগে। মূলত বনী নাযীরের নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, মহানবীকে অতর্কিত আক্রমণ করে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেবে। তাদের একজন আমার হাজ্জাশ প্রস্তুতি নিয়েছিল, সে ছাদের উপর যাবে এবং মহানবী (সা.)- এর উপর একটি পাথর ফেলে তাঁকে হত্যা করবে।

সৌভাগ্যজনকভাবে তাদের নীল-নকশা ব্যর্থ হয়ে যায়। তাদের সন্দেহপূর্ণ ও অসংলগ্ন আচরণ থেকে তাদের চক্রান্ত আঁচ করা যাচ্ছিল। আল ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুযায়ী ওহীর ফেরেশতা মহানবীকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন। তিনি তাঁর স্থান থেকে সরে বসেন এবং এমনভাবে মজলিস ছেড়ে উঠে যান যে, ইহুদীরা মনে করল, কোন কাজে তিনি বাইরে যাচ্ছেন এবং আবার ফিরে আসবেন। কিন্তু রাসূল (সা.) মদীনার পথ ধরে অগ্রসর হন। তাঁর সাহাবীগণকেও এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছু জানালেন না। তাঁরা তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু তাঁরা যতই অপেক্ষা করল, তাতে কোন ফল হলো না।

বনী নাযীরের ইহুদীরা দারুণ দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার মধ্যে পড়ে গেল। তারা একদিকে ধারণা করছিল যে, মহানবী (সা.) তাদের পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছেন। তা-ই যদি হয়, তবে তাদের বড় ধরনের শাস্তি পেতে হবে। অপরদিকে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল : মহানবী যেহেতু এখন আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেছেন, তার প্রতিশোধ আমরা তার সাথীদের কাছ থেকেই নিই। তবে সাথে সাথে বলছিল যে, এ অবস্থায় পরিস্থিতি অনেক জটিল হয়ে যাবে এবং মহানবী (সা.) নিঃসন্দেহে আমাদের কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেবেন।

এহেন পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.)- এর সাথে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, মহানবীর খোঁজে তাঁরা যাবেন এবং তিনি কোথায় আছেন, তা সন্ধান করবেন। দুর্গের প্রাচীর থেকে বেশি দূরে যেতে না যেতেই তাঁরা এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পান, যিনি মদীনা থেকে আসছিলেন। তিনি মহানবীর মদীনা প্রবেশের সংবাদ নিয়ে আসেন। তাঁরা তৎক্ষণাৎ মহানবীর নিকট উপস্থিত হন। সেখানেই তাঁরা ইহুদীদের চক্রান্তের কথা জানতে পারেন, যা ওহীর ফেরেশতা জিবরীল (আ.) তাঁকে জানিয়েছিলেন।^{৮৫}

এ জঘন্য অপরাধ মোকাবেলায় করণীয়

এখন এ বিশ্বাসঘাতকদের ব্যাপারে মহানবীর করণীয় কি? এরাই সেই সম্প্রদায় যারা ইসলামী হুকুমতের নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছিল। ইসলামের সৈনিকরা তাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করছিলেন। জীবনভর তারা মহানবীর নবুওয়াতের সাক্ষ্য-প্রমাণ স্বচক্ষে দেখছিল। তারা তাদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থে শেষ নবীর সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য ও প্রমাণ দেখতে পেয়েছে; অথচ তাঁকে আতিথেয়তার পরিবর্তে হত্যার পরিকল্পনা এঁটেছে। অত্যন্ত কাপুরুষোচিত পন্থায় তাঁকে হত্যার উদ্যোগ নিয়েছে।

এক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের দাবী কী? এ ধরনের পরিস্থিতির যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় এবং এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার মূলোৎপাটন করা হয়, তার জন্য কী ব্যবস্থা নিতে হবে?

এক্ষেত্রে রাসূল (সা.) গৃহীত পদ্ধতি ছিল যুক্তিসঙ্গত। গোটা সেনাবাহিনীতে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। এরপর মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা আউসীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁকে নির্দেশ দেন, অতি সত্বর তাঁর পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত হুকুম যেন বনী নাযীরের নেতাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। তিনি বনী নাযীরের নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বললেন : “ইসলামের মহান নবী আমার মাধ্যমে তোমাদের কাছে এই বার্তা পাঠিয়েছেন যে, দশ দিনের মধ্যে অবশ্যই তোমরা এই ভূখণ্ড ছেড়ে চলে যাবে। কেননা তোমরা চুক্তিভঙ্গ করেছ, প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছ। যদি দশ দিনের মধ্যে এ এলাকা ত্যাগ না কর, তা হলে তোমাদের রক্ত প্রবাহিত করা হবে।”

এ বার্তা ইহুদীদের মধ্যে মারাত্মক হতাশার সৃষ্টি করে। তারা প্রত্যেকে এ ষড়যন্ত্রের দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করে। তাদের জনৈক নেতা সবাইকে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব করে। কিন্তু অধিকাংশের গোয়ারতুমী এ প্রস্তাব গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। চরম অসহায়ত্ব তাদের ঘিরে ধরে। নিরুপায় হয়ে মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমার উদ্দেশে বলে : “হে মুহাম্মদ! আপনি আউস গোত্রের লোক। মহানবীর আগমনের পূর্বে আউস গোত্রের সাথে আমাদের প্রতিরক্ষা চুক্তি ছিল। এখন কেন আমাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছেন?” তিনি পূর্ণ সৎ সাহস ও বলিষ্ঠতা সহকারে বললেন : “সেদিন পার হয়ে গেছে। এখন মানুষের মন পরিবর্তন হয়ে গেছে।”

এ সিদ্ধান্ত সেই চুক্তির আওতায় নেয়া হয়, যে চুক্তি মহানবীর মদীনা আগমনের প্রথম দিন লোয়ই তিনি মদীনার ইহুদী গোত্র লোর সাথে সম্পাদন করেছিলেন। ঐ চুক্তিতে বনী নাযীর গোত্রের পক্ষে হুইয়াই ইবনে আখতাব স্বাক্ষর করেছিল। চুক্তির বিষয়বস্তু আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। এর কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে : মহানবী তিন গোত্রের সাথেই (বনী নাযীর, বনী কাইনুকা ও বনী কুরাইযাহ) চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন, তারা কখনো রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সাহাবীগণের ক্ষতি করার জন্য কোন পদক্ষেপ নেবে না; মুখে বা হাতে তাঁদের কোন ক্ষতি করবে না।... যদি ঐ তিন গোত্রের কোন একটি চুক্তির বিষয়বস্তুর বিরোধী আচরণ করে, তা হলে তাদের রক্তপাত ঘটানো, সম্পদ বাজেয়াফত করা এবং তাদের নারী ও সন্তানদের বন্দী করার অধিকার মহানবীর থাকবে।^{৮৬}

কুস্তিরাশ্রু বিসর্জন

প্রাচ্যবিদদের দেখা যায়, এখানে এসে তাঁরা পুনরায় কুস্তিরাশ্রু বিসর্জন শুরু করে দেন। তাঁরা মায়ের চেয়ে মাসীর দরদের মতো বনী নাযীর গোত্রের বিশ্বাসঘাতক, চুক্তিভঙ্গকারী ইহুদীদের জন্য যারপর নাই অশ্রু বিসর্জন করেছেন। তারা মহানবীর কাজ ন্যায়বিচারের পরিপন্থী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন।

তাদের এ মায়াকান্না ও সমালোচনা সত্য উদঘাটন বা প্রকৃত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে নয়। কেননা সম্মানিত পাঠকবর্গ ইহুদীদের সাথে মহানবীর চুক্তির যে বিবরণ পাঠ করেছেন, তাতে এ মতটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মহানবী তাদের জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা করেন, তা চুক্তিপত্রে উল্লিখিত শাস্তির চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক লঘু। আজকের দিনে এসব প্রাচ্যবিদের প্রভুদের পক্ষ থেকে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে কত জঘন্য অপরাধ করা হচ্ছে, অথচ এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্য হতে একজনও সে লোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন না। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন মুষ্টিমেয় বিশ্বাসঘাতককে তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে উল্লিখিত শাস্তির চেয়েও কম শাস্তির ব্যবস্থা করেন, তখন কতিপয় লেখক সমালোচনামুখর হয়ে উঠেন। অথচ এসব লেখক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এ জাতীয় ঘটনা লোর বিচার- বিশ্লেষণ করে থাকেন।

মুনাফিক দলের ভূমিকা

মুনাফিক দলের ভূমিকা ছিল ইহুদীদের চেয়েও মারাত্মক। কেননা মুনাফিকরা বন্ধুর বেশে পেছন থেকে পিঠে ছুরি মারছিল। এদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও মালেক ইবনে উবাই। এরা মুসলমানদের সামনে বন্ধুত্বের মুখোশ পরেছিল। এরা ত বনী নাসীর গোত্রের নেতাদের কাছে প্রস্তাব পাঠায় যে, আমরা দু'হাজার সৈন্য দিয়ে তোমাদের সাহায্য করব। আর তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ গোত্রসমূহ অর্থাৎ বনী কুরাইযাহ ও বনী গাতফান তোমাদের একাকী ছেড়ে দেবে না। এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দানের কারণে ইহুদীদের সাহস বেড়ে যায়। শুরুতে তারা আত্মসমর্পণ করে দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেও পরবর্তীতে তাদের চিন্তা ও সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আসে। তারা দুর্গের প্রবেশদ্বারসমূহ বন্ধ করে দেয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সজ্জিত হয়। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, যে কোন মূল্যেই হোক, প্রতিরক্ষার লড়াই করবে এবং বিনামূল্যে তাদের ক্ষেত-খামার মুসলমানদের হাতে তুলে দেবে না।

বনী নাসীর গোত্রের অন্যতম সর্দার সালাম ইবনে মুশকাম, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের অঙ্গীকারকে ভিত্তিহীন বলে গণ্য করে এবং বলে, কল্যাণজনক হচ্ছে সবার চলে যাওয়া। কিন্তু হুয়াই ইবনে আখতাব জনসাধারণকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।

রাসূল (সা.) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের বার্তা সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে মদীনায় স্থলবর্তী হিসেবে রেখে যান এবং তাকবীর ধ্বনি দিয়ে বনী নাসীর গোত্রের দুর্গ অবরোধের জন্য অগ্রসর হন। বনী নাসীর ও বনী কুরাইযার মধ্যবর্তী স্থানে তিনি শিবির স্থাপন করেন এবং উভয় গোত্রের মধ্যকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী^{৮৭} ছয় দিন ছয় রাত এবং অন্য কয়েকজনের বর্ণনা মোতাবেক ১৫ দিন তিনি তাদের দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু ইহুদীরা প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। মহানবী (সা.) দুর্গের আশ-পাশের খেজুর গাছ লোকেটে ফেলার নির্দেশ দেন, যাতে ইহুদীরা এ ভূখণ্ডের প্রতি লোভের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়।

এ সময় দুর্গের ভেতর থেকে ইহুদীদের চিৎকার শুরু হয় এবং তারা বলে : “হে আবুল কাসেম (মুহাম্মদ)! আপনি সব সময় আপনার সৈন্যদের গাছ- পালা কাটতে নিষেধ করেছেন। এখন কেন সে কাজ করার নির্দেশ দিলেন?” তবে এর কারণ যেটি ছিল তা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ইহুদীরা আগের ফয়সালা মেনে নিতে রাখী হয়ে যায়। তারা একমত হয়ে বলল : “আমরা দেশত্যাগ করে চলে যেতে রাখী আছি; তবে শর্ত হলো আমাদের যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি আমাদের সাথে নিয়ে যাব।” মহানবী (সা.) এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন এবং বললেন, তারা অস্থাবর সম্পত্তি সাথে নিয়ে যেতে পারবে, তবে অস্ত্র লো নিতে পারবে না; সে লো মুসলমানদের হাতে সমর্পণ করতে হবে।

লোভাতুর ইহুদীরা তাদের সহায়- সম্পত্তি নিয়ে যাবার ব্যাপারে যারপর নাই চেষ্টা চালায়। এমনকি ঘরের দরজা লোও চৌকাঠসহ নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হয়। বাকী ঘর লো নিজেদের হাতে ভেঙে ফেলে। তাদের একদল খাইবর ও আরেক দল সিরিয়ায় চলে যায়। তবে তাদের কেবল দু’ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে। পরাজিত ও অপদস্থ এ জাতিটি এ পরাজয়ের গ্লানি ঢাকার জন্য দফ বাজিয়ে, গান গেয়ে মদীনা ত্যাগ করে এবং এ আচরণের মধ্য দিয়ে এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, এ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ায় তারা ততটা চিন্তিত বা মনঃক্ষুণ্ণ হয় নি।

মুহাজিরগণের মধ্যে বনী নায়ীরের ক্ষেত- খামার বণ্টন

ইসলামের সৈনিকগণ যুদ্ধ- বিগ্রহ ছাড়া শত্রুপক্ষের কাছ থেকে যে সম্পদ গনীমত হিসেবে লাভ করেন, পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী^{১১} তা সম্পূর্ণরূপে মহানবী (সা.)- এর মালিকানাধীন। তিনি যেভাবে ভালো মনে করেন, ইসলামের কল্যাণে তা ব্যয় করবেন। মহানবী এটাই কল্যাণকর মনে করলেন যে, এই ক্ষেত- খামার, পানির উৎস ও বাগান লো মুহাজিরগণের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। কেননা ম া থেকে হিজরত করে আসার কারণে তাঁদের হাতে জাগতিক সহায়- সম্পদ ছিল না বললেই চলে। তাঁরা আনসারগণের উপর নির্ভরশীল এবং তাঁদের মেহমান হিসেবেই ছিলেন। এ মতটিকে সা’ দ ইবনে উবাদা ও সা’ দ ইবনে মায়ায সমর্থন করেন। এ কারণে সকল জমি ম া থেকে আগত মুহাজিরগণের মধ্যে বণ্টন করা হয় এবং আনসারগণের মধ্যে অত্যন্ত

দরিদ্র হবার কারণে সাহল ইবনে হাদীদ এবং আবু দুজানাহ্ ছাড়া অন্য কেউ তার ভাগ পান নি। এভাবে সকল মুসলমানের সার্বিক অবস্থার উন্নতির একটি ব্যবস্থা হয়। বনী নাযীর গোত্রের জনৈক নেতার মূল্যবান তরবারিটি সা' দ ইবনে মায়াযকে প্রদান করা হয়।

হিজরী চতুর্থ শতকের রবিউল আউয়াল মাসে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। সূরা হাশরও এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়। আমরা দীর্ঘতা এড়ানোর জন্য এ সূরার আয়াতসমূহের অনুবাদ ও তাফসীর হতে বিরত থাকছি। অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন, এ ঘটনায় কোনরূপ রক্তপাত ঘটে নি। কিন্তু মরহুম শেখ মুফীদ বলেন, বিজয়ের রাতে সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষ বাঁধে। তাতে বনী নাযীর গোত্রের দশজন ইহুদী নিহত হয় এবং তারা নিহত হবার ফলে ইহুদীদের আ সমর্পণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।^{৮৯}

পঁয়ত্রিশতম অধ্যায় : চতুর্থ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

মদ ও নেশাকর পানীয় নিষিদ্ধকরণ

মদ এবং সামগ্রিকভাবে মাদকদ্রব্য মানব সমাজের অন্যতম জঘন্য ও ধ্বংসা ক আপদ ছিল এবং এখনো রয়েছে। এ ধ্বংসকারী বিষাক্ত দ্রব্যাদির নিন্দায় এটুকুই যথেষ্ট যে, অন্যান্য প্রাণীর সাথে মানুষের পার্থক্যের সর্বপ্রধান সম্বল জ্ঞান- বুদ্ধির সাথে এ মাদকদ্রব্য সাংঘর্ষিক। মানুষের সৌভাগ্য ও কলাণের নিয়ামক হচ্ছে তার জ্ঞান ও বিবেক। অন্যান্য প্রাণীর সাথে মানুষের যে ব্যবধান, তা মানুষের এ অভ্যন্তরীণ শক্তির উপরই নির্ভরশীল। এলকোহল (মদ) বা মাদকদ্রব্য এর চরম শত্রু। এ কারণে মদ ও নেশাকর পানীয় অর্থাৎ মাদকদ্রব্য সেবন প্রতিরোধ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত নবী- রাসূলগণের অন্যতম কর্মসূচী ছিল। একই কারণে সকল শরীয়তে মদ সম্পূর্ণ হারাম ঘোষিত হয়েছে।^{৯০}

আরব উপদ্বীপে মদপান একটি গণ- মুসিবত ও মহামারী আকারে বিদ্যমান ছিল। তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং তার মূলোৎপাটনের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ছিল। পরিবেশের চাহিদা এবং সাধারণভাবে সব আরবের অবস্থা ও পরিস্থিতি এ অনুমতি দিচ্ছিল না যে, মহানবী (সা.) কোন পটভূমি ছাড়াই তা হারাম ঘোষণা করবেন। বরং একজন দক্ষ চিকিৎসকের ন্যায় সমাজের মন- মানসিকতাকে আগে প্রস্তুত করার প্রয়োজন ছিল যাতে চূড়ান্ত ও নিশ্চিত সংস্কার সম্ভবপর হয়। এ কারণে মদপানের নিন্দায় নাযিলকৃত চারখানা আয়াতের ভাষা এক রকম নয়। বরং প্রাথমিক পর্যায়ে থেকে শুরু হয় এবং ক্রমান্বয়ে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

এ আয়াতসমূহ গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে আমরা মহানবীর দীন প্রচারের কর্মকৌশল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে পারি। আমাদের মতে বড় বড় বক্তা ও লেখকরা এ পদ্ধতির অনুসরণ করতে পারেন এবং এ পদ্ধতিতেই তাঁরা সমাজের কলুষ ও অনাচার লো দূর করার চেষ্টা করতে পারেন। কোন একটি অন্যায় ও অনাচার প্রতিরোধ করার জন্য মৌলিক শর্ত হলো, প্রথমে সমাজের লোকদের চিন্তা- চেতনা ও বৃহত্তর জনমতকে ঐ অনাচারের ক্ষয়- ক্ষতি ও অশুভ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সজাগ করা। যতদিন পর্যন্ত সমাজে মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি ও অভ্যন্তরীণ চেতনার সৃষ্টি না

হবে, ততদিন পর্যন্ত কোন অনাচার মৌলিকভাবে মোকাবেলা করা যাবে না। কেননা স্বয়ং মানুষই তো এ সংস্কার- সংশোধনের যিম্মাদার।

যে সমাজে মদপান জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল, পবিত্র কুরআন এ দৃষ্টিকোণ থেকে সেখানে প্রথম বারের মতো খেজুর ও আঙুর দ্বারা মদ তৈরিকে উত্তম জীবিকা বা ‘রি ক হাসান’ - এর পরিপন্থী বলে মন্তব্য করেছে। এভাবে সমাজের ঘুমন্ত অনুভূতিতে নাড়া দিয়ে তা জাগ্রত ও সচেতন করা হয়। এরশাদ হয়েছে :

(و من ثمرات التّخيل و الأعناب تتخذون منه سكرًا و رزقًا حسنًا)

“তোমরা খেজুর গাছের ফল ও আঙুর থেকে মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক।” (সূরা নাহল : ৬৭)

পবিত্র কুরআন প্রথম বারের মতো এ তথ্য কর্ণগোচর করে যে, খেজুর ও আঙুর থেকে মদ তৈরি করা উত্তম খাদ্য নয়; বরং উত্তম খাদ্য হচ্ছে উভয় ফলকে খেজুর ও আঙুর রূপে আহাির করা।

এ আয়াত মানুষের চিন্তায় নাড়া দেয় এবং তাদের মানসিকতা এমনভাবে প্রস্তুত করে যাতে পরবর্তীতে আল্লাহ তাঁর ভাষাকে আরো কঠোরতর করেন এবং আরেকখানা আয়াতের মাধ্যমে এ কথা ঘোষণা করেন যে, মদ ও জুয়ার দ্বারা যে আংশিক (পার্থিব) মুনাফা হয়, তা সমুদয় ক্ষয়-ক্ষতির প্রেক্ষিতে অত্যন্ত তুচ্ছ। নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে এ বক্তব্য সমাজের সামনে পেশ করা হয় :

(يسألونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للنّاس و اثمهما أكبر من نفعهما)

“ তারা আপনার কাছে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জানতে চায়। বলুন, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু তাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।” »

নিঃসন্দেহে লাভ ও ক্ষতির মাঝে তুলনা করা এবং লাভের চাইতে ক্ষতির পাল্লা ভারী দেখানো চিন্তাশীল লোকদের মনে ঐ কাজটির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির জন্য যথার্থ। কিন্তু সাধারণ লোকদের যতক্ষণ পরিষ্কার ভাষায় নিষেধ করা না হবে, ততক্ষণ নিছক এ ধরনের বাচনভঙ্গি ও বর্ণনা পদ্ধতির দ্বারা তারা অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত হয় না।

এমনকি এ আয়াত নাযিল হওয়া সত্ত্বেও আবদুর রহমান ইবনে আউফ এক ভোজসভার আয়োজন করে তাতে খাবার দস্তুরখানে মদ পরিবেশন করেন। মেহমানরা মদ পান করার পর নামাযে দাঁড়ান। তাঁদের একজন নামাযে (মদের নেশায়) পবিত্র কুরআনের আয়াত ভুলভাবে তেলাওয়াত করেন, যার ফলে ঐ আয়াতের অর্থই পাে যায়!

অর্থাৎ সূরা কাফিরুন- এ لا أعبد ما تعبدون “(হে কাফেররা!) তোমরা যার (মূর্তির) উপাসনা করো, আমি তার উপাসনা করি না” - এর পরিবর্তে এভাবে তেলাওয়াত করেন : أعبد ما تعبدون “তোমরা যার উপাসনা করো, আমি তার উপাসনা করি” - যার অর্থ আয়াতের অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়।

এসব ঘটনা মানুষের মন- মানসিকতা প্রস্তুত করতে থাকে যাতে পরিবেশ ও পরিস্থিতি এ অনুমতি দেয় যে, অন্তত বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতিতে শরাব (মদ) হারাম ঘোষিত হোক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, মাতাল অবস্থায় নামায পড়ার অধিকার কোন মুসলমানের নেই।

আর এ বিধান বা নির্দেশ নিম্নোক্ত আয়াতে ঘোষণা করা হয় :

(لا تقربوا الصلوة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا)

অর্থাৎ “মাতাল অবস্থায় নামায পড়ো না। কারণ তোমরা (মাতাল অবস্থায় নামাযে) কী বলছ, তা জান না।”

এ আয়াতের প্রভাব এতটা তীব্র ছিল যে, একদল লোক চিরতরে মদ পান ত্যাগ করে এবং তাদের যুক্তি ছিল এই যে, যে জিনিস তোমাদের নামাযের ক্ষতি করে, তা অবশ্যই তোমাদের জীবনের কর্মসূচী থেকেই নিরঙ্কুশভাবে বাদ দিতে হবে।

তবে আরেকটি দল এরপরও মদ পানের অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে নি; এমনকি আনসারগণের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এমন ভোজসভার আয়োজন করে যাতে মদ পরিবেশন করার পর অতিথিবৃন্দ (নেশাগ্রস্ত হয়ে) পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত হয় এবং

পরস্পরের হাত ভেঙে দেয় ও মাথা ফাটিয়ে দেয়। এরপর মহানবী (সা.)- এর কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করা হয়।

দ্বিতীয় খলীফা ঐ দিন পর্যন্ত মদ পান করতেন। তিনি ‘পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ মদ পান সুনিশ্চিতভাবে হারাম করার জন্য যথেষ্ট নয়’ - এ ধারণার বশবর্তী হয়ে দু’হাত তুলে প্রার্থনা করেন :

اللهم بيّن لنا بيانا شافيا في الخمر

“হে আল্লাহ্! মদ সম্পর্কে আমাদের জন্য একটি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সন্তোষজনক বিধান সম্বলিত ব্যাখ্যা অবতীর্ণ করুন।”

বলার অপেক্ষা রাখে না, এ ধরনের অপ্রীতিকর অবস্থা মদ পান নিশ্চিতভাবে হারাম হবার বিধান মেনে নেয়ার জন্য (তদানীন্তন) মুসলিম সমাজকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছিল। এ কারণেই মদ পান নিষিদ্ধ করার স্পষ্ট ও চূড়ান্ত বিধান অবতীর্ণ হয়। এ আয়াত হলো :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

“হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই শরাব (মদ), জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং আযলাম (এক ধরনের ভাগ্য পরীক্ষা) অপবিত্র বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই সবাই তা থেকে বেঁচে থাক। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।” ৯২

এ স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ঘোষণার ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, যারা তখনো শরীয়তের স্পষ্ট ও পরিষ্কার বিধান না আসার যুক্তিতে মদ পান করত, তারাও মদ পান ত্যাগ করল। সুন্নী ও শিয়া সূত্রের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে, এ আয়াত শোনার পর দ্বিতীয় খলীফা বলেন : انتهينا يا ربّ

“হে প্রভু! এখন থেকে আমরা বিরত হলাম।” ৯৩

বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিষয়ক সংযুক্তি

দ্বিতীয় খলীফা উল্লিখিত তিনখানা আয়াত শোনার পর ক্ষান্ত হন নি। তিনি মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যার অপেক্ষায় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মাদকদ্রব্য হারাম হওয়া সম্পর্কে

বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত আয়াত নাযিল হলে তিনি সন্তুষ্টি লাভ করেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর হুকুম ছিল :

(رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)

“(শরাব) অপবিত্র বস্তু, শয়তানের কাজ। অতএব, তোমরা তা থেকে বিরত থাক। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।” ৯৪

কিন্তু আমাদের যুগের পাশ্চাত্যপন্থীরা এসব আয়াতকে যথেষ্ট মনে করে না; বরং তারা বলতে চায়, মদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে حرام (হারাম) বা حُرِّمَ হুররিমা (হারাম করা হলো) পরিভাষা ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল। অন্যথায় মদ যে নিষিদ্ধ, তা বোঝা যায় না।

এ দলটি কুপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনার পূজারী এবং অজুহাত খুঁজে বেড়াতে অভ্যস্ত। এরা শয়তানী বোতলটার মধ্যে ডুবে থাকতে ও বুক জড়িয়ে রাখতে এবং এ জাতীয় অনর্থক কথা বলতে চায়; অথচ পবিত্র কুরআন এ ধরনের শয়তানী চিন্তাধারা দমন করার উদ্দেশ্যে শরাব হারাম হওয়ার বিষয়ে অন্যভাবে ‘হারাম’ পরিভাষা ব্যবহার করেছে। পবিত্র কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতে বলা হয়েছে : وإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا : “এতদুভয়ের (মদ ও জুয়া) নাহ, উভয়ের উপকারের চেয়ে বড় (জঘন্য)।” ৯৫

অর্থাৎ মদপানকে বড় নাহ ও পাপ বলে আখ্যায়িত করেছে। অপর এক আয়াতে সকল পাপকর্মকে (إِثْمٍ) হারাম ঘোষণা করে বলা হয়েছে :

(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَّنَ وَ الْأَثْمَ)

“বলুন, আমার পালনকর্তা প্রকাশ্য ও গোপন সকল অশ্লীলতা এবং পাপকর্ম হারাম ঘোষণা করেছেন।” ৯৬

এত স্পষ্ট বিবরণের পরও কি পাশ্চাত্যপূজারী নোংরা মানসিকতার লোকেরা মদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত আরো পর্যাণ্ড ও স্পষ্ট ব্যাখ্যার অপেক্ষায় বসে থাকবে?

আমাদের মতে এ বিষয়ে যুক্তিতর্কের কোন অবকাশ নেই। কেননা মদ সম্পর্কিত চার আয়াতে মদকে নোংরা, অপবিত্র এবং মূর্তি, জুয়া ও শয়তানের কাজের সমপর্যায়ের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, মদ হারাম। আর স্বার্থ বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়- এমন সহজ সরল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এ সব আয়াত সবচেয়ে কার্যকরী বর্ণনা ও ব্যাখ্যা।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হচ্ছে মহানবী (সা.) এ চার আয়াতের সাহায্যে তাঁর চারপাশের পরিবেশকে এই অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্র করেন এবং স্বয়ং ঈমানদারদের ঈমানই আল্লাহর হুকুম কার্যকর করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য জগৎ ব্যাপক প্রচার- প্রচারণা চালিয়েও এ ব্যাপারে তেমন কোন সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। এই প্রাণ হরণকারী বস্তুটি বিলুপ্ত করার ক্ষেত্রে তাদের যাবতীয় চেষ্টা- প্রচেষ্টা নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৩৩- ১৯৩৫ সালে এলকোহল জাতীয় পানীয় নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরা সরকারের ব্যর্থতা সর্বজনবিদিত। এটি বিরাট ট্রাজেডি এবং পাঠকগণ এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য ইতিহাসের শরণাপন্ন হতে পারেন।

যাতুর রিকা অভিযান

রিকা (۶۳) আরবদের পরিভাষায় ‘তালি’ নামে পরিচিত। কাজেই এই পবিত্র জিহাদকে ‘যাতুর রিকা অভিযান’ নামকরণের কারণ হচ্ছে এ অভিযানে মুসলমানরা বহু চড়াই- উৎরাইয়ের সম্মুখীন হন, যা তালিযুক্ত জামার সাথে তুলনীয়। কখনো কখনো বলা হয়, এ অভিযানকে ‘যাতুর রিকা’ বলার কারণ মুসলিম সৈনিকগণ পায়ে হেঁটে পথ চলার ক্লান্তি দূর করার জন্য তাঁদের পায়ে পিঁ জড়িয়েছিলেন।

যা হোক, অন্যান্য অভিযানের মতো এ অভিযান প্রথম পর্যায়ের কোন লড়াই ছিল না; বরং প্রজ্বলিত হবার উপক্রম যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত করার জন্যই এ অভিযান পরিকল্পনা করা হয়েছিল। অর্থাৎ ‘গাতফান’ - এর দু’টি শাখা- গোত্র ‘বনী মাহারির’ ও ‘বনী সালাবাহ’ - এর পক্ষ হতে যে অশুভ তৎপরতা চালানো হচ্ছিল, তা দমিয়ে দেয়ার জন্যই এ অভিযান পরিচালিত হয়।

মহানবী (সা.)- এর নিয়ম ছিল তিনি বিচক্ষণ ও সচেতন ব্যক্তিদের আশে- পাশের এলাকায় পাঠাতেন যাতে তাঁরা সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর কাছে প্রতিবেদন প্রদান করেন। হঠাৎ তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, এ গোত্র দু’টি মদীনা নগরী দখল করার জন্য অস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহের চিন্তা- ভাবনা করছে। মহানবী একটি বিশেষ বাহিনী নিয়ে নজ্দের উদ্দেশে গমন করেন এবং শত্রু- ভূখণ্ডের খুব কাছে অবতরণ করেন। ইসলামী বাহিনীর অতীত শৌর্য- বীর্য, ত্যাগ- তিতিক্ষার ঐতিহ্য গোটা আরব উপদ্বীপকে বিস্ময়াভিভূত করেছিল। তাদের আগমনের খবর পেয়ে শত্রুবাহিনী পশ্চাদপসরণ করে এবং কোন প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়াই পাহাড়ী অঞ্চল ও উচ্চভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

তবে মহানবী যেহেতু এ অভিযানে ফরয নামাযসমূহ ‘সালাতে খাওফ’ অর্থাৎ ভীতিকর পরিস্থিতিতে নামায আদায়ের নিয়মে পড়েন এবং এ ধরনের নামায কীভাবে পড়তে হবে, তা সূরা

নিসার ১০২তম আয়াতে বলা হয়, সেহেতু অনুমান করা যায়, শত্রু বাহিনীর যুদ্ধান্ত্র ও রণপ্রস্তুতি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং যুদ্ধ বেশ জটিল রূপ ধারণ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা বিজয় লাভ করতে সক্ষম হন।

বীরত্বের স্বাক্ষর

ইবনে হিশাম^{৯৭} ও আমীনুল ইসলাম তাবারসী- এর মতো সীরাত রচয়িতা ও মুফাসসিরগণ এ অভিযানের বর্ণনা প্রসঙ্গে এমন কতক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, যা শত্রুবাহিনীর মোকাবেলায় মহানবী (সা.)- এর বীরত্বের সাক্ষ্য বহন করে। এর সাদৃশ্যপূর্ণ বর্ণনা আমরা ‘যি আমর অভিযান’ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। বর্ণনা সংক্ষেপ করার প্রয়োজনে আমরা এখানে তার পুনরাবৃত্তি করছি না।

ইসলামের ধৈর্যশীল রক্ষীগণ

ইসলামের সৈনিকগণ যদিও এ অভিযানে সমুখ লড়াই ছাড়াই মদীনায় ফিরে আসেন, তবুও সামান্য কিছু মালে গনীমত তাঁদের হস্তগত হয়। ফেরার পথে একটি বিশাল উপত্যকায় তাঁরা রাতটা বিশ্রামে কাটান। মহানবী (সা.) দু’জন বীর যোদ্ধাকে উপত্যকার প্রবেশপথ সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁদের নাম ছিল ‘আব্বাদ’ ও ‘আম্মার’। তাঁরা দু’জন রাতের ঘণ্টা লোকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। সে হিসেবে রাতের প্রথম ভাগের পাহারার দায়িত্ব পড়ে আব্বাদের উপর।

গাতফান গোত্রের এক লোক মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবন করার মানসিকতা পোষণ করছিল। সে যে কোন ভাবে মুসলমানদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যাওয়ার ফন্দি এঁটেছিল। লোকটি রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে নামাযরত প্রহরীর দিকে তীর নিক্ষেপ করে। কিন্তু প্রহরী নামাযে এতখানি বিভোর ছিলেন যে, তিনি তীরের আঘাত খুব সামান্যই অনুভব করেন এবং তীরটি নিজের পা থেকে বের করে পুনরায় নামাযে মশ ল হয়ে যান। কিন্তু শত্রুর আক্রমণের তিন বার পুনরাবৃত্তি ঘটে। তৃতীয় বারে তীরটি খুব শক্তভাবে তাঁর পায়ে বিদ্ধ হয়। ফলে মনের মাধুরি মিশিয়ে আর নামাযে তন্ময় হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কাজেই খুব সংক্ষিপ্ত রূ ও সিজদা সহকারে নামায শেষ করে আম্মারকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন।

আব্বাদের হৃদয়বিদারক অবস্থা দেখে আমার দারুণভাবে মর্মান্বিত হন এবং অনেকটা প্রতিবাদী সুরে বলেন : “কেন তুমি আমাকে শুরুতে জানালে না?” আহত প্রহরী তাঁকে বললেন : “আমি আল্লাহর কাছে মুনাযাতে মশ ল ছিলাম এবং পবিত্র কুরআনের একখানা সূরা তেলাওয়াত করছিলাম। হঠাৎ প্রথম তীরটি আমাকে আঘাত করে। মহান আল্লাহর কাছে নিভূতে দুআ এবং তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করার স্বাদ আমাকে নামায ভঙ্গ করতে বারণ করে। যদি মহানবী (সা.) আমাকে এ উপত্যকার পাহারার দায়িত্ব প্রদান না করতেন, তা হলে কিছুতেই আমার নামায এবং যে সূরা পাঠ করছিলাম, তাতে বিরতি টানতাম না; বরং মহান আল্লাহর কাছে মুনাযাতরত অবস্থায় আমার প্রাণটি দিয়ে দিতাম। কখনো নামায মাঝখানে শেষ করার চিন্তাও করতাম না “ ৯৮

দ্বিতীয় বদর

উল্লেখ যুদ্ধের পর আবু সুফিয়ান মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছিল : “পরের বদরে ঠিক এ সময়েই ‘বদর প্রান্তরে’ তোমাদের সাথে আমাদের দেখা হবে এবং আরো বড় প্রতিশোধ নেব।”

মুসলমানরা মহানবী (সা.)-এর অনুমতি নিয়ে প্রতিরক্ষামূলক এ জিহাদে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে নিজেদের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করেন। সেই তারিখের পর থেকে দীর্ঘ একটি বছর পার হয়ে যায়। এর মধ্যে কুরাইশদের সর্দার নানা ধরনের সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছিল।

ইতোমধ্যে ‘নুআইম ইবনে মাসউদ’ নামক এক ব্যক্তি মায়গমণ করে। মায়গর কুরাইশ ও মদীনার মুসলমানদের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আবু সুফিয়ান তাঁর কাছে একটি অনুরোধ জানায় যাতে সে মদীনায় গিয়ে রাসূলকে মদীনা থেকে বের হতে বারণ করে। আবু সুফিয়ান আরো বলে : “এ বছর মায়গ ত্যাগ করে বাইরের কোথাও যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই আরবদের কমন মার্কেটতুল্য বদর এলাকায় এসে যদি মুহাম্মদ শক্তির মহড়া দেখায়, তা হলে তা আমাদের জন্য পরাজয়ের গ্লানি সৃষ্টি করবে।”

নুআইম যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, মদীনায় যায়, কিন্তু তার কথাবর্তা মহানবীর মনোবলে সামান্যতম প্রভাবও ফেলতে পারে নি। মহানবী (সা.) দেড় হাজার সৈন্য, কয়েকটি ঘোড়া ও কিছু বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে চতুর্থ হিজরীর যিলকদ মাসে (যা হারাম বা নিষিদ্ধ মাস) বদর ভূখণ্ডে উপনীত হন। তিনি সেখানে দীর্ঘ আট দিন অবস্থান করেন এবং সে সময়টা ছিল বদরে আরবদের সাধারণ বাণিজ্যমেলায় মৌসুম। মুসলমানরা তাদের পণ্য-সামগ্রী বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। এরপর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল লো থেকে আসা লোকেরা চলে গেলেও ইসলামী বাহিনী সেখানে কুরাইশ বাহিনীর আগমনের অপেক্ষা করতে থাকে।

বদর প্রান্তরে মহানবী (সা.)-এর আগমনের খবর মায়গ পৌঁছলে কেবল নিজেদের মান-সম্মান রক্ষার খাতিরে হলেও বদরের উদ্দেশ্যে মায়গ ত্যাগ করা ছাড়া কুরাইশ নেতৃবর্গের আর কোন উপায় ছিল না। তাই আবু সুফিয়ান প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে ‘মররুয যাহরান’ পর্যন্ত যায়। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও রসদ ফুরিয়ে যাওয়ার বাহানা দেখিয়ে মাঝপথ থেকে সে ফিরে যায়।

মুশরিক বাহিনীর পশ্চাদপসরণ এতই লজ্জাজনক ছিল যে, সাফওয়ান আবু সুফিয়ানকে এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে : “আমরা এ পশ্চাদপসরণের কারণে এ পর্যন্ত অর্জিত সকল গৌরব হাতছাড়া করে ফেলেছি। তুমি যদি গত বছর এ যুদ্ধ হবার কথা না দিতে, তা হলে আমরা এতখানি লজ্জিত হতাম না।” ^{৯৯}

হিজরী চতুর্থ সালের ৩ শাবান মহানবী (সা.)- এর দ্বিতীয় দৌহিত্র হুসাইন ইবনে আলী (আ.) জন্মগ্রহণ করেন।^{১০০} আর একই বছর হযরত আলী (আ.)- এর মাতা ফাতিমা বিনতে আসাদ ইন্তেকাল করেন।^{১০১} এ বছরই মহানবী (সা.) যাইদ ইবনে সাবিতকে ইহুদীদের কাছে সুরিয়ানী ভাষা শেখার নির্দেশ দেন।^{১০২}

ছত্রিশতম অধ্যায় : পঞ্চম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ ১০৩

ভ্রান্ত কুসংস্কার মূলোচ্ছেদের প্রয়োজনে

হিজরী পঞ্চম সালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে পরিখার যুদ্ধ (আহযাবের যুদ্ধ), বনী কুরাইযার পরিণতি ও যায়নাব বিনতে জাহাশের সাথে মহানবী (সা.)-এর বিয়ে। মুসলিম ঐতিহাসিকদের ভাষ্য অনুযায়ী এসব ঘটনার সূচনায় রয়েছে উল্লিখিত মহিয়সী মহিলার সাথে মহানবীর বিয়ে।

পবিত্র কুরআন সূরা আহযাবের ৪, ৬ এবং ৩৬ থেকে ৪০ তম আয়াতের মাধ্যমে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছে। তাতে প্রাচ্যবিদদের মিথ্যার বেসাতি এবং কল্পনাবিলাসের কোন অবকাশ রাখেনি।

আমরা ইসলামের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ সূত্র অর্থাৎ পবিত্র কুরআন অবলম্বনে ঘটনাটির বিবরণ পেশ করব। এরপর প্রাচ্যবিদদের উক্তি লোও পর্যালোচনা করব।

যাইদ ইবনে হারিসা কে?

যাইদ এক যুবকের নাম। শৈশবে আরব বেদুইন ডাকাতদল তাঁকে একটি কাফেলা থেকে অপহরণ করে উকায মেলায় ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করেছিল। হাকীম ইবনে হিয়াম তাঁকে আপন ফুফু খাদীজাহর জন্য কিনে নিয়েছিলেন। বিয়ের পর হযরত খাদীজাহ্ ক্রীতদাসটিকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে অর্পণ করেছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর মনের পবিত্রতা, স্বচ্ছতা এবং তাঁর উত্তম চরিত্রের কারণে ছেলেটি তাঁর প্রতি অনুরাগী ও ভক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি যাইদের পিতা যখন ছেলের খোঁজে মায় আসেন এবং মহানবী (সা.)-এর কাছে তাঁকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য আবেদন জানান, যাতে করে তাঁকে মায়ের কাছে ও পরিবারের মাঝে নিয়ে যেতে পারেন, তখন তিনি পিতার সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানান। বরং মহানবীর কাছে থাকাকে নিজের মাতৃভূমি এবং আশীয়া-স্বজনের মাঝে থাকার ওপর অগ্রাধিকার দেন। রাসূল (সা.) তাঁর নিকটে থাকা বা নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি যাইদের ওপর ছেড়ে দেন। এটি ছিল উভয় পক্ষের আর্থিক আকর্ষণ ও মমতার নিদর্শন। যাইদ যেমন

অন্তস্তল থেকে মহানবী (সা.)- এর চারিত্রিক মাধুর্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন, মহানবীও তেমনি তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। এ ভালোবাসা এতটা প্রগাঢ় ছিল যে, তাঁকে তিনি আপন সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে সাহাবীগণ তাঁকে ‘যাইদ ইবনে মুহাম্মদ’ বলতেন। মহানবী (সা.) ব্যাপারটি আনুষ্ঠানিক হবার জন্য একদিন যাইদের হাত ধরে কুরাইশদের উদ্দেশে বলেছিলেন : “এ হচ্ছে আমার সন্তান। আমরা একে অপরের উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করব।” এই আঁক টান ও মমত্ববোধ ততদিন বলবৎ ছিল যতদিন না মুতার যুদ্ধে যাইদ শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর ইস্তিকালে মহানবী ঔরসজাত সন্তান মারা যাবার মতোই শোকাহত হন।^{১০৪}

মহানবী (সা.)- এর ফুপাতো বোনকে যাইদ- এর বিয়ে

(শ্রেণীগত) ব্যবধান ও দূরত্ব কমিয়ে আনা, সমগ্র মানব জাতিকে মানবতার ও খোদাভীরুতার পতাকাতে একত্রিত করা এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যক্তিত্বের মাপকাঠি হিসেবে চারিত্রিক গাবলী ও মানবীয় স্বভাব- প্রকৃতিকে পরিচিত করানোই ছিল মহানবী (সা.)- এর অন্যতম পবিত্র লক্ষ্য। অতএব, যত শীঘ্র সম্ভব আরবদের প্রাচীন ঘৃণ্য প্রথা (অভিজাত শ্রেণীর মেয়ের দরিদ্র শ্রেণীর পাত্রকে বিয়ে করা অনুচিত- এরূপ ধ্যান- ধারণা) বিলুপ্ত করা অত্যাবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। আর এ কর্মসূচী তাঁর নিজ বংশ থেকে শুরু করা এবং হযরত আবদুল মুত্তালিবের পৌত্রী তাঁর নিজ ফুপাতো বোন যায়নাবকে নিজের পূর্বেকার দাস এবং দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত যাইদ ইবনে হারেসার সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করাটা ছিল কতই না উত্তম, যাতে করে সবাই উপলব্ধি করে যে, এসব কল্পিত ব্যবধান যত ত সম্ভব বিলুপ্ত করতে হবে এবং যখনই মহানবী (সা.) তাদেরকে বলবেন, ‘শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া- পরহেযগারী (খোদাভীরুতা) এবং মুসলিম নারী মুসলিম পুরুষের সমমর্যাদাসম্পন্ন’ , তখন স্বয়ং তিনিই হবেন এ আদর্শ ও আইনের প্রথম বাস্তবায়নকারী এবং তাঁকেই তা সর্বপ্রথম কার্যকর করতে হবে।

এ ধরনের ভুল ও অন্যায় প্রথা বিলুপ্ত করার জন্য মহানবী (সা.) যায়নাবের ঘরে গমন করে যাইদের সাথে তাঁর বিয়ের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেন। যায়নাব এবং তাঁর ভাই প্রথমে এ প্রস্তাবে ততটা আগ্রহ দেখান নি। কারণ, তখনও তাঁদের অন্তর থেকে জাহিলী যুগের ধ্যান- ধারণা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নি। অন্যদিকে, যেহেতু মহানবী (সা.)- এর নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করা তাঁদের জন্য অপ্ৰীতিকর ছিল, তাই তাঁরা যাইদের দাস হওয়ার বিষয়টি অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে মহানবীর প্রস্তাব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

অবিলম্বে ওহীর ফেরেশতা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসহ অবতরণ করে যায়নাব ও তাঁর ভাইয়ের এহেন আচরণের নিন্দা করেন। এ আয়াত হলো :

(و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضي الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم و من يعص الله و رسوله

فقد ضلّ ضلّالا مبينا)

“ যখন মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন মুমিন নর-নারীদের সেই বিষয়ে (ফয়সালার বিপরীতে) কোন এখতিয়ার থাকবে না; আর যে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সিদ্ধান্তের) বিরুদ্ধাচরণ করবে, সে সুস্পষ্টভাবে পথ ষ্ট হবে।” (সূরা আহযাব : ৩৬)

মহানবী (সা.) তৎক্ষণাৎ তাঁদের কাছে এ আয়াত পাঠ করে শুনান। মহানবীর প্রতি এবং তাঁর মহান লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি যায়নাব ও তাঁর ভাই আবদুল্লাহর ঈমান এ বিয়ের ব্যাপারে যায়নাবের সম্মতি প্রদানের কারণ হয়েছিল। পরিণামে, অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত রমণী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্বেকার দাস যাইদের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। আর এভাবে ইসলাম ধর্ম ও শরীয়তের প্রাণ সঞ্জীবনী কর্মসূচীর একাংশ বাস্তবায়িত হলো এবং সে সাথে (জাহিলী যুগের) একটি ভুল প্রথা কার্যত বিলুপ্ত হলো।

স্ত্রীর সাথে যাইদ-এর বিয়ে-বিচ্ছেদ

অবশেষে এ বিয়ে বিশেষ কিছু কারণে স্থায়ী হয় নি এবং শেষ পর্যন্ত তালাক (বিচ্ছেদ) পর্যন্ত গড়িয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন, বিয়ে-বিচ্ছেদের কারণ ছিল যায়নাবের মন-মানসিকতা। তিনি স্বামীর বংশ-মর্যাদা ও পরিচয় নীচু হওয়ার বিষয়টি তাঁর সামনে প্রায়ই উত্থাপন করতেন। এভাবে তিনি স্বামী যাইদের জীবনকে তিক্ত করে ফেলেছিলেন।

তবে যাইদের কারণেও বিয়ে-বিচ্ছেদ হয়ে থাকতে পারে। কারণ তাঁর জীবনী থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর মধ্যে সমাজের সাথে সংশ্রবহীনতা ও খাপ না খাওয়ার মনোবৃত্তি বিরাজ করত। তিনি জীবনে বহু বিয়ে করেছিলেন এবং সর্বশেষ স্ত্রী ছাড়া সবাইকে তিনি তালাক দিয়েছিলেন (উল্লেখ্য, মৃত্যুর যুদ্ধে তাঁর শাহাদাত লাভ পর্যন্ত তাঁর সর্বশেষ স্ত্রী তাঁর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন)। একের পর এক তালাক দান থেকে যাইদের মধ্যে খাপ না খাওয়ানোর প্রবণতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যাইদও যে এ ঘটনায় সমান অংশীদার ছিলেন, তার প্রমাণ হচ্ছে তাঁর প্রতি মহানবীর কড়া উক্তি। কারণ তিনি যখন জানতে পারলেন, তাঁর পালিত পুত্র সহধর্মিনীকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে (যাইদকে) বলেছিলেন :

(أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ)

“ তুমি তোমার স্ত্রীকে ধরে রেখ (তালাক দিও না) এবং মহান আল্লাহকে ভয় করো।” (সূরা আহযাব : ৩৭)

যদি যাইদের স্ত্রী যায়নাবই বিয়ে বিচ্ছেদের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হতেন, তা হলে স্ত্রীর সাথে যাইদের সম্পর্কচ্ছেদ তাকওয়া তথা পরহেযগারীর পরিপন্থী বলে গণ্য হতো না। তবে, অবশেষে যাইদ তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন এবং যায়নাবের সাথে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটান।

আরেক ভুল প্রথা বিলুপ্ত করার জন্য বিয়ে

এ বিয়ের মূল কারণ অধ্যয়ন করার আগে বংশ পরিচিতি- যা একটি সমাজের জন্য অত্যন্ত রুতুবহ উপাদান বলে বিবেচিত, অগত্যা তা আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। আরেকভাবে বলতে হয় যে, প্রকৃত (ঔরসজাত) পুত্র ও পালিত পুত্রের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্যও আমাদের জানতে হবে। পিতার সাথে ঔরসজাত সন্তানের অস্তিত্বগত সম্পর্ক রয়েছে। আসলে পিতা হচ্ছেন সন্তানের জন্মগ্রহণ ও অস্তিত্ব লাভের বস্তুগত কারণ। আর সন্তান হচ্ছে পিতা- মাতার শারীরিক এবং আর্থিক বৈশিষ্ট্যাবলীর উত্তরাধিকারী। এ ধরনের একত্ব ও রক্তসম্পর্কের কারণেই পিতা ও সন্তান একে অপরের ধন- সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন এবং বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ বিধান তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় (অর্থাৎ পিতা তার ঔরসজাত সন্তানের বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারবেন না এবং পুত্রও পিতার বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারবে না)।

সুতরাং এ ধরনের বিষয়বস্তু, যার অস্তিত্বগত ভিত্তি রয়েছে, তা কেবল ভাষার মাধ্যমে বা কথা দিয়ে কখনো প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। (সূরা আহযাবের ৪ ও ৫ নং আয়াতসমূহের সারাংশ) উত্তরাধিকার, বিয়ে এবং তালাকের মতো কতক লো বিধানের ক্ষেত্রে প্রকৃত সন্তানের সমকক্ষ হওয়া তো দূরের কথা, পালিত পুত্র (দত্তক সন্তান) কখনোই মানুষের প্রকৃত সন্তান হয় না। যেমন প্রকৃত সন্তান যদি পিতার উত্তরাধিকারী বা পিতা তার ঔরসজাত সন্তানের উত্তরাধিকারী হন বা ঔরসজাত সন্তানের পত্নী, সন্তান কর্তৃক তালাক প্রদানের পর সন্তানের পিতার জন্য হারাম হয়, তা হলে কখনোই এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, পালিত পুত্রও এসব বিধানের ক্ষেত্রে প্রকৃত সন্তানের সাথে সমান অংশীদার হবে।

নিঃসন্দেহে এ ধরনের অংশীদারিত্ব সঠিক উৎসমূলবিশিষ্ট নয়। এছাড়াও এটি বংশ পরিচিতি নিয়ে এক ধরনের হাস্য- কৌতুক ও ছিনিমিনি খেলা মাত্র।

সুতরাং দত্তক সন্তান গ্রহণ যদি আবেগ- অনুভূতি, মমত্ববোধ ও ভালবাসা প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তা হলে তা খুবই পছন্দনীয় ও যথাযথ হবে। তবে তা যদি কতক লো সামাজিক

বিধানের ক্ষেত্রে অংশীদার করানোর নিমিত্ত হয়ে থাকে, তা হলে তা হবে বৈজ্ঞানিক বা জ্ঞানগত হিসাব- নিকাশ থেকে বহু দূরে। এখানে উল্লেখ্য, এসব সামাজিক বিধান একান্তভাবেই প্রকৃত সন্তানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত।

জাহিলী আরব সমাজ দত্তক (পালিত) পুত্রকে প্রকৃত সন্তানের মতো মনে করত। মহানবী (সা.) পূর্বে তাঁর পালিত পুত্র যাইদের স্ত্রী যায়নাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করার মাধ্যমে এ ভুল প্রথা কার্যত অর্থাৎ বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে আরব জাতির মধ্য থেকে উচ্ছেদ করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। মুখে বলা এবং আইন প্রবর্তন করার চেয়েও দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে দেখানোর প্রভাব অনেক বেশি। যেহেতু তদানীন্তন আরব সমাজে পালিত পুত্রের তালাক প্রাপ্তা বা বিধবা পত্নীকে বিয়ে করা- যা আরবদের কাছে অস্বাভাবিক ধরনের জঘন্য বিষয় বলে বিবেচিত হতো- বাস্তবে কার্যকর করার সৎ সাহস কারো ছিল না, সেহেতু মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা.)- কে এ কাজের জন্য সরাসরি আহ্বান করেছিলেন। তাই পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন :

(فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَ
كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا)

“ অতঃপর যখন যাইদ যায়নাবকে তালাক দিল, তখন আমরা তাকে আপনার সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে ঈমানদারদের দত্তক পুত্ররা যখন তাদের স্ত্রীদের তালাক প্রদান করবে, তখন সেসব রমণীকে বিয়ে করায় মুমিনদের কোন বিঘ্ন না হয়; আর মহান আল্লাহর নির্দেশ অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।” (সূরা আহযাব : ৩৭- ৩৮)

এ বিয়ে একটি ভুল প্রথা বিলোপ করা ছাড়াও সাম্যের সর্ববৃহৎ নিদর্শন হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ, ইসলাম ধর্মের মহান নেতা এমন এক নারীকে বিয়ে করেন, যিনি এর আগে তাঁর আযাদকৃত দাসের সহধর্মিনী ছিলেন। আর ঐ সময় এ ধরনের বিয়ে সমাজে মর্যাদার পরিপন্থী বলে গণ্য হতো।

এ সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ মুনাফিকচক্র ও সংকীর্ণ চিন্তাধারার অধিকারী ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে তীব্র সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। এটাকে এক ঘণ্য ব্যাপার হিসেবে তারা সর্বত্র বলে বেড়াতে লাগল যে, মুহাম্মদ তাঁর পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন।

মহান আল্লাহ এ ধরনের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা মূলোৎপাটন করার জন্য নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করলেন :

(ما كان محمد أباً أحد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين و كان الله بكل شيء عليماً)

“ মুহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি মহান আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী; আর মহান আল্লাহ সব ব্যাপারে অবগত আছেন।” (সূরা আহযাব : ৪০)

পবিত্র কুরআন এ বিষয় বর্ণনা করাকেই যথেষ্ট বলে মনে করে নি; বরং মহানবী (সা.), যিনি মহান আল্লাহর বিধি-নির্দেশ কার্যকর করার ব্যাপারে নির্ভীক ছিলেন, সূরা আহযাবের ৩৮ ও ৩৯তম আয়াতে তাঁর ভূয়সী প্রশংসাও করেছে। এ দুই আয়াতের সারাংশ হচ্ছে : মুহাম্মদ (সা.) অন্য সকল নবীর মতো, যাঁরা মহান আল্লাহর বাণীসমূহ মানব জাতির কাছে পৌঁছে দেন এবং মহান আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার ক্ষেত্রে কাউকেই ভয় করেন না।^{১০৫}

এটাই হচ্ছে যায়নাবের সাথে মহানবী (সা.)-এর শুভ পরিণয়ের মূল দর্শন বা হিকমত। এখন আমরা প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করব।

প্রাচ্যবিদগণ এবং হযরত য়ায়নাব বিনতে জাহাশের বিয়ে

যাইদ ইবনে হারিসার আগের স্ত্রী য়ায়নাব বিনতে জাহাশের সাথে মহানবীর বিয়ে একটি সাদামাটা ও সব ধরনের অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত বিষয়। তবে যেহেতু কতিপয় প্রাচ্যবিদ সরলমনা ও অনবহিত লোককে ধোঁকা দেয়া ও বিভ্রান্ত করার জন্য এ ঘটনাকে দলিল হিসেবে দাঁড় করিয়েছে এবং এভাবে মহানবীর জীবন-চরিত সম্পর্কে যাদের সঠিক জ্ঞান নেই, তাদের ঈমান দুর্বল করার চেষ্টা করেছে, সেহেতু এ গোষ্ঠীটির বক্তব্য উল্লেখ করে এ বিষয়টি অধ্যয়ন করব।

বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রাচ্যের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ কেবল সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে না, বরং কখনো কখনো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার ধুয়ো তুলে প্রাচ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং সূক্ষ্ম পরিকল্পনা সহ সবচেয়ে নিকৃষ্ট পর্যায়ের দাসত্ব অর্থাৎ চিন্তামূলক দাসত্ব বাস্তবায়িত করে। আসলে প্রাচ্যবিদ হচ্ছে ঐ সাম্রাজ্যবাদী, যে এক বিশেষ ভাবমূর্তি নিয়ে সমাজের অভ্যন্তরে এবং বুদ্ধিজীবীদের মাঝে কর্মতৎপরতা শুরু করে এবং শিক্ষিত ও সুধী শ্রেণীর চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করে নিজস্ব উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য লো বাস্তবায়ন করে থাকে।

অনেক সুধী লেখক এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-প্রেমিক আমাদের এ বক্তব্য গ্রহণ করতে নাও পারেন এবং আমাদেরকে ‘গোঁড়া’ ও ‘প্রতিক্রিয়াশীল’ বলে অভিযুক্ত করতে পারেন। তাঁরা ভাবতে পারেন, জাতিগত (সাম্প্রদায়িক) বা ধর্মীয় গোঁড়ামি আমাদের পাশ্চাত্য সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করতে প্ররোচিত করেছে। তবে প্রাচ্যবিদদের রচনাবলী এবং ইসলামের ইতিহাসের ব্যাপারে তাদের সত্য গোপন রাখা এবং উদ্দেশ্যমূলক আচরণ এ বিষয়ের উজ্জ্বল দলিল যে, তাদের অনেকের মাঝেই জ্ঞানগত উদ্দেশ্য খুব কম এবং তাদের রচনাবলী কতক লো ধর্মবিরোধী ও জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা মিশ্রিত।^{১০৬}

এর প্রমাণ হচ্ছে আমাদের বক্তব্যের বিষয়বস্তু। তারা পশ্চিমা ধাঁচের ধারণার বশবর্তী হয়ে এ বিয়ে-যা একটি ঐতিহাসিক প্রথা বিলোপ করার জন্য বাস্তবায়িত হয়েছিল, তা পরকীয়া ও

প্রণয়সক্তির রঙে রাঙিয়েছে এবং ঔপন্যাসিক ও গল্পকারদের মতো যতটা সম্ভব ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে একটি বানোয়াট ইতিহাস বর্ণনা করেছে এবং তা মানব জাতির সবচেয়ে পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত করে তাঁর পবিত্র চরিত্রের ওপর কালিমা লেপনের চেষ্টা করেছে।

যা হোক, তাদের এ ভিত্তিহীন উপাখ্যানের ভিত্তি হচ্ছে ঐ সব বর্ণনা যে লো ইবনে আসীর^{১০৭}, তাঁর পূর্বে তাবারী এবং আরো কতিপয় মুফাসসির বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো : একদিন অনিচ্ছাকৃতভাবে মহানবীর দৃষ্টি যাইদের সহধর্মিনী যায়নাবের ওপর পড়ে। যাইদ বুঝতে পারে যে, মহানবী যায়নাবের প্রতি প্রণয়সক্ত হয়ে পড়েছেন এবং মহানবীর প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা থাকার কারণে তিনি মহানবীর নিকট উপস্থিত হয়ে যায়নাবকে তালাক দেয়ার বিষয় উপস্থাপন করেন, যাতে করে মহানবীর যায়নাবকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে ছোট-খাটো কোন বাধাও যেন বিদ্যমান না থাকে। মহানবী (সা.) যাইদকে তাঁর স্ত্রী যায়নাবকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে বারবার নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি যায়নাবকে তালাক দেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বিয়ে করেন।

তবে প্রাচ্যবিদরা ইতিহাসের সনদ ও দলিল-প্রমাণ যাচাই করার স্থলে এ ভিত্তিহীন ইতিহাসের পাঠ নিয়েই কেবল সন্তুষ্ট থাকে নি, বরং তারা এটাকে অলংকার পরিয়েছে যে, তা ‘এক হাজার এক রজনীর উপাখ্যান’ - এর রূপ পরিগ্রহ করেছে। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যাঁরা মহানবীর পবিত্র জীবন চরিত সম্পর্কে অবগত, তাঁরা এ কল্পকাহিনীর মূল ও এর শাখা-প্রশাখাকে কল্পনার ফসল বলেই জানেন এবং মহানবীর পবিত্র জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায়সমূহের সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে বিবেচনা করেন। এমনকি ফখরুদ্দীন রাযী ও আলূসীর মতো পণ্ডিতগণও যতটা স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় সম্ভব, সেভাবে এ কাহিনীটি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন যে, ইসলামের শত্রুরা এ সব কল্প-কাহিনী তৈরি করেছে এবং মুসলিম লেখক ও পণ্ডিতদের মধ্যে তা প্রচার করেছে।^{১০৮}

এ কথা কিভাবে বলা সম্ভব যে, এ কল্পকাহিনীটি তাবারী ও ইবনে আসীরের কাছে বিশ্বাসযোগ্য, অথচ তাঁরা তার কয়েক গ বেশি এ কল্পকাহিনীর পরিপন্থী বিষয় বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা মহানবীকে সব ধরনের পাপ ও কলুষতা থেকে মুক্ত বলে বিশ্বাস করেন?

যা হোক, আমরা পরবর্তী কয়েকটি পৃষ্ঠায় এ কাহিনী ভিত্তিহীন হওয়ার প্রমাণ উপস্থাপন করব এবং বিষয়টি এতটা স্পষ্ট যে, এর চেয়ে বেশি আলোচনা করা নিস্প্রয়োজন বলে মনে করি।

আমাদের প্রমাণসমূহ হলো :

১. উপরিউক্ত কাহিনীটি ইসলাম ও মুসলমানদের অকাট্য প্রামাণ্য দলিল ও সনদের পরিপন্থী। কারণ, পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবের ৩৭ তম আয়াতের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, আরবদের বাতিল (ান্ত) প্রথা বিলোপ করার জন্যই যায়নাবের সাথে মহানবীর বিয়ে হয়েছিল। আরবদের প্রথা ছিল এই যে, পালিত পুত্রের বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করার অধিকার কারো নেই। আর এ বিয়ে মহান আল্লাহর আদেশেই সংঘটিত হয়েছিল। তবে তা পরকীয়া প্রেম ছিল না। কেউই ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ বিষয়টি অস্বীকার করে নি। আর পবিত্র কুরআনের বক্তব্য যদি বস্তুনিষ্ঠ না হতো, তা হলে ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং মুনাফিক চক্র তাৎক্ষণিকভাবে মহানবীর ব্যাপারে সমালোচনামুখর হয়ে যেত এবং হৈ চৈ সৃষ্টি করত। অথচ তাঁর শত্রুরা, যারা সবসময় ওঁৎ পেতে সুযোগের অপেক্ষায় থাকত, তাদের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা শোনা যায় নি।

২. যায়নাব হচ্ছেন সেই মহিলা যাইদের সাথে বিয়ে হবার আগেই যিনি মহানবীর কাছে তাঁর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে যায়নাবের এ বিয়েতে তীব্র আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও মহানবী তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস যাইদকে যেন যাইনাব বিয়ে করেন, এ ব্যাপারে তাকীদ দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) যদি তাঁকে বিয়ে করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে থাকতেন, তা হলে ঐ দিন তাঁকে বিয়ে করার ব্যাপারে ক্ষুদ্রতম বাধা- বিপত্তিও ছিল না। অথচ তিনি তখন যায়নাবকে কেন বিয়ে করলেন না? বরং আমরা দেখতে পাই, যায়নাব তাঁর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে ইতিবাচক সাড়া তো দেন নি; বরং তাঁকে অন্য একজনকে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

ইতিহাসের এ ভিত্তিহীন কাহিনী প্রত্য্যখ্যান করার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিক সেনাদের এ ঘটনাকে রঙ লাগিয়ে ফুলিয়ে- ফাঁপিয়ে বর্ণনা করার আর কোন ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকে না। এ

গোষ্ঠীটির ঘৃণ্য ও মর্যাদাহানিকর মন্তব্যের উদ্ধৃতি পেশ করা অপেক্ষা আমরা মহানবীর জীবনচরিত ও ইতিহাসের পৃষ্ঠাসমূহকে অধিক পবিত্র ও উচ্চ বলে বিবেচনা করি। মহানবী (সা.) ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর চেয়ে ১৮ বছরের ছোট য়ানাবের সাথে (একই সমাজে) বসবাস করেছেন। এ কারণেই আমরা এখানে প্রাচ্যবিদদের বক্তব্য উদ্ধৃতি প্রদান থেকে বিরত থাকলাম।

প্রয়োজন দু'টি কথার ব্যাখ্যা

আলোচনার পূর্ণতা বিধানের জন্য এ প্রসঙ্গে যে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, তা এবং এর দু'খানা বাক্য, যা স্বল্প জ্ঞান ও তথ্যের অধিকারী কিছুসংখ্যক লোকের দ্বিধা ও সংশয়ের কারণ হয়েছিল, এখানে উল্লেখ করে এসবের ব্যাপারে কিছু ব্যাখ্যা প্রদান করব। নিচে এ আয়াত উদ্ধৃত করা হলো:

(و إذ تقول للذي أنعم الله عليه و أنعمت عليه أمسك عليك زوجك و اتق الله)

“ স্মরণ করুন, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাকে বলছিলেন : ‘তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর’ ।”

(সূরা আহযাব : ৩৭)

এ অংশের বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা নেই। এখন যে বাক্যদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করা প্রয়োজন, তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. **و تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ** - “আপনি যা নিজ অন্তরে গোপন রাখছেন, তা মহান আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেবেন।”

যাইদকে এতসব উপদেশ দেয়ার পর মহানবী (সা.) নিজ অন্তরে এমন কোন্ বিষয় গোপন রেখেছিলেন যা মহান আল্লাহ্ স্পষ্ট প্রকাশ করে দেয়ার কথা বলেছেন?

এমনটা হয় তো কেউ ভাবতে পারে যে, মহানবী (সা.) যে বিষয় গোপন রাখতেন, তা ছিল এই যে, যদিও তিনি যাইদকে তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিতে বারণ করতেন, তবুও তিনি মনে মনে ঠিকই চাইতেন যে, যাইদ তাঁর স্ত্রীকে তালাক প্রদান করুন এবং এরপর তিনি তাঁকে বিয়ে করবেন।

এ ধরনের সম্ভাবনা কোনভাবেই সঠিক নয়। কারণ মহানবী (সা.) যদি মনে মনে এরূপ ধারণা পোষণ করবেন, তা হলে মহান আল্লাহ কেন অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে তাঁর এ গোপন আকাঙ্ক্ষা ফাঁস করে দিলেন না? অথচ তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মহানবী যা কিছু অন্তরে গোপন রেখেছেন, তা তিনি প্রকাশ করে দেবেন, যেমনটি তিনি এ আয়াতে বলেছেন : **الله مبديه** অর্থাৎ (আপনি যা গোপন রাখছেন) তা মহান আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন।

এ কারণেই মুফাসসিরগণ বলেন : মহানবী (সা.) যা নিজ অন্তরে গোপন রেখেছিলেন, তা ছিল ঐ ওহী যা মহান আল্লাহ তাঁর ওপর অবতীর্ণ করেছিলেন। এর ব্যাখ্যা হলো : মহান আল্লাহ তাঁর কাছে ওহী প্রেরণ করে জানিয়েছিলেন : যাইদ তার পত্নীকে তালাক দেবে। আর আপনি আরবদের কু-প্রথা বিলুপ্ত করার জন্য তাকে বিয়ে করবেন। যে মুহূর্তে তিনি যাইদকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, সে মুহূর্তেও এ ইলাহী বাণীর প্রতি তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। তবে তিনি যাইদ ও অন্যান্য ব্যক্তির কাছে এ বাণী গোপন রেখেছিলেন। কিন্তু মহান আল্লাহ এ বাক্যে মহানবীকে জানিয়ে দেন : আপনার অন্তঃকরণে যা আছে, মহান আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন এবং আপনার গোপন রাখার কারণে তা গোপন থাকবে না।

এ বক্তব্যের প্রমাণ হচ্ছে এই যে, পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

(**فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ**)

“ অতঃপর যখন যাইদ য়ানাবকে তালাক দিল, তখন আমরা তাকে আপনার সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে ঈমানদারদের দণ্ডক পুত্ররা যখন তাদের স্ত্রীদের তালাক প্রদান করবে, তখন সেসব রমণীকে বিয়ে করায় মুমিনদের কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়।”

এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সা.) যা গোপন রেখেছিলেন, তা ছিল ঐ খোদায়ী প্রত্যাদেশ যাতে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তিনি ভুল প্রথা বিলোপ করার জন্য বিয়ে বিচ্ছেদের পর পালিত পুত্রের সহধর্মিণীকে অবশ্যই বিয়ে করবেন।

٢. و تخشي الناس و الله أحق أن تخشاه. - “আর আপনি জনগণকে ভয় পাচ্ছেন, অথচ মহান আল্লাহই হচ্ছেন সবচেয়ে উপযুক্ত সত্তা যাঁকে আপনার ভয় করা উচিত।”

এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় বাক্য যার অস্পষ্টতা প্রথম বাক্যের তুলনায় অনেক কম। কারণ, একটি কলুষিত পরিবেশে বহু বছর ধরে প্রচলিত একটি ঘৃণ্য প্রথা পদতলে পিষ্ট করা অর্থাৎ পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করার সাথে স্বভাবতই এক ধরনের আঁকি অশান্তি ও উদ্বেগ বিদ্যমান, যা মহান নবীগণের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আদেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার মাধ্যমে বিদূরিত হয়ে যায়।

মহানবীর মাঝে যদি কোন উদ্বেগ থেকে থাকে বা তাঁর মাঝে যদি কোন উৎকর্ষার উ ব ঘটে থাকে, তা হলে তা এ কারণে হয়েছিল যে, তিনি চিন্তা করতেন আরব জাতি- যারা জাহিলী যুগ এবং অপবিত্র ধ্যান- ধারণা ও আকীদা- বিশ্বাস থেকে সদ্য মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে), - তারা হয় তো বলবে যে, মহানবী (সা.) একটি জঘন্য কাজ করেছেন; অথচ তা প্রকৃতপক্ষে কখনোই ঘৃণ্য ও অন্যায় কাজ ছিল না।

সাঁইত্রিশতম অধ্যায় : পঞ্চম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

আহযাব অর্থাৎ জোটবদ্ধ দলসমূহের যুদ্ধ ১০৯

হিজরতের পঞ্চম বর্ষে মহানবী (সা.) বেশ কিছু যুদ্ধ বা গায়ওয়ায় সরাসরি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং শত্রুদের সম্ভাব্য চক্রান্ত প্রশমনের জন্য বেশ কিছু সারিয়াহ বা সামরিক অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন। এখন আমরা হিজরতের পঞ্চম বর্ষের কয়েকটি গায়ওয়ার বিবরণ প্রদান করব :

১. গায়ওয়া- ই- দাওমাতুল জান্দাল ১১০

পবিত্র মদীনা নগরীতে গোপন সংবাদ এসে পৌঁছায় যে, ‘দাওমাতুল জান্দাল’ নামক অঞ্চলে একদল লোক সংঘবদ্ধ হয়ে মুসাফির ও পথচারীদের ওপর অত্যাচার করছে এবং মদীনা নগরী অবরোধ করার অভিপ্রায় পোষণ করছে। মহানবী (সা.) তাদেরকে দমন করার জন্য এক হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা নগরী ত্যাগ করেন। তিনি রাতের বেলা পথ চলতেন এবং দিনের বেলা যাত্রা-বিরতি করতেন ও বিশ্রাম নিতেন। শত্রুরা মহানবী (সা.)-এর সেনা অভিযানের ব্যাপারে অবগত হলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। এরপর মহানবী (সা.) সেখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন এবং তিনি এ অঞ্চলের সম্ভাব্য ষড়যন্ত্র লো ব্যর্থ করার জন্য বেশ কয়েকটি প্রতিনিধিদল আশে-পাশের অঞ্চল লোয় প্রেরণ করেন।

মহানবী (সা.) ২০ রবীউস সানী মদীনার উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং ফেরার সময় তিনি ফিয়ার গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। মহানবী (সা.) তাকে মদীনার চারণক্ষেত্র লো ব্যবহার করার অনুমতি দেন। কারণ তার গোত্র দুর্ভিক্ষ ও খরা কবলিত হয়েছিল।^{১১১}

২. খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ

আমাদের ইতোমধ্যে উল্লেখ মতো মহানবী (সা.) হিজরতের চতুর্থ বর্ষে বনী নাযীরের ইহুদীদের চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে পবিত্র মদীনা নগরী থেকে বহিস্কার এবং তাদের কিছু ধন-সম্পদও জব্দ করেন। বনী নাযীর খাইবরের দিকে যেতে এবং সেখানে বসবাস করতে বা শামের দিকে যেতে বাধ্য হয়েছিল। মহানবী (সা.)-এর এ বৈ বিক পদক্ষেপ ঐ চুক্তি মোতাবেক ছিল যাতে দু'পক্ষ স্বাক্ষর করেছিলেন। মহানবীর এ পদক্ষেপই বনী নাযীর গোত্রের নেতাদেরকে ষড়যন্ত্র করতে এবং মাদীনা গিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে কুরাইশদের যুদ্ধে উস্কানি দিতে প্রভাবিত করেছিল। এখন এ যুদ্ধের একটি বিশদ বিবরণ দেয়া হলো :

এ যুদ্ধে আরব মুশরিক ও ইহুদীদের সেনাবাহিনীকে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে সংগঠিত করা হয়েছিল। তারা একটি শক্তিশালী সামরিক ঐক্যজোট গঠন করে প্রায় দীর্ঘ এক মাস মদীনা নগরী অবরোধ করে রেখেছিল। আর যেহেতু এ যুদ্ধে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী যোগদান করেছিল এবং শত্রুবাহিনীর অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্য মুসলমানরা মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করেছিল, সেহেতু এ যুদ্ধকে 'আহযাব' বা 'দলসমূহের যুদ্ধ' এবং কখনো কখনো 'পরিখার যুদ্ধ' বলে অভিহিত করা হয়।

যেভাবে আমরা উল্লেখ করেছি, বনী নাযীর গোত্রের ইহুদী নেতারা এবং বনী ওয়ায়েল গোত্রের একদল লোক ছিল এ যুদ্ধের অগ্নিশিখা প্রজ্বলনকারী। বনী নাযীর গোত্রের ইহুদীরা মুসলমানদের কাছ থেকে যে আঘাত পেয়েছিল, সে কারণে এবং বাধ্য হয়ে তাদের মদীনা ত্যাগ করতে হয়েছিল এবং তাদের একদল খাইবরে আবাসন নিয়েছিল বিধায় তারা ইসলাম ধর্মের মূলোৎপাটনের একটি সূক্ষ্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল। তারা আসলেই একটি অত্যাচারী পরিকল্পনা এঁটেছিল এবং মুসলমানদেরকে তারা বিভিন্ন দলের মুখোমুখি করে দিয়েছিল, যা ছিল আরব জাতির ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা।

এ পরিকল্পনার ছত্রছায়ায় অগণিত আরব গোত্র ও গোষ্ঠী ইহুদীদের অর্থনৈতিক সহায়তা পেয়েছিল এবং মুসলমানদের বিরোধী সেনাবাহিনীর জন্য সব ধরনের যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছিল।

পরিকল্পনাটি ছিল এই যে, সাল্লাম ইবনে আবীল হুকাইক এবং হুইয়াই ইবনে আখতাবের মতো বনী নাযীর গোত্রের নেতারা একটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়ে পবিত্র মায় গিয়ে কুরাইশ নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল এবং তাদেরকে বলেছিল : “মুহাম্মদ আপনাদের ও আমাদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করেছে এবং বনী কাইনুকা গোত্র ও বনী নাযীর গোত্রের ইহুদীদেরকে তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে।

আপনারা কুরাইশ গোত্র (মুহাম্মদের বিরুদ্ধে) রুখে দাঁড়ান এবং আপনাদের মিত্রদের কাছ থেকে সাহায্য নিন; আর মদীনার প্রবেশ মুখের কাছে আমাদেরও সাত শ’ ইহুদী তীরন্দাজ সৈন্য আছে এবং তাদের সবাই আপনাদের সাহায্যার্থে ত ছুটে আসবে। যদিও বাহ্যত মুহাম্মদের সাথে বনী কুরাইশ গোত্রের ইহুদীদের প্রতিরক্ষামূলক চুক্তি আছে তবুও আমরা তাদেরকে এ চুক্তি উপেক্ষা করে আপনাদের সহযোগী হবার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করব।” ১১২

তাদের দশোক্তি ও আশ্ফালন- কুরাইশ নেতৃবর্গ, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে কার্যকর প্রভার বিস্তার করেছিল এবং ইহুদী নেতৃবর্গের পরিকল্পনাটি তাদের মনঃপূত হয়েছিল এবং তারা তাদের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করেছিল। তবে (চূড়ান্ত) সম্মতি দানের কথা ঘোষণা করার আগেই তারা ইহুদী নেতৃবর্গকে জিজ্ঞেস করেছিল :

“ আপনারা আহলে কিতাব সম্প্রদায় এবং আসমানী কিতাবসমূহের অনুসারী। আপনারা সত্য ও মিথ্যা শরীয়তকে ভালোভাবেই পৃথক করতে সক্ষম। আর আপনারা জানেন, তার (মুহাম্মদ) ধর্ম যা আমাদের ধর্মের পরিপন্থী, কেবল তা ছাড়া মুহাম্মদের সাথে আমাদের কোন মতপার্থক্য নেই। সত্যি করে আমাদের বলুন তো, আমাদের ধর্ম উত্তম, নাকি তার ধর্ম- যা একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত?”

এখন অবশ্যই দেখা উচিত, এ গোষ্ঠীটি (ইহুদীরা), যারা নিজেদেরকে পৃথিবীর বুকে তাওহীদের (একত্ববাদ) ধ্বজাধারী বলে মনে করে, ঐ অজ্ঞ গোষ্ঠীর প্রশ্নের কী জবাব দিয়েছিল, যারা তাদেরকে বিশেষজ্ঞ বলে গণ্য করে তাদের কাছে নিজেদের সমস্যা লো উপস্থাপন করেছিল? তারা চরম নির্লজ্জ ভাবে বলেছিল : “মূর্তিপূজা মুহাম্মদের ধর্ম অপেক্ষা উত্তম। আপনারা আপনাদের ধর্মের ওপর অটল থাকবেন এবং তার ধর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র ঝোঁক প্রদর্শন করবেন না।” ১১৩

তারা এ বক্তব্যের দ্বারা আসলে নিজেদেরকেই কলঙ্কিত করেছে এবং এর ফলে ইহুদী জাতির ইতিহাস, যা আগে থেকেই কালো ছিল, আরো কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে। এ লন এতটাই অমার্জনীয় ছিল যে, স্বয়ং ইহুদী লেখকরাও এ ধরনের ঘটনায় অস্বাভাবিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ড. ইসরাইল ‘ইহুদী জাতি ও আরবোদ্বীপের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিখেছেন :

“ যদি কুরাইশরা ইহুদীদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যানও করত, তবুও ইহুদীদের এ ধরনের ভুল ও অন্যায় করা শোভনীয় ছিল না। অধিকন্তু, পৌত্তলিকদের শরণাপন্ন হওয়া ইহুদী জাতির জন্য কখনোই ঠিক হয় নি। কারণ এ ধরনের পদক্ষেপ আসলে তাওরাতের শিক্ষা ও নীতিমালারই পরিপন্থী।” ১১৪

আসলে এটা হচ্ছে এমন এক অভিমত যা বর্তমান কালের রাজনীতিবিদরা নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করে থাকেন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে কোন ধরনের বৈধ- অবৈধ মাধ্যম ব্যবহার করা উচিত। আর এ কথাটিই এ মতাদর্শের পূর্বসূরি মেকিয়াভেলী বলেছেন : “লক্ষ্য মাধ্যমকে বৈধতা ও সিদ্ধতা প্রদান করে” (অর্থাৎ লক্ষ্য যদি মহান হয়, তা হলে তা অর্জন করার জন্য বৈধ- অবৈধ যে কোন পন্থা অবলম্বন করা যাবে এবং তা বৈধ হবে)। আর তাঁদের মতাদর্শে চারিত্রিক গাবলী (আখলাক) হচ্ছে এমন বিষয় যা লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সহায়ক।

পবিত্র কুরআন এ তিক্ত বিষয়টি সম্পর্কে এভাবে বলেছে :

(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت و يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا)

“ তুমি কি তাদের দেখ নি, যাদের কিতাবের (ইলাহী গ্রন্থ) এক (সামান্য) অংশ দেয়া হয়েছিল, তারা জিবত (প্রতিমার নাম) ও আল্লাহ ছাড়া সব পূজ্য সত্তায় বিশ্বাস করে? তারা কাফেরদের সম্পর্কে বলে : এদের পথ মুমিনদের চেয়ে উত্তম।” (সূরা নিসা : ৫১)

এসব আলেম নামধারীদের (ইহুদী নেতাদের) বক্তব্য মূর্তিপূজকদের মন-মানসিকতার ওপর কার্যকর প্রভাব ফেলে এবং তারা তাদের সম্মতির কথা ঘোষণা করে এবং মদীনার দিকে অভিযানের সময়ও নির্ধারণ করা হয়।

যুদ্ধের অগ্নিশিখা প্রজ্বলনকারীরা খুশী মনে পবিত্র ম া থেকে বের হয়ে ইসলাম ধর্মের চরম শত্রু গাতফান গোত্রের সাথে যোগাযোগ করার জন্য নাজদ অভিমুখে যাত্রা করে। গাতফান গোত্রের মধ্য থেকে বনী ফাযারাহ, বনী মুররাহ ও বনী আশজা-এ শাখা-গোত্র লো তাদের প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দেয়, এ শর্তে যে, বিজয়ের পর খাইবরের উৎপাদিত শস্য এক বছর পর্যন্ত তাদেরকে প্রদান করতে হবে।

তবে এখানেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয় নি। কুরাইশরা তাদের মিত্র বনী সালীম গোত্রকে এবং গাতফান গোত্র তাদের মিত্র বনী আসাদ গোত্রকে পত্র লিখে তাদেরও ঐ সামরিক জোটে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানায়। মিত্ররাও তাদের আহ্বানে সাড়া দেয়। এরপর একটি নির্দিষ্ট দিবসে এসব দল ও গোষ্ঠী আরবোপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মদীনা অবরোধ ও দখল করার উদ্দেশ্যে অকস্মাৎ বন্যার মতো ছুটে আসে।^{>>>}

মুসলমানদের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক

পবিত্র মদীনা নগরীতে বসবাসের শুরুর দিন থেকে মহানবী (সা.) ইসলামের প্রভাব বলয়ের চৌহদ্দির বাইরে শত্রুদের সার্বিক অবস্থা, গতিবিধি ও তৎপরতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য সর্বদা দক্ষ ও নিপুণ গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের মদীনার আশেপাশে প্রেরণ করতেন। এ কারণেই গোয়েন্দা তথ্য প্রদানকারীরা গোপন তথ্য প্রদান করেন যে, ইসলামের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী সামরিক জোট গঠিত হয়েছে এবং এ জোটের লোকেরা একটি নির্দিষ্ট দিনে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হবে এবং মদীনা নগরী অবরোধ করবে। মহানবী (সা.) তৎক্ষণাৎ একটি প্রতিরক্ষা বিষয়ক পরামর্শ সভার আয়োজন করেন, যাতে সবাই উহুদ যুদ্ধে অর্জিত তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হন। একদল দুর্গে আশ্রয় নিয়ে দুর্গের টাওয়ার ও উচ্চ স্থান থেকে যুদ্ধ পরিচালনাকে শহরের বাইরে গিয়ে শত্রু সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার ওপর অধিক রুত্ব প্রদান করেছিলেন। তবে এ পরিকল্পনা যথেষ্ট ছিল না। কারণ উত্তাল সৈন্যদের আক্রমণ দুর্গ ও টাওয়ার লোকে ধ্বংস করে ফেলত এবং মুসলমানদের ভুলুর্ঠিত করে ফেলত। তাই তখন এমন কোন কাজ করা প্রয়োজন ছিল, যার ফলে তারা মদীনা নগরীর নিকটবর্তী হতে সক্ষম না হয়।

ইরানীদের রণকৌশলের সাথে পরিচিত সালমান ফার্সী বললেন : “যখনই পারস্যবাসী ভয়ঙ্কর শত্রুর আক্রমণের মুখোমুখি হয়, তখন তারা শহর ও নগরীর চারপাশে গভীর পরিখা খনন করে শত্রুবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করে থাকে। তাই মদীনা নগরীর যে সব স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে অর্থাৎ শত্রুবাহিনীর যানবাহন এবং যুদ্ধের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি যে সব স্থান দিয়ে সহজেই আনা-নেয়া করা যাবে, সেসব স্থানে গভীর পরিখা খনন করে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে মদীনা নগরীর এ অঞ্চলে শত্রুবাহিনীর অগ্রগতি অবশ্যই থামিয়ে দিতে হবে। আর পরিখার পাশে বাঙ্কার নির্মাণ করে সেখান থেকে শহরের প্রতিরক্ষা কার্যকর করতে হবে এবং পরিখার আশে-পাশের

টাওয়ার লো থেকে শত্রুবাহিনীর উপর তীর ও পাথর নিক্ষেপ করে পরিখা অতিক্রম করে শহরের ভিতরে তাদের প্রবেশ প্রতিহত করতে হবে।” ১১৬

সালমানের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রতিরক্ষামূলক এ পরিকল্পনাটি ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, মহানবী (সা.) কয়েক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে যে সব স্থানের ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা বিদ্যমান, সে লো পর্যবেক্ষণ করে একটি বিশেষ রেখা টেনে পরিখা খননের স্থান নির্ধারণ করলেন। ঠিক হলো, উহুদ থেকে রাতিজ পর্যন্ত একটি পরিখা খনন করা হবে এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রতি চল্লিশ হাত অন্তর স্থানের প্রহরা দশ যোদ্ধার ওপর ন্যস্ত করা হবে।

মহানবী (সা.) নিজে সর্বপ্রথম গাঁইতি দিয়ে পরিখা খনন কাজ শুরু করলেন এবং হযরত আলী (আ.) খননকৃত মাটি সেখান থেকে বের করে আনতে লাগলেন। মহানবীর কপাল ও মুখমণ্ডল বেয়ে ঘাম ঝরছিল। ঐ সময় নিম্নোক্ত বাক্য তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো :

لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم اغفر الأنصار و المهاجرة

“ পারলৌকিক জীবনই হচ্ছে প্রকৃত জীবন। হে আল্লাহ! মুহাজির ও আনসারদের আপনি ক্ষমা করে দিন।”

মহানবী (সা.) তাঁর এ কাজের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের কর্মসূচীর একটি দিক উন্মোচন করেছেন এবং ইসলামী সমাজকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং জনগণের নেতাকে অবশ্যই অন্য ব্যক্তিদের মতো সবার শোক-দুঃখে অংশীদার হতে হবে এবং সর্বদা তাদের কাঁধ থেকে বোঝা নিজের কাঁধেও বহন করতে হবে। এ কারণেই মহানবীর এ কর্ম মুসলমানদের মধ্যে এক বিস্ময়কর কর্মোদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা সবাই ব্যতিক্রম ছাড়াই পরিখা খনন কাজে আ নিয়োগ করেছিলেন। এমনকি বনী কুরাইযা গোত্রের ইহুদীরা- যারা মুসলমানদের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেছিল, তারা পর্যন্ত খনন করার সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করে খনন কাজের অগ্রগতিতে সাহায্য করেছিল। ১১৭

মুসলমানরা ঐ সময় তীব্র খাদ্য সংকটের মধ্যে ছিলেন। তা সত্ত্বেও অবস্থাপন্ন পরিবারসমূহের পক্ষ থেকে ইসলামের সৈনিকদের সাহায্য করা হচ্ছিল। যখন বিশাল বিশাল পাথরের স্তর বের হওয়ার কারণে পরিখা খনন কাজের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল, তখন তাঁরা মহানবীর শরণাপন্ন হলে তিনি খুব জোরে আঘাত করে ঐ সব প্রকাণ্ড পাথর ভেঙে টুকরো টুকরো করেছিলেন।

খননকারী শ্রমিকদের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য করলে পরিখার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা যায়। কারণ ঐ সময় মুসলমানদের সংখ্যা (প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত অনুসারে) ছিল তিন হাজার^{১১৮} এবং নির্ধারণ করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক দশ জন যোদ্ধা চল্লিশ হাত ভূমি প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন। এ অবস্থায় পরিখার দৈর্ঘ্য বারো হাজার হাত অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার হবে এবং এর প্রস্থ এতটা ছিল যে, চৌকস অশ্বারোহীরাও অশ্ব নিয়ে তা অতিক্রম করতে পারছিল না। স্বভাবতই এ পরিখার গভীরতা কমপক্ষে পাঁচ মিটার এবং এর প্রস্থও পাঁচ মিটার হয়ে থাকবে।

সালমান ফার্সী সম্পর্কে মহানবী (সা.)- এর প্রসিদ্ধ উক্তি

লোকদেরকে ভাগ করে দেয়ার সময় সালমানের ব্যাপারে মুহাজির ও আনসারগণ পরস্পর কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হন। তাঁদের সবাই বলছিলেন : “সালমান আমাদের মধ্যে এবং তিনি অবশ্যই আমাদের সহকর্মী হবেন।” মহানবী (সা.) তখন তাঁর এ বক্তব্যের মাধ্যমে বিতর্কের অবসান ঘটালেন : **سلمان منّا أهل البيت** “সালমান আমাদের আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।” ^{১১৯}

মহানবী (সা.) দিন-রাত পরিখার পাশে কাটাতে লাগলেন যাতে পরিখা খনন কাজ (যথাসময়ে) শেষ হয়। তবে মুনাফিক চক্র বিভিন্ন ধরনের ঠুনকো অজুহাত দাঁড় করিয়ে দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি নিয়ে, কখনো কখনো অনুমতি না নিয়েই নিজেদের বাড়ীতে ফিরে যেত। তবে মুমিনগণ দৃঢ় সংকল্প সহকারে কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শিয়ে সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই তাঁরা দায়িত্ব থেকে অবসর নিতেন এবং প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে তাঁরা আবার নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসতেন। পুরো বিষয়টা স্পষ্টভাবে সূরা নূরের ৬২ ও ৬৩ তম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আরব ও ইহুদী যৌথ বাহিনীর মদীনা অবরোধ

যে গভীর পরিখা সম্মিলিত আরব বাহিনীর আগমনের ছয়দিন আগে খনন করা হয়েছিল, তারা পঙ্গপালের মতো তার পাশে এসে সমবেত হলো। তারা উহুদ পর্বতের পাদদেশে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হবার আশা করেছিল। কিন্তু উহুদের ময়দানে পৌঁছে তারা সেখানে মুসলিম বাহিনীর কোন চিহ্নই দেখতে পেল না। তাই তারা তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে এবং অবশেষে পরিখার ধারে এসে উপস্থিত হয়। মদীনার সংবেদনশীল অঞ্চলে একটি গভীর পরিখা দেখতে পেয়ে তারা হতবিস্ত্র হলে পড়ে। তারা সবাই বলছিল : মুহাম্মদ এ রণ-কৌশলটা একজন ইরানীর কাছ থেকে শিখেছে। তা না হলে আরবরা এ ধরনের রণ-কৌশলের সাথে মোটেই পরিচিত নয়।

উভয় পক্ষের সামরিক শক্তির একটি সূক্ষ্ম পরিসংখ্যান

আরব বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। পরিখার অপর প্রান্তে তাদের তারবারি লোর ঝলকানি সবার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। ‘ইমতা’ গ্রন্থে মাকরীযীর উদ্ধৃতি অনুসারে কেবল কুরাইশ গোত্রই চার হাজার সৈন্য, তিন শ’ অশ্ব এবং পনেরো শ’ উট নিয়ে পরিখার পাশে তাঁবু স্থাপন করেছিল। কুরাইশদের মিত্র বনী সালীম গোত্র মাররুয যাহরান এলাকায় সাত শ’ সৈন্য নিয়ে কুরাইশদের সাথে যোগ দিয়েছিল। বনী ফিয়ারাহ্ এক হাজার যোদ্ধা এবং বনী আশজা ও বনী মুররাহ্ গোত্রের প্রতিটিই চার শ’ সৈন্য সহ এবং অবশিষ্ট গোত্র লো, যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার পাঁচ শ’ , অন্য একটি স্থানে তাঁবু স্থাপন করেছিল; আর এভাবে সম্মিলিত আরব বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

মুসলমানদের সংখ্যা তিন হাজার অতিক্রম করে নি। সালা (سلا) পর্বতের প্রান্তদেশে উঁচু ভূমিতে তারা তাঁবু স্থাপন করেছিল। এ অঞ্চলে পরিখা ও পরিখার বাইরের অবস্থার ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখছিল এবং শত্রু বাহিনীর যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও গতিবিধি সেখান থেকে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।

একদল মুসলিম সৈন্য পরিখার উপর দিয়ে গমানাগমন নিয়ন্ত্রণ এবং এর প্রতিরক্ষা বিধানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁরা প্রাকৃতিক ও কৃত্রিমভাবে নির্মিত বাস্কারসমূহে অবস্থান নিয়ে শত্রু বাহিনীর পরিখা অতিক্রম করার প্রচেষ্টা প্রতিহত করছিলেন।

মুশরিক বাহিনী প্রায় এক মাস পরিখার অপর প্রান্তে অবস্থান করেছিল। কেবল সীমিত সংখ্যক সৈন্য ব্যতীত তারা পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় নি। আর পরিখা অতিক্রম করার চিন্তা যাদের মাথায় ছিল, তারা আধুনিককালে ব্যবহৃত গোলার পরিবর্তে তখন ব্যবহৃত পাথর নিক্ষেপ করার কারণে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। ঐ সময় আগ্রাসনকারী আরব বাহিনীকে নিয়ে মুসলমানদের বেশ কিছু মিষ্টি- মধুর কাহিনী আছে যেসব ইতিহাসে বর্ণিত আছে।^{১২০}

তীব্র শীত ও খাদ্য- সামগ্রীর অভাব

পরিখার যুদ্ধ শীতকালে সংঘটিত হয়েছিল। ঐ বছর মদীনা অনাবৃষ্টি ও এক ধরনের দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে মুশরিক বাহিনীর খাদ্য ও রসদপত্র এতটা ছিল না যে, তারা সেখানে দীর্ঘ দিন অবস্থান করতে সক্ষম হবে। তারা ভাবতেও পারে নি যে, পরিখার পাশে তাদেরকে এক মাস আটকে থাকতে হবে। বরং তারা নিশ্চিত ছিল, অতর্কিত হামলা চালিয়ে ইসলামের সকল সাহসী যোদ্ধাকে ধরাশায়ী এবং মুসলমানদের হত্যা করবে।

কয়েকদিন অতিবাহিত হবার পর যুদ্ধের আ ন প্রজ্বলনকারীরা (ইহুদীরা) এ সমস্যা উপলব্ধি করল। তারা বুঝতে পারল, সময় গত হওয়ার সাথে সাথে সম্মিলিত মুশরিক বাহিনীর সেনাপতিদের ইচ্ছাশক্তিও হ্রাস পেতে থাকবে এবং খাদ্য ও রসদপত্রের অভাব এবং শীতের প্রকোপ বাড়ার কারণে তাদের প্রতিরোধ ও দৃঢ়তাও হ্রাস পাবে। এ কারণেই তারা এ চিন্তা করতে লাগল যে, মদীনা নগরীর ভেতরে বসবাসকারী বনী কুরাইযার কাছে তারা সাহায্য চাইবে যাতে তারা মদীনার অভ্যন্তরে যুদ্ধের আ ন প্রজ্বলিত করে সম্মিলিত আরব বাহিনীর সামনে মদীনা নগরীতে প্রবেশ করার পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

বনী কুরাইযার দুর্গে হুইয়াই ইবনে আখতাবের আগমন

বনী কুরাইযাহ ছিল একমাত্র ইহুদী গোত্র যারা মদীনায় মুসলমানদের সাথে শান্তিতে বসবাস করত এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে সন্ধিচুক্তি করার কারণে মুসলমানরাও তাদের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করত।

হুইয়াই ইবনে আখতাব বুঝতে পারল, সম্মিলিত আরব বাহিনীর স্বার্থে মদীনার ভেতর থেকে সাহায্য নেয়াই হচ্ছে বিজয় লাভের একমাত্র পথ। মুসলমান এবং বনী কুরাইযার ইহুদীদের মাঝে যুদ্ধের আন প্রজ্জলিত করার জন্য এবং গৃহযুদ্ধে মুসলমানদের ব্যস্ত হওয়া সম্মিলিত আরব বাহিনীর বিজয় লাভের অনুল বিবেচনায় সে মহানবীর সাথে বনী কুরাইযার ইহুদীদের শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করার আহ্বান জানায়। এ পরিকল্পনা মোতাবেক সে বনী কুরাইযার দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হয়ে তাদের কাছে নিজের পরিচিতি তুলে ধরে। বনী কুরাইযার সর্দার কা'ব দুর্গের ফটক না খোলার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সে খুব মিনতি করতে থাকে এবং চিৎকার করে বলতে থাকে : “হে কা'ব! তুমি কি তোমার রুটি-রোয়গারের ব্যাপারে ভীত যে, এ কারণে তুমি আমার জন্য দুর্গের ফটক খুলছ না?” এ কথা কা'বের অনুভূতিকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। সে দুর্গের ফটক খোলার নির্দেশ দিল। তার নির্দেশে দুর্গের ফটক খোলা হলো এবং যুদ্ধের আন প্রজ্জলনকারী (হুইয়াই ইবনে আখতাব) অভিন্ন ধর্মানুসারী কা'বের পাশে বসে বলল : “আমি তোমার জন্য এক দুনিয়া সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে এসেছি। কুরাইশ গোত্রপতিরা, আরবের নেতারা এবং গাতফান গোত্রের সর্দাররা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অভিন্ন শত্রু অর্থাৎ মুহাম্মদকে ধ্বংস করার জন্য পরিখার পাশে এসে অবস্থান নিয়েছে এবং আমাকে কথা দিয়েছে মুহাম্মদ ও মুসলমানদের পাইকারীভাবে হত্যা না করে তারা নিজেদের বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করবে না।”

কা'ব জবাবে তাকে বলল, “তুমি এক দুনিয়া অপদস্থতা ও অসম্মান সাথে নিয়ে এসেছ। আমার দৃষ্টিতে আরব বাহিনী ঐ মেঘসদৃশ, যা কেবল গর্জনই করে, তবে এক ফোঁটা বৃষ্টিও এ থেকে বর্ষিত হয় না। হে আখতাব তনয়! হে যুদ্ধের উস্কানিদাতা ও যুদ্ধের আন প্রজ্জলনকারী! আমাদের ওপর থেকে তোমার হাত টিয়ে নাও। মুহাম্মদের সুকুমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীর কারণে আমরা তাঁর সাথে আমাদের শান্তি চুক্তি উপেক্ষা করতে পারব না। আমরা তাঁর থেকে

সত্যবাদিতা, নির্মলতা, সততা ও পবিত্রতা ছাড়া আর কিছুই প্রত্যক্ষ করি নি। তাই আমরা কিভাবে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করব?”

কিন্তু হুইয়াই ইবনে আখতাব একজন দক্ষ উ চালকের মতো- যে কুঁজের উপর হাত বুলিয়ে পাগলা উটকে শান্ত করে- এতটা কথা বলল যে, কা’ ব শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। হুইয়াই তাকে কথা দিল, সম্মিলিত আরব বাহিনী যদি মুহাম্মদের ওপর বিজয়ী নাও হয়, স্বয়ং সে দুর্গে প্রবেশ করে (তাদের সুখ-দুঃখের) ভাগীদার হবে। কা’ ব হুইয়াই এর উপস্থিতিতে ইহুদী নেতাদের ডেকে একটি পরামর্শসভার আয়োজন করল এবং সে তাদের মতামত জানতে চাইল। তারা সবাই বলল : “তোমার অভিমতই আমাদের অভিমত। তুমি যা সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা তা মানতে প্রস্তুত আছি।” ১১১

যুবাইর বাতা ছিল একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। সে বলল : “আমি তাওরাতে পড়েছি, শেষ যুগে ম া থেকে এক নবী আবির্ভূত হবেন এবং মদীনায় হিজরত করবেন। তাঁর ধর্ম সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হবে। আর কোন বাহিনীই তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখবে না। মুহাম্মদ যদি ঐ প্রতিশ্রুত নবী হয়ে থাকেন, তা হলে এ সম্মিলিত বাহিনী তাঁর ওপর বিজয়ী হবে না।” হুইয়াই ইবনে আখতাব সাথে সাথে বলল : “ঐ (প্রতিশ্রুত) নবী বনী ইসরাঈল বংশো ূত হবেন। আর মুহাম্মদ হচ্ছে ইসরাঈলের বংশধর যে যাদু ও ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে এ দলটিকে (মুসলমানদের) জড়ো করেছে।” সে এ প্রসঙ্গে এতটা দৃঢ়তার সাথে বুঝালো, যা অবশেষে তাদের সবাইকে শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করতে প্ররোচিত করল (এবং তারা শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নিল)। এ সময় হুইয়াই তাদের ও মহানবী (সা.)- এর মাঝে সম্পাদিত শান্তিচুক্তিপত্র চাইল এবং তাদের সবার চোখের সামনে তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল। এরপর সে বলল : “সবকিছু এখন শেষ হয়ে গেছে। কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন তোমরা সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।” ১১২

বনী কুরাইযার চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে মহানবী (সা.)- এর অবগতি

মহানবী (সা.) তাঁর দক্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বনী কুরাইযাহ কর্তৃক শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করার ব্যাপারে ঐ অতি সংবেদনশীল মুহূর্তে অবগত হলেন এবং খুবই চিন্তিত ও ব্যথিত হলেন।

তিনি তৎক্ষণাৎ মুসলিম সাহসী সেনা কর্মকর্তা এবং আউস ও খায়রাজ গোত্রের সর্দার সা' দ ইবনে মায়ায এবং সা' দ ইবনে উবাদাকে দায়িত্ব দিলেন, তাঁরা এ সংক্রান্ত সূক্ষ্ম তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং বনী কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতা করার খবর সঠিক হয়ে থাকলে তাঁরা মহানবীকে 'আযাল ওয়া কারাহ' ^{১২৩} (عضل و قاره) - এ সাংকেতিক শব্দ উচ্চারণ করে অবহিত করবেন।

আর তারা তাদের চুক্তির ওপর অটল থাকলে যেন তাঁরা প্রকাশ্যে এ বিষয়টি অস্বীকার করেন।

সা' দ ইবনে মায়ায এবং সা' দ ইবনে উবাদাহ্ আরো দু'জন কর্মকর্তাকে সাথে নিয়ে বনী কুরাইযার দুর্গের ফটকের কাছে আগমন করলেন এবং কা' বের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবার মুহূর্তেই মহানবী (সা.)- কে উদ্দেশ্য করে তার গালি- গালাজ, নিন্দাবাদ ও কটুক্তি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলেন না। সা' দ তাঁর অভ্যন্তরীণ অনুপ্রেরণার (ইলহাম) ভিত্তিতে বললেন : "মহান আল্লাহর শপথ! সম্মিলিত আরব বাহিনী এ ভূ- খণ্ড থেকে চলে যাবে এবং মহানবী (সা.) এ দুর্গ অবরোধ করে তোমার মুণ্ডপাত করবেন এবং তোমার গোত্রকে অপদস্থ করবেন।" এরপর তাঁরা সাথে সাথে ফিরে এসে মহানবীকে বললেন : ' আযাল ওয়া কারাহ' ।

মহানবীও উচ্চকণ্ঠে বললেন : الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين بالفتح "আল্লাহ্ আকবার (আল্লাহ্ মহান)। হে মুসলিম জনতা! তোমাদের সুসংবাদ (দিচ্ছি), বিজয় অতি নিকটে।"

ইসলামের মহান নেতার সাহসিকতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক এ বাক্য তিনি এজন্য বলেছিলেন যাতে বনী কুরাইযাহ্ গোত্রের চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ শুনে মুসলমানদের মনোবল দুর্বল না হয়ে পড়ে।^{১২৪}

বনী কুরাইযাহ্ পরিচালিত প্রাথমিক আগ্রাসন

বনী কুরাইযা গোত্রের প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল এই যে, প্রথমে তারা মদীনা নগরীতে লুটতরাজ চালাবে এবং যে মুসলমান নারী ও শিশু ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, তারা তাদেরকে ভীত- সন্ত্রস্ত করবে। আর তারা মদীনায় তাদের এ পরিকল্পনা ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত করবে।

যেমন বনী কুরাইযাহ্ গোত্রের বীরেরা রহস্যজনকভাবে মদীনা নগরীতে টহল দেয়া শুরু করে ও ঘোরাফেরা করতে থাকে। সাফীয়াহ্ বিনতে আবদুল মুত্তালিব এ ব্যাপারে বলেছেন : “আমি হাঙ্গান ইবনে সাবিতের ঘরে ছিলাম এবং হাঙ্গানও স্ত্রী ও সন্তান- সন্ততি সহ সেখানে বসবাস করছিল। হঠাৎ আমি একজন ইহুদী লোককে দেখতে পেলাম, সে দুর্গের চারপাশে রহস্যজনকভাবে ঘোরাফেরা করছে। আমি হাঙ্গানকে বললাম : এ লোকটির মনে কুমতলব আছে। হাঙ্গান বললেন : হে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা! তাকে হত্যা করার সাহস আমার নেই এবং এ দুর্গ থেকে বের হলে আমার ক্ষতি হতে পারে বলে আমি শঙ্কা বোধ করছি। আমি নিরুপায় হয়ে নিজেই দাঁড়িয়ে আমার কোমর বাঁধলাম এবং এক টুকরো লোহা নিলাম এবং এক আঘাতে ঐ ইহুদী লোকটাকে ধরাশায়ী করে ফেললাম।”

মুসলমানদের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা মহানবী (সা.)- কে গোপন রিপোর্ট প্রদান করে অবহিত করলেন, বনী কুরাইযাহ্, কুরাইশ গোত্র এবং বনী গাতফানের কাছে দু’হাজার সৈন্য চেয়েছে যাতে তারা বনী কুরাইযার দুর্গের ভেতর দিয়ে মদীনায় প্রবেশ করে মদীনা নগরী তখনছ ও লুটপাট করতে সক্ষম হয়। এ সংবাদ ঐ সময় পৌঁছে যখন মুসলমানরা পরিখার পার লো রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত ছিলেন, যাতে শত্রু সেনারা তা অতিক্রম করে মদীনায় প্রবেশ করতে না পারে। মহানবী (সা.) তৎক্ষণাৎ যাইদ ইবনে হারিসা ও মাসলামাহ ইবনে আসলাম নামের দু’জন সেনানায়ককে পাঁচ শ’ সৈন্য নিয়ে মদীনার অভ্যন্তরে টহল দেয়া এবং তাকবীর দিয়ে বনী কুরাইযার আগ্রাসন প্রতিহত করার নির্দেশ দেন যাতে করে মদীনার মুসলিম নারী ও শিশুরা তাদের তাকবীর ধ্বনি শুনে শান্ত ও নিরুদ্ভিগ্ন থাকে।^{১২৫}

মুখোমুখি ঈমান ও কুফর

মুশরিক ও ইহুদীরা পরিখার যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধ পরিচালিত করেছিল। তবে এ সব যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিপক্ষ একটি বিশেষ গোষ্ঠী ছিল এবং সে লো সমগ্র আরবোপদ্বীপকে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার মত ব্যাপক ও সর্বজনীন দিকসম্পন্ন ছিল না। শত্রুরা এতসব চেষ্টা করেও নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সরকার ও রা কে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হয় নি বলে এবার তারা বিভিন্ন গোত্রের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি সম্মিলিত সেনাবাহিনী গঠন করে ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করতে এবং তুণের সর্বশেষ তীরটি মুসলমানদের দিকে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল। তারা সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি কাজে লাগিয়ে এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা করে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে মদীনা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে শত্রুবাহিনী এ যুদ্ধে বিজয় লাভ করত।

এ কারণেই ইসলামের শত্রুরা আরবদের সেরা বীর যোদ্ধা আমর ইবনে আবদে উদকে সাথে করে এনেছিল এ উদ্দেশ্যে যে, তার বাহুবলের দ্বারা তারা তাদের বিজয় আরো ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হবে।

সুতরাং পরিখা যুদ্ধের দিন লোয় শিরক ও ইসলামের দুই বীরের মুখোমুখী হবার মুহূর্তে আসলে ইসলাম ও কুফরই মুখোমুখী হয়েছিল; আর এ দ্বৈত সমর ছিল ঈমান ও কুফরের পরস্পর মুখোমুখী হবার প্রাঙ্গন।

সম্মিলিত আরব বাহিনীর ব্যর্থ হবার অন্যতম কারণ ছিল তাদের সামনে খনন করে রাখা ঐ গভীর পরিখা। শত্রু বাহিনী ঐ পরিখা অতিক্রম করার জন্য রাতদিন চেষ্টা করেছিল। তবে তারা পরিখা রক্ষাকারী সৈন্যদের তীব্র আক্রমণ এবং মহানবী (সা.)-এর গৃহীত প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপসমূহের মুখোমুখী হতে থাকে।

ঐ বছরের তীব্র হাঁড়- কাঁপানো শীত, খাদ্যসামগ্রী এবং খড়- কুটার অভাব আরব বাহিনীর অস্তিত্ব ও তাদের পশু লোর জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হুয়াই ইবনে আখতাব বনী কুরাইযার ইহুদীদের কাছ থেকে ২০টি উট বোঝাই খেজুর সাহায্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল। কিন্তু মুসলিম কর্মকর্তারা সে লো আটক করেছিলেন। এরপর সে লো মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়েছিল।^{১২৬}

একদিন আবু সুফিয়ান মহানবী (সা.)- এর কাছে প্রেরিত এক পত্রে লিখেছিল : “আমি এক বিশাল ব্যয়বহুল সেনাবাহিনী নিয়ে আপনার ধর্মকে উচ্ছেদ করার জন্য এসেছি। কিন্তু কী আর করব। আপনি যেন আমাদের মুখোমুখী হতে পছন্দ করছেন না! আপনি আমাদের ও আপনার মাঝে একটি গভীর পরিখা খনন করে রেখেছেন। জানি না, আপনি এ সমরকৌশল কার কাছ থেকে শিখেছেন! তবে এ কথা বলে রাখছি যে, উহুদের মতো একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ না বাঁধিয়ে আমি মায় ফিরে যাচ্ছি না।”

মহানবী (সা.) তাকে উত্তরে লিখেছিলেন : “আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের কাছে মহান আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে... অনেক দিন যাবত আদর্পে বিভোর হয়ে তুমি ভাবছ, ইসলাম ধর্মের চির উজ্জ্বল প্রদীপ তুমি নিভিয়ে দিতে সক্ষম হবে। তবে তুমি এটা জেনে নাও, এ ব্যাপারে সফল হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে তুমি অনেক হীন ও নীচ। অতি শীঘ্রই তুমি পরাজিত হয়ে ফিরে যাবে। আর আমি ভবিষ্যতে কুরাইশদের বড় বড় প্রতিমা তোমার চোখের সামনেই ভেঙে ঝড়িয়ে দেব।”^{১২৭}

পত্রলেখকের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করা এ পত্রের উত্তর ছিল নিষ্কিঞ্চ তীরতুল্য যা মুশরিক-বাহিনীর সেনাপতির হৃদপিণ্ডে গঁথে গিয়েছিল। কুরাইশরা মহানবীর সত্যবাদিতায় আস্থা রাখত বলে তারা অস্বাভাবিকভাবে নিজেদের মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল। তবে তারা তাদের চেষ্টা চালানো থেকে হাত টিয়ে নেয় নি। এক রাতে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ একটি বিশেষ সেনাদল নিয়ে এ পরিখা অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু উসাইদ ইবনে হুয়াইরের নেতৃত্বে দু’শ’ মুসলিম সৈন্যের প্রতিরক্ষামূলক তৎপরতার কারণে সে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

মহানবী (সা.) মুসলিম সেনাবাহিনী ও যোদ্ধাদের মনোবল শক্তিশালী করার ব্যাপারে ক্ষণিকের জন্যও অমনোযোগী হন নি। তিনি তাঁর অগ্নিগর্ভ ভাষণ এবং আকর্ষণীয় ও প্রাণোদ্দীপক বাণীর দ্বারা তাঁদেরকে চিন্তা-বিশ্বাসের স্বাধীনতার পবিত্র অঙ্গনের প্রতিরক্ষার জন্য সदा প্রস্তুত রাখতেন। একদিন তিনি এক বিশাল মহতী সমাবেশে সৈনিক ও সেনাধ্যক্ষগণের দিকে তাকিয়ে এক সংক্ষিপ্ত দুআর পর বলেছিলেন :

أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ فَاصْبِرُوا وَاَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ

“ হে ইসলামের সৈনিকবৃন্দ! শত্রুবাহিনীর মোকাবেলায় প্রতিরোধ করে যাও এবং জেনে রাখ, বেহেশত হচ্ছে ঐসব তরবারির ছায়ায় যেসব সত্য, ন্যায় ও মুক্তির পথে উন্মুক্ত করা হয়।”

১২৮

আরব বাহিনীর কতিপয় বীর যোদ্ধার পরিখা অতিক্রম

আমর ইবনে আবদে উদ, ইকরামাহ্ ইবনে আবী জাহল, হুবাইরা ইবনে ওয়াহাব, নওফেল ইবনে আবদুল্লাহ্ এবং যিরার ইবনে খাতাব নামের পাঁচ বীর যোদ্ধা যুদ্ধের পোশাক পরে দর্পভরে বনী কিনানার সৈন্যদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল : “তোমার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। আজ তোমরা বুঝতে পারবে, কারা আরব বাহিনীর প্রকৃত বীর যোদ্ধা।” এরপর অশ্ব চালনা করে পরিখার যে অংশটির প্রস্থ কম ছিল, সেখান দিয়ে ঘোড়া সহ লাফ দিয়ে এ পাঁচ বীর যোদ্ধা সেখানে প্রহরারত মুসলিম তীরন্দায় সৈন্যদের নাগালের বাইরে চলে যায়। তবে তাৎক্ষণিকভাবে পরিখা পার হবার স্থান ঘেরাও করে ফেলা হয় এবং অন্যদের তা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে বাধা দান করা হয়।

মল্ল (দ্বৈত) যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আসা এ পাঁচ বীর যোদ্ধা পরিখা ও সালা পাহাড়ের (ইসলামী সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় শিবির) মাঝখানে এসে দাঁড়াল। এ আরব বীরেরা সেখানে অহংকারবশত নিজেদের অশ্ব লোর সাথে ক্রীড়ায় লিপ্ত হলো এবং ইশারায় তাদের প্রতিপক্ষকে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানাতে লাগল।^{১২৯}

এ পাঁচ জনের মধ্যে বীরত্ব ও কৌশলের দিক থেকে বেশ বিখ্যাত বীর যোদ্ধাটি মুসলমানদের সামনে এসে দ্বৈত যুদ্ধে লিপ্ত হবার আহ্বান জানাল। সে মুহূর্তের পর মুহূর্ত ধরে নিজের কণ্ঠ উচ্চকিত করতে লাগল এবং মাতলামিপূর্ণ হুঙ্কারধ্বনি দিয়ে বলতে লাগল : هل من مبارز؟ “তোমাদের মধ্যে কি কোন যোদ্ধা আছে?” তার এ আশ্ফালন সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল এবং মুসলিম সৈন্যদের দেহে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। মুসলমানদের নীরবতা তার স্পর্ধা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। সে (ব্যঙ্গচ্ছলে) বলছিল : “বেহেশতের দাবীদাররা কোথায়? তোমরা মুসলমানরা কি বলো না যে, তোমাদের নিহত ব্যক্তির বেহেশতে এবং আমাদের নিহতরা

জাহান্নামে যাবে? তোমাদের মধ্য থেকে কি একজনও আমাকে দোযখে পাঠানোর জন্য বা আমার পক্ষ থেকে তাকে বেহেশতে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত নয়?”

আর সে তার এ কথা লো বীরগাঁথায় এভাবে বলছিল :

و لقد بححت من التّـداء يجمعكم هل من مبارز

“ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার জন্য এবং মল্লযোদ্ধাকে আহ্বান জানাতে জানাতে আমার গলা বসে গেছে।”

ইসলামী বাহিনীর সমাবেশ কেন্দ্রে আমরের আক্ষালন ও দস্তোক্তির বিপরীতে সুমসাম নীরবতা বিরাজ করছিল। তখন মহানবী (সা.) বলছিলেন, মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন বের হয়ে এ লোকের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের রেহাই দিক। কিন্তু একমাত্র হযরত আলী ইবনে আবী তালিব ছাড়া আর কেউই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন না।

ওয়াকিদী লিখেছেন : “যখন আমার মুসলমানদের মধ্য থেকে তার সমকক্ষ যোদ্ধাকে এসে তার সাথে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছিল, তখন সকল মুসলিম যোদ্ধার মাঝে এতটা নীরবতা বিরাজ করতে লাগল যে, এমন প্রতীয়মান হচ্ছিল, তাঁদের মাথার উপর যেন পাখিও বসে থাকতে পারবে।” ১৩০

অগত্যা এ সমস্যার সমাধান অবশ্যই হযরত আলী ইবনে আবী তালিবের হাতেই হতে হবে। মহানবী (সা.) তাঁর তরবারি হযরত আলী (আ.)- এর হাতে তুলে দিলেন এবং তাঁর বিশেষ পাগড়ী তাঁর মাথায় বেঁধে দিয়ে তাঁর জন্য দুআ করলেন : “হে আল্লাহ! আলীকে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। হে প্রভু! বদরের যুদ্ধে উবাইদাহ ইবনে হারেসা এবং উছদের যুদ্ধে শেরে খোদা (আল্লাহর ব্যাঘ্র) হামযাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। হে প্রভু! আলীকে শত্রুর আঘাত ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন।” এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন :

(رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ)

“ হে প্রভু! আমাকে একাকী করবেন না; আর আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী।” (সূরা

আস্বিয়া : ৮৯)

হযরত আলী বিলম্ব পুষিয়ে দেয়ার জন্য যত ত সম্ভব রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সময় মহানবী তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক এ উক্তি করেছিলেন :

برز الإيمان كله إلى الشرك كله

“ পূর্ণ শিরকের মোকাবেলা করতে পূর্ণ ঈমান (রণক্ষেত্রে) আবির্ভূত হয়েছে।”

হযরত আলী (আ.) তাঁর প্রতিপক্ষের বীরগাঁথার অনুরূপ বীরগাঁথা রচনা করে বললেন :

لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز

“তাড়াছড়ো করো না।

কারণ তোমার আহ্বানে সাড়া দানকারী তোমার কাছে এসেছে,

যে অক্ষম (দুর্বল) নয়।”

হযরত আলী (আ.)- এর সমগ্র দেহ লৌহ নির্মিত ভারী বর্ম ও অস্ত্র- শস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল এবং তাঁর চোখদ্বয় কেবল শিরস্রাণের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে জ্বলজ্বল করছিল। আমার প্রতিপক্ষকে চিনতে চাচ্ছিল। তাই সে হযরত আলী (আ.)- কে বলল : “তুমি কে?” স্পষ্টবাদিতার জন্য বিখ্যাত হযরত আলী বললেন : “আলী ইবনে আবী তালিব।” আমার বলল : “আমি তোমার রক্ত ঝরাব না। কারণ তোমার পিতা ছিলেন আমার পুরনো বন্ধু। আমি তোমার চাচাত ভাইয়ের ব্যাপারে ভেবে অবাক হচ্ছি, সে তোমাকে কোন ভরসায় আমার সাথে লড়ার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছে? আমি তোমাকে না জীবিত, না মৃত এমন অবস্থার মধ্যে বর্শায় গোঁথে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে (শূন্যে) ঝুলিয়ে রাখতে পারি।”

ইবনে আবীল হাদীদ বলেন : “আমার ইতিহাস বিষয়ক শিক্ষক (আবুল খাইর) ইতিহাসের এ অধ্যায় বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে গেলেই বলতেন : আমার আসলে আলীর সাথে দ্বৈত যুদ্ধে লিপ্ত হবার ব্যাপারে ভয় পাচ্ছিল। কারণ সে বদর ও উহুদ যুদ্ধে উপস্থিত ছিল এবং হযরত আলীর বীরত্ব সে সচক্ষে দেখেছে। এ কারণেই সে আলীকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছিল।”

হযরত আলী (আ.) বললেন : “তুমি আমার মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামিও না। আমি উভয় অবস্থায় (আমি নিহত হই বা তোমাকে হত্যা করি) সৌভাগ্যবান এবং আমার বাসস্থান বেহেশত। তবে সকল অবস্থায় দোষখ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।” আমার মুচকি হেসে বলল : “আলী! এ ধরনের বণ্টন ন্যায়ভিত্তিক নয় যে, বেহেশত ও দোষখ উভয়ই তোমার সম্পত্তি হবে।”

ঐ সময় আলী (আ.) আমার ইবনে আবদে উদকে ঐ প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, যা একদিন কাবার পর্দা ছুঁয়ে নিজ প্রভুর (মহান আল্লাহর) সাথে করেছিল। আর তা ছিল, যুদ্ধের ময়দানে যদি কোন বীর তার প্রতিপক্ষকে তিনটি প্রস্তাব দেয়, তা হলে সে লোর যে কোন একটি তাকে গ্রহণ করতে হবে। এ কারণেই হযরত আলী (আ.) প্রস্তাব দিলেন, প্রথমে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। কিন্তু সে বলল : “আলী! এটা বাদ দাও। কারণ তা সম্ভব নয়।” আলী (আ.) তাকে বললেন : “যুদ্ধ থেকে ক্ষান্ত হও এবং মুহাম্মদ (সা.)- কে তাঁর নিজ অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে চলে যাও।” সে বলল : “এ প্রস্তাব আমার জন্য লজ্জাকর। কারণ আগামীকালই আরবের কবিরা আমার ব্যাপারে ব্যঙ্গ করবে এবং তারা ভাববে, আমি ভয় পেয়ে এ কাজ করেছি।” তখন আলী (আ.) বললেন : “এখন যখন তোমার প্রতিপক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, তখন তুমিও তোমার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এসো যাতে আমরা মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হই।” সে বলল: “আলী! আসলে এটি একটি তুচ্ছ প্রস্তাব মাত্র। আমি কখনোই ভাবি নি যে, কোন আরব আমার কাছে এমন প্রস্তাব করতে পারে!” ১৩১

দুই বীরের লড়াই শুরু

দুই বীরের মধ্যে তীব্র মল্লযুদ্ধ শুরু হলো এবং তাদের দু’জনের চারপাশ ধূলো- বালিতে ছেয়ে গেল। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারছিল না। ঢাল ও বর্মের উপর তরবারির আঘাতের শব্দ ছাড়া আর কিছুই তাদের কানে আসছিল না। বেশ কয়েকটা আঘাত ও পা া আঘাতের পর আমার তার তরবারি দিয়ে হযরত আলীর মাথায় আঘাত হানলে আলী (আ.) তা তাঁর ঢাল দিয়ে প্রতিহত করলেন। এ সত্ত্বেও তাঁর মাথা ফেটে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি এ সুযোগে

তরবারি দিয়ে প্রতিপক্ষের পায়ে তীব্র আঘাত হানলেন অথবা তিনি তার দু'পা বা একটি পা কেটে ফেললেন। ফলে আমার মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ধূলো- বালির মধ্য থেকে আলী (আ.)- এর বিজয়ী হবার নিদর্শন তাকবীর ধ্বনি উত্থিত হলো। যে সব আরব বীর আমার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে ছিল, আমার ধরাশায়ী হবার দৃশ্য তাদের অন্তরে এতটা ভীতির সঞ্চার করল যে, তারা নিজেদের অজান্তেই লাগাম ধরে নিজেদের ঘোড়া লোকে পরিখার দিকে চালনা করল এবং একমাত্র নওফেল ছাড়া তাদের সবাই তাদের নিজেদের সেনাশিবিরে ফিরে গেল। নওফেলের অশ্ব পরিখার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল এবং সে নিজেও মাটিতে পড়ে গিয়ে তীব্র আঘাত পেয়েছিল। পরিখায় প্রহরারত সৈন্যরা তার দিকে পাথর ছুঁড়তে থাকলে সে চিৎকার করে বলতে লাগল : “এভাবে হত্যা করা মহানুভবতার পরিপন্থী। আমার সাথে মল্লযুদ্ধের জন্য একজন পরিখার ভেতরে নেমে এসো।” হযরত আলী (আ.) পরিখার ভেতরে নেমে তাকে হত্যা করলেন।

মুশরিক বাহিনীর সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে প্রচণ্ড ভীতির সৃষ্টি হলো। আর আবু সুফিয়ানই সবচেয়ে বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিল। সে ভাবছিল, মুসলমানরা হামযার হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নওফেলের লাশ বিকৃত করতে পারে। তাই সে নওফেলের লাশ দশ হাজার দীনারে ক্রয় করার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠালে মহানবী (সা.) বলেছিলেন : “লাশটা দিয়ে দাও। কারণ ইসলাম ধর্মে মৃতদেহের বিনিময়ে অর্থ নেয়া হারাম করা হয়েছে।”

হযরত আলী (আ.)- এর তরবারির এ আঘাতের মূল্য

বাহ্যত হযরত আলী (আ.) একজন বীরকে বধ করেছিলেন। তবে আসলেই তিনি ঐ সব ব্যক্তির মধ্যে প্রাণ সঞ্চারণ করেছিলেন, আমাদের গগন বিদারী হুঙ্কারধ্বনি শুনে যাদের দেহে কম্পন শুরু হয়ে গিয়েছিল। ঠিক তেমনি দশ হাজার সৈন্যের যে বিশাল বাহিনী নবগঠিত ইসলামী হুকুমত ধ্বংস করার জন্য কোমর বেঁধে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল, তিনি তাদেরকেও ভীত-সন্তপ্ত করে দিয়েছিলেন। আর যদি আমরা জয়লাভ করত, তা হলে তখনই বোঝা যেত হযরত আলীর এ আ ত্যাগের মূল্য কত অপারিসীম ছিল!

হযরত আলী মহানবী (সা.)- এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি এভাবে আলী (আ.)- এর এ আঘাতের মূল্যায়ন করে বলেছিলেন : “আমার উম্মতের সমুদয় সৎকর্মের উপরে হচ্ছে এ আ ত্যাগের রক্ত। কারণ কুফরের সবচেয়ে বড় বীরের পরাজিত হবার কারণেই সকল মুসলমান মর্যাদাবান এবং সকল মুশরিক অপদস্থ হয়েছে।” ১৩২

আলী (আ.)- এর মহানুভবতা

আমরের বর্ম অত্যন্ত দামী ও মূল্যবান হলেও হযরত আলী (আ.) মহানুভবতার কারণে তা ছুঁয়েও দেখেন নি। এমনকি দ্বিতীয় খলীফা এ জন্য আলী (আ.)- কে ভর্ৎসনা করেছিলেন যে, কেন তিনি আমরের দেহ থেকে বর্মটি খুলে আনেন নি। আমরের বোন ঘটনা জানতে পেরে বলেছিল : “আমি কখনই দুঃখ করব না যে, আমার ভাই নিহত হয়েছে। কারণ সে এক মহানুভব ব্যক্তির হাতেই নিহত হয়েছে। আর এর অন্যথা হলে আমার দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত আমি অশ্রুপাত করতাম।” ১৩৩

এখন আমরা দেখব, আরবের বীর আমর ইবনে আবদে উদ নিহত হবার পর মুশরিক বাহিনীর কী পরিণতি হয়েছিল।

ছত্রভঙ্গ সম্মিলিত আরব বাহিনী

ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পেছনে আরব বাহিনী ও ইহুদীদের একক উদ্দেশ্য ছিল না। নব্য প্রতিষ্ঠিত তরুণ ইসলামী রাে র উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করার কারণে ইহুদীরা ভীত হয়ে পড়েছিল এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি কুরাইশদের পুরনো শত্রুতা তাদেরকে এ যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করেছিল। সেখানকার ইহুদীরা গাতফান, ফিয়ারাহ ও অন্যান্য গোত্রকে খাইবরের শস্য প্রদান করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে কারণেই তারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। সুতরাং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে গোষ্ঠী লোকে সর্বশেষ যা প্ররোচিত করেছিল, তা ছিল একটি বস্তুগত বিষয়। আর এ লক্ষ্য যদি মুসলমানদের মাধ্যমে পূরণ করা হতো, তা হলে তারা পূর্ণ সন্তুষ্টি সহ নিজেদের ঘর-বাড়িতে ফিরে যেত, বিশেষ করে যখন তীব্র শীত, খাদ্যাভাব এবং অবরোধকাল দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে তাদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল এবং তাদের মন দুর্বল ও তাদের পশু লোও মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল।

এ কারণেই মহানবী (সা.) উল্লিখিত গোত্র লোর নেতাদের সাথে চুক্তি করার জন্য একটি প্রতিনিধিদলকে দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি প্রতিনিধিদলকে এ গোত্র লোর কাছে এ কথা বলে দেয়ার আদেশ দেন যে, মুসলমানরা তাদেরকে মদীনার এক- তৃতীয়াংশ উৎপাদিত ফল প্রদানে সম্মত আছে। তবে এ শর্তে যে, তাদেরকে সম্মিলিত বাহিনী থেকে বের হয়ে নিজেদের এলাকায়

ফিরে যেতে হবে। মহানবী (সা.)- এর প্রতিনিধিগণ এ গোত্র লোর নেতাদের সাথে বসে একটি চুক্তির খসড়া তৈরি করে তা চূড়ান্ত অনুমোদন ও স্বাক্ষরের জন্য মহানবী (সা.)- এর নিকট উপস্থাপন করেন। তবে মহানবী (সা.) সা' দ ইবনে মায়ায ও সা' দ ইবনে উবাদাহ্ নামক তাঁর দু'জন সেনাকর্মকর্তার সাথে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা দু'জনই একই অভিমত ব্যক্ত করে বললেন, “এ চুক্তি যদি মহান আল্লাহর নির্দেশে হয়ে থাকে, তা হলে তা মেনে নিতে হবে। আর এটি যদি আপনার ব্যক্তিগত বিবেচনায় হয়ে থাকে এবং আপনি যদি এ ব্যাপারে আমাদের অভিমত চেয়ে থাকেন, তা হলে আমাদের অভিমত হচ্ছে এই যে, চুক্তিটি এখানেই স্থগিত রাখতে হবে এবং তা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবে না। কারণ আমরা অতীতে কখনই এসব গোত্রকে সেলামি দিই নি এবং এসব গোত্রের মধ্য থেকে একজনেরও জোর করে আমাদের কাছ থেকে এক টুকরো খেজুর পর্যন্ত ছিনিয়ে নেয়ার সাহস হয় নি। আর এখন যখন মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে এবং আপনার নেতৃত্বে আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি এবং আমরা এ দ্বীনের বদৌলতে মর্যাদাবান ও শক্তিশালী, তখন এ সব গোষ্ঠী ও দলকে সেলামী দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

و الله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا و بينكم

- “ মহান আল্লাহর শপথ! মহান আল্লাহ্ কর্তৃক আমাদের ও তাদের মাঝে তরবারি দিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমরা তাদের সকল বৃথা ও অন্যায় আদারের উত্তর তরবারি দিয়েই দেব।”

মহানবী বললেন : “এ ধরনের চুক্তি সম্পাদন করার ব্যাপারে আমার চিন্তা- ভাবনার কারণ ছিল এই যে, যেহেতু তোমরা সম্মিলিত আরব বাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছ এবং চতুর্দিক থেকে তোমরা তাদের আক্রমণের শিকার হয়েছ, সেহেতু আমি দেখতে পেলাম, শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার মধ্যেই উদ্ধার পাবার পথ বিদ্যমান। এখন যখন তোমাদের আ ত্যাগের মনোবৃত্তি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে, তখন আমি এ চুক্তি স্থগিত করে দিচ্ছি এবং তোমাদের বলছি মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীকে অপদস্থ করবেন না এবং শিরকের ওপর তাওহীদের বিজয়ের ব্যাপারে তাঁর প্রতিশ্রুতি তিনি অবশ্যই বাস্তবায়িত করবেন। ঐ সময় সা' দ ইবনে মায়ায

মহানবীর অনুমতি নিয়ে চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু মুছে ফেলে বললেন : “মূর্তিপূজারীরা আমাদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা তা করুক, আমরা কোন অবস্থায়ই তাদেরকে সেলামি দেব না।” ১৩৪

সম্মিলিত আরব বাহিনীর ছত্রভঙ্গ ও ব্যর্থতার কারণ

১. বিজয়ের প্রথম কারণ ছিল গাতফান ও ফাযারাহ গোত্রের নেতাদের সাথে মহানবী (সা.)- এর প্রতিনিধিগণের সংলাপ। কারণ এ চুক্তি যদিও চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়নি, তবু তা বাতিল করারও ঘোষণা দেয়া হয় নি। এ গোত্র লো এভাবে নিজেদের মিত্রদের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকার ব্যাপারে দোদুল্যমান হয়ে যায় এবং দিনের পর দিন তারা এ চুক্তি সম্পাদনের প্রতীক্ষা করতে থাকে। যখন তাদেরকে সর্বা ক আক্রমণ করার অনুরোধ জানানো হতো, তখনই তারা এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার আশায় কতক লো বিশেষ অজুহাত দাঁড় করিয়ে কুরাইশদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করত।

২. সম্মিলিত আরব বাহিনীর শক্তিশালী বীর আমরের নিহত হওয়া, যার মল্লযুদ্ধে বিজয়ী হবার ব্যাপারে অনেকেই আশাবাদী ছিল। যুদ্ধে আমর নিহত হলে সম্মিলিত আরব বাহিনীর মাঝে তীব্র ভীতির উ ব হয়। বিশেষ করে তার নিহত হবার পরপরই আরব বাহিনীর অন্যান্য বীর যোদ্ধা যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেছিল।

৩. নব বাইয়াতপ্রাপ্ত মুসলমান নুআইম ইবনে মাসউদ সম্মিলিত আরব বাহিনীর ঐক্য ভেঙে দেবার ব্যাপারে অসাধারণ প্রভাব রেখেছিলেন। তিনি মুশরিক বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন এবং এ কালের দক্ষ গুচরদের কর্মতৎপরতার চেয়ে তাঁর কর্মকাণ্ড কোন অংশে কম ছিল না; বরং ছিল আরো উন্নত এবং রত্নপূর্ণ।

নুআইম ইবনে মাসউদ মহানবী (সা.)- এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : “আমি একজন নও মুসলিম। আগে থেকেই সকল গোত্রের সাথে আমার বন্ধুত্ব আছে। তারা আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কথা জানে না। আপনার যদি কোন নির্দেশ থাকে তা হলে আমাকে তা বলুন, আমি তা বাস্তবায়ন করব।” মহানবী (সা.) তাঁকে বললেন : “এমন একটা কাজ কর যার ফলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অর্থাৎ কতক লো মহান কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য যদি তুমি একটি

উপায় বের করার চিন্তা- ভাবনা কর এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন কর, তা হলে এতে কোন আপত্তি নেই।” ১৩৫

নুআইম একটু চিন্তা করে তৎক্ষণাৎ বনী কুরাইযাহ্ গোত্রের কাছে গেলেন। আর এ গোত্র আসলেই শত্রুর পঞ্চম বাহিনী ছিল এবং তাদের মাধ্যমে পেছনে থেকে মুসলমানদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকায় তারা ছিল প্রত্যক্ষ হুমকিস্বরূপ। তিনি বনী কুরাইযার দুর্গে প্রবেশ করে তাদের কাছে তাঁর বন্ধুত্ব, আন্তরিকতা ও সহর্মিতা প্রকাশ করেন। তিনি তাদের সাথে এমনভাবে কথাবার্তা বললেন যেন তিনি তাদের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হন। এরপর তিনি বললেন : “জোটবদ্ধ দল লো অর্থাৎ কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের সাথে তোমাদের অবস্থার পার্থক্য আছে। কারণ মদীনা হচ্ছে তোমাদের সন্তান ও নারীদের আবাসস্থল এবং তোমাদের যাবতীয় ধন- সম্পদ এখানেই রয়েছে। তাই কোন অবস্থায়ই এখান থেকে অন্য কোথাও তোমাদের চলে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে মিত্র ও জোটভুক্ত গোষ্ঠী, যারা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এখানে এসেছে, তাদের আবাসস্থল ও ব্যবসা- বাণিজ্যের জায়গা মদীনার বাইরে ও এখান থেকে অনেক দূরে অবস্থিত।

তারা যদি সুযোগ পেয়ে এ যুদ্ধে বিজয়ী হয়, তা হলে তো তারা তাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে উপনীত হবেই। আর যদি তারা এ যুদ্ধে পরাজিত হয়, তখন তারা তৎক্ষণাৎ এ স্থান ত্যাগ করে নিজেদের আবাসস্থলে ফিরে যাবে, যা মুহাম্মদের নাগালের বাইরে।

তবে তোমাদের এ কথা ভেবে দেখা উচিত, যদি জোটভুক্ত দল লো এ যুদ্ধে বিজয়ী না হয় এবং তারা যদি তাদের কেন্দ্রে ফিরে যায়, তা হলে তোমরা মুসলমানদের হাতের মুঠোর মধ্যে পড়ে যাবে। আমি মনে করি, এখন যেহেতু তোমরা জোটভুক্ত দল লোর সাথে যোগ দিয়েই ফেলেছ, সেহেতু এ সিদ্ধান্তের ওপর তোমাদের অটল থাকা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তবে যাতে করে সম্মিলিত জোটভুক্ত দল লো দুই চলাকালে তোমাদের ত্যাগ করে নিজ নিজ ভূ- খণ্ডে প্রত্যাবর্তন না করে, সেজন্য তাদের কয়েকজন নেতা ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিকে যিম্মী রাখ, যেন তারা তোমাদের দুর্দিনে তোমাদের একাকী রেখে যেতে না পারে। কারণ তখন তারা তাদের

গণ্যমান্য ব্যক্তি ও নেতাদের মুক্তির জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুহাম্মদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে বাধ্য হবে।

বনী কুরাইযার দুর্গে কুরাইশ প্রতিনিধিদের গমন

আবু সুফিয়ান যুদ্ধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার জন্য শনিবার রাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ কারণেই কুরাইশ ও গাতফান গোত্রপতি ও নেতারা কয়েকজন প্রতিনিধিকে বনী কুরাইযার দুর্গে প্রেরণ করে এবং তারা তাদেরকে জানায় : “এ স্থান আমাদের আবাসভূমি নয়; আমাদের পশু লো ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা আগামীকাল পেছন থেকে আক্রমণ চালাবে যাতে আমরা এ যুদ্ধের একটা চূড়ান্ত রফা করতে পারি।” সম্মিলিত আরব গোষ্ঠী লোর প্রতিনিধিদেরকে বনী কুরাইযাহ গোত্রের সেনাপতি বলেছিল : “আগামীকাল শনিবার। আর আমরা ইহুদী জাতি এ দিন কোন কাজ করি না। কারণ আমাদের একদল পূর্বপুরুষ এ দিনে কাজে হাত দিয়েছিল বলে আল্লাহর শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল। অধিকন্তু আমরা ঐ অবস্থায় যুদ্ধ করব যখন আরব দল ও গোষ্ঠী লোর কতিপয় নেতা যিম্মী হিসেবে আমাদের দুর্গে অবস্থান করবে যাতে করে তোমরা তাদের মুক্তির জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করে যেতে থাকবে এবং যুদ্ধ চলাকালে তোমরা আমাদের একাকী ফেলে পলায়ন করবে না।”

কুরাইশ প্রতিনিধিদল ফিরে গিয়ে গোত্রপতি ও নেতাদের এ বিষয় লো সম্পর্কে অবহিত করে। তখন সবাই বলেছিল : “নুআইম সহানুভূতি প্রকাশ করে যা বলেছে, তা ঠিকই (সত্যই) ছিল। আসলে বনী কুরাইযা আমাদের সাথে চালাকী করতে চাচ্ছে।” আবারো কুরাইশ প্রতিনিধিরা বনী কুরাইযার নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে বলল : “আমাদের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তোমাদের কাছে যিম্মী হিসেবে দেব, তা আসলে বাস্তব নয়। এমনকি আমরা আমাদের মধ্য থেকে একজন লোককেও তোমাদের কাছে যিম্মী হিসেবে হস্তান্তর করতে প্রস্তুত নই। যদি তোমরা চাও, কাল মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করতে পার। তা হলে আমরাও তোমাদের সাহায্য করব।”

‘ আমরা আমাদের মধ্য থেকে একজনকেও তোমাদের কাছে যিম্মী হিসেবে তুলে দেব না’ -
কুরাইশ প্রতিনিধিদলের এ ধরনের উক্তি নুআইমের কথা সত্য হবার ব্যাপারে বনী কুরাইযার

সকল সংশয় দূর করে দিল এবং সবাই অভিমত ব্যক্ত করল : “নুআইম যা বলেছে, তা- ই সত্য। কুরাইশরা আসলে নিজেদের স্বার্থ ও পরিণতি নিয়েই কেবল ভাবে। যদি তারা এ যুদ্ধে জয়ী হবার সম্ভাবনা না দেখে, তা হলে তারা নিজেদের পথ ধরবে এবং এভাবে তারা মুসলমানদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করবে।” ১৩৬

সর্বশেষ কারণ

উপরিউক্ত কারণ লো, আরেকটি কারণ- যা আসলে ‘গায়েবী সাহায্য’ বলে উল্লেখ করা যেতে পারে- এর সাথে যুক্ত হয়ে জোটভুক্ত দল ও গোষ্ঠী লোকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল। অন্য কারণটি ছিল হঠাৎ করে আবহাওয়া তীব্রভাবে ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং ঝড় বইতে থাকে। আবহাওয়ার এ পরিবর্তন এতটা তীব্র ছিল যে, তাঁবু লোকে উঠে ফেলে দেয়; ফানুস ও প্রদীপ লো নিভে যায় এবং প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি মরুর বুকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এ সময় মহানবী (সা.) হুয়াইফাকে পরিখা অতিক্রম করে শত্রুদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে আনার দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি বলেন : “আমি আবু সুফিয়ানের কাছে গেলাম। তাকে সম্মিলিত আরব বাহিনীর সেনাপতিদের মাঝে বক্তৃতা করতে দেখলাম এবং তখন সে বলছিল : আমরা যে অঞ্চলে এসেছি তা আমাদের বসবাসের কেন্দ্র নয়। আমাদের পশু লো ধ্বংস হয়েছে এবং ঝড়ো হাওয়া আমাদের তাঁবু, আস্তাবল ও প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড লো অবশিষ্ট রাখে নি। আর বনী কুরাইয়াও আমাদের সাহায্য করে নি। আমাদের এ স্থান ত্যাগ করাই হচ্ছে কল্যাণকর। এরপর সে তার হাঁটুবাঁধা উটের উপর আরোহণ করে সেটাকে চাবুক দিয়ে কষে আঘাত করতে লাগল। বেচারি আবু সুফিয়ান এতটা ভীত ও হতাশাগ্রস্ত ছিল যে, তার উটের পা লো যে বাঁধা রয়েছে, সেদিকে তার বিন্দুমাত্র খেয়াল ছিল না।”

তখনও ভোরের আলো ফুটে বের হয় নি; সম্মিলিত আরব বাহিনী এ সময় ঐ স্থান ত্যাগ করে এবং তাদের একটি লোকও সেখানে অবশিষ্ট থাকে নি। ১৩৭

আটত্রিশতম অধ্যায় : পঞ্চম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

ফিতনার সর্বশেষ ঘাঁটি

প্রথম যে বছর মহানবী (সা.) হিজরত করে মদীনায় আসেন সে বছর তিনি মদীনার সকল অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে মদীনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্য একটি জীবন্ত সনদ বা ঘোষণাপত্র তৈরি করেন। আউস ও খায়রাজ গোত্র এবং বিশেষ করে দু'টি ইহুদী গোত্র মদীনার প্রতিরক্ষার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। সকল বৈশিষ্ট্য ও ধারা সমেত এ সনদ সম্মানিত পাঠকবর্গের সামনে ইতোমধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে।^{১৩৮}

অন্যদিকে মহানবী (সা.) মদীনার ইহুদীদের সাথে আরেকটি চুক্তি সম্পাদন করেন। বিভিন্ন ইহুদী গোত্র চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে, তারা যদি মহানবী ও তাঁর সাহাবীগণের ক্ষতি করে বা শত্রুকে অস্ত্র ও বহনকারী পশু দিয়ে সাহায্য করে, তা হলে তাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান, তাদের ধন- সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং তাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করার ব্যাপারে মহানবীর হাত উন্মুক্ত থাকবে।

তবে তিন ইহুদী গোত্রই বিভিন্ন অজুহাতে এ চুক্তি লঙ্ঘন করেছিল। বনী কাইনুকা একজন মুসলমানকে হত্যা করেছিল, আর বনী নাযীর গোত্র মহানবীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তাই মহানবীও তাদেরকে মদীনা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছিলেন এবং তাদেরকে মুসলমানদের এলাকা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। বনী কুরাইযাহ গোত্রও ইসলাম ধর্মের মূলোৎপাতন করার জন্য সম্মিলিত আরব বাহিনীর সাথে (পরিখার যুদ্ধে) সহযোগিতা করেছিল। এখন আমরা দেখব, ইসলামের মহান নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) বনী কুরাইযাহ গোত্রকে কিভাবে শাস্তি করেছেন।

মদীনার আকাশ তখনও ভোরের আলোয় ফর্সা হয় নি, এমন সময় সম্মিলিত আরব বাহিনীর সর্বশেষ দলটি অস্বাভাবিক ধরনের ভীতি সহকারে মদীনা ত্যাগ করে। ক্লাস্তির চিহ্ন তখনও মুসলমানদের চোখে- মুখে বিদ্যমান। এ সত্ত্বেও মহানবী (সা.) মহান আল্লাহর তরফ থেকে বনী কুরাইযার ভাগ্য চূড়ান্ত করার ব্যাপারে আদেশপ্রাপ্ত হন। মুয়াযযিন আযান দেন এবং মুসলমানদের সাথে মহানবী যুহরের নামায পড়েন। এরপর মহানবীর নির্দেশে মুয়াযযিন ঘোষণা করেন : “বনী কুরাইযার মহল্লায় মুসলমানদের আসরের নামায পড়তে হবে।”^{১৩৯}

এরপর মহানবী হযরত আলীর হাতে পতাকা অর্পণ করেন। সাহসী মুসলিম সৈনিকগণ হযরত আলীর পেছনে পেছনে অগ্রযাত্রা শুরু করে বনী কুরাইযার দুর্গ চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলেন। দুর্গের প্রহরীরা মুসলিম সেনাবাহিনীর অগ্রসর হবার সংবাদ দুর্গের ভেতরে পৌঁছে দেয়। আর ইহুদীরা তাৎক্ষণিকভাবে দুর্গের দরজা বন্ধ করে দেয়। মুসলিম বাহিনী সেখানে উপস্থিত হবার মুহূর্ত থেকেই ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। তখন বনী কুরাইযাহ গোত্রের ইহুদীরা দুর্গের ছিদ্র ও টাওয়ার থেকে মহানবীকে অকথ্য ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করছিল। ইহুদীদের অশোভন উক্তি লো মহানবীর কর্ণগোচর না হওয়ার জন্য মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী হযরত আলী (আ.) মদীনার দিকে যাত্রা করলেন, যাতে তিনি মহানবীকে দুর্গের নিকটবর্তী হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেন। কিন্তু মহানবী হযরত আলীকে বললেন : “তাদের চোখ যদি আমার উপর পড়ে, তা হলে তারা গালিগালাজ ও অশোভন উক্তি থেকে বিরত হবে।” মহানবী দুর্গের কাছে গেলেন এবং তাদের লক্ষ্য করে বললেন : هل أخزاكم الله و أنزل عليكم نقمته : “মহান আল্লাহ কি তোমাদের লাঞ্ছিত করেন নি?”

ইহুদীদের উদ্দেশে মহানবীর এ ধরনের কঠোর উক্তির আসলেই কোন নযীর ছিল না। তাঁর আবেগ প্রশমিত করার জন্য তারা তখন বলল : “হে আবুল কাসেম! আপনি তো এতটা কঠোরভাষী ছিলেন না!”

এ কথাটি মহানবীর অনুভূতিকে এতটা নাড়া দিয়েছিল যে, তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে পেছনের দিকে চলে যান এবং তাঁর দেহ থেকে তাঁর লম্বা জামাটি মাটিতে পড়ে যায়।^{১৪০}

দুর্গের অভ্যন্তরে ইহুদীদের পরামর্শ সভার আয়োজন

এ সভায় হুয়াই ইবনে আখতাব নাযীরী উপস্থিত ছিল, যে ছিল পরিখা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলনকারী। সে সম্মিলিত আরব বাহিনী ও দল লোর ছত্রভঙ্গ হয়ে প্রস্থান করার পর খাইবরের দিকে না গিয়ে বনী কুরাইযার দুর্গে প্রবেশ করে।

ইহুদী গোত্রের নেতা নিম্নোক্ত তিনটি প্রস্তাব দেয় এবং তাদেরকে যে কোন একটি গ্রহণ করার আহ্বান জানায় :

১. আমরা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব; কারণ মুহাম্মদের নবুওয়াত একটি অকাট্য বিষয় এবং আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত। আর তাওরাতও তা সত্যায়ন করেছে;
২. আমরা আমাদের নারী ও শিশুদের হত্যা করে দুর্গ থেকে বের হয়ে মুসলমানদের সাথে স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করব। যদি আমরা নিহত হই, তা হলে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আর যদি আমরা এ যুদ্ধে বিজয়ী হই, তা হলে আমরা পুনরায় স্ত্রী ও সন্তান- সন্ততি লাভ করতে পারব;
৩. আজ শনিবারের রাত। মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীরা জানে, ইহুদীরা শনিবার দিন ও রাতে কোন কাজে হাত দেয় না। অতএব, আমরা তাদের এ অমনোযোগিতার সদ্ব্যবহার করে রাতের বেলা তাদের ওপর আক্রমণ চালাব।^{১৪১}

পরামর্শসভা এ তিন প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করে অভিমত ব্যক্ত করে : “আমরা কখনোই আমাদের ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাত থেকে হাত টিয়ে নেব না। আমাদের নারী ও শিশুদের হত্যা করার পর আমাদের কাছে আমাদের জীবন আর সুখের থাকবে না। আর তৃতীয় প্রস্তাবটিও ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবায়নযোগ্য নয়। কারণ এর ফলে যেভাবে আমাদের পূর্বেকার জাতি লো শনিবার দিবসের মর্যাদা এবং অধিকার সংরক্ষণ না করার জন্য মহান আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়েছিল, সেভাবে আমরাও খোদায়ী ক্রোধের শিকার হব।”

পরামর্শ সভার সদস্যদের মানসিকতা জানার জন্য তাদের কথোপকথনই হচ্ছে সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রথম প্রস্তাব নাকচ করার অর্থই হচ্ছে আসলেই এই ইহুদীরা একটি এক'য়ে ও শত্রু

মনোভাবাপন্ন সম্প্রদায় ছিল। কারণ সত্যি যদি তারা মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে অবহিত থাকে, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এক ঐয়েমি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। দ্বিতীয় প্রস্তাব এবং এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছে তা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, এ সম্প্রদায় ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। কারণ তা না হলে তাদের পক্ষে নিরপরাধ শিশু ও নারীদের হত্যা করা সম্ভব নয়। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, পরামর্শসভা এ কারণে এ প্রস্তাব বাতিল করেছিল যে, তাদের শিশু- সন্তান ও নারীদের মৃত্যুর পর জীবন তাদের কাছে আর সুখকর থাকবে না। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে একজনও ঘৃণাকরেও বলে নি : “এসব অসহায় শিশু ও নারী কী অপরাধ করেছে, যেজন্য তাদেরকে আমরা জবাই করব? যদি মুহাম্মদ তাদের ওপর বিজয়ী হয় এবং তাদেরকে নিজ কর্তৃত্বেও নিয়ে যায়, তবুও সে তাদেরকে কখনোই হত্যা করবে না। তাই আমরা (স্নেহময় পিতারা) কিভাবে এ ধরনের কাজে লিপ্ত হতে পারি?”

তৃতীয় প্রস্তাব থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা মহানবীর আধ্যাতিক শক্তি এবং সামরিক কলা-কৌশল ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করে নি; বরং তারা ভেবেছিল যে, ইসলাম ও মুসলমানদের মহান নেতা শনিবার দিন ও রাতে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না। তাও আবার ইহুদীদের মতো শত্রুর ক্ষেত্রে, যারা ছলচাতুরী ও শঠতার জন্য দুর্নাম অর্জন করেছিল।

পরিখার যুদ্ধের ঘটনা পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হয়, এ গোষ্ঠীর মধ্যে সতর্ক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের সংখ্যা অনেক কম ছিল। তা না হলে তারা রাজনৈতিক (প্রজ্ঞার) দৃষ্টিকোণ থেকেও এ দুই গোষ্ঠীর (মুসলমান ও মুশরিক) মধ্য থেকে কোনটির সাথে যোগ না দিয়েই নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারত এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও সম্মিলিত আরব বাহিনীর মধ্যকার যুদ্ধে দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারত। আর এভাবে যে কোন পক্ষ জয়যুক্ত হোক না কেন, সর্বাবস্থায় তাদের অস্তিত্ব ও সম্মান বজায় থাকত।

অথচ তারা দুর্ভাগ্যজনকভাবে হুয়াই ইবনে আখতারের মিষ্টি ভাষা ও চাটুকারিতায় বিপ্লবিত হয়ে সম্মিলিত আরব বাহিনীর সাথে যোগদান করেছিল। তাদের এ দুর্ভাগ্য তীব্র হয়ে পড়ে যখন এক

মাস আরব বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করার পর অবশেষে তাদেরকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকল এবং নুআইম ইবনে মাসউদ কর্তৃক সৃষ্ট পরিস্থিতির কাছে আ সমর্পণ করে কুরাইশদের কাছে বার্তা পাঠাল : যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের বড় বড় ব্যক্তিত্বের মধ্য থেকে কতিপয় ব্যক্তিকে আমাদের কাছে যিম্মী স্বরূপ হস্তান্তর না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমাদের সাথে কখনোই সহযোগিতা করব না।

এসব অবিবেচক ব্যক্তি এ সময় ভীষণভাবে হতাশ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। তারা ভাবতে পারছিল না, এদিকে তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, এখন কুরাইশদের সাথে যদি তারা সম্পর্কচ্ছেদ করে, তা হলে সম্মিলিত আরব বাহিনী শক্তিহীনতা অনুভব করবে এবং তারা যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য হবে। আর এ অবস্থায় সমগ্র বনী কুরাইযাহ গোত্র মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে পড়বে।

তাদের যদি আসলেই সঠিক রাজনৈতিক দূরদর্শিতা থাকত, তা হলে যে মুহূর্তে তারা সম্মিলিত আরব বাহিনী থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছিল, সেই মুহূর্তেই তাৎক্ষণিকভাবে চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে অনুশোচনা প্রকাশ করতে পারত এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে নিজেদের দোষ স্বীকার করত, যার ফলে তারা মুসলমানদের সম্ভাব্য বিজয়ের বিপদ থেকে নিরাপদ থাকত। কিন্তু দুর্ভাগ্য তখন তাদেরকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলেছিল যে, তারা কুরাইশদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েও মুসলমানদের সাথে যোগ দিতে সক্ষম হয় নি।

মহানবী (সা.) সম্মিলিত আরব বাহিনীর প্রস্থান করার পরও বনী কুরাইযাহ গোত্রকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিতে পারেন নি। কারণ উপযুক্ত সময় ও সুযোগ পেলেই সম্মিলিত আরব বাহিনী পর্যাপ্ত অস্ত্র ও রসদপত্র সংগ্রহ করে মদীনা দখল করার পায়তারা করত এবং বনী কুরাইযাহ গোত্র- যারা ইসলাম ধর্মের মূলোৎপাটন করার চাবিকাঠি এবং ঘরের শত্রু বলে গণ্য হতো, - তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে তারা ইসলাম ধর্মের অস্তিত্বকেই পুনরায় হুমকির সম্মুখীন করত। সুতরাং ‘বনী কুরাইযাহ সমস্যা’ র সমাধান এবং তাদের ব্যাপারটা চূড়ান্তভাবে

নিষ্পত্তি করা তখন মুসলমানদের জন্য একটি অতি সংবেদনশীল ও ভাগ্যনির্ধারণী বিষয় বলে গণ্য হয়।

আবু লুবারার বিশ্বাসঘাতকতা

দুর্গ অবরোধের পর বনী কুরাইযাহ গোত্রের ইহুদীরা মহানবী (সা.)- এর কাছে অনুরোধ করেছিল যেন তিনি আবু লুবাবাহ আওমীকে তাদের কাছে প্রেরণ করেন যাতে তারা তাঁর সাথে পরামর্শ করতে পারে। আগে থেকেই বনী কুরাইযার সাথে আবু লুবারার মৈত্রীচুক্তি ছিল। তিনি দুর্গে গেলে ইহুদী নারী ও শিশুরা তাঁকে ঘিরে ধরে কান্নাকাটি ও বিলাপ করতে লাগল এবং বলল : “শতহীন আ সমর্পণ কি আমাদের জন্য কল্যাণকর?”

আবু লুবাবাহ বললেন, “হ্যাঁ।” তবে তিনি হাত দিয়ে গলার দিকে ইঙ্গিত করলেন অর্থাৎ তারা আ সমর্পণ করলে নিহত হবে। তিনি জানতেন, মহানবী (সা.) এ গোষ্ঠীটির অস্তিত্ব আর বরদাশু করবেন না। কারণ তারা তাওহীদী আদর্শ ও দীনের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক হুমকি। যেহেতু আবু লুবাবাহ ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন অর্থাৎ তাদের গোপন পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়েছেন, সেহেতু তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন। তিনি কাঁপতে কাঁপতে অত্যন্ত ফ্যাকাসে চেহারায় ইহুদীদের দুর্গ থেকে বের হয়ে সরাসরি মসজিদে নববীতে চলে গেলেন এবং সেখানে নিজেকে মসজিদের একটি স্তম্ভের সাথে বাঁধলেন। আর তিনি মহান আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন, মহান আল্লাহ যদি তাঁর পাপ ক্ষমা না করেন, তা হলে তিনি মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত এ অবস্থার মধ্যেই থাকবেন।

মুফাসসিরগণ বলেছেন, এ আয়াত আবু লুবারার বিশ্বাসঘাতকতা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

“ হে ঈমানদারগণ! তোমরা সজ্ঞানে মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে এবং যে সব আমানত তোমাদের কাছে আছে, সেসবের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।” (সূরা আনফাল : ২৭)

মহানবী (সা.) আবু লুবারার অবস্থার কথা জানতে পেরে বললেন : “এ কাজ করার আগে সে আমার কাছে এলে আমি তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম এবং মহান

আল্লাহও তাকে ক্ষমা করে দিতেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে না দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে এ অবস্থায় থাকতে হবে।”

যে রশি দিয়ে তিনি নিজেকে স্তম্ভের সাথে বেঁধে রেখেছিলেন, আবু লুবারার স্ত্রী নামায পড়ার সময় গিয়ে তা খুলে দিতেন এবং নামায পড়ার পর আবার তাঁকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখতেন।

এভাবে ছয় দিন গত হয়ে গেল। ভোরের বেলা যখন মহানবী (সা.) উম্মে সালামার হুজরায় অবস্থান করছিলেন, তখন ওহীর ফেরেশতা আবু লুবাবাকে ক্ষমা করে দেয়ার কথা ঘোষণাসম্বলিত নিম্নোক্ত আয়াতসহ আগমন করেন :

(و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إِنَّ الله غفور رَحِيم)

“ তাদের মধ্যকার আরেকটি দল নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা সৎ কর্ম ও অসৎ কর্ম পরস্পর মিশ্রিত করেছে; সম্ভবত আশা করা যায়, মহান আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও চিরদয়ালু।” (সূরা তওবা : ১০২)

উম্মে সালামার দৃষ্টি মহানবী (সা.)-এর উজ্জ্বল মুখমণ্ডলের উপর পড়লো। ঐ সময় মহানবীর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠেছিল। মহানবী (সা.) উম্মে সালামাকে বললেন : “মহান আল্লাহ আবু লুবারার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন; উঠে গিয়ে সুসংবাদ দাও।” উম্মে সালামা মহান আল্লাহ যে আবু লুবাবাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, জনগণকে সে সম্পর্কে সুসংবাদ প্রদান করলে জনতা এ কথা শুনে তাঁর বন্ধন লো খুলে দেয়ার জন্য মসজিদের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু তিনি বললেন : “মহানবী (সা.) এসে আমার বন্ধন খুলে দেবেন।” মহানবী (সা.) ফজরের নামায পড়ার জন্য মসজিদে গমন করলেন এবং তিনি তাঁর বন্ধন লো খুলে দিলেন।^{১৪২}

অবশ্য আবু লুবারার এ লন তাঁর অনুচিত অনুভূতির কারণেই হয়েছিল। বিশ্বাসঘাতক নারী-পুরুষের ক্রন্দন তাঁর থেকে আ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল এবং তিনি মুসলমানদের গোপন পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়েছিলেন। তবে তাঁর ঈমানী শক্তি এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর ভয়-ভীতি এর চেয়েও উন্নত ছিল যা তাঁকে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য এতটা

উদ্ধুদ্ধ করেছিল যে, দ্বিতীয় বারের মতো বিশ্বাঘাতকতা করার চিন্তা তাঁর মনে কখনোই উঁকি দেয়
নি।

পঞ্চম বাহিনীর পরিণতি

একদিন ইহুদী শাস বিন কাইস বনী কুরাইযার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে দুর্গ থেকে বের হয়ে মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয় এবং আবেদন করে, তিনি যেন বনী কুরাইযাকে অন্যান্য ইহুদীর ন্যায় অস্থাবর সম্পত্তি সাথে নিয়ে মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুমতি দেন। মহানবী তার এ প্রস্তাব গ্রহণ না করে বললেন : “বনী কুরাইযার উচিত বিনা শর্তে আ সমর্পণ করা।” শাস তখন তার প্রস্তাব পরিবর্তন করে বলল : “বনী কুরাইযাহ তাদের সমস্ত ধন- সম্পদ মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মদীনা ত্যাগ করতে প্রস্তুত রয়েছে।” কিন্তু মহানবী এবারও তার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না।^{১৪৩}

এখানে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, মহানবী (সা.) কেন বনী কুরাইযাহ গোত্রের প্রতিনিধির প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি? এর কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। তা এজন্য যে, বনী নাযীর গোত্রের মতো এ গোত্র যখন মুসলমানদের নাগালের বাইরে চলে যেত, তখন তারা মুশরিক আরব সামরিক শক্তি লোকে পুনরায় উস্কানি দিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে বড় বড় বিপদ ও হুমকির সম্মুখীন এবং এক বিপুল সংখ্যক লোকের রক্তপাতের কারণ হতে পারত। এ কারণেই মহানবী বনী কুরাইযার প্রেরিত প্রতিনিধির প্রস্তাব মেনে নেন নি। তাই শাস ফিরে গিয়ে বিষয়টা বনী কুরাইযাহ গোত্রের উর্ধ্বতন নেতাদের অবহিত করে।

বনী কুরাইযাহ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, তারা বিনা শর্তে মুসলমানদের কাছে আ সমর্পণ করবে বা কতিপয় ঐতিহাসিকের বর্ণনা মতে, বনী কুরাইযাহ তাদের মিত্র সা’ দ ইবনে মায়ায তাদের ব্যাপারে যে ফয়সালা দেবেন, তা বিনা বাক্যে মেনে নেবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্গের ফটক লো খুলে দেয়া হলে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) একটি বিশেষ সেনাদল নিয়ে দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করে তাদের সবাইকে নিরস্ত্র করলেন এবং তাদেরকে বনী নাজ্জার গোত্রের ঘর- বাড়িতে অন্তরীণ করে রাখা হলো, যাতে তাদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়।

ইসলামী সেনাবাহিনী এর আগে বনী কাইনুকা গোত্রের ইহুদীদের বন্দী করেছিল। কিন্তু খায়রাজ গোত্র, বিশেষ করে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের হস্তক্ষেপের কারণে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং মহানবী (সা.) তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান থেকে বিরত থাকেন। এ কারণেই খায়রাজ গোত্রের সাথে পাল্লা দিয়ে এবার আউস গোত্র বনী কুরাইযার সাথে তাদের পুরনো মিত্রতা থাকার কারণে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার ব্যাপারে মহানবীকে তাকীদ দিতে থাকে। কিন্তু মহানবী তাদের আবেদনের বিরোধিতা করে বললেন : “এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার তোমাদের গোত্রের প্রধান ও নেতা সা’ দ ইবনে মায়াযের ওপর অর্পণ করছি। তিনি এ ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত দেবেন, আমি তা গ্রহণ করব।” তখন উপস্থিত সবাই মহানবীর প্রস্তাব মেনে নিল।

এখানে আকর্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, সা’ দ ইবনে মায়াযের ফয়সালা প্রদানের বিষয়টি বনী কুরাইযার কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। তাই ইবনে হিশাম ও শেখ মুফীদেবর্ণনানুসারে, বনী কুরাইযাহ গোত্রের ইহুদীরা মহানবীকে এ বার্তা পাঠিয়েছিল : نزل علي حكم سعد معاذ “সা’ দ ইবনে মায়ায আমাদের ব্যাপারে যে রায় প্রদান করবেন, আমরা তা মেনে নেব।”^{১৪৪}

হাতে তীর বিদ্ধ হয়ে আহত হবার কারণে ঐ সময় সা’ দ ইবনে মায়ায অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে পারদর্শী ‘ফীদা’ নামের মহিলার সেবা ও তত্ত্বাবধানে তাঁর তাঁবুতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আর মহানবী (সা.) তাঁকে দেখার জন্য কখনো কখনো সেখানে যেতেন। আউস গোত্রের যুবকরা উঠে চলে গেল এবং গোত্রপতিকে বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা সহকারে মহানবীর কাছে নিয়ে আসল। সা’ দ রাসূলের দরবারে হাজির হলে মহানবী (সা.) বললেন : “সবার উচিত আউস গোত্রপ্রধানকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা।” তখন উপস্থিত সবাই সা’ দের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলেন। সা’ দের সাথে যারা এসেছিল তারা তাঁকে মহানবীর কাছে আসার সময় বারবার অনুরোধ করছিল, তিনি যেন বনী কুরাইযার ব্যাপারে দয়া প্রদর্শন করেন এবং মৃত্যুর হাত থেকে তাদের প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু তিনি তাদের এত অনুরোধ সত্ত্বেও ঐ সভায় রায় প্রদান করলেন যে, বনী কুরাইযার যুদ্ধ করতে সক্ষম পুরুষদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

করতে হবে; তাদের ধন- সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন এবং তাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করতে হবে।^{১৪৫}

সা' দ ইবনে মায়াযের দলিল অধ্যয়ন

এতে কোন বিতর্ক নেই যে, বিচারকের আবেগ- অনুভূতি যদি তার বিচার- বুদ্ধি ও বিবেকের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তা হলে সম্পূর্ণ বিচার ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের উ ব হবে; আর এর পরিণতিতে সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে; গোটা সমাজের অস্তিত্বই তখন বিপন্ন হয়ে যাবে। আবেগ- অনুভূতি হচ্ছে কৃত্রিম ক্ষুধার মতো, যা ক্ষতিকর ও অনাকাঙ্ক্ষিত খাদ্য- সামগ্রীকে উপকারী হিসেবে দেখায়। তাই মানুষের বিবেক ও বিচার- বুদ্ধির ওপর এ ধরনের আবেগ- অনুভূতির প্রাধান্য ব্যক্তি ও সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য ক্ষতিকর।

সা' দ ইবনে মায়ায ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু হৃদয় ও আবেগপ্রবণ মানুষ। অন্যদিকে বনী কুরাইযার নারী ও শিশুদের দিকে তাকালে স্বভাবতই যে কারো হৃদয়ে করুণার উদ্বেক হতো। তেমনি বন্দী শিবিরে অবস্থানরত পুরুষদের দিকে তাকালেও হৃদয়ে করুণার উদ্বেক হবার কথা। এ ছাড়া বিচারক যাতে তাদের অপরাধ উপেক্ষা করেন, এ জন্য আউস গোত্রের লোকেরা খুবই পীড়াপীড়ি করছিল। এসব বিষয়ের দাবী ছিল এটাই যে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নিয়োজিত বিচারক সংখ্যা রুদের (মুসলিম জনগণের) স্বার্থের ওপরে একটি সংখ্যাস্বল্প সম্প্রদায়ের (বনী কুরাইযার) স্বার্থকে অগ্রাধিকার প্রদান করে রায় দেবেন এবং বনী কুরাইযার অপরাধীদের কোন না কোনভাবে নির্দোষ ঘোষণা করবেন অথবা অন্তত তাদেরকে শাস্তি দানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নমনীয়তা প্রদর্শন করবেন বা পূর্ববর্তী পরিকল্পনা লোর যে কোন একটি মেনে নেবেন।

কিন্তু বিচারকের যুক্তি, বিবেক- বুদ্ধি এবং মুক্ত ও স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হওয়া, সর্বসাধারণের (মুসলিম জনতার) কল্যাণ ও স্বার্থ বিবেচনা তাঁকে এমন এক দিকে পরিচালিত করল যে, তিনি অবশেষে সে দিকেই ধাবিত হলেন এবং বনী কুরাইযাহ গোত্রের যোদ্ধা পুরুষদের মৃত্যুদণ্ড, তাদের যাবতীয় ধন- সম্পদ জব্দকরণ এবং তাদের নারী ও শিশুদের বন্দী

করার পক্ষে রায় প্রদান করলেন। তিনি নিম্নোক্ত দলিল- প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁর এ ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছিলেন। যথা :

১. বনী কুরাইযাহ গোত্রের ইহুদীরা কিছু দিন আগে মহানবীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে, যদি তারা ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাওহীদী ধর্ম ও আদর্শের শত্রুদের সাহায্য করে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুদের উস্কানী দেয়, তা হলে মুসলমানরা তাদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে।^{১৪৬} বিচারক বললেন :

“আমি যদি এ চুক্তি মোতাবেক বনী কুরাইযার ইহুদীদের শাস্তি দিই, তা হলে আমি ন্যায়বিচার পরিপন্থী কোন রায় প্রদান করি নি।”

২. চুক্তি ভঙ্গকারী গোষ্ঠীটি সম্মিলিত আরব বাহিনীর ছত্রছায়ায় বেশ কিছু কাল মদীনা নগরীতে বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল এবং মুসলমানদের ভীত- সন্ত্রস্ত— করার জন্য তাদের বাড়ি- ঘরে প্রবেশ করতে চেয়েছিল। তবে মহানবী (সা.) যদি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করতেন এবং নগরীর নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য একদল সৈন্যকে মদীনা নগরীর দিকে প্রেরণ না করতেন, তা হলে বনী কুরাইযাহ গোত্রের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতো এবং তারা এ অবস্থায় যুদ্ধ করতে সক্ষম মুসলিম পুরুষদের হত্যা করত, তাদের ধন- সম্পদ জব্দ করত এবং তাদের নারী ও সন্তানদের বন্দী ও দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করত। সা’ দ ইবনে মায়ায ভেবে দেখলেন, তিনি যদি তাদের ব্যাপারে এ ধরনের বিচার করেন, তা হলে তা সত্য ও ন্যায়বিচার পরিপন্থী পদক্ষেপ বলে গণ্য হবে না।

৩. আউস গোত্রপ্রধান সা’ দ ইবনে মায়ায বনী কুরাইযাহ গোত্রের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন এবং তাদের সাথে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। ইহুদীদের দণ্ডবিধি সম্পর্কেও তাঁর জানার সম্ভাবনা ছিল। ইহুদীদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাতের মূল ভাষ্য নিম্নরূপ :

তুমি যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে কোন শহরের দিকে অগ্রসর হলে প্রথমে তাদেরকে শান্তি ও সন্ধির দিকে আহ্বান জানাবে; আর তারা যুদ্ধ বাঁধিয়েই দিলে তাদের নগরী অবরোধ করবে এবং যখনই ঐ

নগরীর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে, তখনই তাদের পুরুষদের হত্যা করবে। তবে নারী, শিশু, পশু এবং যা কিছু ঐ শহরের মধ্যে থাকবে, সে লো গনীমত হিসেবে নিজ অধিকারে আনবে।^{১৪৭}

সম্ভবত সা' দ ইবনে মায়াযের ধারণা ছিল এই যে, তিনি উভয় পক্ষের মনোনীত কাযী (বিচারক) এবং তিনি যদি আগ্রাসনকারীদের তাদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে শাস্তি প্রদান করেন, তা হলে তাঁর এ কাজ ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হবে না।

৪. আমরা মনে করি, এ ধরনের রায় প্রদান করার প্রধান কারণ ছিল সা' দ ইবনে মায়ায নিজ চোখে দেখেছিলেন, মহানবী (সা.) খায়রাজ গোত্রের অনুরোধের ভিত্তিতে বনী কাইনুকা গোত্রের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং তাদের মদীনা নগরী ত্যাগ করাকেই যথেষ্ট মনে করেছিলেন। কিন্তু গোষ্ঠীটি তখনও ইসলামী ভূ-খণ্ড ত্যাগ করে নি, এ অবস্থায় (তাদের গোত্রপতি) কা' ব ইবনে আশরাফ ম া নগরী গিয়ে বদর যুদ্ধে নিহত কুরাইশ ব্যক্তিদের জন্য কুস্তিরাশ্রু ঝারিয়েছিল এবং কুরাইশরা (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে নিশ্চুপ বসে থাকে নি। ফলে উভ্দের যুদ্ধের আ ন জ্বলেছিল এবং ইসলামের সত্তার জন শ্রেষ্ঠ সন্তান এ যুদ্ধে শাহাদাতের শরবত পান করেছিলেন।

ঠিক একইভাবে বনী নায়ীর গোত্রকেও মহানবী (সা.) ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা মহানবীর মহান এ কাজের বিপক্ষে একটি সামরিক জোট গঠন করে আহযাবের যুদ্ধ বাঁধিয়েছিল। যদি মহানবী দক্ষ সমর-কৌশল ও যুদ্ধ পরিচালনা এবং পরিখা খননের পরিকল্পনা প্রণয়ন না করতেন, তা হলে সেই প্রথম দিন লোয়ই তারা ইসলামের অস্তিত্ব মুছে ফেলত এবং পরবর্তী কালে ইসলামের আর কোন নাম-নিশানাই থাকত না এবং এভাবে হাজার হাজার লোক নিহত হতো।

সা' দ ইবনে মায়ায এ সব দিক খুব ভালোভাবে বিবেচনা করেছিলেন। অতীত অভিজ্ঞতাসমূহও তাঁকে আবেগ-অনুভূতির কাছে বশ্যতা স্বীকার এবং একটি অপরাধী সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বন্ধুত্ব ও স্বার্থের অনু লে হাজার হাজার লোকের স্বার্থ বিসর্জন দেয়ার অনুমতি দেয় নি। কারণ সন্দেহাতীতভাবে এ গোষ্ঠীটি ভবিষ্যতে আরো বৃহত্তর জোট গঠন করে ইসলাম ও মুসলমানদের

বিরুদ্ধে পৌত্তলিক আরব বাহিনী ও সামরিক শক্তি লোকে ক্ষেপিয়ে তুলত এবং যুদ্ধ করার জন্য উস্কানি দিত। এভাবে তারা বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ইসলাম ধর্মের কেন্দ্রকেই হুমকি ও বিপদের সম্মুখীন করত। এ কারণেই তিনি এ গোষ্ঠীটির অস্তিত্বকে মুসলিম সমাজের জন্য পুরোপুরি বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন, যদি এ গোষ্ঠীটি মুসলমানদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তা হলে এক মুহূর্তের জন্যও স্থির থাকবে না এবং মুসলমানদের ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন করবে।

যদি এসব কারণ বিদ্যমান না থাকত, তা হলে সা' দ ইবনে মায়াযের জন্য সাধারণ জনতার আশা- আকাঙ্ক্ষা ও দাবী পূরণ করে তাদেরকে সন্তুষ্ট করা রত্ন পেত ও প্রাধান্য লাভ করত। আর একটি জাতি বা গোত্রের প্রধান সবকিছুর চেয়ে তাঁর নিজ গোষ্ঠী বা জনগণের প্রতি সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী। তাই তাদেরকে অসন্তুষ্ট করা বা তাদের প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাখ্যান করা যে কোন গোত্রপ্রধানের জন্য ভয়াবহ ক্ষতি বয়ে আনতে পারে। তবে তিনি এসব আবেদন ও অনুরোধকে হাজার হাজার মুসলমানের কল্যাণ ও স্বার্থের পরিপন্থী বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তাই তিনি নিজ গোত্রের লোকদের অসন্তুষ্ট করে হলেও বিবেক ও যুক্তির বিধানকে উপেক্ষা করতে পারেন নি।

সা' দ ইবনে মায়াযের সূক্ষ্মদর্শিতা এবং সঠিক নীতি অবলম্বন করে ইনসাফপূর্ণ রায় প্রদানের সাক্ষ্য এটাই যে, (সা' দের এ রায় প্রদানের পর) যখন বনী কুরাইযার অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তারা তাদের মনের গোপন কথা লো ফাঁস করে দিচ্ছিল।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় পরিখা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলনকারী হুইয়াই ইবনে আখতাবের দৃষ্টি মহানবী (সা.)- এর উপর পড়লে সে বলেছিল :

أما والله ما لُمت في عداوتك و لكن من يخذل الله يُخذل

“ আমি আপনার সাথে শত্রুতা পোষণ করার জন্য মোটেই অনুতপ্ত নই; তবে মহান আল্লাহ্ যাকে অপদস্থ করেন কেবল সে-ই অপদস্থ হয়।” ১৪৮

এরপর সে বনী কুরাইযার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল : “মহান আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বনী ইসরাইলের লাঞ্ছনা অবশ্যস্বাবী।”

বনী কুরাইযার নারীদের মধ্য থেকে একজনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছিল। কারণ সে যাঁতাকলের পাথর নিক্ষেপ করে একজন মুসলমানকে হত্যা করেছিল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ‘যুবাইর বাতা’ নামের এক ব্যক্তি ‘সাবিত ইবনে কাইস’ নামের এক মুসলমানের সুপারিশে মৃত্যু দণ্ডদেশ থেকে অব্যহতি পেয়েছিল। তার স্ত্রী ও সন্তানরাও বন্দিত্বদশা থেকে মুক্তি পেয়েছিল এবং তার জন্মকৃত ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তার কাছে ফেরত দেয়া হয়েছিল। বনী কুরাইযাহ গোত্রের মধ্য থেকে প্রাপ্ত গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ (খুমস)- যা ইসলাম ধর্মের আর্থিক বিষয়াদি পরিচালনা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট- বের করার পর মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়েছিল। অশ্বারোহী সৈন্যরা তিন ভাগ ও পদাতিক সৈন্যরা এক ভাগ করে গনীমত লাভ করেছিল। মহানবী (সা.) গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ যাইদের হাতে অর্পণ করলেন, যাতে তিনি নাজদে গিয়ে তা বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে ঘোড়া, অস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করেন। আর এভাবে হিজরতের পঞ্চম বর্ষের ১৯ ফিলহজ্জ বনী কুরাইযা সৃষ্ট ফিতনার অবসান হলো। সূরা আহযাবের ২৬-২৭ তম আয়াত বনী কুরাইযার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সা’দ ইবনে মায়ায, যিনি পরিখার যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন, বনী কুরাইযার ঘটনার পর এ ক্ষতজনিত কারণেই শাহাদাত লাভ করেন।^{১৪৯}

উনচল্লিশতম অধ্যায় : ষ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

ইসলামের শত্রুদের ওপর কড়া নজর

পঞ্চম হিজরী শেষ হওয়ার পূর্বেই খন্দক যুদ্ধের সম্মিলিত শত্রুবাহিনী ও বিদ্রোহী বনী কুরাইযাহ গোত্র ব্যাপকভাবে পর্যুদস্ত হলো। ফলে মদীনাসহ মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ মুসলমানদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসলো। ইসলামের নবীন প্রশাসন দৃঢ়তর হলো এবং ইসলামী ভূ-খণ্ডে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হলো। কিন্তু এই শান্ত পরিবেশ স্থায়ীভাবে বজায় রাখার পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। তাই মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতা শত্রুদের ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন বলে মনে করলেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী শক্তি লোকে অক্ষুরেই বিনষ্ট করার জন্য তাঁর অধীন শক্তিকে নিয়োজিত করলেন।

শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তিনি খন্দকের যুদ্ধের পর শত্রুপক্ষের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া বিভিন্ন দল লোর মধ্যে যে লো মুসলমানদের হাতের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ পদক্ষেপ নিলেন। আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধের আন জ্বালানোর পেছনে যে ব্যক্তিটির সরাসরি হাত ছিল, সে হলো হুয়াই ইবনে আখতাব এবং সে ইহুদী গোত্র বনী কুরাইযার সাথে যুদ্ধে নিহত হয়। কিন্তু তার অন্যতম সহযোগী সাল্লাম ইবনে হুকাইক^{১৫০} খাইবরে পালিয়ে গিয়েছিল। সে ইসলামের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর শত্রু বলে গণ্য হতো এবং সবসময় ইসলামের শত্রু দল লোকে নতুন ভাবে সংগঠিত করার প্রচেষ্টায় ছিল। বিশেষত খন্দকের যুদ্ধের জন্য আগত আরবের পৌত্তলিক গোত্র লো যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও সরঞ্জাম হাতে পেলে নতুন করে সম্মিলিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতো।

এ সব বিভিন্ন দিক চিন্তা করে মহানবী (সা.) ইসলাম বিদ্রোহী ক্ষতিকর এ শত্রু নিধনের জন্য খায়রাজ গোত্রের^{১৫১} কয়েকজন সাহসী যুবককে প্রেরণ করলেন। তবে তাদের নির্দেশ দিলেন যেন কোন প্রকারেই তার স্ত্রী ও সন্তানদের ক্ষতি না হয়। খায়রাজ গোত্রের যুবকরা খাইবরে পৌঁছে তার ঘরের নিকটবর্তী সকল ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন যাতে তার চিৎকারের শব্দে তারা সাহায্যে এগিয়ে আসতে না পারে। অতঃপর তার ঘরের দোতলার দরজায় কড়া নাড়লেন।

তার স্ত্রী দরজা খুললে তাঁরা বললেন, খাদ্যশস্য কিনতে এসেছেন, এজন্য সালামকে দরকার। তার স্ত্রী সত্য মনে করে তাদেরকে তার শয়ন কক্ষ দেখিয়ে দিল। সালাম তখন সবে মাত্র শয়্যায় গিয়েছিল। সে কিছু বুঝে উঠার আগেই তারা তার শয়নকক্ষে ত প্রবেশ করলেন এবং ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাকে সেখানে হত্যার মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর ও তাদের শান্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ফিতনার অপসারণ করলেন। অতঃপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে ইহুদীদের দুর্গের বাইরে পের নিকট আ গোপন করলেন।

সালামের স্ত্রীর চিৎকারে প্রতিবেশীরা জেগে উঠলো। তারা ঘর থেকে বের হয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে যুবকদের খুঁজতে লাগল। কিন্তু অনেকক্ষণ খোঁজার পরও তাদের না পেয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। তখন তার মৃত্যু নিশ্চিত কি না তা জানার জন্য ঐ যুবকদের একজন মুখ ঢেকে তার ঘরে সমবেত ইহুদীদের মধ্যে গিয়ে লক্ষ্য করলেন তার স্ত্রী তাদের কাছে ঘটনাটি খুলে বলছে। অতঃপর মৃত স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল : “ইহুদীদের খোদার শপথ! সে মৃত্যুবরণ করেছে।” এ কথা শুনে সেই যুবক নিজ সঙ্গীদের নিকট ফিরে এসে অভিযান সফল হয়েছে বলে জানালেন। তখন তাঁরা রাতের অন্ধকারেই মদীনার দিকে যাত্রা করলেন এবং মদীনায় পৌঁছে সকল ঘটনা বিস্তারিতভাবে রাসূলকে জানালেন।^{১৫২}

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কুরাইশগণের হাবাশার (আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া) দিকে যাত্রা

কুরাইশের কিছুসংখ্যক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক দিন দিন ইসলামের অগ্রযাত্রা লক্ষ্য করে ভীত হয়ে পড়ল। তারা স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য হাবাশার দিকে যাত্রা করল। তারা ভাবল, যদি মুহাম্মদ (সা.) আরব উপদ্বীপের সকল স্থানে তাঁর দখল প্রতিষ্ঠিত করেন, তবে তা তাদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। তাই এ ঘটনা ঘটার পূর্বেই উপায় বের করতে হবে ও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে যেতে হবে। এ জন্য উপযুক্ত স্থান হলো হাবাশা। কুরাইশরা কখনো মুসলমানদের ওপর জয়ী হলে তারা নিজ দেশে ও ঘরে ফিরে যাবে।

এই সুদূরপ্রসারী চিন্তার অন্যতম অংশীদার হলো আমার ইবনুল আস। সেও এ দলের সাথে প্রচুর পরিমাণ উপটোকন নিয়ে হাবাশার উদ্দেশে ম া ত্যাগ করল। যেদিন আমার ইবনুল আস ও কুরাইশগণের কাফেলা আবিসিনিয়ায় পৌঁছে, একই দিন রাসূল (সা.)- এর পত্রবাহক আমার ইবনে উমাইয়্যা দ্বামারীও নাজ্জাশীর নিকট উপস্থিত হন। তিনি হযরত জাফর ইবনে আবী তালিবসহ অন্যান্য মুসলমানের সম্পর্কে করণীয় বিষয়ে রাসূলের পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার ইবনুল আস নাজ্জাশীর দরবারে তার যে বিশেষ মর্যাদা রয়েছে তা বোঝানোর জন্য নিজ সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল: “আমি বিশেষ উপটোকন নিয়ে আবিসিনিয়ার সম্রাটের নিকট যাচ্ছি এবং তাঁকে আহবান জানাবো, তিনি যেন আমাকে মুহাম্মদের এ বিশেষ দূতের শিরচ্ছেদ করার অনুমতি দেন।” অতঃপর সে মনের ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে সম্রাটের দরবারে প্রবেশ করল। সম্রাটকে সম্মান প্রদর্শনের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী দরবারের মাটিতে চুম্বন করে সম্রাটকে সিজদা করল। সম্রাট তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন : “নিজ দেশ হতে আমার জন্য কি কোন উপটোকন নিয়ে এসেছ?”

সে বলল : “জী, হে সম্রাট!” তারপর তার সঙ্গে আনীত উপটোকন সম্রাটের নিকট পেশ করে বলল : “কিছুক্ষণ পূর্বে যে ব্যক্তিটি আপনার দরবার থেকে বের হয়ে গেল, সে এমন এক ব্যক্তির প্রতিনিধি যে আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিদের হত্যা করেছে। তাই আজ অনুমতি দিন আমি তার

শিরচ্ছেদের মাধ্যমে ঐ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করি এবং এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হবে। আমার ইবনুল আসের কথায় নাজ্জাশী এতটা রাগান্বিত হলেন যে, নিজের মুখে এত জোরে আঘাত করলেন যে, তাঁর নাক ফেটে রক্ত বের হওয়ার উপক্রম হলো। অতঃপর তিনি ক্রোধান্বিত অবস্থায় বললেন : “তুমি আমার নিকটে চাও এমন ব্যক্তির প্রতিনিধিকে তোমার হতে সোপর্দ ও হত্যা করি, যার ওপর হযরত মূসার ন্যায় ইলাহী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহর শপথ! তিনি সত্য নবী এবং অচিরেই তাঁর শত্রুদের ওপর বিজয়ী হবেন।” আমার ইবনুল আস তার জবানবন্দীতে বলেছে : “আমি এই কথা শুনে মুহাম্মদের ধর্মের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লাম; কিন্তু নিজ সঙ্গীদের থেকে তা গোপন রাখলাম।” ১৫৩

তিক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হওয়ার জন্য পদক্ষেপ

রাজীর মর্মান্তিক ও তিক্ত ঘটনায় ইসলামের একদল নিবেদিত প্রাণ ধর্মপ্রচারক বনী লাহিয়ান গোত্রের দুই শাখাগোত্র ‘আজাল’ ও ‘কারেহ’ -এর নিষ্ঠুর ও কপট ব্যক্তিদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন এবং তাঁদের দুই ব্যক্তিকে জীবিত অবস্থায় কুরাইশদের কাছে প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত বিক্রী করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে কুরাইশরা তাঁদেরকে নির্যাতন করে হত্যা করে। এ ঘটনাটি মুসলমানদের হৃদয়ে শোকের কালো ছায়া ফেলেছিল। এর পর হতে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে মুসলমানদের সামনের সব প্রতিবন্ধক একে একে দূর করা সম্ভব হয়েছিল। খন্দকের যুদ্ধে শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ ও ইহুদীদের পর্যুদস্ত করার পর ইসলামের মহান নেতা বনী লাহিয়ানকে শাস্তি দানের চিন্তা করলেন যাতে অন্য কোন গোত্র এরূপ অন্যায় কাজে সাহসী না হয় এবং ইসলামের প্রচারকগণের প্রতি অত্যাচার চালাতে না পারে।

তিনি ষষ্ঠ হিজরীর পঞ্চম মাসে মদীনার দায়িত্ব ইবনে উম্মে মাকতুমের হাতে অর্পণ করে নিজ বাহিনী নিয়ে মদীনা হতে বের হলেন। কিন্তু কাউকেই নিজ গন্তব্য সম্পর্কে জানালেন না। কারণ, এতে কুরাইশ বা বনী লাহিয়ান তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। কেউ যাতে বুঝতে না পারে, তাই তিনি উত্তর দিকে সিরিয়ার পথ ধরলেন। দীর্ঘ পথ ঐ দিকে যাত্রার পর তার মোড় ঘুরিয়ে বনী লাহিয়ানের আবাসস্থলের নিকটে পৌঁছলেন। কিন্তু বনী লাহিয়ানের বসতি গারানে পৌঁছার পূর্বেই তারা তাঁর আগমন টের পেয়ে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা মুসলমানদের নাগালের বাইরে আশ্রয় গ্রহণ করলেও এ সামরিক অভিযান তাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করল এবং এ ভীতি সৃষ্টিই তাদের ও অন্যান্যের ওপর কার্যকর প্রভাব ফেলল।

মহানবী (সা.) তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ সফলতায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে একটি সামরিক মহড়া দিলেন। তিনি দুই শ’ সৈন্য নিয়ে গারান থেকে যাত্রা করে মার নিকটবর্তী আসফানে পৌঁছলেন এবং দশ ব্যক্তির একটি টহল দল মার পার্শ্ববর্তী কারাউল গামিমে পাঠালেন। তাঁর এ শক্তি প্রদর্শনের

মহড়া কুরাইশদের অবগতির মধ্যেই ছিল। অতঃপর তিনি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী বলেছেন, মহানবী (সা.) এ সামরিক মহড়া থেকে ফিরে এসে মদীনায় পৌঁছে এই দুআ পড়লেন :

أعوذ بالله من وعشاء السّففر و كآبة المنقلب و سوء المنظر في المال و الأهل

“ হে আল্লাহ! মণের ক্লাস্তি, স্থানান্তরের কষ্ট এবং পরিবার ও সম্পদের অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষয়ক্ষতি হতে আপনার আশ্রয় চাই।” ১৫৪

যি কাবাদের^{১৫৫} যুদ্ধ

মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে আসার কয়েক দিন অতিবাহিত না হতেই উয়াইনা ইবনে হিসান কাজ্জারী নামে এক ব্যক্তি গাতফান গোত্রের কয়েক ব্যক্তির সহায়তায় সিরিয়ার পথের নিকটে অবস্থিত মদীনার মুসলমানদের চারণভূমি ‘গাবা’ য় হামলা চালায়। তারা ঐ চারণভূমির পাহারাদারদের হত্যা করে এবং চারণভূমিতে বিচরণকারী এক পাল উটসহ এর নিকটে বসবাসকারী এক মুসলমান নারীকে বন্দী করে নিয়ে যায়। সালাফ আসলামী নামের এক যুবক মদীনার বাইরে শিকারে গেলে এ দৃশ্য দেখে। সে ‘ত সা’ ল পর্বতের চূড়ায় উঠে মুসলমানদের প্রতি সাহায্যের আহ্বান জানায় ও চিৎকার করে বলতে থাকে : ‘ওয়া সাবাহা’ । এ শব্দটি আরবরা সাহায্য প্রার্থনার জন্য ব্যবহার করে থাকে। অতঃপর সে তার তীর-ধনুক নিয়ে লুণ্ঠনকারীদের ধাওয়া করতে থাকে। সে তাদের উদ্দেশ্যে একের পর এক তীর ছুঁড়ে পালিয়ে যাওয়ার পথে বাধা দিতে থাকে। মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম তার সাহায্যের আহ্বান শুনতে পান। তিনি নিজেও চিৎকার করে সবাইকে আহ্বান জানাতে থাকেন। একদল মুসলমান অশ্ব নিয়ে ত রাসূলের নিকট পৌঁছলে তিনি সালাহ ইবনে যাইদকে তাদের নেতা নিযুক্ত করে লুণ্ঠনকারীদের ধাওয়া করতে বললেন এবং নিজেও প্রস্তুত হয়ে তাদের পেছনে যাত্রা করলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে তীর বিনিময়ে দু’জন মুসলমান এবং শত্রুপক্ষের তিনজন নিহত হলো। অবশেষে অধিকাংশ উট এবং মুসলিম নারীকেও উদ্ধার করা সম্ভব হলো। কিন্তু শত্রুরা গাতফান গোত্রের বসতিতে আশ্রয় নিল। মহানবী (সা.) শত্রুর সন্ধানে যি কাবাদে এক দিন ও এক রাত অবস্থান করলেন। তাঁর সঙ্গীরা অগ্রসর হয়ে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করতে চাইলেও তিনি তা সঠিক মনে করলেন না এবং তাদের নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন।^{১৫৬}

যে নযর^{১৫৭} বৈধ নয়

যে মুসলমান নারী লুটেরাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, তিনি রাসূলের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : “আপনার এ উটটিতে বসিয়ে যখন হামলাকারীরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমি নযর করেছিলাম, যদি শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পাই, তা হলে এ উটটিকে আল্লাহর জন্য কুরবানী

করব।” মহানবী (সা) তার কথায় স্মিত হেসে বললেন : “এ উটের জন্য কীরূপ মন্দ পুরস্কারই নির্ধারণ করেছ! প্রাণীটি তোমাকে বাঁচিয়েছে, আর তুমি কি না তাকে হত্যা করতে চাইছ!” অতঃপর গান্ধীর্যের সাথে বললেন : “যে নযরের মধ্যে আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করা হয় এবং এমন কোন বস্তু নযর করা- যার মালিক নযরকারী নয়, - তা বৈধ নয়। তুমি যে উটের মালিক নও, তার নযর করেছ; অথচ আমি হচ্ছি তার মালিক। তাই তোমার এ নযর পালন করার কোন প্রয়োজন নেই।” ১৫৮

চল্লিশতম অধ্যায় : ষ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

বনী মুস্তালিকের বিদ্রোহীরা

ষষ্ঠ হিজরীতে মুসলমানদের সামরিক শক্তি এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তাদের বিশেষ অংশও মার নিকট মহড়া দিয়ে ফিরে এসেছিল, কেউ তাদের কিছু বলার সাহস পায় নি। অবশ্য মুসলমানদের এই সামরিক শক্তি অর্জনের বিষয়টি মদীনার আশে-পাশের অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর আধিপত্য বিস্তার ও তাদের সম্পদ হস্তগত করার উদ্দেশ্যে ছিল না।

মুশরিকরা মুসলমানদের স্বাধীনতা হরণ না করলে এবং ইসলামের প্রচারকাজে বাধা প্রদান না করলে কখনোই মহানবী (সা.) অস্ত্র ক্রয় এবং সৈন্য প্রেরণ করতেন না। কিন্তু যেহেতু মুসলমানরা এবং তাদের ধর্ম প্রচারক দলের সদস্যরা সব সময়ই শত্রুদের পক্ষ থেকে হুমকির মুখে ছিলেন, সেহেতু ইসলামের মহান নবী বুদ্ধিবৃত্তিক কারণেই (আ রক্ষার স্বার্থে) মুসলমানদের প্রতিরক্ষা শক্তিকে সুসংহত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

ষষ্ঠ হিজরী পর্যন্তই শুধু নয়, রাসূলের শেষ জীবন পর্যন্ত সংঘটিত সকল যুদ্ধই নিম্নলিখিত যে কোন এক কারণে ঘটেছে :

১. মুশরিকদের কাপুরুষোচিত আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে। যেমন : বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ।

২. মুসলমানদের এবং ইসলামের প্রচারক দলের সদস্যদের ওপর নির্যাতন বা তাঁদের হত্যাকারী বিভিন্ন গোষ্ঠী, বা মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভঙ্গের মাধ্যমে ইসলামকে যারা হুমকির মুখে ফেলেছে, এমন গোত্র লোকে দমন করার জন্য। ইহুদীদের তিনটি গোত্র (বনী কাইনুকাহ, বনী নাযির ও বনী কুরাইযাহ) এরূপ চুক্তি ভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক ছিল, যাদের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধ করেছিলেন।

৩. ঐ সকল গোত্র ও দলের বিরুদ্ধে, যারা অস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহের প্রচেষ্টায় রত ছিল এবং এ প্রস্তুতির মাধ্যমে মদীনায় হামলার পায়তারা করছিল। ছোট-খাটো যুদ্ধ লো এ লক্ষ্যেই ঘটেছিল।

বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ

বনী মুস্তালিক খুযাআ গোত্রের একটি উপগোত্র ছিল। তারা ছিল কুরাইশদের প্রতিবেশী। মদীনায় সংবাদ পৌঁছল, বনী মুস্তালিকের নেতা হারিস ইবনে আবি জারার মদীনা অবরোধ করার লক্ষ্যে অস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহের অপতৎপরতা চালাচ্ছে। মহানবী (সা.) সাথে সাথে এ ফিতনার বীজ ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ উদ্দেশ্যে প্রথমে সংবাদ সংগ্রহের জন্য সাহাবী বুরাইদাকে ঐ এলাকায় পাঠালেন। বুরাইদা আগন্তুক হিসেবে ঐ গোত্রপ্রধানের সঙ্গে দেখা করে কৌশলে তথ্য জেনে নিলেন। অতঃপর ত মদীনায় ফিরে এসে প্রতিবেদন পেশ করলেন। মহানবী (সা.) সঙ্গীদের নিয়ে বনী মুস্তালিক গোত্র অভিমুখে যাত্রা করে ‘মুরাইসাহ’ নামক পের নিকট পৌঁছলে দু’দলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলিম যোদ্ধাদের আ ত্যাগী ভূমিকা এবং তাঁদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও দুর্ধর্ষ আক্রমণের যে ভীতি কাফেরদের মধ্যে ছিল, তাতে তারা সহজেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ক্ষণস্থায়ী এ যুদ্ধে দশজন কাফের সেনা নিহত হয় এবং ভুলবশত একজন মুসলিম সেনা নিহত হন। এ যুদ্ধের ফলে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং ঐ গোত্রের নারীরা বন্দী হিসেবে মদীনায় আনীত হয়।^{১৫৯}

এ যুদ্ধের সবচেয়ে শিক্ষণীয় দিকটি যুদ্ধের পর গৃহীত রাসূলের রাজনৈতিক পদক্ষেপ থেকে নেয়া যেতে পারে।

মদীনায় হিজরতের পর প্রথম বারের মতো মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে বিরোধের অগ্নি জ্বলে উঠল। মহানবীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কার্যকর না হলে তাদের মধ্যকার এত দিনের ঐক্য ও সম্প্রীতি কয়েকজন অদূরদর্শী ব্যক্তির প্রবৃত্তির শিকার হয়ে বিনষ্ট হতো।

ঘটনাটি এরূপ : যুদ্ধ শেষের পর মুহাজিরগণের মধ্য থেকে ‘জাহজাহ ইবনে সাঈদ’^{১৬০} এবং আনসারগণের মধ্য থেকে ‘সানান জুহনী’ নামক দু’জন মুসলমানের মধ্যে পানিকে কেন্দ্র করে বিরোধ দেখা দিলে তারা উভয়েই নিজ নিজ গোত্রকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানায়। এ গোত্রভিত্তিক সাহায্যের আহ্বানের পরিণতি এতটা ক্ষতিকর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যে, তারা

মদীনা থেকে দূরে এই স্থানে পরস্পরের রক্তপাত করতে উদ্যত হয়েছিল, যা তাদের উভয়কেই নিশ্চিহ্ন করে দিত। মহানবী (সা.) ঘটনাটি জানতে পেরে ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বললেন : “এই দু’ব্যক্তিকে তাদের অবস্থার ওপর (মন্দ পরিণতির) ছেড়ে দাও। এরূপ সাহায্য কামনা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও দুর্গন্ধযুক্ত। এটি জাহিলী যুগের আহবান। তাদের অন্তর হতে জাহিলী যুগের মন্দ প্রভাব এখনো দূরীভূত হয় নি। এ দুই ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা ও কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত নয়। ইসলাম সকল মুসলমানকে পরস্পরের ভাই বলেছে এবং যে আহবানই পরস্পরকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে, তা মূল্যহীন ‘একত্ববাদে’ পর্যবসিত হবে।” ১৬১

দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য দায়ী মুনাফিক

মহানবী (সা.) এ দ্বন্দ্বের পরম প্রাজ্ঞজনোচিত মোকাবেলা করলেন এবং উভয় দলকে শান্ত ও নিরস্ত করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মদীনার মুনাফিকদের নেতা ছিল। সে ইসলাম ও রাসূলের প্রতি খুবই বিদ্বেষী ছিল এবং গনীমতের লোভে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। সে এ বিরোধের সুযোগে নিজের বিদ্বেষ প্রকাশ করল। তার কিছু সঙ্গী ও সমর্থকদের সামনে বলল : “আমাদের কারণেই তারা আমাদের ওপর চেপে বসেছে। আমরা মদীনার অধিবাসীরা মার মুহাজিরদের নিজ ভূমিতে আশ্রয় দিয়ে তাদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছি। আমরা ঐ প্রবাদের মতো হয়েছি, যাতে বলা হয়েছে : ‘তোমার কুকুরকে খাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট কর, পরে সে তোমাকেই খাবে’

। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্মানিত ও শক্তিশালীরা (মদীনার অধিবাসীরা) দুর্বল ও অসম্মানিতদের (মার মুহাজিরদের) বের করে দেব।”

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের এ কথা ঐ সব লোকের উপর মন্দ প্রভাব ফেলল যাদের মনে তখনও জাহিলী যুগের গোঁড়ামী ও গোত্রপ্রীতি বিরাজ করছিল। ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের স্থায়ী বীজ বপন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

সৌভাগ্যক্রমে সেখানে ইসলামের চেতনায় উজ্জীবিত যুবক যাইদ ইবনে আরকাম বসেছিলেন। এই যুবক ঐ শয়তানী প্ররোচনামূলক কথার কঠোর জবাব দিয়ে বলেন : “তুমিই সেই দুর্বল ও লাঞ্চিত, যার নিজ সম্প্রদায়ের নিকটেও কোন সম্মান নেই। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) মুসলমানদের নিকট সম্মানিত এবং তাদের হৃদয় তাঁর ভালোবাসায় পূর্ণ।”

অতঃপর তিনি ঐ সভা হতে উঠে মুসলিম সেনাপতির তাঁবুর দিকে যাত্রা করলেন। তাঁবুতে প্রবেশ করে মহানবীকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করলেন। রাসূল (সা.) বাহ্যিকতা (সৌজন্য) বজায় রাখার জন্য তিন বার যাইদের কথা প্রত্যাক্ষ্যান করে ইতিবাচক সম্ভাবনার দিকটি বললেন : “তুমি হয় তো ভুল শুনেছ। হয় তো তুমি তার প্রতি ক্ষোভ ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এরূপ বলছ। সে হয় তো তোমাকে ক্ষুদ্র ও বুদ্ধিহীন বলে তিরস্কার

করে, এজন্য। সে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু বলে নি।” যাইদ সব লো সম্ভাবনাই বাদ দিয়ে বললেন : “তার উদ্দেশ্য বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি এবং নিফাকের (কপটতার) বিস্তৃতি ঘটানো।” হযরত উমর মহানবীকে বললেন : “আপনি আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে হত্যার নির্দেশ দিন।” কিন্তু মহানবী (সা.) বললেন : “এ সিদ্ধান্ত সঠিক হবে না। কারণ এতে সবাই বলবে, মুহাম্মদ তার সঙ্গীদের হত্যা করে।” ১৬২

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার কথা যাইদ ইবনে আরকামের মাধ্যমে রাসূলের কানে পৌঁছেছে জানতে পেরে ত তাঁর কাছে গিয়ে আল্লাহর শপথ করে বলল : “আমি কখনোই এরূপ কথা বলি নি।” কেউ কেউ কল্যাণ চিন্তা করে আবদুল্লাহর পক্ষ নিয়ে বললেন : “যাইদ আবদুল্লাহর কথা ভুল শুনেছেন।”

কিন্তু ঘটনাটির এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটল না। কারণ তা ঝড়ের পূর্বে ক্ষণিক নিস্তরঙ্গতার মতো, যার ওপর নির্ভর করা যায় না। তাই ইসলামের মহান কাণ্ডারী সবার মন থেকে বিদ্বেষের ঝড় প্রশমিত করতে ও মুসলমানদের মন থেকে তা সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে পদক্ষেপ নিলেন। এ লক্ষ্যেই দুপুরের তীব্র রোদে বিশ্রাম নেয়ার সময়ে যাত্রার নির্দেশ শুনে আনসারগণের অন্যতম নেতা উসাইদ ইবনে হুযাইর রাসূলের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন : “এই অসময়ে কেন যাত্রার নির্দেশ দিচ্ছেন?” মহানবী (সা.) বললেন : “তুমি আবদুল্লাহর কথা শোন নি? যে আ ন সে জ্বালিয়েছে, তার খবর পাও নি?” উসাইদ আল্লাহর শপথ করে বললেন : “হে আমাদের প্রিয় ও সম্মানিত! শাসন ক্ষমতা আপনার হাতে ন্যস্ত। আপনি চাইলেই তাকে বের করে দিতে পারেন। আপনি সবচেয়ে মান্য ও সম্মানের পাত্র। সে-ই লাঞ্ছিত ও অসম্মানিত। আপনি তাকে ক্ষমা করুন। কারণ, সে এক পরাজিত ব্যক্তি। আপনি মদীনায় হিজরতের পূর্বে আউস ও খায়রাজ গোত্র মতৈক্যে পৌঁছেছিল, তাকে মদীনার শাসক নিযুক্ত করবে। তার জন্য মুকট তৈরি করতে সে সোনা ও হীরা সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু ইসলামের তারকার উদয়ের ফলে তার অবস্থা অসহায় হয়ে পড়ে। সবাই তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই সে আপনাকে বিভেদের কারণ মনে করে।”

রাসূল (সা.) যাত্রার নির্দেশ দিলেন। নামায ও খাদ্য গ্রহণের স্বল্প সময় ব্যতীত চব্বিশ ঘণ্টা সবাই একনাগাড়ে পথ চললেন। দ্বিতীয় দিন আবহাওয়া বেশ গরম ছিল। অবিরত পথ চলার ফলে সবাই শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তখন রাসূল (সা.) থামার নির্দেশ দিলেন। মুসলমানরা এতটা ক্লান্ত ছিলেন যে, যে যেখানে ছিলেন, বাহন থেকে নেমে সেখানেই বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লেন। সবাই গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন। এভাবে তাঁদের মন থেকে সব তিক্ততা দূর হয়ে গেল এবং এ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে রাসূল (সা.) তাঁদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব প্রশমিত করলেন।^{১৬০}

ঈমান ও ভাবাবেগের দোলাচলে এক সৈনিক

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র পবিত্র মনের ইসলামের একজন সৈনিক ছিলেন। ইসলামের মহান শিক্ষায় শিক্ষিত এ যুবক নিজ মুনাফিক পিতার প্রতি সবার থেকে সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরে ভাবলেন মহানবী (সা.) হয় তো তাঁর পিতাকে হত্যার নির্দেশ দেবেন। তাই তিনি মহানবীর সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন : “যদি সিদ্ধান্ত হয়, আমার পিতাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, তা হলে সে দায়িত্ব পালনে আমি রাজী আছি। আমি অনুরোধ করব, এ দায়িত্ব আপনি অন্য কারো ওপর অর্পণ করবেন না। কারণ আমি ভয় পাচ্ছি, যদি আপনি অন্য কাউকে এ দায়িত্ব দেন, আর সে আমার পিতাকে হত্যা করে, তবে হয় তো আমি তা সহ্য করতে পারব না এবং পিতার প্রতি ভালবাসা ও আরবীয় বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে হত্যাকারীকে হত্যা করে ফেলব। এর ফলে আমার হাত একজন মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত হবে এবং নিজের জন্য জাহান্নামের মন্দ পরিণতি ডেকে আনব।”

এই যুবকের কথায় পরিপূর্ণ ও উজ্জীবিত ঈমানের প্রকাশ ঘটেছে। কারণ তিনি মহানবীর কাছে আবেদন জানান নি, তাঁর পিতাকে ক্ষমা করা হোক। কারণ তিনি জানতেন, রাসূল (সা.) যে কাজই করুন না কেন, তা আল্লাহর নির্দেশে করেন। কিন্তু তিনি তাঁর মনে এক আশ্চর্য দ্বিধা অনুভব করলেন। একদিকে আরবীয় চেতনা ও পিতার প্রতি ভালবাসা তাঁকে পিতার হত্যাকারী মুসলমানকে হত্যায় প্ররোচিত করছে, অন্যদিকে হৃদয়ের গভীরে ইসলামী সূষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছে পিতার হত্যা মেনে নিতে। এ দুই চিন্তার

টানাপোড়েনে তিনি এমন পথ বেছে নিলেন যাতে একদিকে ইসলামের কল্যাণও সংরক্ষিত হয়, অন্যদিকে আরেক মুসলমানের পক্ষ থেকে তাঁর পিতার প্রতি ভালোবাসাও আঘাত প্রাপ্ত না হয়। তাই নিজেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এ কাজটি তাঁর জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও আল্লাহর নির্দেশের সামনে আ সর্মপণের ঈমানী দাবীতে সাড়া দেয়ার মানসিক শক্তি তিনি লাভ করতেন। কিন্তু করুণার আধার মহানবী (সা.) তাঁকে জানালেন, এসব কোন সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ করেন নি এবং তার প্রতি তিনি স্বাভাবিক আচরণই করবেন।

এরূপ কথা মহানবীর বিশাল হৃদয়ের পরিচয় বহন করে যা সবাইকে আশ্চর্যান্বিত করেছিল। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঢেউ উঠল। সবাই তাকে এতটা নিন্দা করল যে, মানুষের সামনে সে অসম্মানিত ও লাঞ্চিত হলো। এরপর হতে কেউই তাকে আর পাত্তা দিত না।

মহানবী (সা.) এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের বেশ কিছু শিক্ষণীয় নির্দেশনা দান করলেন যা তাঁর প্রাজ্ঞ ইসলামী রাজনীতিকে প্রকাশিত করেছে। এ ঘটনার পর থেকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আর মাথা উঁচু করে কথা বলার সাহস পায় নি। সকল ক্ষেত্রেই সে প্রতিবাদের সম্মুখীন হয় ও নিন্দার পাত্র হয়ে পড়ে। একদিন মহানবী (সা.) হযরত উমরকে ডেকে বলেন : “যেদিন তুমি তাকে হত্যার পরামর্শ আমাকে দিয়েছিলে, সেদিন তাকে হত্যার নির্দেশ দিলে অনেকেই তার হত্যায় প্রভাবিত হয়ে তার পক্ষ নিত। কিন্তু আজ তারা তার প্রতি এতটা বীতশ্রদ্ধ যে, যদি আমি তাকে হত্যার নির্দেশ দিই, তা হলে তারা কোন আপত্তি ছাড়াই তা কার্যকর করবে।

এক বরকতময় বিয়ে

বিদ্রোহী বনী মুস্তালিক গোত্রপতি হারিস ইবনে জারারের কন্যা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। তাঁর পিতা মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এক পাল উট নিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করল। মদীনার পথে আকীক প্রান্তরে পৌঁছে মুক্তিপণ হিসেবে আনা উট লোর মধ্য হতে দু'টি ভালো উট বেছে নিয়ে নিকটবর্তী পাহাড়ের উপত্যকায় লুকিয়ে রাখল। যখন মদীনায় রাসূলের সামনে উপস্থিত হয়ে বলল : “আমার কন্যার মুক্তিপণ হিসেবে এই উট লো এনেছি” , তখন রাসূল (সা.) বললেন : যে দু'টি উট উপত্যকায় লুকিয়ে রেখে এসেছ, সে লো কোথায়?” হারিস এই গায়েবী খবরে আশ্চর্যান্বিত ও কম্পিত হলো। তার সঙ্গে আসা দু'পুত্রকে ত গিয়ে উট দু'টি আনার নির্দেশ দিল। সব লো উট রাসূলকে দিয়ে কন্যাকে মুক্ত করল। তার কন্যাও এ ঘটনায় মুসলমান হলেন। রাসূল (সা.) তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তাঁর পিতা সম্ভ্রষ্ট চিন্তে বারো শ' দিরহাম মোহরানার বিনিময়ে তাঁকে রাসূলের বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করল। বনী মুস্তালিকের গোত্রপতি হারিসের সঙ্গে রাসূলের আণীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের ফলে বনী মুস্তালিকের এক শ' পরিবার মুক্তি পেল। তাদের সকল বন্দী নারী- পুরুষ মুক্ত হয়ে নিজ গোত্রের নিকট ফিরে গেল। এভাবে এই মহীয়সী নারী নিজ গোত্রের জন্য কল্যাণের কারণ হলেন। সবাই বলতে লাগলো : এ নারীর ন্যায় কেউই তাঁর গোত্রের জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করেন নি।^{১৬৪}

পাপাচারীর মুখোশ উন্মোচিত

বনী মুস্তালিকের ইসলাম গ্রহণ প্রকৃতপক্ষেই আন্তরিক ছিল। কারণ তারা মুসলমানদের হাতে বন্দী থাকা অবস্থায় কোন খারাপ আচরণের সম্মুখীন হয় নি; বরং মুসলমানদের পক্ষ হতে সদাচরণ ও সম্মানই পেয়েছে। অবশেষে বিভিন্ন উসিলায় তারা সমবেতভাবে মুক্তি পেয়ে নিজ গোত্রের নিকট ফিরে যায়। মহানবী (সা.) ওয়ালীদ ইবনে উক্বাকে তাদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। তারা রাসূলের প্রতিনিধির আগমনের সংবাদ শুনে ঘোড়ায় আরোহণ করে তাঁকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসল। ওয়ালীদ তাদেরকে সমবেতভাবে আসতে দেখে (ঐ গোত্রের সঙ্গে পূর্বশত্রুতার কারণে) ভীত হয়ে ত মদীনায় ফিরে আসে এবং রাসূলকে মিথ্যা প্রতিবেদন দেয় যে, তারা তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল ও যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে।

ওয়ালীদের দেয়া খবর মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। তারা বনী মুস্তালিকের কাছে এরূপ আচরণ কখনোই আশা করেন নি। এ সময় বনী মুস্তালিকের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল রাসূলের নিকট এসে বলল : “আমরা তাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এসেছিলাম; সে আমাদের দেখে হঠাৎ করে ত প্রশ্ন করে। আমরা শুনেছি, সে মদীনায় এসে মিথ্যা প্রতিবেদন দিয়েছে।

” এ সময় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সূরা হুজুরাতের ষষ্ঠ আয়াত অবতীর্ণ হয় যা বনী মুস্তালিকের দাবীকে সত্যায়ন করে এবং ওয়ালীদ ইবনে উক্বাকে ফাসেক ও মিথ্যুক বলে অভিহিত করে।

আয়াতে বলা হয় : “হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের জন্য কোন খবর আনে, তোমরা তা যাচাই কর, যাতে তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে এমন কাজ করে না বসো, যার ফলে পরবর্তীতে অনুশোচনাগ্রস্ত হতে হয়।”

একচল্লিশতম অধ্যায় : ষ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

গুরুতর পাপের অভিযোগ

মুনাফিকদের সর্দার ইসলামের যুগেও তার জাহিলী যুগের অন্যায় কাজ অব্যাহত রেখেছিল। সে দাসী ও অন্যান্য নারী ক্রয় করে তাদের দ্বারা অবৈধ দেহ ব্যবসা করাত এবং এভাবে অর্থ উপার্জন করত। ব্যভিচার হারাম ঘোষিত হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও সে তার এ কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের দাসীরা চরম মানসিক কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে রাসূলের নিকট এসে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে : “আমরা নিজেরা পবিত্র থাকতে চাই, কিন্তু সে আমাদের অন্যায় ও অশ্লীল কাজে বাধ্য করে থাকে।” এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে ঐ পাপাচারী ব্যক্তি সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় :

(و لا تُكْرَهُوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنًا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا)

“ তোমাদের ক্রীতদাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনে সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না।” (সূরা নূর : ৩৩)

নারীদের সবচেয়ে রুত্বপূর্ণ পবিত্রতার বিষয় নিয়ে ব্যবসাকারী (এ ব্যক্তি) চেয়েছিল তৎকালীন ইসলামী সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশেষ নারীর^{১৬৫} প্রতি এরূপ অশালীন অপবাদ আরোপ করতে।

ঈমানের সঙ্গে নিফাকের চরম শত্রুতা ও বৈপরীত্য রয়েছে। মুশরিক সকল অবস্থায় শত্রুতা প্রকাশের মাধ্যমে নিজের ক্রোধ ব্যক্ত ও প্রশমিত করে। কিন্তু মুনাফিক যেহেতু ঈমানকে নিজেকে রক্ষার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, তাই নিজের শত্রুতা প্রকাশ করতে পারে না। এ কারণেই তার ভেতরে পুষে রাখা ক্ষোভ হঠাৎ করে বিস্ফোরণের ন্যায় প্রকাশিত হয়। ফলে সে উন্মাদের ন্যায় যাচাই- বাছাই ছাড়াই কথা বলে ও অপবাদ আরোপ করে।

বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার মুহূর্তে সংঘটিত ঘটনার প্রেক্ষাপটে মুনাফিকদের নেতা অপমানিত হয় এবং তার পুত্র তার মদীনায় প্রবেশে বাধাদান করে। পরে মহানবী (সা.)- এর

অনুমতিক্রমে সে মদীনায় প্রবেশ করে। তার কপটতামূলক কাজের ফলে তার অবস্থান মদীনার সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন থেকে এতটা অপমানজনক অবস্থায় নেমে যায় যে, মাতৃভূমিতে প্রবেশের সময় তাকে নিজ পুত্রের বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

এরূপ লাঞ্ছিত ব্যক্তি উন্মাদের মতো যে কোন কাজ করতে পারে। সে অপমান ও লাঞ্ছনাকর জব ছড়ানোর মাধ্যমে চাইবে ইসলামী সমাজের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে।

কোন শত্রু সরাসরি আক্রমণ করতে সক্ষম না হলে সাধারণত এরূপ জব ছড়িয়ে সমাজকে উদ্দিগ্ন করতে চায়, যাতে তারা তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ও রুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে চিন্তার অবকাশ না পায়।

মিথ্যা জব রটানো সৎকর্মশীল, পবিত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্বহানি করার একটি মোক্ষম অস্ত্র। স্বনামধন্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এ নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকারক অস্ত্র ব্যবহার করে তাঁদের আশ-পাশের লোকদের তাদের থেকে সরিয়ে দিতে ও বিচ্ছিন্ন করতে মুনাফিকরা প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে।

পবিত্র এক ব্যক্তি বা নারীর নামে মুনাফিকদের অপবাদ

‘ ইফক’ বা ‘ব্যভিচারের অপবাদ’ আরোপ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ থেকে জানা যায়, মুনাফিকরা, অপরাধী নন এমন এক ব্যক্তি বা নারীর ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেছিল এবং সেই ব্যক্তি বা নারী ইসলামী সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। মুনাফিকরা এ অপবাদের অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে চেয়েছিল ইসলামী সমাজের ক্ষতি করতে এবং তা থেকে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করতে। পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ তাদের ওপর সরাসরি ও ব্যতিক্রমীভাবে কঠোর আঘাত হেনেছে ও তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

কিন্তু ঐ আলোচিত ব্যক্তি বা নারী কে, তা নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসিরের বর্ণনা মতে আলোচিত নারী রাসূল (সা.)- এর স্ত্রী হযরত আয়েশা ছিলেন; অপর একদল মুফাসসির বলেছেন যে, ঐ আলোচিত নারী মারিয়া কিবতী ছিলেন (রাসূলের সন্তান ইবরাহীমের মাতা)। উভয় ক্ষেত্রে বর্ণিত শানে নুযূল প্রসঙ্গে সমস্যা রয়েছে। এখন আমরা ইফকের আয়াত হযরত আয়েশা সম্পর্কে ছিল, এর সপক্ষে বর্ণিত হাদীসসমূহ আলোচনা করব এবং তার বিভিন্ন দিকের সঠিকত্ব যাচাই করব।

প্রথম শানে নুযূল

আহলে সুন্নাতে তাফসীরকারক ও হাদীসবিশারদগণ ইফকের আয়াতসমূহ হযরত আয়েশা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে বলে দাবী করে থাকেন। এর সপক্ষে তাঁরা দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন যার কিছু অংশ মহানবী (সা.)- এর নিষ্পাপত্বের পরিপন্থী। তাই এই হাদীস কোনরূপ যাচাই- বাছাই ছাড়া গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

এখন আমরা এ হাদীসের বর্ণিত যে অংশ রাসূল (সা.)- এর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল, তা উল্লেখ করব। অতঃপর ইফকের আয়াত ও তার অনুবাদ আপনাদের কাছে পেশ করব। সবশেষে বর্ণিত হাদীসের যে অংশ রাসূল (সা.)- এর নিষ্পাপত্ব ও মর্যাদার সাথে সংগতিশীল নয়, তার উল্লেখ করব।

ইফকের শানে নুযূলের হাদীস স্বয়ং হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : “মহানবী (সা.) কোন স্থানে মণের জন্য গেলে লটারীর মাধ্যমে স্ত্রীগণের মধ্য হতে একজনকে সফরসঙ্গী হিসেবে বেছে নিতেন। বনী মুস্তালিকের যুদ্ধে যাত্রার সময় লটারীতে আমার নাম আসলো। এ সফরে তাঁর সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য ঘটেছিল। শত্রুর পরাজয়ের মাধ্যমে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলে আমরা মদীনার দিকে ফিরে আসছিলাম। মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে রাত হয়ে গেলে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করা হলো। বিশ্রামের সময় হঠাৎ করে চারদিক থেকে কয়েক জন আহবান জানাতে লাগল : যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। এখন যাত্রা করব। আমি উটের পিঠের হাওদা^{১৬৬} থেকে নেমে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে দূরবর্তী এক স্থানে গেলাম। যখন হাওদার নিকট ফিরে আসলাম, তখন গলায় হাত দিয়ে দেখলাম, আমার ইয়েমেনী পুঁতির মূল্যবান হারটি কোথায় যেন পড়ে গেছে! আমি তার খোঁজে এদিক-ওদিক গেলাম এবং এজন্য দেবী হয়ে গেল। যখন হার খুঁজে পেয়ে ফিরে এলাম, দেখলাম, সবাই চলে গেছে। আমি হাওদার মধ্যে আছি মনে করে তারা তা উটের পিঠে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। আমি একাকী সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলাম, আর ভাবলাম পরবর্তী কোন স্থানে তারা থামলে আমাকে না পেয়ে ফিরে আসবে।

ঘটনাক্রমে মুসলমানদের একজন সৈনিক তাদের থেকে পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি হলেন সাফওয়ান। সকাল বেলা ঐ স্থান দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে দেখে কাছে এসে আমাকে চিনতে পারলেন। আমাকে কিছু না বলে ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ পড়লেন। এই বলে নিজ উটকে মাটিতে বসালেন যাতে আমি তাতে আরোহণ করতে পারি। অতঃপর উটের দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চললেন। আমরা মুসলমানদের কাফেলার নিকট পৌঁছলাম। যখন মুনাফিকরা, বিশেষত তাদের নেতা এ ঘটনা জানতে পারল, তখন সে জব ছড়াতে লাগল এবং তা বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত হতে লাগল।

পরিস্থিতি এতটা খারাপ হয়ে পড়ল যে, মুসলমানদের কেউ কেউ আমার ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করা শুরু করল। এর কিছুদিন পরই ‘ইফক’ - এর আয়াত অবতীর্ণ হলো এবং আল্লাহ আমাকে মুনাফিকদের মিথ্যা অপবাদ থেকে পবিত্র ঘোষণা করলেন।”

এ বর্ণনা আমরা হাদীস থেকে সংক্ষিপ্ত করে উল্লেখ করেছি। হাদীসের এ অংশ কুরআনের আয়াতের সাথে সংগতিশীল এবং রাসূল (সা.)- এর নিষ্পাপত্বের সাথে অসামঞ্জস্যশীল নয়।

এখন আমরা ‘ইফক’ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ (সূরা নূর : ১১- ১৬) অনুবাদসহ উল্লেখ করব।

(إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم و الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم)

“ যারা অপবাদ রচনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু আসে, যতটুকু সে নাহু করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি।”

(لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم خيراً و قالوا هذا إفك مبين)

“ যখন তোমরা এ কথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীরা কেন নিজেদের সম্পর্কে উত্তম ধারণা করল না এবং বলল না যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ।”

(لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون)

“ তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে নি? অতঃপর যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করে নি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী।”

(و لولا فضل الله عليكم و رحمته في الدنيا و الآخرة لمستكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم)

“ যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যা চর্চা করছিলে, তার জন্য তোমাদের রুতর আযাব স্পর্শ করত।”

(إذ تلقونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم و تحسبونه هيناً و هو عند الله عظيم)

“ যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে; অথচ এটা আল্লাহর কাছে রুতর ব্যাপার ছিল।”

(و لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم)

“ এবং যখন তোমরা এ কথা শুনলে, তখন কেন বললে না : এ বিষয়ে আমাদের কথা বলা উচিত নয়। আল্লাহ পবিত্র ও মহান। এটি তো এক রুতর অপবাদ।”

আয়াতে নির্দেশিত কিছু বিষয়

আয়াতের ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায়, মুনাফিকরা এ অপবাদ দিয়েছিল ও ছড়াচ্ছিল। ইঙ্গিত লো হলো :

১. আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে **وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ** অর্থাৎ ‘তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে’ অর্থাৎ মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।

২. এগারোতম আয়াতে অপবাদ আরোপকারীদের ব্যাপারে **عصبة** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা থেকে বোঝা যায়, তারা একতাবদ্ধ, পরস্পর সহযোগী ও সমচিন্তার অধিকারী একটি দল ছিল অর্থাৎ ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক ছিল। আর মুসলমানদের মধ্যে মুনাফিকরা ছাড়া অন্য কেউ এতটা সুসংগঠিত ছিল না। তাই প্রমাণিত হয়, মুনাফিকরা এ কাজ করেছিল।

৩. ঘটনাটি বনী মুস্তালিক গোত্রের সাথে যুদ্ধের পর ঘটে থাকলে তার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ হতে জানা যায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যেহেতু মদীনায় প্রবেশে বাধা পেয়েছিল, তাই মদীনার বাইরে সে-ই অপেক্ষা করছিল এবং সেই রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীকে সাফওয়ানের সাথে আসতে দেখেছে। তাই মদীনা প্রবেশ করেই সে প্রচার করতে থাকে যে, রাসূলের স্ত্রী বেগানা (স্বামী, পিতা, ভাই ও এরূপ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ) ব্যক্তির সঙ্গে রাত কাটিয়েছেন। তাঁরা উভয়ে নাহ হতে বাঁচতে পারেন নি।

৪. এগারোতম আয়াতে বলা হয়েছে :

(لا تحسبوه شرًا لكم بل هو خير لكم)

“ এ ঘটনাকে তোমাদের নিজেদের জন্য অকল্যাণকর মনে করো না; বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।”

এখন আমাদের দেখতে হবে, একজন মুমিন পুরুষ বা নারীকে ব্যভিচারের ন্যায় অপবাদ আরোপ অমঙ্গল না হয়ে মঙ্গলজনক হতে পারে। এর কারণ এটাই যে, এ ঘটনার ফলে মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে ও তারা সবার সামনে লাঞ্চিত হয়েছে। উপরন্তু মুসলমানরা এ ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় অনেক কিছু শিখেছে।

বর্ণিত হাদীসে অতিরঞ্জিত বিষয়

যে অংশটুকু আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, হাদীসের সে অংশ পবিত্র কুরআনের আয়াতের সঙ্গে সংগতিশীল এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্রতা ও নিষ্পাপত্বেরও পরিপন্থী নয়। কিন্তু সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীস যা অন্যরা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে দু'টি রুত্বপূর্ণ সমস্যা রয়েছে, যা আমরা এখানে উল্লেখ করব :

১. প্রথমত হাদীসের একটি অংশ রাসূল (সা.)-এর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। বুখারী হযরত আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন : আমি সফর থেকে ফিরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। রাসূল (সা.) আমাকে দেখতে এলেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে পূর্বের সেই ভালবাসা ও সহানুভূতি ছিল না। আমি ঘটনাটি সম্পর্কে জানতাম না। ধীরে ধীরে আমার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে আমি কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলে মুনাফিকদের জব সম্পর্কে জানতে পারলাম। ফলে দ্বিতীয় বারের মতো অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমার অসুস্থতা তীব্রতা লাভ করল। রাসূল (সা.)-এর কাছে অনুমতি চাইলাম, পিতৃগৃহে বিশ্রাম নিতে যাব। তিনি অনুমতি দিলে পিতৃগৃহে গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকেরা আমার সম্পর্কে কি বলাবলি করে? তিনি বললেন : যে নারীর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, লোকজন তার পশ্চাতে অনেক কিছুই বলে থাকে।

রাসূল (সা.) এ বিষয়ে উসামা ইবনে যাইদের সাথে পরামর্শ করেন। উসামা আমার পবিত্রতার বিষয়ে সাক্ষ্য দান করেন। রাসূল এ বিষয়ে আলীর পরামর্শ চাইলে তিনি আমার দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করার পরামর্শ দেন। তখন তিনি বলেন : সেই আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমি তাঁর মধ্যে কোন অপবিত্রতার ছাপ দেখি নি।” ১৬৭

বর্ণনার এ অংশ রাসূল (সা.)- এর মর্যাদা ও নিষ্পাপত্বের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ এ অংশ হতে বোঝা যায়, রাসূল (সা.) নিজেও এই জবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। এতে তাঁর আচরণ এতটা পরিবর্তিত হয়েছিল যে, তিনি আয়েশার সঙ্গে ভিন্নরূপ ব্যবহার করতে শুরু করেন। এমনকি বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে সন্দেহ অপনোদনের জন্য পরামর্শও করেন। কোন অপ্রমাণিত অভিযুক্তের সঙ্গে এরূপ আচরণ মহানবী (সা.) তো দূরের কথা, একজন সাধারণ মুমিনের জন্যও শোভনীয় নয়। কারণ কোন মুমিনেরই কোন জবে কান দিয়ে একজন মুসলমানের সাথে আচরণ পরিবর্তন করা উচিত নয়। এমনকি তার মনে সন্দেহের উদ্রেকও হলেও তার আচরণ পরিবর্তিত হওয়া উচিত নয়।

পবিত্র কুরআন সূরা নূরের ১২ ও ১৪তম আয়াতে এ অপপ্রচারে প্রভাবিত লোকদের তীব্র সমালোচনা করে বলেছে : “কেন তারা এ অপবাদের কথা শুনল। তাদের মুমিন পুরুষ ও নারীরা কেন ঐ ব্যক্তি (অভিযুক্তের) সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করল না এবং কেন বলল না যে, এটি স্পষ্ট মিথ্যা; এবং যদি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ইহ ও পরকালে তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমরা যা চর্চা করছিলে, সে কারণে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হতে।”

যদি উল্লিখিত বর্ণনার এ অংশ সঠিক হয়, তবে বলতে হয় স্বয়ং রাসূলও (নাউযুবিল্লাহ) এ শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। অথচ নবুওয়াতের মহান মর্যাদার সঙ্গে নিষ্পাপত্বের বিচ্ছিন্নতা অসম্ভব এবং মহানবী (সা.)- এর নিষ্পাপত্ব তাঁকে কখনোই এরূপ আয়াতের মুখোমুখি হতে অনুমতি দেয় না। তাই রাসূল (সা.)- এর নিষ্পাপত্ব ও মর্যাদার সাথে অসংগতিশীল অংশ থাকার কারণে এ হাদীস সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হবে অথবা যে অংশ তাঁর নিষ্পাপত্বের সাথে সংগতিশীল নয়, সে অংশ বর্জন করে সংগতিশীল অংশ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. ইফকের ঘটনার পূর্বেই সা’ দ ইবনে মায়ায মৃত্যুবরণ করেছিলেন। বুখারী তাঁর ‘সহীহ’ - এ হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত শানে নুযূলে উল্লেখ করেছেন : মহানবী (সা.) আমার দাসী বুরাইরাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর মসজিদের মিম্বারে গিয়ে মুসলমানদের উদ্দেশে বললেন : “আমার স্ত্রীর বিষয়ে আমাকে অসম্ভষ্টকারী লোককে শাস্তি দান থেকে কে আমাকে বিরত রাখতে (অধিকারহীন প্রমাণ

করতে) চায়? অথচ আমি আমার যে স্ত্রীর মধ্যে ভাল বৈ মন্দ দেখি নি এবং ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যার থেকে কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ পাই নি, তাদেরকে অশালীন অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে?” এ সময় সা’ দ ইবনে মায়ায^{১৬৮} দাঁড়িয়ে বললেন : “হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার অধিকার রয়েছে বলে মনে করি। যদি ঐ লোক আউস গোত্রের হয়ে থাকে, তবে আমরা তার শিরচ্ছেদ করব। আর যদি আমাদের ভাই খায়রাজ গোত্রের হয়ে থাকে, তবে তার ক্ষেত্রেও আপনার নির্দেশ পালন করব।”

সা’ দ ইবনে মায়াযের এ কথা খায়রাজ গোত্রপতি সা’ দ ইবনে উবাদার কাছে অসম্মানজনক ঠেকলো। সে দাঁড়িয়ে ক্রোধের সাথে বললো : “আল্লাহর শপথ! তুমি তাকে হত্যার ক্ষমতা রাখ না।”

সা’ দ ইবনে মায়াযের চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনে হুযাইর^{১৬৯} সা’ দ ইবনে উবাদার কথার প্রতিবাদ করে বললেন : “আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে হত্যা করব। তুমি মুনাফিক বলে মুনাফিকের পক্ষপাতিত্ব করছ।” রাসূল (সা.) মিস্বারে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়ই দুই গোত্রের লোকেরা একে অপরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। রাসূলের নির্দেশে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ নিজ স্থানে বসল।^{১৭০} ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩০০ পৃষ্ঠায় সা’ দ ইবনে মায়াযের নাম উল্লেখ করেন নি; কিন্তু সা’ দ ইবনে উবাদার সঙ্গে উসাইদ ইবনে হুযাইরের বাক-বিতণ্ডার কথা উল্লেখ করেছেন।

শানে নুযুলের এ অংশ ঘটনার সঠিক ইতিহাসের সঙ্গে সংগতিশীল নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে সা’ দ ইবনে মায়ায আহযাবের যুদ্ধে রুতর আহত হন এবং বনী কুরাইযার বিষয়ে সিদ্ধান্ত দান ও বিচারকাজ পরিচালনার পরপরই মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনা খন্দকের (আহযাবের) যুদ্ধ ও বনী কুরাইযাহ সম্পর্কিত আলোচনায় বুখারী তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। তাই যে ব্যক্তি বনী কুরাইযার ঘটনার পর মৃত্যুবরণ করেছেন কিভাবে তার পাঁচ মাস পর সংঘটিত ‘ইফক’ - এর ঘটনায় জীবিত হয়ে রাসূলের মিস্বারে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সা’ দ ইবনে উবাদার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে পারেন! ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত

হওয়ার (পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে) পর বনী কুরাইযার ঘটনা ঘটেছে। বনী কুরাইযার সঙ্গে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি পঞ্চম হিজরীর ১৯ যিলহজ্জ ঘটে। সা' দ ইবনে মায়ায এ যুদ্ধের পরপরই রক্তের আঘাতজনিত কারণে ব্যাপক রক্তপাত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।^{১৭১} আর বনী মুস্তালিকের সঙ্গে যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীর শা' বান মাসে ঘটেছিল।

ইফকের ঘটনায় যে বিষয়টি জানা আমাদের জন্য রক্তপূর্ণ, তা হলো, মুনাফিকরা ইসলামী সমাজের একজন বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের ওপর অপবাদ আরোপের মাধ্যমে মুসলমানদের মানসিকভাবে দুর্বল করতে চেয়েছিল।

পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ১১তম আয়াতের **الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ** এ অংশের লক্ষ্য আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল বলে শানে নুযূলে উল্লিখিত হয়েছে অর্থাৎ সে- ই ছিল জব রটনার হোতা।

দ্বিতীয় শানে নুযূল

এ শানে নুযূলে বলা হয়েছে, উপরিউক্ত আয়াতসমূহ রাসূল (সা.)- এর স্ত্রী মারীয়া কিবতীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলের পুত্র ইবরাহীমের ইন্তেকালে রাসূল (সা.) খুবই শোকাহত হন। শোক লক্ষ্য করে তাঁর কোন এক স্ত্রী তাঁকে বলেন : “কেন আপনি শোকাহত হয়েছেন; অথচ সে আপনার সন্তান নয়, বরং ইবনে জারিহের সন্তান।” রাসূল (সা.) তা শোনার পর ইবনে জারিহকে হত্যার জন্য আলী (আ.)- কে নির্দেশ দেন। হযরত আলী তাকে হত্যার জন্য যে বাগানে ইবনে জারিহ কাজ করছিল, মুক্ত তরবারি হাতে সেখানে যান। আলীকে ক্রোধান্বিত দেখে সে দৌড়ে একটি খেজুর গাছে উঠে পড়ে। আলীও তাকে ধরতে গাছে উঠলে গাছ থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে তার পরনের কাপড় খুলে যায়। আলী লক্ষ্য করেন, সে একজন খোজা পুরুষ। তখন তিনি ফিরে এসে রাসূল (সা.)- কে তা জানান।

এ বর্ণনা মুহাদ্দিস বাহরাইনী তাঁর ‘তাফসীরে বুরহান’ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১২৬- ১২৭ পৃষ্ঠায় এবং হুয়াইজী তাঁর ‘তাফসীরে নুরুস সাকালাইন’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৫৮১- ৫৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। ঘটনার বিষয়বস্তু অত্যন্ত দুর্বল ও এর ভিত্তিহীনতার প্রমাণ থাকায় তা আলাদাভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজন মনে করছি না। আমরা এ শানে নুযূলকে এ কারণে গ্রহণ করতে পারি না।

সুতরাং ইফকের ঘটনায় যিনি-ই অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত হয়ে থাকুন না কেন, মূল ঘটনাই আমাদের প্রতিপাদ্য।

বিয়াল্লিশতম অধ্যায় : ষ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

একটি ধর্মীয়- রাজনৈতিক সফর

ষষ্ঠ হিজরী সাল তিব্বত- মিস্র বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে আসছিল। হঠাৎ এক রাতে মহানবী (সা.) একটি সুন্দর স্বপ্নে দেখলেন, মুসলমানরা মসজিদুল হারামে (পবিত্র কাবাঘরের চারদিকে) হজ্জের আনুষ্ঠানিকতাসমূহ পালনে রত। তিনি এ স্বপ্নের কথা তাঁর সাথীগণকে বললেন এবং একে একটি শুভ আলামত মনে করে বললেন, খুব শীঘ্রই মুসলমানরা তাদের মনের আশা পূরণে সক্ষম হবে।^{১৭২}

কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি মুসলমানদের উমরার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং মদীনার আশে- পাশের যে সকল গোত্র তখনও মূর্তিপূজক ছিল, তাদেরও আহবান জানালেন মুসলমানদের সফরসঙ্গী হওয়ার। এ খবর হিজায়ের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল যে, মুসলমানরা যিলকদ মাসে উমরার উদ্দেশ্যে মায় যাচ্ছে।

এই আধ্যাতিক ও ধর্মীয় সফরে আর্থিক ও নৈতিক কল্যাণের দিক ছাড়াও সামাজিক ও রাজনৈতিক কল্যাণের দিকও বিদ্যমান ছিল এবং সমগ্র আরবোপদ্বীপে মুসলমানদের অবস্থানকে সুদৃঢ়করণ ও হিজায়ের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে একত্ববাদী ধর্ম ইসলাম প্রচারের জন্য সহায়ক ছিল।

কারণ হলো :

প্রথমত আরবের মূর্তিপূজক বিভিন্ন গোত্র ভাবত, মহানবী (সা.) তাদের সকল ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার- অনুষ্ঠানের বিরোধী, এমনকি তাদের অন্যতম প্রাচীন আচার হজ্ব ও উমরারও তিনি বিরোধী। এ কারণে রাসূল (সা.) ও তাঁর প্রচারিত ধর্মের প্রতি ভীত ছিল। তাই এমন মুহূর্তে রাসূল (সা.) ও তাঁর সঙ্গীগণের উমরা পালনে যাত্রার ঘোষণায় তাদের ঐ ভীতি ও আশংকা খানিকটা দূর হলো। মুহাম্মদ (সা.) কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারিকভাবে দেখিয়ে দিতে চাইলেন তিনি আল্লাহর ঘরের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও একে কেন্দ্র করে আবর্তিত ধর্মীয় আচার ও অন্যান্য স্মৃতিচিহ্নসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিরোধী তো ননই; বরং এরূপ কর্মকে ফরয মনে করেন এবং আরবদের আদি পিতা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ন্যায় এর সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট। যারা

ইসলামকে তাদের সকল ধর্মীয় ও জাতীয় আচার-অনুষ্ঠানের এক শ' ভাগ বিরোধী মনে করত, মুহাম্মদ (সা.) চেয়েছিলেন ঐ সকল দল ও গোষ্ঠীকে এভাবে আকর্ষণ করতে ও তাদের মন থেকে ভীতি দূর করতে।

দ্বিতীয়ত এভাবে যদি মুসলমানগণ শত-সহস্র আরব মুশরিকের সামনে সফলতার সাথে ও স্বাধীনভাবে মসজিদুল হারামে উমরা পালনে সক্ষম হন, তা হলে তা ইসলামের পক্ষে প্রচারের এক বিরাট সুযোগ এনে দেবে। কারণ এ সময়ে আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুশরিকরা মুসলমানদের খবর তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে নিয়ে যাবে। ফলে যে সকল স্থানে ইসলামের আহ্বান পৌঁছানো মহানবী (সা.)-এর পক্ষে সম্ভব ছিল না বা তাঁর পক্ষে কাউকে প্রচারক হিসেবে পাঠানো সম্ভব হয়ে ওঠে নি, সেখানেও তাঁর বাণী পৌঁছে যাবে। অন্ততপক্ষে এর প্রভাব কার্যকর হবে।

তৃতীয়ত মুহাম্মদ (সা.) যাত্রার পূর্বে মদীনায় অবস্থানকালেই হারাম মাসসমূহের^{১৭৩} কথা স্মরণ করে বলেন : “আমরা শুধুই আল্লাহর ঘর যিয়ারতে যাব।” তাই সফরের সময় বহনের জন্য আরবদের মধ্যে প্রচলিত একটি তরবারি ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র সঙ্গে না নেয়ার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন। এ নির্দেশের ফলে অনেকেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলো। কারণ, আরবের মুশরিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাতো যে, তিনি কোন আরব রীতি মানেন না, তারা দেখল, রাসূল ও অন্যদের মতো এ মাস লোতে যুদ্ধ হারাম মনে করেন ও এই প্রাচীন রীতিকে সমর্থন করেন।

ইসলামের মহান কাণ্ডারী জানতেন, এ পদ্ধতিতে মুসলমানরা সফলতা লাভ করলে তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত একটি লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে। তা ছাড়া জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত এ দল নিজ আশ্রয়-স্বজন, বন্ধু ও সুহৃদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পাবে। আর কুরাইশরা মায় প্রবেশে মুসলমানদের বাধা দিলে সমগ্র আরবোপদ্বীপের গোত্র লোর কাছে অসম্মানিত হবে। কারণ আরবের সাধারণ নিরপেক্ষ গোত্র লোর আগত প্রতিনিধিরা দেখবে আল্লাহর ঘরের উদ্দেশে ফরয হজ্ব করতে আসা একদল নিরস্ত্র হাজীর সঙ্গে কুরাইশরা কিরূপ আচরণ করেছে; অথচ

মসজিদুল হারামের ওপর সকল আরবের অধিকার রয়েছে এবং কুরাইশরা কেবল তার তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে রয়েছে।

এর ফলে মুসলমানদের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটবে এবং কুরাইশদের অবৈধ শক্তি প্রয়োগের বিষয়টি তারা বুঝতে পারবে। ফলে কুরাইশরা ইসলামের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে তাদেরকে সঙ্গী ও চুক্তিবদ্ধ করতে পারবে না। কারণ তারা সহস্র লোকের সামনে মুসলমানদের বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে।

মহানবী (সা.) বিষয়টির বিভিন্ন দিক চিন্তা করে উমরার জন্য যাত্রার নির্দেশ দিলেন। চৌদ্দ হাজার^{১৭৪} হাজার অথবা আঠারো হাজার^{১৭৬}, হজ্জযাত্রী ‘যুল হুলাইফা’ নামক স্থানে ইহরাম বাঁধলেন। তাঁরা কুরবানীর জন্য সত্তরটি উট সঙ্গে নিলেন এবং উট লোকে কোরবানীর জন্য চিহ্নিত করে সবার কাছে নিজেদের সফরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন।

রাসূল (সা.) কয়েকজন সংবাদবাহককে পূর্বেই সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করলেন যাতে কোন শত্রু দেখলে তাঁর কাছে ত সংবাদ পৌঁছান।

‘ আসফান’ থেকে রাসূলের প্রেরিত সংবাদবাহক সংবাদ নিয়ে এলেন :

“ কুরাইশরা আপনাদের আগমন সম্পর্কে জানতে পেরেছে এবং তাদের সৈন্যদের প্রস্তুত করে লাভ ও ওজ্জার^{১৭৭} শপথ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে যে, আপনাকে কোনক্রমেই মায় প্রবেশ করতে দেবে না। কুরাইশের শীর্ষস্থানীয় নেতা ও ব্যক্তির মায় নিকটবর্তী ‘যি তুয়া’ য সমবেত হয়েছে এবং মুসলমানদের অগ্রযাত্রা রোধ করতে তাদের সাহসী যোদ্ধা খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে দু’শ’ সৈন্যসহ আসফানের আট মাইল দূরের ‘কারাউল গামীম’ - এ নিয়োজিত করেছে।^{১৭৮}

তাদের উদ্দেশ্য মুসলমানদের গতিরোধ করা, এমনকি যদি এতে তাদের নিহতও হতে হয়।”

মহানবী (সা.) এ সংবাদ শুনে বললেন : “কুরাইশদের জন্য আফসোস! যুদ্ধ তাদের শেষ করে দিয়েছে। হায়! যদি কুরাইশরা আরবের মূর্তিপূজক গোত্র লোর সঙ্গে আমাকে মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ দিত! সেক্ষেত্রে ঐ গোত্র লো আমার ওপর বিজয়ী হলে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতো, আর আমি তাদের ওপর বিজয়ী হলে হয় তারা ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিত, নতুবা তারা তাদের

বিদ্যমান শক্তি নিয়ে আমার সাথে যুদ্ধ করত। আল্লাহর শপথ! একত্ববাদী এ ধর্মের প্রচারের সর্বা ক প্রচেষ্টা চালাব। হয় এতে আল্লাহ আমাদের বিজয়ী করবেন, নতুবা তাঁর পথে প্রাণ বিসর্জন দেব।” অতঃপর একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শককে ডেকে এমনভাবে কাফেলাকে নিয়ে যেতে বললেন যাতে খালিদের সেনাদলের মুখোমুখি না হতে হয়। আসলাম গোত্রের একজন দিশারী কাফেলা পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি এক দুর্গম উপত্যকা দিয়ে কাফেলাকে অতিক্রম করিয়ে ‘হুদায়বিয়া’ য় পৌঁছলে মহানবী (সা.)- এর উট মাটিতে বসে পড়ল। মহানবী (সা.) বললেন : “এ উট আল্লাহর নির্দেশে এখানে বসে পড়েছে। এখানেই আমাদের করণীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে।” অতঃপর সবাইকে বাহন হতে নেমে তাঁর স্থাপনের নির্দেশ দিলেন।

সময় না গড়াতেই কুরাইশ অশ্বারোহী সেনারা রাসূল (সা.)- এর নতুন পথ সম্পর্কে জানতে পেরে তাঁর অবস্থান গ্রহণের স্থানের কাছে চলে আসে। মহানবী (সা.) যাত্রা স্থগিত না করে অগ্রযাত্রার সিদ্ধান্ত নিলে অবশ্যই কুরাইশ সৈন্যদের রক্ষণবৃহ ভেদ করে যেতে হতো। সেক্ষেত্রে তাদের হত্যা করে রক্তের ওপর দিয়ে পথ অতিক্রম করতে হতো। অথচ সবাই জানত রাসূল (সা.) উমরা ও কাবা ঘর যিয়ারত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসেন নি। তাই এ রকম কিছু ঘটলে মহানবীর ব্যক্তিত্ব ও শান্তিকামী চরিত্রের ভাবমর্যাদার ওপর আঘাত আসত। উপরন্তু আগত ঐ সৈন্যদের হত্যার মাধ্যমেই ঘটনার যবনিকাপাত ঘটতো না। কারণ সাথে সাথেই একের পর এক নতুন সেনাবাহিনী তাঁদের প্রতিরোধের জন্য আসত এবং তা অব্যাহত থাকত। অন্যদিকে মুসলমানরা তরবারি ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র সঙ্গে নেন নি। এ অবস্থায় যুদ্ধ করা কখনোই কল্যাণকর হতো না। তাই আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান বাঞ্ছনীয় ছিল।

এ কারণেই বাহন হতে নামার পর মহানবী (সা.) তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলেন : “যদি আজ কুরাইশরা আমার কাছে এমন কিছু চায় যা তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় করে, তবে আমি অবশ্যই তা দেব এবং সমঝোতার পথকেই বেছে নেব।” ১৭৯

সবাই রাসূল (সা.)- এর কথা শুনলেন এবং শত্রুদের কানেও তা পৌঁছল। তারা রাসূলের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে জানার সিদ্ধান্ত নিল। তাই কয়েকজনকে তাঁর নিকট প্রেরণ করল তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার জন্য।

রাসূল (সা.) সকাশে কুরাইশ প্রতিনিধিদল

কুরাইশরা কয়েক দফায় রাসূলের নিকট বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রেরণ করে তাঁর সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাইল।

সর্বপ্রথম বুদাইল খাযায়ী তার গোত্রের কয়েকজনকে নিয়ে রাসূলের কাছে এল। মহানবী (সা.) তাদের বললেন : “আমি যুদ্ধের জন্য আসি নি; বরং আল্লাহর ঘর যিয়ারতে এসেছি।” প্রতিনিধিদল কুরাইশ নেতাদের নিকট ফিরে গিয়ে প্রকৃত ঘটনা খুলে বলল। কিন্তু কুরাইশরা তাদের কথা সহজে বিশ্বাস করতে পারল না। তাই তারা বলল : “আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে কোন অবস্থায়ই মায় প্রবেশ করতে দেব না, এমনকি যদি সে উমরাও করতে আসে।”

দ্বিতীয় বার কুরাইশদের পক্ষ থেকে ‘মুকরিজ’ নামের এক ব্যক্তি রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করল। সেও কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে বুদাইলের অনুরূপ প্রতিবেদন দিল। কিন্তু কুরাইশরা তাদের দু’জনের কথাই বিশ্বাস করল না। তৃতীয় বার আরবের তীরন্দাজ বাহিনীর নেতা হুলাইস ইবনে আলকামাকে হৃন্দ- সংশয় অবসানের লক্ষ্যে রাসূলের নিকট পাঠালো।^{১৮০} তাকে দূর থেকে দেখেই রাসূল (সা.) মন্তব্য করলেন :

“ এই ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় লাভকারী পবিত্র এক গোত্রের মানুষ। তার সামনে কুরবানীর জন্য আনীত উট লো ছেড়ে দাও যাতে সে বুঝতে পারে আমরা যুদ্ধ করতে আসি নি। উমরা করা ছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।” এই শীর্ণ সত্তরটি উটের উপর হুলাইসের দৃষ্টি পড়লে সে দেখল সে লো খাদ্যাভাবে শুকিয়ে গেছে এবং একে অপরের লোম ছিঁড়ে খাচ্ছে। সে মহানবীর সঙ্গে দেখা না করেই যত ত সম্ভব কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে বলল : “আমরা তোমাদের সাথে এ শর্তে কখনোই চুক্তিবদ্ধ হই নি যে, আল্লাহর ঘরের যিয়ারতকারীদের বাধা দেবে। মুহাম্মদ যিয়ারত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন নি। যে খোদার হাতে আমার জীবন, তাঁর

শপথ! যদি মুহাম্মদকে প্রবেশে বাধা দাও, তা হলে আমি আমার গোত্রের সকল লোক (যাদের অধিকাংশই তীরন্দাজ) নিয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করব।”

হুলাইসের কথায় কুরাইশরা ভীত হলো এবং চিন্তা করে তাকে বলল : “শান্ত হও। আমরা এমন পথ অবলম্বন করব, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও।”

অবশেষে তারা বুদ্ধিমান, সমঝদার ও তাদের কল্যাণকামী উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফীকে মহানবী (সা.)- এর নিকট প্রেরণ করল। সে প্রথমে কুরাইশদের প্রতিনিধি হিসেবে যেতে রাজী হয় নি। কারণ সে লক্ষ্য করেছে, পূর্ববর্তী প্রতিনিধিদের তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে ও তাদের বিশ্বাস না করে মানহানি ঘটিয়েছে। কিন্তু কুরাইশরা তাকে আশ্বস্ত করল এই বলে যে, তাদের নিকট তার বিশেষ সম্মান রয়েছে এবং তাকে তারা বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ দেবে না।

উরওয়া ইবনে মাসউদ রাসূল (সা.)- এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল : “বিভিন্ন দলকে নিজের চারদিকে সমবেত করেছ এ উদ্দেশ্যে যে, নিজ জন্মভূমি (ম) আক্রমণ করবে? কিন্তু জেনে রাখ, কুরাইশরা তাদের সমগ্র শক্তি নিয়ে তোমার মোকাবেলা করবে এবং কোন অবস্থায়ই তোমাকে ম ায় প্রবেশ করতে দেবে না। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি, তোমার চারপাশে সমবেত এরা তোমাকে একা ফেলে পালিয়ে না যায়!”

তার এ কথা বলার সময় হযরত আবু বকর মহানবীর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি উরওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন : “তুমি ভুল করছ। মহানবী (সা.)- এর সঙ্গীরা কখনোই তাঁকে ছেড়ে যাবে না।

” উরওয়া মুসলমানদের মানসিক শক্তি দুর্বল করার জন্য টনৈতিক চাল চালছিল। সে কথা বলার সময় মহানবীকে অসম্মান করার লক্ষ্যে বারবার তাঁর শ্মশ্রুতে হাত দিচ্ছিল। অন্যদিকে মুগীরা ইবনে শু' বা প্রতিবারই তার হাতে আঘাত করে সরিয়ে দিচ্ছিলেন ও বলছিলেন : “সম্মান ও আদব রক্ষা করে আচরণ কর। মহানবীর সাথে বেয়াদবী করো না।” উরওয়া ইবনে মাসউদ রাসূলকে প্রশ্ন করল : “এই ব্যক্তিটি কে?” (সম্ভবত রাসূলের চারদিকে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা মুখ ঢেকে রেখেছিলেন)। মহানবী (সা.) বললেন : “সে তোমার াতুপুত্র শু' বার পুত্র মুগীরা।”

উরওয়া রাগান্বিত হয়ে মুগীরাকে বলল : “হে চালবাজ প্রতারক! আমি গতকাল তোর সম্মান

কিনেছি (রক্ষা করেছি)। তুই ইসলাম গ্রহণের পর সাকীফ গোত্রের তের জনকে হত্যা করেছিস। আমি সাকীফ গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে রক্ষা পেতে সবার রক্তপণ শোধ করেছি।” মহানবী তার কথায় ছেদ টেনে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা দিলেন যেমনটি পূর্ববর্তী প্রতিনিধিদের নিকট দিয়েছিলেন। অতঃপর উরওয়ার এতক্ষণের কথার দাঁতভাঙা জবাব দিতে উঠে ওয়ূ করতে গেলেন। উরওয়া লক্ষ্য করল মহানবীর ওয়ূর পানি মাটিতে পড়ার পূর্বেই কাড়াকাড়ি করে মুসলমানরা তা নিয়ে নিচ্ছেন। উরওয়া সেখান থেকে উঠে কুরাইশদের সমাবেশস্থল ‘যি তুয়া’ র দিকে যাত্রা করল। কুরাইশদের বৈঠকে প্রবেশ করে রাসূলের আসার উদ্দেশ্য ও সাক্ষাতের বিবরণ পেশ করল। অতঃপর বলল : “আমি বড় বড় রাজা- বাদশা দেখেছি। ক্ষমতাবান সম্রাট, যেমন পারস্য ও রোম সম্রাট, আবিসিনিয়ার বাদশাহ, সবাইকে দেখেছি। কিন্তু নিজ অনুসারী ও ভক্তদের মাঝে মুহাম্মদের মতো সম্মানের অধিকারী কাউকে দেখি নি। আমি দেখেছি তাঁর অনুসারীরা তাঁর ওয়ূর পানি মাটিতে পরার পূর্বেই বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তা ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে। যদি তাঁর কোন চুল বা লোমও মাটিতে পড়ে, তারা তা ত্বরিতগতিতে তুলে নিচ্ছে। সুতরাং তার বিপজ্জনক মর্যাদাকর অবস্থান সম্পর্কে কুরাইশদের চিন্তা করা উচিত।” ১৮১

মহানবী (সা.)- এর প্রতিনিধি প্রেরণ

বিশ্ব মুসলিমের নেতা মুহাম্মদ (সা.)- এর সঙ্গে কুরাইশ প্রতিনিধি দল লোর বৈঠক সফলতা লাভ করে নি। তাই স্বাভাবিকভাবে মহানবীর ভাববার সম্ভাবনা ছিল, কুরাইশদের প্রেরিত প্রতিনিধি সঠিকভাবে তথ্য পৌঁছাতে সক্ষম হয় নি বা কেউ কেউ সঠিক তথ্য সেখানে পৌঁছাক, তা চায় নি কিংবা মিথ্যুক বলে অভিযুক্ত হওয়ার ভয়ে স্পষ্টভাবে বক্তব্য উপস্থাপন থেকে বিরত থেকেছে। এদিক চিন্তা করে মহানবী সিদ্ধান্ত নিলেন নিজের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি পৌত্তলিক দলের নেতাদের কাছে প্রেরণ করে তাঁর উদ্দেশ্য যে উমরা করা ছাড়া অন্য কিছু নয়, তা জানিয়ে দেবেন। তিনি খাযায়া গোত্রের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ কাজের জন্য মনোনীত করলেন। তাঁর নাম খিরাশ ইবনে উমাইয়্যা। মহানবী (সা.) তাঁকে একটি উট দিয়ে কুরাইশদের নিকট যেতে বললেন। তিনি কুরাইশদের নিকট গিয়ে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলেন। কিন্তু কুরাইশরা কোন দূতের প্রতি সম্মানজনক আচরণের বিশ্বজনীন নীতি অনুসরণের বিপরীতে তাঁর উটটিকে হত্যা করল ও তাঁকেও হত্যা করতে উদ্যত হলো। কিন্তু তীরন্দাজ আরবরা কুরাইশদের এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করল। এ কাজের মাধ্যমে কুরাইশরা প্রমাণ করল, তারা শান্তি, সন্ধি ও সমঝোতার পথ অবলম্বন করতে রাজী নয়; বরং যুদ্ধ বাঁধানোর চিন্তায় রয়েছে।

এ ঘটনার পরপরই কুরাইশদের প্রশিক্ষিত ৫০ যুবক মুসলমানদের অবস্থানের নিকট মহড়া দেয়ার দায়িত্ব পেল। সে সাথে সুযোগ পেলে মুসলমানদের সম্পদ লুট করে তাঁদের কয়েকজনকে বন্দী করে কুরাইশদের নিকট নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরকে বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদের এ পরিকল্পনা ব্যর্থ তো হলোই; বরং তারা সবাই মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে রাসূলের নিকট আনীত হলো। বন্দী হওয়ার পূর্বে তারা মুসলমানদের উদ্দেশে তীর ও পাথর নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) তাঁর শান্তিকামী মনোভাব প্রমাণ করতে তাদের সবাইকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বুঝিয়ে দিলেন, তিনি যুদ্ধ করতে আসেন নি।^{১৮২}

মহানবী (সা.) দ্বিতীয় বারের মতো প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন। এতকিছু সত্ত্বেও তিনি সন্ধি ও সমঝোতার বিষয়ে নিরাশ হলেন না এবং সংলাপের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করতে এবং কুরাইশ নেতাদের মতের পরিবর্তন ঘটাতে চাইলেন। তিনি এমন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন কুরাইশদের রক্তে যার হাত রঞ্জিত হয় নি। সুতরাং হযরত আলী, যুবাইরসহ ইসলামের যে সব মহাসৈনিক আরব ও কুরাইশদের মহাবীরদের মুখোমুখি হয়ে তাদের অনেককে হত্যা করেছেন, তাঁদেরকে মনোনীত করা সমীচীন মনে করলেন না। এজন্য তিনি সর্বপ্রথম হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের কথা চিন্তা করলেন। কারণ তিনি সেদিন পর্যন্ত কোন কুরাইশের এক ফোঁটা রক্তও ঝরান নি। কিন্তু হযরত উমর এ দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে অজুহাত দেখিয়ে বললেন : “আমি আমার জীবনের বিষয়ে কুরাইশদের হতে শঙ্কিত এবং মায় আমার কোন নিকটীয়ও নেই যে আমার পক্ষাবলম্বন করে আমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচাবে। তাই আমি এমন এক ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করছি, যিনি এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম। তিনি হলেন উসমান ইবনে আফফান। যেহেতু তিনি উমাইয়্যা বংশোদ্ভূত এবং আবু সুফিয়ানের নিকটীয়, সেহেতু তিনি আপনার বাণী কুরাইশদের নিকট পৌঁছানোর অধিক উপযুক্ত।” হযরত উসমান ইবনে আফফান এ কাজের দায়িত্ব পেলেন এবং মায়ার দিকে রওয়ানা হলেন। তিনি পথিমধ্যে আবান ইবনে সাঈদ ইবনে আসের সাক্ষাৎ পেলেন এবং তার আশ্রয়ে মায় প্রবেশ করলেন। আবান প্রতিশ্রুতি দিল, কেউ তাঁর ক্ষতি করবে না এবং সে তাঁকে নিরাপদে কুরাইশদের নিকট নিয়ে যাবে যাতে তিনি রাসূলের বাণী পৌঁছাতে পারেন। কিন্তু কুরাইশরা রাসূলের বাণী শুনে বলল : “আমরা শপথ করেছি মুহাম্মদকে জোরপূর্বক মায় প্রবেশ করতে দেব না। এ শপথের ফলে সংলাপের মাধ্যমে তাকে মায় প্রবেশ করতে দেয়ার পথ রুদ্ধ হয়েছে।” অতঃপর তারা হযরত উসমানকে কাবা ঘর তাওয়াফের অনুমতি দিল। কিন্তু তিনি রাসূলের সম্মানে তা থেকে বিরত থাকলেন। কুরাইশরা আরো যা করল, তা হলো হযরত উসমানকে ফিরে যেতে দিল না। সম্ভবত তারা চাইল তাঁর যাত্রা বিলম্বিত করে কোন উপায় বের করতে।^{১৮০}

বাইয়াতে রিদওয়ান

মহানবী (সা.)- এর প্রেরিত প্রতিনিধির ফিরতে বিলম্ব হওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হলো এবং তাঁরা উদ্দিগ্ন হয়ে পড়লেন। হঠাৎ হযরত উসমানের নিহত হওয়ার সংবাদ মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এবং তাঁরা প্রতিশোধের জন্য গর্জে উঠলেন। মহানবী (সা.) তাদের এই পবিত্র ও উজ্জীবিত চেতনাকে ধারণ ও দৃঢ় করার জন্য তাঁদের উদ্দেশে বললেন: “চূড়ান্ত কিছু না করা পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাব না।” যেহেতু সে মুহূর্তে মুসলমানরা সমূহ বিপদের আশংকা করছিলেন এবং এজন্য তাঁরা যুদ্ধের মনোভাব নিয়ে সমবেত হয়েছিলেন, সেহেতু মহানবী (সা.) সিদ্ধান্ত নিলেন মুসলমানদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুত শপথ নবায়ন করবেন। তাই নতুনভাবে তাঁদেরকে তাঁর সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার লক্ষ্যে একটি গাছের নিচে বসলেন এবং সকল সঙ্গীকে বাইয়াত (প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার জন্য শপথ) নেয়ার জন্য তাঁর হাতে হাত রাখতে আহ্বান জানালেন। তাঁরা রাসূলের হাতে হাত রেখে শপথ করলেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত ইসলামের প্রতিরক্ষায় নিবেদিত থাকবেন। এটিই সেই ঐতিহাসিক ‘বাইয়াতে রিদওয়ান’ , যা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে :

(لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يُبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم و أثنى عليهم فتحاً قريباً)

“ আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন, যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।” (সূরা ফাতহ : ১৮)

বাইয়াত সম্পন্ন হওয়ার পর মুসলমানরা তাঁদের করণীয় সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন। হয় কুরাইশরা তাঁদের আল্লাহর ঘরে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেবে, নতুবা তাঁরা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করবেন। মহানবী (সা.) হযরত উসমানের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। হঠাৎ হযরত উসমান ফিরে এলেন। এটি সন্ধির সবুজ সংকেত দিল। তিনি কুরাইশদের অবস্থান সম্পর্কে রাসূল (সা.)-

কে বললেন : “কুরাইশদের সমস্যা হলো তারা আল্লাহর নামে শপথ করেছে। তাই এ সমস্যার সমাধানের জন্য তাদের প্রতিনিধি আপনার নিকট আসবে।”

রাসূল (সা.)- এর সাথে কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইল ইবনে আমর- এর সাক্ষাৎ

কুরাইশদের পঞ্চম প্রতিনিধি হিসেবে বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে সুহাইল ইবনে আমর রাসূলের নিকট এল যাতে বিশেষ এক চুক্তির মাধ্যমে এ অচলাবস্থার অবসান হয়। সুহাইলকে দেখামাত্রই রাসূল (সা.) বললেন : “সুহাইল কুরাইশদের পক্ষ থেকে আমাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করতে এসেছে।”

সুহাইল এসে মহানবীর সামনে বসল। সে যে বিষয়েই কথা বলছিল, তার মাধ্যমে একজন ঝানু টনীতিকের ন্যায় মহানবীর ভাবাবেগকে উদ্বেলিত করার চেষ্টা করছিল। সে বলল : “হে আবুল কাসেম! ম া আমাদের হারাম (পবিত্র স্থান) এবং আমাদের জন্য সম্মানের বস্তু। আরবের সকল গোত্র জানে, তুমি আমাদের সাথে যুদ্ধ করেছ। তুমি যদি এ অবস্থায় জোরপূর্বক ম ায় প্রবেশ কর, তবে সকল আরব গোত্রই জানবে, আমরা দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়েছি। তখন সকল আরব সম্প্রদায় আমাদের এ ভূমি দখল করার জন্য প্ররোচিত হবে। তোমার সঙ্গে আমাদের যে আ িয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তার কসম দিয়ে বলছি, তোমার এ জন্মভূমি ম ার যে মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে...”

সুহাইল এটুকু বলতেই মহানবী (সা.) তার কথায় ছেদ ঘটিয়ে বললেন : “তুমি কী বলতে চাও?” সে বলল : “কুরাইশ নেতাদের প্রস্তাব হলো : তুমি এ বছর ম ায় প্রবেশ না করে এখান থেকেই মদীনায় ফিরে যাও এবং পরের বছর উমরা করার জন্য এসো। মুসলমানরা আগামী বছর আরবের অন্যান্য গোত্রের ন্যায় হজ্ব করার জন্য কাবা ঘরে আসতে পারবে। তাদের হজ্বের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের শর্ত হলো তারা তিন দিনের বেশি ম ায় অবস্থান করতে পারবে না এবং সঙ্গে একটি তরবারি ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র বহন করতে পারবে না।”

মহানবী (সা.)- এর সঙ্গে সুহাইলের আলোচনার ফলে মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে একটি ব্যাপক ও সার্বিক চুক্তি সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি হলো। কিন্তু চুক্তির শর্ত নির্ধারণ ও ধারা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সে বেশ কঠোরতা অবলম্বন করছিল। কখনো কখনো তার প্রস্তাব এতটা অগ্রহণীয় ছিল

যে, তা সন্ধির সম্ভাবনাই নাকচ করছিল। কিন্তু উভয় পক্ষই সন্ধির পক্ষে থাকায় তা যাতে ছিন্ন না হয়, সে চেষ্টাও ছিল।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক বর্ণনামতে মহানবী (সা.) হযরত আলীকে চুক্তিপত্র লেখার নির্দেশ দেন। প্রথমে তিনি আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)-কে বলেন : লিখ : ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ এবং আলী তা লিখলেন। কিন্তু সুহাইল বলল : “আমি এ বাক্যের সাথে পরিচিত নই। ‘রাহমান’ ও ‘রাহীম’ - কে আমি চিনি না; লিখ : ‘বিসমিকা আল্লাহুমা’ অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ! তোমার নামে’ ।”

মহানবী (সা.) সুহাইলের কথা মেনে নিয়ে অনুরূপ লিখতে বললেন। অতঃপর মহানবী বললেন : “লিখ : এ সন্ধিচুক্তি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ এবং কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইলের মধ্যে সম্পাদিত হচ্ছে।” সুহাইল বলল : “আমরা তোমার রাসূল ও নবী হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করি না। যদি তা স্বীকারই করতাম, তবে তোমার সাথে যুদ্ধ করতাম না। অবশ্যই এ বিশেষণ চুক্তিপত্র থেকে মুছে দিয়ে নিজের নাম ও পিতার নাম লেখ।” রাসূল এ বিষয়টিও মেনে নেবেন ও তাকে ছাড় দেবেন, এ সময় কোন কোন মুসলমান তা চান নি। কিন্তু মহানবী একটি উচ্চতর লক্ষ্য সামনে রেখে- যা আমরা পরে উল্লেখ করব- সুহাইলের দাবী মেনে নিয়ে হযরত আলীকে ‘আল্লাহর রাসূল’ শব্দটি মুছে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী অত্যন্ত সম্মান ও বিনয়ের সাথে বললেন : “হে আল্লাহর নবী! আপনার পবিত্র নামের পাশে নবুওয়াতের স্বীকৃতিকে মুছে ফেলার মতো অসম্মানের কাজ থেকে আমাকে ক্ষমা করুন।” মহানবী হযরত আলীকে বললেন : “ঐ শব্দের ওপর আমার আঙ্গুল রাখ। আমি নিজেই তা মুছে দিই।” আলী তা-ই করলেন এবং রাসূল স্বহস্তে তা মুছে দিলেন।^{১৮৪}

মহানবী (সা.) এ সন্ধিচুক্তি লিখতে যে ব্যাপক ছাড় দেন, বিশ্বের ইতিহাসে তা বিরল। কারণ তিনি প্রবৃত্তির তাড়না ও বৈষয়িক চিন্তার অনুবর্তী ছিলেন না এবং তিনি জানতেন, মহাসত্য কখনো লেখা বা মোছার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয় না। তাই সন্ধির ভিত্তি অটল রাখতে সুহাইলের সকল কঠোর শর্ত সমঝোতামূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে মেনে নিয়েছেন।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

মহানবীর শিক্ষালয়ের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ ছাত্র আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবি তালিবও অনুরূপ ইতিহাসের শিকার হন। এ দৃষ্টিতে রাসূল (সা.)- এর মানস- প্রতিবিশ্বকেও জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই রাসূলের অনুরূপ পর্যায়ে মুখোমুখি হতে হয়েছে। হযরত আলী রাসূলের নাম মুছে ফেলতে অপারগতা প্রকাশ করে ক্ষমা চাইলে তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁর ক্ষেত্রেও যে অনুরূপ ঘটনা ঘটে, তার ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন : “হে আলী! এদের উত্তরসূরিরূপ তোমাকে এরূপ করতে বলবে এবং তুমি তাদের দ্বারা মযলুম হয়ে তা করতে বাধ্য হবে।”^{১৮৫} এ স্মৃতি আলী (আ.)- এর মনে সফফীনের যুদ্ধের পর জাগ্রত হলো যখন আলী (আ.)- এর সরল ও অদূরদর্শী সৈন্যরা ধোঁকায় পড়ে প্রতারিত হয়ে আলীকে সন্ধি করতে বাধ্য করল। যখন আলীর পক্ষে আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাফে সন্ধিপত্রে লিখলেন, *هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين على* ‘আমিরুল মুমিনীন আলী যে বিষয়ে আহবান জানাচ্ছেন’ , তখন মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে নিয়োজিত প্রতিনিধি আমর ইবনে আস ও সিরীয় সৈন্যরা আপত্তি জানিয়ে বলল : “আলী ও আলীর পিতার নাম লিখ। কারণ আমরা যদি তাকে মুমিনদের নেতা মনে করতাম, তবে তার সঙ্গে কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হতাম না।” এ ক্ষেত্রে বাক- বিতণ্ডা চলতে লাগল। হযরত আলী (আ.) চাচ্ছিলেন না এর মাধ্যমে নিজের অদূরদর্শী সৈনিকরা নতুন বাহানা শুরু করুক। উভয় পক্ষ দীর্ঘক্ষণ বিতর্ক করছিল। অবশেষে তাঁর একজন সেনাপতির উপর্যুপরি অনুরোধে ‘আমিরুল মুমিনীন’ শব্দটি মুছে ফেলার অনুমতি দিলেন। অতঃপর বললেন : *الله أكبر سنّة بسنّة* “আল্লাহ্ মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ। একই ধারার পুনরাবৃত্তি ঘটছে।” অতঃপর বললেন : “এটি রাসূল (সা.)- এর অনুসৃত রীতি এবং তাঁরই উদ্ধৃতি।” এরপর হৃদায়বিয়ার স্মৃতিচারণ করলেন।^{১৮৬}

হৃদায়বিয়ার সন্ধি- শর্ত

এখন আমরা মহানবী (সা.) ও কুরাইশদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির বিভিন্ন শর্ত উল্লেখ করব :

১. কুরাইশ ও মুসলমানরা সমগ্র আরব ভূ-খণ্ডে সামাজিক নিরাপত্তা ও শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে এ মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছে যে, দশ বছর একে অপরের সাথে যুদ্ধ করবে না ও পরস্পরের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ হতে বিরত থাকবে।

২. যদি কুরাইশদের কেউ তাদের অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়া মায় থেকে পলায়ন করে ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়, মুহাম্মদ অবশ্যই তাকে কুরাইশদের নিকট ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু যদি কোন মুসলমান মদীনা থেকে মায় পালিয়ে আসে, কুরাইশরা তাকে মুসলমানদের নিকট ফিরিয়ে দিতে বাধ্য নয়।

৩. মুসলমান ও কুরাইশরা স্বাধীনভাবে যে কোন গোত্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবেন।

৪. মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীগণ এ বছর এখান থেকেই মদীনায় ফিরে যাবেন। কিন্তু পরবর্তী বছর লোয় স্বাধীনভাবে মায় গিয়ে হজ্ব বা উমরা পালন করতে পারবেন। তবে শর্ত হলো এই যে, তিন দিনের বেশি মায় অবস্থান করতে পারবেন না ও সঙ্গে সাধারণত একজন মুসাফির যাত্রী যে ধরনের তরবারি বহন করে, তা ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র বহন করতে পারবেন না।^{১৮৭}

৫. মায় মুসলমানরা এ চুক্তির অধীনে মায় স্বাধীনভাবে ইসলামী বিধান পালন করতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে কুরাইশরা তাদের বাধা দিতে পারবে না। তাঁদের ধর্মান্তরিত করা ও মুসলমান হওয়ার কারণে তিরস্কার করতে পারবে না।^{১৮৮}

৬. চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় একে অপরের ধন-সম্পদ সম্মানিত মনে করবেন এবং বিদ্বেষমূলক দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখতে ও প্রতারণা করতে পারবেন না।^{১৮৯}

৭. যে সকল মুসলমান মদীনা থেকে মায় আসবেন, তাঁদের জীবন ও ধন-সম্পদের প্রতি সম্মান ও নিরাপত্তা দেয়া হবে।^{১৯০}

হৃদয়বিয়ার এ শর্ত লো আমরা বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছি যার সূচী আমরা নিয়ে প্রদান করছি। চুক্তিপত্র দু’টি ভিন্ন পত্রে লিখিত হয়। অতঃপর কয়েকজন কুরাইশ ও মুসলিম প্রতিনিধি সাক্ষী হিসেবে তাতে স্বাক্ষর করেন। পরে তার একটি অনুলিপি মহানবী (সা.)- কে এবং অন্যটি সুহাইলকে দেয়া হয়।

স্বাধীনতার বাণী

এ চুক্তিপত্রের পর্বে পর্বে স্বাধীনতা ও মুক্তির বাণী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যার অনুরণন প্রতিটি নিরপেক্ষ বিবেকবান ব্যক্তির কানেই পশবে। কিন্তু সবচেয়ে স্পর্শকাতর হলো দ্বিতীয় শর্ত যা অনেককেই ক্রোধান্বিত করেছিল। রাসূল (সা.)- এর কোন কোন সঙ্গী এ বৈষম্যমূলক শর্তে চরম অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং এমন কিছু কথা বলেছিলেন, যা ইসলামের নবী ও মহান নেতার প্রতি দৃষ্টিকটু ও সমালোচনামূলক। অথচ চুক্তিপত্রের এ ধারাটি উজ্জ্বল এক শিখার ন্যায় আজো প্রজ্বলিত রয়েছে। এতে ইসলামের প্রসার ও বিস্তারের পদ্ধতিতে মহানবী (সা.)- এর উন্নত চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে এবং স্বাধীনতা ও মুক্তির মৌলনীতির প্রতি ইসলামের মহান নেতার অনির্বচনীয় সম্মানের প্রকাশ পেয়েছে।

কোন কোন সাহাবীর এ আপত্তির (‘কেন আমরা মুসলমানদের ফিরিয়ে দেব, অথচ তারা আমাদের থেকে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য নয়’) জবাবে বলেন : “যে মুসলমান ইসলামের পতাকার নিচ থেকে শিরকের দিকে পালিয়ে যায় এবং তাওহীদবাদী ইসলামের পবিত্র পরিবেশের ওপর মানবতার পরিপন্থী শিরকমিশ্রিত পরিবেশকে অগ্রাধিকার দেয়, সুস্পষ্ট যে, তার ঈমান সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং সে মন থেকে ইসলামকে গ্রহণ করে নি। এরূপ কোন মুসলমান আমাদের কোন কল্যাণে আসবে না। অন্যদিকে আমরা যদি আমাদের নিকট আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তিকে কাফেরদের নিকট ফিরিয়ে দিই, তা হলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ তার মুক্তির পথ করে দেবেন।” ১১১

মহানবী (সা.)- এর দৃষ্টিভঙ্গি বুদ্ধিবৃত্তিক ও যুক্তিসম্মত ছিল। সময়ের পরিক্রমায় তাঁর গৃহীত ভূমিকার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। কারণ সময় না গড়াতেই কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধারাটির

মন্দ প্রভাব কুরাইশদের ওপর পড়ল। ফলে তারা নিজেরাই এ ধারা বাতিলের আহ্বান জানালো। আমরা পরবর্তীতে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

হুদায়বিয়ার সন্ধির এই ধারা কোন কোন উদ্দেশ্যপ্রবণ ও পক্ষপাতদুষ্ট প্রাচ্যবিদের জন্য দাঁতভাঙ্গা জবাব। কারণ তাঁরা ইসলামের বিস্তার ও অগ্রযাত্রার মূল কারণ ‘অস্ত্র’ বলে মনে করেন এবং বলে থাকেন, ইসলাম অস্ত্রের মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে। ইসলাম তার বিষয়বস্তুর গভীরতা ও আকর্ষণ ক্ষমতার কারণে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পৃথিবীর বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার যে গৌরব লাভ করেছিল, তা সহ্য করতে না পেরে তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইসলাম সম্পর্কে অন্যদের দ্বিধাস্থিত করতে ইসলামের অগ্রযাত্রার কারণ মুসলমানদের পেশীশক্তি বলে উল্লেখ করে থাকেন। অথচ যে সন্ধিচুক্তিটি ইসলামের মহান নেতা আরব উপদ্বীপের শত-সহস্র (রূপক অর্থে) ব্যক্তির সামনে স্বাক্ষর করেছিলেন, তাতে ইসলামের মহান শিক্ষা ও আকর্ষণীয় রূপ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তদুপরি যদি কেউ বলে, ইসলাম মুসলমানদের তরবারির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে, তবে সে বাস্তবদর্শী ও সত্যনিষ্ঠ নয়।

খাযাআ গোত্র হুদায়বিয়া সন্ধির তৃতীয় ধারার অধীনে মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো। তাদের চিরশত্রু বনী কিনানাহ্ কুরাইশদের সাথে মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর করলো।

সন্ধিচুক্তি বলবৎ রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা

সন্ধির পটভূমি ও এর শর্তসমূহ হতে সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই উল্লিখিত শর্ত চাপিয়ে দেয়ার শামিল ছিল ও তা অনেকটা আরোপিত বলে গণ্য। মহানবী (সা.) যে চুক্তিপত্র থেকে ‘আল্লাহর রাসূল’ বিশেষণ বাদ দিয়েছিলেন এবং জাহিলী যুগের ন্যায় পত্রের প্রথমে ‘বিসমিকা আল্লাহুমা’ লিখতে রাজী হয়েছিলেন- এ সবই আরব ভূ-খণ্ডে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে করেছেন। তিনি কুরাইশ কোন মুসলমান মদীনায় আশ্রয় নিলে তাকে মুশরিকদের কাছে ফেরত দেয়ার শর্তটিও সুহাইলের এক াঁয়ে মনোভাবের ফলে মেনে নেন। যদি তিনি মদীনায় আশ্রয়প্রার্থী কুরাইশ মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার চিন্তা করতেন এবং সন্ধির বৈষম্যমূলক শর্তটি না মানার জন্য তাঁর সঙ্গীদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করে সুহাইলের প্রস্তাব না মানতেন, তবে সংলাপের পথ বন্ধ হয়ে যেত এবং সন্ধিচুক্তিও সম্পাদিত হতো না। ফলে আল্লাহর এক বড় নিয়ামতস্বরূপ এ সন্ধির চোখ ধাঁধানো সাফল্য হতে মুসলমানরা বঞ্চিত হতো। মহান এক লক্ষ্যের চিন্তা করে মহানবী (সা.) সব ধরনের চাপ সহ্য করেছেন। কারণ ঐ মহান লক্ষ্যের তুলনায় এ প্রতি লতা কিছুই নয়। যদি রাসূল মুসলমানদের ঐ অংশের স্বার্থ রক্ষার চিন্তা করতেন ও সাধারণ মুসলমানদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করতেন, তবে সুহাইল তার এক াঁয়ে চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়ে যুদ্ধ বাঁধানোর পরিবেশ সৃষ্টি করত। নিম্নোক্ত ঘটনাটি এর সপক্ষে একটি সুস্পষ্ট দলিল :

সন্ধির শর্তসমূহ সম্পর্কে আলোচনা শেষে উভয় পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে হযরত আলী (আ.) চুক্তিপত্র লিখছিলেন, এমন সময় সুহাইলের পুত্র আবু জান্দাল শিকলবদ্ধ অবস্থায় সভাস্থলে উপস্থিত হলেন। সবাই তাঁর আগমনে হতভম্ব হলেন। কারণ তিনি তাঁর পিতার কারাগারে শিকলবদ্ধ অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছিলেন, তা কারো জানা ছিল না। তিনি একজন নিরপরাধ বন্দী ছিলেন- যাঁর একমাত্র অপরাধ তিনি তাওহীদবাদী ধর্ম ইসলামকে মেনে নিয়েছিলেন ও মহানবী (সা.)-এর অন্যতম ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি কোনভাবে খবর পেয়েছিলেন

যে, মুসলমানরা হৃদয়বিয়ায় অবস্থান করছে। তাই কৌশলে কারাগার থেকে পালিয়ে ভিন্নপথে বন্ধুর পথ পেরিয়ে মুসলমানদের নিকট পৌঁছান।

সুহাইল তার পুত্রকে দেখামাত্র এতটা ক্রোধান্বিত হলো যে, তাঁর মুখে জোরে চপেটাঘাত করল। অতঃপর রাসূল (সা.)- এর দিকে তাকিয়ে বলল : “সন্ধির দ্বিতীয় ধারা অনুযায়ী এরূপ প্রথম ব্যক্তি হিসেবে একে মায় ফিরিয়ে দাও অর্থাৎ আমাদের থেকে পলাতক ব্যক্তিকে আমাদের হাতে সোপর্দ কর।” নিঃসন্দেহে সুহাইলের দাবী সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক ছিল। কারণ তখনও চুক্তি কাগজে- কলমে লিপিবদ্ধ হয় নি এবং উভয় পক্ষ তাতে স্বাক্ষরও করেন নি। যে চুক্তিনামা তখনও চূড়ান্ত হয় নি, কিভাবে তা এক পক্ষের দাবীর সপক্ষে দলিল হতে পারে? এ কারণে মহানবী (সা.) বললেন : “এখনও চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় নি।” সুহাইল বলল : “সেক্ষেত্রে আমি পুরো চুক্তিটিই অস্বীকার ও বাতিল ঘোষণা করব।” সুহাইল এতটা বাড়াবাড়ি করছিল যে, কুরাইশদের অন্য দুই প্রতিনিধি মুকরেজ ও হুয়াইতাব ক্রোধান্বিত হয়ে ত উঠে আবু জান্দালকে তার পিতার হাত থেকে নিয়ে রাসূল (সা.)- এর হাতে দিয়ে বলল : “আবু জান্দাল তোমার আশ্রয়ে থাকুক।” তারা এভাবে বিতর্কের অবসান ঘটাতে চেয়েছিল। কিন্তু সুহাইল তার এক ঐয়মী অব্যাহত রেখে বলল : “চুক্তির সংলাপ শেষ হয়ে গেছে।” অবশেষে মহানবী (সা.) বাধ্য হয়ে ইসলামের প্রসারের জন্য সুবর্ণ সুযোগদানকারী এ সন্ধিচুক্তিটি রক্ষার শেষ প্রচেষ্টা হাতে নিলেন। তিনি আবু জান্দালকে তাঁর পিতার হাতে সমর্পণের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে নির্যাতিত বন্দীকে সানাদানের জন্য বললেন : “আবু জান্দাল! তুমি ধৈর্য অবলম্বন কর। আমরা চেয়েছিলাম তোমার পিতা স্নেহ- ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে তোমাকে আমাদের নিকট সমর্পণ করবে। কিন্তু সে তা করল না। তুমি সহনশীল হও এবং জেনে রাখ! আল্লাহ তুমি ও তোমার মত অন্যান্য নির্যাতিতের মুক্তির পথ বের করে দেবেন।”

বৈঠকের সমাপ্তি ঘটল এবং উভয় পক্ষ চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করল। সুহাইল ও তার সঙ্গীরা মায় পথ ধরল। আবু জান্দাল মুকরেজ ও হুয়াইতাবের নিরাপত্তায় মায় ফিরে গেল। মহানবী (সা.)

ইহরাম অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে সেখানে নিজ উট কুরবানী করলেন এবং মাথার চুল
কামিয়ে ফেললেন। অনেকেই তাঁকে অনুসরণ করলেন।^{১১২}

হৃদয়বিয়ার সন্ধি : পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

মহানবী (সা.) ও মুশরিক নেতাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হলো। সর্বমোট উনিশ দিন হৃদয়বিয়ায় অবস্থানের পর মুসলমানরা মদীনার পথে রওয়ানা হলেন এবং মুশরিকরা মার পথে হৃদয়বিয়া ত্যাগ করল। চুক্তিপত্র লেখার সময় এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরবর্তীতে রাসূল (সা.) ও তাঁর কোন কোন সাহাবীর মধ্যে মতপার্থক্য ও বিতর্ক হয়েছিল। তাঁদের একদল এই সন্ধিচুক্তি মুসলমানদের স্বার্থের অনু ল বললেন এবং কিয়দংশ একে মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করলেন। হৃদয়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার প্রায় চৌদ্দ শ' বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আমরা বর্তমান সময়ে বসে দূর হতে গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ দূরে থেকে নিরপেক্ষভাবে বাস্তবতার দৃষ্টিতে হৃদয়বিয়ার সন্ধি পর্যালোচনার করব এবং বিতর্কের উভয় পক্ষের মত যাচাই করে দেখব। আমাদের দৃষ্টিতে নিম্নোক্ত যুক্তিতে এ সন্ধি ইসলামের পক্ষে এক শ' ভাগ গিয়েছিল এবং তার বিজয় নিশ্চিত করেছিল :

১. কুরাইশদের অনবরত আক্রমণ এবং মদীনার ভেতর ও বাইরে থেকে তাদের পরিচালিত উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা উল্লেখ ও আহ্বাবের যুদ্ধের আলোচনায় দিয়েছি। এই অবিরত চাপের ফলে মহানবী (সা.) আরব ভূ-খণ্ডের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী গোত্র লো ও তার বাইরের বিভিন্ন জাতির প্রতি ইসলামের দাওয়াত দেয়ার ও তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের সুযোগ পান নি। তাঁর মূল্যবান সময়কে (অধিকাংশ সময়ই) ইসলামের প্রতিরক্ষা ও শত্রুদের ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র লো নস্যাৎ করতে ব্যয় করতে হতো। কিন্তু এ সন্ধিচুক্তির ফলে ইসলামের মহান নেতা ও তাঁর অনুসারীরা মদীনার দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ থেকে নিরাপদ হলেন। ফলে অন্যান্য দিকে ইসলামের প্রচারের ক্ষেত্র সৃষ্টি হলো। এ প্রশান্তিকর পরিবেশের ফল দু'বছর পর পাওয়া গেল যখন মায় ইসলামের সূর্য উাসিত হলো। মহানবী (সা.) হৃদয়বিয়ায় যাওয়ার সময় চৌদ্দ শ' সঙ্গী নিয়ে যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু এর ঠিক দু'বছর পর মা বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করাকালে দশ হাজার মুসলমান ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়ে তাঁর সঙ্গে যাত্রা

করেন। এই লক্ষণীয় পার্থক্য হৃদয়বিয়ার সন্ধির প্রত্যক্ষ ফল। কারণ একদল লোক কুরাইশদের ভয়ে মুসলমান হতে সাহস পাচ্ছিল না। কিন্তু কুরাইশরা ইসলামকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার ফলে বিভিন্ন গোত্র ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পেল; তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব দূর হলো। মুসলমানরাও মুক্তভাবে ইসলামের প্রচারে রত হলেন।

২. দ্বিতীয় যে সুফলটি মুসলমানরা এ চুক্তির মাধ্যমে পেয়েছিল, তা হলো ইসলাম ও আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে মুশরিকরা যে লৌহপ্রাচীর নির্মাণ করেছিল, এর ফলে তা বিলুপ্ত হয়েছিল। ফলে মদীনায় অবাধ যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলমানদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন গোত্র ইসলামের মহান ও কল্যাণময় শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারল। মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান ঈমান, মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ নির্ধিধায় পালনের মনোবৃত্তি, শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা প্রভৃতি দিক মুশরিকদের বিবেক-বুদ্ধিকে আকৃষ্ট করত। নামাযের পূর্বে ওয়ু ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নামাযের জামাআতে সারিবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল দাঁড়ানো, মহানবীর উষ্ণ অভ্যর্থনা ও আকর্ষণীয় ভাষণ, সর্বোচ্চ সহিত্যমানের ইলাহী বাণী শ্রবণ তাদের ইসলামের দিকে আকর্ষণ করত। অন্য দিকে এ সন্ধিচুক্তির পর মুসলমানরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ম + ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সফর করতেন। এ সফর লোতে নিজেদের আণীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং ইসলামের বিভিন্ন দিক, বিধি-বিধান, হালাল-হারাম, নৈতিকতার বিষয়সমূহ তাদের সামনে তুলে ধরতেন। এ প্রচারের ফলে অনেক মুশরিক নেতা, যেমন খালিদ ইবনে ওয়ালীদ, আমর ইবনুল আস প্রমুখ মুসলমান হন। ইসলামের মহাসত্যের সাথে মুশরিকদের পরিচয় ম + বিজয়ের পথ সুগম করে। আর তাই শিরকের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র কোনরূপ রক্তক্ষয় ও প্রতিরোধ ছাড়াই মুসলমানদের পদানত হয়। ফলে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।^{১৯৩} এ মহাবিজয় পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, ভীতি দূরীভূত হওয়া, প্রচারের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভ এবং মুসলমানদের প্রচারকাজের ফলে অর্জিত হয়।

৩. মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে সন্ধিচুক্তির আলোচনার সময় থেকেই কুরাইশদের মানসিক জটিলতার প্যাঁচ খুলতে শুরু করে। কারণ, মহানবীর উন্নত নৈতিক চরিত্র, কোমল

আচরণ, প্রতিপক্ষের কঠোরতার বিপরীতে ধৈর্যশীলতার পরিচয় দান, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা প্রভৃতি তাঁর মহামানবীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দান করে এবং সকল উন্নত নৈতিক বৈশিষ্ট্যের তিনি যে ধারক, এতে তা-ই প্রমাণিত হয়।

কুরাইশদের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর অনেক কঠিন আঘাত এলেও তাদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল মানবপ্রেমে পূর্ণ। বিশেষত যখন কুরাইশরা প্রত্যক্ষ করল চুক্তির চাপিয়ে দেয়া শর্ত লোর ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গীদের উল্লেখযোগ্য অংশের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ আসা সত্ত্বেও তিনি তাঁর জন্মভূমি মাদীনা ও হারাম শরীফের পবিত্রতার বিষয়কে একদল সঙ্গীর প্রত্যাশার বিপরীতে প্রাধান্য দিলেন, তখন তারা তাঁর উদ্দেশ্যের সততায় বিশ্বাস স্থাপন করল। এরূপ আচরণ মহানবীর স্বভাব ও মানসিকতা সম্পর্কে যে অপপ্রচার ছিল, তা মিথ্যা প্রমাণ করল। সে সাথে এটাও প্রমাণিত হলো যে, তিনি মানবপ্রেমী ও শান্তিকামী ব্যক্তিত্ব- যিনি এতটা বিশাল হৃদয়ের অধিকারী যে, কোন দিন সমগ্র আরব ভূ-খণ্ডের শাসনক্ষমতাও হস্তগত করলেও নিজ শত্রুদের সাথে বিদ্বেষমূলক আচরণ করবেন না; বরং তাদের প্রতিও সহানুভূতিশীল আচরণ করবেন। কারণ এ বিষয়টি আলোচনার অবকাশ রাখে না যে, মহানবী (সা.) যদি সেদিনও (বাইয়াতে রিদওয়ানের শপথের পরিপ্রেক্ষিতে) কুরাইশদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতেন, তাদের সবার ওপর জয়ী হতেন। যেমনটি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

(و لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأعداء ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا)

“ কাফেররা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করলে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন (পলায়ন) করত। অতঃপর তারা কোন বন্ধু ও সাহায্যকারীও পেত না।” (সূরা ফাতহ : ২২)

এ সত্ত্বেও তিনি এ ক্ষেত্রে বিশেষ কোমলতার পরিচয় দিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করেছেন এবং আরব গোত্র লোর প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল অপপ্রচার মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

উপরিউক্ত যুক্তিসমূহ হতে হৃদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে ইমাম জাফর সাদিক (আ.) হতে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত বাণীর যথার্থতা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন : *و ما كان قضية أعظم بركة منها* “মহানবীর জীবনে হৃদায়বিয়ার সন্ধি অপেক্ষা কল্যাণকর কোন ঘটনাই ঘটে নি।”

হৃদায়বিয়ার সন্ধির পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহসমূহ প্রমাণ করে, মহানবীর গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপরীতে যে সাহাবীরা অবস্থান নিয়েছিলেন- যাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত উমর, - তাঁদের যুক্তি লো সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন ছিল। ঐতিহাসিকরা প্রতিবাদকারীদের বক্তব্য ও মন্তব্য লো খুঁটিনাটিসহ উল্লেখ করেছেন।^{১৯৪}

হৃদায়বিয়ার সন্ধির মূল্য এখন থেকেই বোঝা যায় যে, মহানবী (সা.) তখনও মদীনায় গিয়ে পৌঁছেন নি, সূরা ফাতহ মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে অবতীর্ণ হলো। এরশাদ হলো :

(إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا)

“ নিশ্চয়ই আমি আপনাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি” । (সূরা ফাতহ : ১)

এ আয়াতকে ম া বিজয়ের প্রাথমিক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

কুরাইশরা হৃদায়বিয়ার সন্ধির একটি ধারা বাতিল ও অকার্যকর ঘোষণা করার জন্য উপর্যুপরি আহবান জানাতে থাকে। কিছুদিন না যেতেই কুরাইশরা এমন এক তিক্ত ঘটনার মুখোমুখি হলো যে, বাধ্য হয়ে মহানবীর নিকট সন্ধির দ্বিতীয় ধারাটি বাতিলের আহবান জানাল। যে ধারাটি মুহাম্মদ (সা.)- এর সাহাবীদের ক্ষুব্ধ করেছিল, কিন্তু তিনি সুহাইলের এক ায়ে মনোভাবের কারণে তা মেনে নেন, তাতে বলা হয়েছিল, রাসূল কুরাইশদের থেকে পলায়নকারী মুসলমানদের তাদের নিকট ফিরিয়ে দেবেন; কিন্তু কোন মুসলমান পালিয়ে ম ায় আশ্রয় নিলে কুরাইশরা তাদের ফিরিয়ে দেবে না। মহানবী (সা.) এ ধারা মেনে নেয়ার সময় বলেছিলেন, মহান আল্লাহ কুরাইশদের হাতে বন্দী দুর্বল ও নির্যাতিত মুসলমানদের মুক্তির পথ করে দেবেন।

‘ আবু বাসির’ নামের এক মুসলমান দীর্ঘ দিন মুশরিকদের হাতে বন্দী ছিলেন। তিনি একবার সুযোগ বুঝে কৌশলে ম া থেকে পালিয়ে গিয়ে মদীনায় পৌঁছিলেন। কুরাইশদের দু’জন বিশিষ্ট ব্যক্তি আযহার এবং আখনাস মহানবীকে সন্ধির দ্বিতীয় ধারার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আবু

বাসিরকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য পত্র লিখে পাঠাল। বনী আমের গোত্রের এক ব্যক্তিসহ স্বীয় এক দাসকে এ পত্র দিয়ে মদীনায় রাসূলের নিকট পৌঁছাতে বলল।

মহানবী (সা.) সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী আবু বাসিরকে বললেন : “অবশ্যই তোমাকে নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যেতে হবে। আমি কখনোই তাদের সাথে প্রতারণার কৌশল অবলম্বন করব না। আমি নিশ্চিত, মহান আল্লাহ তোমার ও অন্যদের মুক্তির পথ করে দেবেন।” আবু বাসির বললেন: “হে নবী! আপনি কি আমাকে মুশরিকদের হাতে অর্পণ করতে চান যাতে তারা আমাকে আমার ধর্ম হতে ফিরিয়ে নিতে পারে?” মহানবী (সা.) তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করে কুরাইশ প্রতিনিধিদের হাতে তাঁকে অর্পণ করলেন। তারা মার দিকে যাত্রা করে যখন ‘যুল হুলাইফা’^{১৯৫} নামক স্থানে পৌঁছল, তখন আবু বাসির ক্লান্ত হয়ে একটি দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। অতঃপর বনী আমেরের ঐ ব্যক্তিকে নিজের কাছে ডেকে গল্প জমালেন। এক ফাঁকে তার তরবারিটি দেখার নাম করে হাতে নিয়ে তা খাপ থেকে বের করলেন এবং আকস্মিকভাবে ঐ ব্যক্তির ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করলেন। এ ঘটনা দেখে দাসটি ভয়ে পলায়ন করল।

দাসটি মদীনায় পৌঁছে মহানবীকে ঘটনা খুলে বলল। কিছুক্ষণ পর আবু বাসিরও সেখানে এসে মহানবীকে বললেন : “হে আল্লাহর নবী! আপনি আপনার শর্ত অনুযায়ী কাজ করেছেন। কিন্তু আমি কখনোই আমার ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে কাফেরদের ছিনিমিনি খেলার সুযোগ দেব না” । এই বলে তিনি লোহিত সাগরের তীরে কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার চলার পথের ‘ঈস’ নামক একটি স্থানের দিকে যাত্রা করলেন এবং সেখানে একাকী বসবাস শুরু করলেন। মার মুসলমানগণ আবু বাসিরের ঘটনা জানতে পারলেন এবং তাঁর অবস্থান সম্পর্কেও অবহিত হলেন। ফলে তাঁদের মধ্যে সত্তর জন মার থেকে পালিয়ে আবু বাসিরের প্রতিবেশী হলেন। এই সত্তর জন সক্ষম যুবক কুরাইশদের চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন- তাঁদের কোন স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ছিল না; ঈস- এ পৌঁছেও তাঁদের কোন জীবিকার উপায় ছিল না। তাই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলায় আক্রমণ চালাবেন এবং তাদের যাকেই পাবেন, হত্যা করবেন। তাঁরা দক্ষতার সাথে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা লোর ওপর আক্রমণ চালাতে থাকলেন এবং

তাঁদের অনবরত হামলার ফলে কুরাইশরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। ফলে তারা বাধ্য হয়ে মহানবী (সা.)-এর নিকট এ মর্মে পত্র দিল যে, হৃদয়বিয়ার সন্ধির দ্বিতীয় ধারা অকার্যকর ঘোষণা করা হোক এবং ঈস হতে মুসলমানদের মদীনায় নিয়ে যাওয়া হোক। মহানবী (সা.) উভয় পক্ষের সম্মতিতে তা অকার্যকর ঘোষণা করলেন এবং ঈস-এ সমবেত মুসলমানদের মদীনায় চলে আসতে নির্দেশ দিলেন।^{১৯৬}

এ ঘটনার ফলে কুরাইশরা বুঝতে পারল ঈমানদার ব্যক্তিদের সব সময় বন্দী করে রাখা যায় না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের বন্দী করে রাখা স্বাধীনতা দান অপেক্ষা বিপজ্জনক। কারণ, একদিন তাদের মধ্যে প্রতিশোধের আন জ্বলে উঠবে এবং তারা শত্রুদের নিকট থেকে চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।

কুরাইশদের নিকট মুসলিম নারীদের ফিরিয়ে না দেয়া

হৃদয়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর উকবা ইবনে আবি মুঈত্তের কন্যা উম্মে কুলসুম ম ১ থেকে মদীনায় গেলেন। তাঁর দুই ভাই আম্মারাহ্ এবং ওয়ালীদ মহানবীর নিকট সন্ধির দ্বিতীয় ধারা অনুযায়ী তাঁকে ম ায় ফিরিয়ে দেয়ার আহ্বান জানান। মহানবী জানালেন, নারীরা এ ধারার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং ধারাটি কেবল পুরুষদের জন্যই প্রযোজ্য।^{১৯৭}

সূরা মুমতাহিনার দশম আয়াত এক্ষেত্রে করণীয় বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حَلَالٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُحَلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا)

“ হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আসে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে না। এরা কাফেরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফেররা এদের জন্য হালাল নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের ফিরিয়ে দাও।”

হৃদয়বিয়ার সন্ধির পর মহানবী (সা.) শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রা প্রধানদের নিকট পত্র দেয়ার এবং ইসলাম ও তাঁর নবুওয়াতের আহ্বানকে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছানোর সুযোগ পেয়েছিলেন।

তেতাল্লিশতম অধ্যায় : সপ্তম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

মহানবী (সা.) ও তাঁর বিশ্ব-রিসালতের ঘোষণা

হৃদয়বিয়ার সন্ধি আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ ভাগ অর্থাৎ পবিত্র মক্কা নগরীর দিক থেকে মহানবীকে চিন্তামুক্ত করেছিল এবং এ সন্ধির কারণে শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার দরুন একদল আরব গোত্র পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এ সময় মহানবী এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তদানীন্তন বিশ্বের শাসকশ্রেণী, গোত্রপতি ও খ্রিষ্ট ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে পত্র বিনিময়ের দ্বারা উন্মুক্ত করেছিলেন এবং সেদিন তিনি যে ইসলাম ধর্মকে সরল আকীদা- বিশ্বাস ছাড়াও বৃহত্তর পরিসরে সমগ্র মানব জাতিকে তাওহীদ এবং এ ধর্মের সুমহান সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষামালার পতাকাতে সমবেত ও একত্র করতে সক্ষম ছিলেন, তা তিনি তৎকালীন বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন।

এটা ছিল তাঁর উদ্ধত কুরাইশ গোত্রের সাথে দীর্ঘ উনিশ বছর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পর প্রথম পদক্ষেপ। অভ্যন্তরীণ শত্রুরা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও সংঘর্ষ বাঁধিয়ে তাঁকে ব্যস্ত না রাখলে তিনি এর বহু পূর্বেই বিশ্বের বিভিন্ন জাতিকে ইসলাম ধর্মের দাওয়াত দিতেন। তবে আরবদের কাপুরুষোচিত আক্রমণ-আগ্রাসন লোর কারণে তিনি তাঁর সময়ের একটা রক্তপূর্ণ অংশ ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মহানবী (সা.) আমীর-অমাত্য, রাজা-বাদশাহ, গোত্রপতি এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও আধ্যাতিক (ধর্মীয়) ব্যক্তিত্বদের কাছে যেসব পত্র প্রদান করেছিলেন, সেসবই তাঁর দাওয়াহ বা প্রচার পদ্ধতির কথাই ব্যক্ত করে।^{১৯৮}

বর্তমানে আমাদের হাতে ইসলাম ধর্মের তাবলীগ ও এ ধর্ম গ্রহণের প্রতি আহবান (দাওয়াত) বা চুক্তি ও প্রতিজ্ঞা হিসেবে মহানবী লিখিত পত্রসমূহের মধ্যে এক শ' পঁচাশিখানা পত্র বিদ্যমান, যেসব মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ সংরক্ষণ করেছেন। এসব চিঠি-পত্র থেকে প্রতীয়মান হয়, ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে ইসলামের পদ্ধতি ছিল যুক্তি ও প্রামাণ্য দলিল নির্ভর, আর তা যুদ্ধ ও তরবারি ছিল না। মহানবী কুরাইশদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ হওয়ার পরপরই তিনি পত্র ও

মুবাঞ্জিগগণকে (ধর্মপ্রচারকারী) প্রেরণ করার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য ও আহ্বান জগৎবাসীর কানে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

এসব পত্রের মূল পাঠ এবং এসবের পরতে পরতে যে সব ইশারা বিদ্যমান সেসব; বিদেশী জাতিসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন করার সময় মহানবী যেসব উপদেশ ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং নমনীয়তা প্রদর্শন করেছেন, সে সবকিছুই আসলে ঐসব প্রাচ্যবিদের তত্ত্ব পরিপন্থী, যারা অযৌক্তিক ও অবৈধ অপবাদ আরোপের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রকৃত চেহারা ঢেকে ফেলতে এবং এ ধর্মের প্রসারকে তরবারি ও বর্শার ফল বলে গণ্য করতে চেয়েছেন। আমরা আশাবাদী, একদিন আমরা এসব চিঠি-পত্রের মূল পাঠ এবং যেসব ঘটনা এসবের ব্যাপারে সংঘটিত হয়েছে বা এ লো লেখার কারণ হয়েছে, সেসব এমনভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারব যে, এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের পদ্ধতি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

মহানবী (সা.)- এর বিশ্বজনীন রিসালত

একদল অজ্ঞ লোক মহানবী (সা.)- এর বিশ্বজনীন রিসালতকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন এবং এ ব্যাপারে তারা কতিপয় দালাল লেখকের রচিত গীতই গেয়ে থাকেন। এ গোষ্ঠীর নেতা হচ্ছেন স্যার উইলিয়াম মুরের মতো প্রাচ্যবিদ, যিনি বলেছেন :

“ হযরত মুহাম্মদের রিসালত বিশ্বজনীন হওয়ার^{১৯৯} বিষয়টি পরবর্তীকালে উত্থাপিত হয়েছে এবং মুহাম্মদ তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কেবল আরব জাতিকেই ইসলাম ধর্মের দিকে আহ্বান জানাতেন। আর তিনি আরব উপদ্বীপ ব্যতীত অন্য কোন স্থানের সাথে পরিচিতও ছিলেন না।”

এই লেখক (স্যার উইলিয়াম মুর) তাঁর ইংরেজ পূর্বসূরিদের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন এবং পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত যেসব সাক্ষ্য দেয়, মহানবী (সা.) সর্বসাধারণ বিশ্ববাসীকে তাওহীদ ও তাঁর নিজ রিসালতের প্রতি আহ্বান জানাতেন, সেসবের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে তিনি বাস্তবতাসমূহ ঢেকে দেয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাই তিনি বলেন : “তিনি (মুহাম্মদ) কেবল আরব জাতিকে দাওয়াত দিতেন (ধর্মের আহ্বান জানাতেন)।” আমরা এখানে পবিত্র কুরআনের কয়েকখানা আয়াত উল্লেখ করব যেসব থেকে প্রমাণিত হয়, মহানবী (সা.)- এর রিসালত ছিল বিশ্বজনীন দাওয়াত বা প্রচার কার্যক্রম।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا)

“ বলুন, হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সবার কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত (রাসূল)।” (সূরা আরাফ : ১৫৮)

এ আয়াতে যে পক্ষকে সম্বোধন করা হয়েছে, তারা শুধু আরব জাতিই নয়; বরং তারা হচ্ছে সমগ্র মানব জাতি।

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا)

“ (হে মুহাম্মাদ!) আমরা কেবল আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।” (সূরা সাবা : ২৮)

এ গ্রন্থকে (আল কুরআন) সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য স্মরণ করার মাধ্যম করা হয়েছে :

(و ما هو إلا ذكر للعالمين)

“ আর তা (কুরআন) জগৎসমূহের (সমগ্র বিশ্ববাসীর) জন্য উপদেশ বৈ কিছু নয়। (সূরা কলম : ৫২)

(لينذر من كان حيًّا)

“ যাতে তিনি সতর্ক করেন জীবিতকে।” (সূরা ইয়াসীন : ৭০)

(هو الذى أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون)

“ তিনিই স্বীয় রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্ম সহ প্রেরণ করেছেন অন্য সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।” (সূরা তওবা : ৩৩)

এখন আমরা এই ইংরেজ লেখককে প্রশ্ন করব : এসব আয়াতে এসব বিশ্বজনীন আহ্বান থাকা সত্ত্বেও আপনি কিভাবে বলছেন যে, মহানবী (সা.)- এর রিসালত ও নবুওয়াত বিশ্বজনীন হওয়ার বিষয়টি পরবর্তীকালে (অর্থাৎ তাঁর ওফাতের পরে) উত্থাপন করা হয়েছে? এসব আয়াত ও আরো অন্যান্য আয়াত থাকা সত্ত্বেও এবং দূরদেশ ও অঞ্চল লোয় মহানবীর প্রেরিত দূতগণের উপস্থিতি ও মহানবীর যেসব পত্র ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়েছে, সেসব থাকা সত্ত্বেও (এমনকি বিদেশী জাতি লোর কাছে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য দূরবর্তী অঞ্চল ও দেশ লোয় তিনি যেসব পত্র প্রেরণ করেছিলেন, সেসবের কয়েকখানা আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে এবং সে লোর শোভা বর্ধন করছে) কি কোন বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)- এর রিসালতের বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা সম্ভব?

এই লেখক সম্পূর্ণ নির্লজ্জভাবে লিখেছেন : “মুহাম্মাদ আরব উপদ্বীপ (হিজাজ) ব্যতীত অন্য কোন অঞ্চলের সাথে পরিচিত ছিলেন না।” অথচ তিনি ষোল বছর বয়সে পিতৃব্য আবু তালিবের সাথে শামদেশে গিয়েছিলেন এবং যৌবনে তিনি পবিত্র ম া থেকে শামদেশ পর্যন্ত হযরত

খাদীজার বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে তিনি শামদেশে গমন করেছিলেন।

সত্যি-সত্যি যখনই আমরা ইতিহাসে পাঠ করি, এক গ্রীক যুবক (ইস্কান্দার মাকদূনী অর্থাৎ ম্যাসিডোনিয়ার রাজা আলেকজান্ডার) সমগ্র বিশ্বের শাসনকর্তা হতে চাইতেন অথবা আমরা যখন শুনতে পাই, নেপোলিয়ান বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার খায়েশ পোষণ করতেন, তখন তো আমরা মোটেই বিস্মিত হই না। কিন্তু যখনই একদল প্রাচ্যবিদ এ কথা শোনে যে, মুসলিম উম্মাহর মহান নেতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মহান আল্লাহর নির্দেশে তদানীন্তন বিশ্বের দুই মহা পরাক্রমশালী সম্রাট (রোমান ও পারস্য সম্রাট), যাদের জাতিসমূহের সাথে তাঁর জাতি ও গোত্রের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, তাদেরকে তাওহীদী ধর্মের দিকে আহ্বান করেছিলেন, তখনই তারা ঔদ্ধত্য সহকারে এ ঘটনাকে অসম্ভব বলে অভিহিত করেন।

পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চল ও দেশসমূহে রিসালতের দূতগণ

মহানবী (সা.) একটি বৃহৎ পরামর্শসভায় অন্য সকল রুত্বপূর্ণ বিষয়ের মতো (বিশ্বের বিভিন্ন দেশের) শাসনকর্তাদের কাছে ইসলাম ধর্মের দাওয়াতের বিষয়টি উত্থাপন করেন। একদিন তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বললেন : “সকালে তোমরা সবাই উপস্থিত থাকবে যাতে আমি তোমাদের কাছে একটি রুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করতে পারি।” পরের দিন ফজরের ফরয নামায আদায় করার পর তিনি সাহাবীগণকে বললেন :

“ তোমাদের উচিত মহান আল্লাহর বান্দাদেরকে উপদেশ প্রদান করা; যে ব্যক্তি জনগণের তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালক হবে এবং তাদের সুপথ প্রদর্শন ও হেদায়েতের ব্যাপারে চেষ্টা করবে না, মহান আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্ত হারাম করে দিয়েছেন। তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও এবং দূর-দূরান্তের অঞ্চলসমূহে রিসালতের বার্তাবাহী দূত হয়ে বিশ্ববাসীদের কানে তাওহীদের শাস্বত আহবান পৌঁছে দাও। তবে হযরত ঈসা (আ.)- এর অনুসারীদের মতো তোমরা কখনো আমার বিরোধিতা করো না।” তখন মহানবীর কাছে তাঁরা প্রশ্ন করলেন : “তারা কীভাবে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল?” তিনি জবাবে বলেছিলেন : “তিনিও আমার মতো তাঁর একদল সাহাবীকে বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর রিসালতের বার্তা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। তখন তাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি, যাদের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত ছিল (অর্থাৎ যাদের গন্তব্যস্থল নিকটবর্তী ছিল), তারা তাঁর নির্দেশ মেনে নিয়েছিল; কিন্তু যাদের যাত্রাপথ দীর্ঘ ছিল, তারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল।”

অতঃপর মহানবী (সা.) সবচেয়ে দক্ষ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে ছয় জনকে তাঁর বিশ্বজনীন রিসালতের কথা উল্লেখসহ পত্র সমেত বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশের উদ্দেশে প্রেরণ করলেন। আর এভাবে হেদায়েতের বার্তাবাহক দূতগণ একই দিনে ইরান, রোম, হাবাশা, মিশর, ইয়ামামাহ, বাহরাইন ও হীরার (জর্দান) উদ্দেশে রওয়ানা হলেন।^{২০০}

মহানবীর পত্রসমূহ লেখা শেষ হলে কতিপয় ব্যক্তি, যাঁরা তখনকার রাজদরবার লোর রীতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন, মহানবীর কাছে আরজ করলেন, পত্রসমূহে যেন তিনি সীলমোহর দেন; কারণ, বিশ্বের সম্রাট, রাজা ও শাসকগণ স্বাক্ষরবিহীন পত্র পাঠ করেন না। তাই মহানবীর নির্দেশে তাঁর জন্য একটি রূপার আংটি তৈরি করা হয়, যার উপর তিন লাইনে مُحَمَّد رسول الله ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্’ খোদাই করে লেখা হয়েছিল। এ আংটিতে খোদাই কাজ এমনভাবে করা হয়েছিল যে, ‘আল্লাহ্’ শব্দ সবচেয়ে উপরে, রাসূল শব্দ মাঝখানে এবং মুহাম্মাদ শব্দ নিচে স্থান পেয়েছিল। আর জাল করার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই এ ধরনের সূক্ষ্ম ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং পাঠকের উচিত স্বাক্ষর বা সীলমোহরকে নিচ থেকে শুরু করে ‘আল্লাহ্’ শব্দ পর্যন্ত পাঠ করা। মহানবী (সা.) একেও যথেষ্ট মনে করেন নি এবং পত্রের খাম বিশেষ এক ধরনের মোম দিয়ে বন্ধ করে তার উপর মোহরাংকিত করে দেন।^{২০১}

রিসালত প্রচারের যুগে বিশ্ব- পরিচিতি

তৎকালীন বিশ্বের সমুদয় শক্তি ও কর্তৃত্ব দুই সাম্রাজ্যের হাতের মুঠোয় ছিল। আর এ কারণে এ দুই পরাশক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধের এক দীর্ঘ অতীত ইতিহাস ছিল। ইরান ও রোমের মধ্যকার যুদ্ধ হাখামানেশী যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল এবং তা সাসানীয় যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। প্রাচ্য পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। তখন ইরাক, ইয়েমেন এবং এশিয়া মাইনরের একাংশ পারস্যের শাহানশাহী প্রশাসনের উপনিবেশ বলে গণ্য হতো। তৎকালীন রোম সাম্রাজ্য পশ্চিম ও পূর্ব- এ দু'অংশে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কারণ রোমান সম্রাট থিওডর দ্য গ্রেট ৩৫৯ খ্রিষ্টাব্দে নিজ সাম্রাজ্যকে দুই পুত্রের মধ্যে পশ্চিম রোম ও পূর্ব রোম নামের দুই দেশে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। পশ্চিম রোম ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর ইউরোপের অসভ্য ও বর্বর জাতি লোর আক্রমণের মুখে ধ্বংস হয়ে যায়। তবে পূর্ব রোম, যার রাজধানী ছিল কন্সটান্টিনোপল এবং শাম ও মিশর যার শাসনাধীন ছিল, তা দীন ইসলামের আবির্ভাবকালে তদানীন্তন বিশ্বের এক বিরাট অংশের ওপর স্থায়ী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল। অবশেষে ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে যখন কন্সটান্টিনোপল বিজয়ী বীর তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের হাতে পদানত হয়, তখন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য ও প্রশাসনের সূর্য অস্তমিত হয়ে যায় এবং তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। আরব উপদ্বীপও ঐ সময় এ দুই পরাশক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। তবে যেহেতু সেখানে উর্বর ভূখণ্ড ছিল না এবং সেখানকার অধিবাসীরাও যাযাবর জীবন যাপন করত ও ছড়িয়ে- ছিটিয়ে থাকত, সেহেতু এ দুই সাম্রাজ্য কখনো উক্ত অঞ্চল দখল ও পদানত করার ইচ্ছা প্রকাশ করত না। তাদের (এ দুই সাম্রাজ্য) গর্ব, অন্যায়- অবিচার এবং যুদ্ধ- বিগ্রহ লো তাদেরকে আরব উপদ্বীপে যে এক মহান বি ব এবং মৌলিক পরিবর্তনের শুভ সূচনা হতে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে অবগত হওয়া থেকে বিরত রেখেছিল। তারা কখনো ভাবতে পারে নি যে, সভ্যতার আলো থেকে বহু দূরে অবস্থানকারী একটি জাতি ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এ দুই সাম্রাজ্য ও পরাশক্তির পতন ঘটাবে এবং যেসব অঞ্চল তাদের অন্যায় ও শোষণের কারণে অন্ধকারের অতল গহুরে নিমজ্জিত ছিল, সে লোকে ইসলাম ধর্মের উজ্জ্বল আলোক- প্রভার দ্বারা উ াসিত করবে। তারা

যদি আগে থেকেই এ আলোকবর্তিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পারত, তা হলে ইসলাম ধর্মের সূচনালগ্নেই এ ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দিত।

রোমান সাম্রাজ্যে ইসলামের বার্তাবাহী দূত

রোমান সম্রাট কায়সার (সিজার) মহান আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হলে এ মহাবিজয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ তিনি তাঁর রাজধানী কন্সটান্টিনোপল থেকে পায়ে হেঁটে ‘বাইতুল মুকাদ্দাস’ যিয়ারত করতে যাবেন। তিনি যুদ্ধে বিজয়ী হবার পর তাঁর মানত পুরো করেছিলেন এবং পায়ে হেঁটে বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিলেন। দাহিয়াহ কালবী রোমান সম্রাটের কাছে পত্র পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তিনি শামদেশে বহু বার সফর করেছিলেন বিধায় সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান ছিল। তাঁর আকর্ষণীয় চেহারা ও দৈহিক গড়ন এবং তাঁর সুন্দর চারিত্রিক গুণ, সর্বোপরি তাঁর বহুমুখী যোগ্যতাই এ অতি রত্নপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা তাঁর জন্য অত্যাবশ্যিক করে দিয়েছিল। কন্সটান্টিনোপলের উদ্দেশে শাম ত্যাগ করার আগেই ‘বুসরা’ নামের একটি শহরে তিনি জানতে পারলেন, রোমান সম্রাট কায়সার বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন। এ কারণেই তিনি বিলম্ব না করেই বুসরার প্রাদেশিক শাসনকর্তা হারিস ইবনে আবী শিমরের সাথে যোগাযোগ করে তাঁর রত্নপূর্ণ মিশন সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন।

আত তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থের লেখক^{২০২} লিখেছেন :

“ মহানবী (সা.) তাঁকে (দাহিয়াহ কালবী) বুসরার শাসনকর্তার কাছে পত্রখানা হস্তান্তর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তিনি তা রোমান সম্রাটের কাছে পৌঁছে দেন। সম্ভবত মহানবী (সা.) এ নির্দেশ এ কারণে দিয়েছিলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে কায়সারের এ সফর সম্পর্কে আগে থেকেই অবগত ছিলেন বা দাহিয়াহ কালবীর সফরের সুযোগ-সুবিধা সীমিত ছিল এবং কন্সটান্টিনোপল পর্যন্ত তাঁর সফর করাটাও ছিল কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ণ।

যা হোক, মহানবীর প্রেরিত দূত বুসরার শাসনকর্তার সাথে যোগাযোগ করলেন। আর তিনিও আদী ইবনে হাতেমকে ডেকে পাঠিয়ে মহানবীর দূতের সাথে বাইতুল মুকাদ্দাস পানে যাত্রা করে রোমান সম্রাট কায়সারের কাছে মহানবীর পত্র পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

মহানবীর দূত হিমস শহরে কায়সারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি কায়সারের সামনে উপস্থিত হতে চাইলে দরবারের কর্মকর্তারা তাঁকে বললেন : “আপনি অবশ্যই কায়সারকে সিজদাহ করবেন। তা না হলে সম্রাট আপনার দিকে মোটেই ফিরে তাকাবেন না এবং আপনার পত্রও গ্রহণ করবেন না।” মহানবীর প্রেরিত বুদ্ধিমান দূত দাহিয়াহ বললেন : “আমি ভুল প্রথাসমূহ ঠিকিয়ে দেয়ার জন্যই এত কষ্ট স্বীকার করে সফর করে এসেছি। আমি ‘মুহাম্মদ’ নামক একজন রাসূলের পক্ষ থেকে রোমান সম্রাট কায়সারের কাছে এ বাণী পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পেয়েছি। মানবপূজা অবশ্যই রহিত ও বিলুপ্ত করতে হবে এবং এক- অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করা যাবে না। এ বিশ্বাস সহকারে কিভাবে আমি আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেব এবং মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার সিজদাহ করব?”

দরবারের কর্মকর্তাগণ মহানবীর দূতের শক্তিশালী যুক্তিতে বিস্মিত হয়েছিলেন। দরবারের একজন শুভাকাঙ্ক্ষি কর্মকর্তা দাহিয়াকে বললেন : “আপনি সম্রাটের বিশেষ টেবিলের উপর পত্রখানা রেখে আসতে পারেন; আর সম্রাট কায়সার ছাড়া অন্য কেউ টেবিলের উপর রাখা পত্রের উপর হাত দেবেন না এবং সম্রাট যখনই ঐ পত্র পড়বেন, তখনই তিনি আপনাকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠাবেন।”

কায়সার পত্রখানা খুললেন। ‘আল্লাহর নামে’ (بِسْمِ اللّٰهِ) - এ বাক্য দিয়ে এ পত্র শুরু করা হয়েছিল। তা সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং তিনি বললেন : “আমি একমাত্র সুলাইমান (আ.) ছাড়া এ পর্যন্ত আর কারো কাছ থেকে এ ধরনের পত্র দেখি নি।” এরপর তিনি আরবী ভাষার বিশেষ অনুবাদককে পত্রখানা অনুবাদ করে তাঁকে পড়ে শোনানোর জন্য তলব করলেন। অনুবাদক মহানবীর পত্র এভাবে অনুবাদ করলেন :

- মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর কাছ থেকে রোম সাম্রাজ্যের প্রধান জনাব হিরাক্লিয়াসের প্রতি (প্রেরিত এ পত্র)। হেদায়েতের অনুসারীদের ওপর সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক। আমি আপনাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, তা হলে আপনিও নিরাপত্তা লাভ করবেন এবং মহান আল্লাহও আপনাকে পুরস্কার দেবেন। আর যদি ইসলাম ধর্ম থেকে মুখ

ফিরিয়ে নেন, তা হলে আরীসী^{২০০}দের পাপও আপনার উপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব! আমরা আপনাদেরকে একটি অভিন্ন মূলনীতির দিকে আহ্বান করছি। আর তা হলো, আমরা মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্তার ইবাদত করব না, আমরা অন্য কোন সত্তাকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করব না এবং আমরা পরস্পরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না। আর (হে মুহাম্মদ!) তারা যদি সত্য ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা হলে আপনি (তাদের) বলে দিন : তোমরা সবাই সাক্ষী থেকে, আমরা সবাই মুসলমান।” ^{২০৪}

মহানবী (সা.)- এর অব ১ জানতে রোমান সম্রাটের অনুসন্ধান শুরু

পত্রের লেখক তাওরাত ও ইনযীলের প্রতিশ্রুত মুহাম্মদই হবেন বলে রোমের কর্ণধার এ সম্ভাবনার কথা জানালেন। এ কারণেই তিনি তাঁর জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার উদ্যোগ নিলেন। তিনি একজন পদস্থ কর্মকর্তাকে ডেকে বললেন : “সমগ্র শামদেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াও; সম্ভবত মুহাম্মদের আণীয়- স্বজনদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি বা যারা তাঁর অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তাদের মধ্য থেকে কাউকে খুঁজে বের করতে পারবে, যাদের কাছে থেকে আমি মুহাম্মদ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী লাভ করতে পারব।” ঘটনাক্রমে ঐ দিন লোতে একদল কুরাইশসহ আবু সুফিয়ান ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শামদেশে গমন করেছিল। রোমান সম্রাটের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজকীয় কর্মকর্তা তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সবাইকে বাইতুল মুকাদ্দাসে সম্রাটের কাছে নিয়ে গেলেন। রোমান সম্রাট তাদের জিজ্ঞেস করলেন : “আপনাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে কি, মুহাম্মদের সাথে যার আণীয়তার সম্পর্ক রয়েছে?” আবু সুফিয়ান তখন নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বলল : “আমরা ও তিনি একই গোত্রভুক্ত এবং আমাদের ও তাঁর উর্ধ্বতন চতুর্থ পিতৃপুরুষ হচ্ছেন আদে মানাফ।” রোমান সম্রাট তখন নির্দেশ দিলেন আবু সুফিয়ান যেন তাঁর সামনে দাঁড়ায় এবং কাফেলার অন্যান্য ব্যক্তি তার পেছনে থেকে তার কথাবার্তা মনোযোগ সহকারে শোনে এবং লক্ষ্য রাখে। যখনই সে সম্রাটের প্রশ্নের দূরভিসন্ধিমূলক জবাব দেবে তখন তারা তৎক্ষণাৎ তার ভুল বা মিথ্যা বক্তব্যের

দিকে ইঙ্গিত করবে। এ অবস্থায় সম্রাট আবু সুফিয়ানের কাছে নিম্নোক্ত প্রশ্ন লো করলেন এবং সেও সে লোর উত্তর দিল:

-মুহাম্মদের বংশ পরিচয় কেমন?

-তাঁর পরিবার বা বংশ অত্যন্ত সম্মানিত, মর্যাদাবান ও মহান।

-তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন কি, যিনি জনগণের উপর রাজত্ব করেছেন?

-না, কখনো এমন কেউ ছিলেন না।

-নবুওয়াতের দাবী করার আগে কি তিনি মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকতেন?

-হ্যাঁ, মুহাম্মদ সত্যবাদী ছিলেন।

-সমাজের কোন্ শ্রেণী তাঁর অনুসারী এবং তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেছে?

-অভিজাত শ্রেণী তাঁর বিরোধী এবং সমাজের সাধারণ ও মধ্য পর্যায়ের লোকেরা তাঁর একনিষ্ঠ ও দৃঢ় সমর্থক।

-তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা কি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

-হ্যাঁ।

-তাঁর অনুসারীদের মধ্য থেকে কি কোন ব্যক্তি এ পর্যন্ত তাঁর ধর্ম ত্যাগ করেছে?

-না।

-তিনি কি শত্রু ও বিরোধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী অথবা পরাজিত হন?

-কখনো তিনি বিজয়ী, আবার কখনো তিনি পরাজয়ের সম্মুখীন হন।

সম্রাট তখন দোভাষীকে বললেন : “আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের বল, তোমাদের তথ্য যদি সঠিক হয়, তা হলে তিনি অবশ্যই শেষ যামানার প্রতিশ্রুত নবী।” তিনি সবশেষে বললেন : “আমি আগে থেকে অবগত ছিলাম, এ ধরনের এক নবীর আবির্ভাব হবে। তবে আমি জানতাম না তিনি কুরাইশ বংশীয় হবেন। আমি তাঁর সামনে বিনয়াবনত হতে এবং সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাঁর পদযুগল ধৌত করতে প্রস্তুত। আর অতি শীঘ্রই তাঁর শক্তি, মর্যাদা ও মহত্ত্ব সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যকে ঘিরে ফেলবে।”

রোমান সম্রাটের তুপ্পত্র বলল : “মুহাম্মদ তাঁর পত্রে আপনার নামের আগে তাঁর নিজের নাম উল্লেখ করেছেন।” এ সময় সম্রাট তাকে ধমক দিয়ে বললেন : “তাঁর প্রতি ‘নামূসে আকবার’ অর্থাৎ ওহীর ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। আমার নামের উপর তাঁর নাম অগ্রগণ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়।” আবু সুফিয়ান বলে : “মুহাম্মদের প্রতি রোমান সম্রাট অকুণ্ঠ দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করায় রাজদরবারে তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল এবং আমি এ ঘটনা ঘটায় খুবই অসন্তুষ্ট হলাম এ কারণে যে, মুহাম্মদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এতটা বেড়ে যাবে যে, এর ফলে রোমান জাতিও তাকে ভয় পেতে থাকবে। যদিও প্রশ্ন ও উত্তরের শুরুতে আমি রোমান সম্রাট কায়সারের কাছে মুহাম্মদকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম এবং আমি বলছিলাম, আপনি মুহাম্মদ সম্পর্কে যা শুনেছেন আসলে সে তার চেয়ে অনেক তুচ্ছ; তবে কায়সার আমার তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের প্রতি মোটেই কর্ণপাত করলেন না এবং বললেন : আমি আপনাকে যা জিজ্ঞেস করব, আপনি কেবল সে প্রশ্নেরই উত্তর দেবেন।” ২০৫

কায়সারের উপর মহানবী (সা.)- এর পত্রের প্রভাব

আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট ও তথ্যাবলীকে রোমান সম্রাট যথেষ্ট মনে করলেন না; বরং তিনি পত্রসমেত বিষয়টি রোমের একজন পণ্ডিতের কাছে উত্থাপন করলেন। আর সেই পণ্ডিতও জবাবে লিখলেন : “ইনি সেই নবী যাঁর জন্য সমগ্র বিশ্ব অপেক্ষমান।” রোমান সম্রাট রোমের সর্দার ও নেতৃবৃন্দের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য একটি ধর্মীয় আশ্রমে এক বিরাট সমাবেশের আয়োজন করে সেখানে মহানবীর পত্র তাদেরকে পড়ে শুনালেন এবং বললেন : “তোমরা কি তাঁর কর্মসূচী ও ধর্মের সাথে একমত (অর্থাৎ তা গ্রহণ করার ব্যাপারে সম্মত আছ কি?)।” সাথে সাথেই এ সভায় এক বড় ধরনের গোলযোগ বেঁধে গেল। তাদের মতপার্থক্য ও বিরোধিতার কারণে স্বয়ং রোমান সম্রাট নিজের প্রাণনাশের আশংকা করলেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ উক্ত সভাস্থলের উঁচু জায়গায় স্থাপিত তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে লক্ষ্য করে বললেন : “আমার এ প্রস্তাবটা ছিল তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। তাই

হযরত ঈসা মসীহ্ (আ.)- এর ধর্মের প্রতি তোমাদের দৃঢ়পদ থাকার বিষয়টি সত্যি আমাকে
বিস্মিত করেছে এবং তা আমার কাছে প্রশংসনীয়।”

কায়সার দাহিয়াহকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে সম্মান করলেন এবং মহানবীর পত্রের জবাব লিখে কিছু
উপহারও তাঁর সাথে প্রেরণ করলেন। সম্রাট এ পত্রে মহানবীর প্রতি স্বীয় বিশ্বাস, ভক্তি ও নিষ্ঠা
ব্যক্ত করেছিলেন।^{২০৬}

পারস্য- সম্রাটের দরবারে মহানবী (সা.)- এর দূত

মহানবী (সা.)- এর দূত ইরানের শাহী দরবারের উদ্দেশে রওয়ানা হবার সময়ে ইরান অর্থাৎ পারস্য সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন খসরু পারভেজ। তিনি আনুশীরওয়ানের (নওশেরওয়ান) পর ইরানের দ্বিতীয় নৃপতি ছিলেন, যিনি মহানবী (সা.)- এর হিজরতেরও ৩২ বছর আগে পারস্যের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। এ দীর্ঘ ৩২ বছরে তাঁর সরকার ও প্রশাসন অসংখ্য তিক্ত ও মধুর ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিল। তাঁর শাসনামলে ইরানের শক্তি সম্পূর্ণরূপে দোদুল্যমান ছিল। ইরানের প্রভাব-প্রতিপত্তি একদিন এশিয়া মাইনরের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা কন্সটান্টিনোপল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

হযরত ঈসা (আ.)- এর ক্রস, যার চেয়ে অধিকতর পবিত্র আর কিছুই খ্রিষ্টানদের কাছে ছিল না, তা তীস নৃ অর্থাৎ মাদায়েনে আনা হলো এবং রোমের সম্রাট সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করার জন্য একজন দূতকে পারস্যের রাজদরবারে প্রেরণ করলেন। ইরানের সীমান্ত, হাখামানেশী যুগে পারস্যসাম্রাজ্য যতখানি বিস্তৃতি লাভ করেছিল, সম্রাট খসরু পারভেজের রাজত্বকালে ততখানি বিস্তৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু পরে তদানীন্তন পারস্য সম্রাটের অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা, মাত্রাতিরিক্ত অহংকার এবং ভোগ-বিলাসের কারণে ইরান অধঃপতনের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। বিজিত অঞ্চলসমূহ একের পর এক নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে লাগল এবং শত্রুবাহিনী পারস্য সাম্রাজ্যের একেবারে কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ তীসফূনের কাছে দাস্তগার্দ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। অবস্থা এতটা শোচনীয় হয়ে গেল যে, স্বয়ং সম্রাট খসরু পারভেজ রোমানদের ভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সম্রাটের এ গর্হিত কাজ (পলায়ন) ইরানী জাতিকে অতিশয় ক্রুদ্ধ করেছিল এবং অবশেষে তিনি (সম্রাট) নিজ সন্তান শীরাভেইয়ের হাতেই নিহত হয়েছিলেন।

ইতিহাস বিশ্লেষণকারী জ্ঞানী বীগণ সম্রাট খসরু পারভেজের গর্ব-অহংকার, স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদকে পারস্য সাম্রাজ্যের

দক্ষতা ও শক্তিতে ভাটা পড়ার কারণ বলে গণ্য করেন। সম্রাট যদি সন্ধি প্রস্তাব আনয়নকারী দূতের বার্তা গ্রহণ করতেন, তা হলে সন্ধি ও শান্তিচুক্তির ছত্রছায়ায় ইরানের গৌরব ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকত।

মহানবীর প্রেরিত পত্র খসরু পারভেজের মন-মানসিকতার উপর ভালো প্রভাব রেখে না থাকলে তা এ পত্র বা পত্রবাহকের দোষ-ত্রুটির কারণে ছিল না, বরং তাঁর বিশেষ ধরনের মানসিকতা এবং সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা তাঁকে মহানবীর আহ্বান সম্পর্কে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা-ভাবনা করারও সুযোগ দেয় নি। দোভাষী মহানবীর পত্র অনুবাদ করে শেষ করতে পারে নি, এমন মুহূর্তে সম্রাট খসরু পারভেজ উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে মহানবীর পত্রখানি ছিঁড়ে ফেলেন।

হিজরতের সপ্তম বর্ষের শুরুতে^{২০৭} মহানবী তাঁর অন্যতম সাহসী সেনা কর্মকর্তা আবদুল্লাহ ইবনে হাযাফাহ কারাশীকে ইরানের রাজদরবারে সম্রাট খসরু পারভেজের কাছে একটি পত্র হস্তান্তর করে তাঁকে ইসলাম ধর্ম ও তাওহীদী আদর্শ গ্রহণ করার আহ্বান জানানোর দায়িত্ব প্রদান করেন।

মহানবী (সা.)- এর পত্র ছিল নিম্নরূপ :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى كَسْرِيِّ عَظِيمِ فَارِسَ، سَلَامٌ عَلَيَّ مِنْ أَتْبَعِ الْهُدَى وَ آمَنَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ اللَّهِ، فَإِنِّي أَنَا رَسُولُ النَّاسِ كَافَّةً لِأَنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَ يَحَقُّ الْقَوْلُ عَلَيَّ الْكَافِرِينَ، أَسْلَمَ تَسْلَمَ، فَإِنِ ابْتَيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْمُجْرِمِ

“ পরম করুণাময় ও চির দয়ালু মহান আল্লাহর নামে। মহান আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট খসরুর প্রতি। যে সত্যস্বেষণ করে, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং সাক্ষ্য দেয়, - কেবল তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তাঁর কোন শরীক ও সমকক্ষ নেই, আর বিশ্বাস করে, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি মহান আল্লাহর নির্দেশে আপনাকে মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। তিনি সমগ্র মানব জাতিকে পথ প্রদর্শন করার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন যাতে আমি তাদেরকে তাঁর ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন এবং অবিশ্বাসীদের ওপর মহান আল্লাহর যুক্তি পরিপূর্ণ করি। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুন, তা হলে আপনিও নিরাপত্তা লাভ করবেন। আর যদি আপনি ঈমান ও ইসলাম থেকে মুখ

ফিরিয়ে নেন, তা হলে মাজুস্ জাতির (সকল যারথুস্ত্র ধর্মান্বলম্বীর) পাপের বোঝা আপনার কাঁধে বর্তাবে।’ ২০৮

ইরানের মিষ্টভাষী কবি হাকীম নিয়ামী এ ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা কবিতায় বর্ণনা করেছেন :

“ হে দুর্বল অক্ষম নৃপতি! তোমার নাম খসরু
এমনকি যদি তুমি হও শত পানপাত্রের অধিকারী কায়খসরু ২০৯
হয়ো না অহংকারী, কারণ অহংকারী যে, নেই তার অন্তর্দৃষ্টি,
হও শ্রষ্টাদ্রষ্টা; কারণ আ সুরিতায় নেই কোন গ ও নিপুণতা;
সাক্ষ্য দাও, এ বিশ্ব- জগতের রয়েছেন এমন শ্রষ্টা
যিনি নেই কোন স্থানে আবদ্ধ, আর না যিনি কোন স্থানের মুখাপেক্ষী
এমন শ্রষ্টা, যিনি মানুষকে দিয়েছেন নেতৃত্ব
আর তিনিই দিয়েছেন আমাকে মানুষের ওপর পয়গম্বরী।

মহানবীর দূত রাজদরবারে প্রবেশ করলেন। খসরু পারভেজ তাঁর হাত থেকে পত্র নেয়ার আদেশ দিলেন। দূত বললেন : “আমি অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে মহানবীর পত্র অর্পণ করব।” খসরু পারভেজ দোভাষীকে তলব করলেন। দোভাষী পত্র খুলে অনুবাদ করল :

এটা মহান আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্যের সম্রাট খসরুর প্রতি। তখনও অনুবাদক পত্র পড়ে শেষ করতে পারে নি, অমনি ইরানের অধিপতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করে অনুবাদকের হাত থেকে পত্রখানা নিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন এবং চিৎকার করে বললেন : “এ লোকটির স্পর্ধা দেখ! সে আমার নামের আগে নিজের নাম লিখেছে!” তৎক্ষণাৎ পারস্য সম্রাট আবদুল্লাহকে প্রাসাদ থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দেন। আবদুল্লাহ প্রাসাদ থেকে বের হয়ে এলেন এবং নিজের সওয়ারী পশুর উপর আরোহণ করে মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তিনি মহানবীর নিকট পুরো ঘটনা বিস্তারিত বললেন এবং মহানবীও সম্রাট খসরুর অবমাননাকর আচরণে খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর মুখমণ্ডলে তীব্র ক্রোধের চিহ্ন স্পষ্ট

ফুটে উঠল। মহানবী (সা.) সম্রাট খসরু সম্পর্কে বললেন : اللهم مَرِّقْ ملكه “হে আল্লাহ! তার রাজত্বকে টুকরো টুকরো করে দিন।” ২১০

ইরানের প্রসিদ্ধ কবি ও সুবক্তা সাহিত্যিক হাকীম নিয়ামী এ প্রসঙ্গে কবিতা রচনা করেছেন :

যখন দূত পেশ করলেন ঐ নতুন পত্র
তখন শাস্তিদানের অভিপ্রায়ে টগবগিয়ে উঠলো খসরুর রুধির
দেখল সে ভাবগান্ধীর্ষ্যে উদ্দীপ্ত কালো রেখা^{২১১}
যা মুহাম্মদের পক্ষ থেকে পারভেজের প্রতি লেখা
কার আছে এত পিন্ড- বুকুর পাটা
আমার এত মর্যাদা সত্ত্বেও সে কি না
আমার নামের উপর লিখে নিজের নাম!
গর্দান ড়িয়ে দেয়ার পত্রখানা^{২১২} সে ছিঁড়ে করল টুকরো টুকরো
আসলে পত্র নয়; বরং সে নিজেকেই ছিঁড়ে করল টুকরো টুকরো

ঐতিহাসিক ইয়াকুবীর মত

ইয়াকুবীর প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে ওয়াজেহ একটি বর্ণনায় এমন কিছু বলেছেন যা সকল ঐতিহাসিকের মতের বিপরীত। তিনি লিখেছেন, খসরু পারভেজ (পারস্য সম্রাট) মহানবী (সা.)- এর পত্র পড়ে তাঁর সম্মানে এক খণ্ড রেশমী বস্ত্র ও সুগন্ধী উপহার হিসেবে পাঠান। মহানবী সুগন্ধিটি গ্রহণ করে সাহাবীগণের মধ্যে বিলিয়ে দেন। কিন্তু রেশমী বস্ত্র সম্পর্কে বলেন, তা পুরুষদের জন্য হারাম। অতঃপর বলেন : “ইসলাম তার ভূখণ্ডে প্রবেশ করবে।” ২১৩

এক্ষেত্রে একমাত্র আহমদ ইবনে হাম্বল ছাড়া অন্য কোন ঐতিহাসিকের মতই ইয়াকুবীর অনুরূপ নয়। তিনি অনুরূপ মত ব্যক্ত করে বলেছেন, মহানবীর জন্য খসরু পারভেজ কিছু উপহার পাঠান।^{২১৪}

ইয়েমেনের শাসনকর্তার প্রতি খসরু পারভেজের নির্দেশ

ইয়েমেন মার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত একটি অঞ্চল। সেখানে সবসময়ই পারস্যের সাসানী সম্রাটের নিযুক্ত প্রতিনিধি শাসনকাজ পরিচালনা করত। তখন সেখানকার শাসনকর্তা ছিল বজান। খসরু পারভেজ অহংকারবশত ইয়েমেনের শাসনকর্তাকে পত্র লিখলেন :

“ আমার নিকট খবর পৌঁছেছে, মার কুরাইশ বংশের এক ব্যক্তি নবুওয়াত দাবী করেছে। তোমার সেনাদলের দু’জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে তাকে গ্রেফতারের জন্য প্রেরণ কর, যাতে তারা তাকে গ্রেফতার করে আমার কাছে নিয়ে আসে।” ^{২১৫}

ইবনে হাজার তাঁর ‘আল ইসাবাহ্’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, খসরু তার এই সেনাপতিকে নির্দেশ দেন রাসূলকে তাঁর পূর্বসূরিদের ধর্মে বিশ্বাস আনয়নে বাধ্য করতে এবং যদি তিনি তা করতে অস্বীকার করেন, তবে তাঁর মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তার নিকট প্রেরণ করতে। পারস্য সম্রাটের এ পত্র তার অজ্ঞতার পরিচায়ক। কারণ তিনি পরিস্থিতি সম্পর্কে এতটা অনবগত ছিলেন যে, তিনি জানতেন না এই নবুওয়াতের দাবীদার ছয় বছরের অধিক সময় হলো মা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন এবং তাঁর প্রভাব সেখানে এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সম্রাটদের উদ্দেশে পত্র দিচ্ছেন। এমন ব্যক্তিত্বকে বন্দী করার জন্য দু’জন সেনাপতি প্রেরণ সত্যিই হাস্যকর!

ইয়েমেনের শাসনকর্তা কেন্দ্রীয় নির্দেশে দুই শক্তিশালী সেনাপতি ফিরক্য ও খার খাসরাহকে হিজায়ের উদ্দেশে প্রেরণ করল। এ দু’জন মার নিকটবর্তী তায়েফে গিয়ে এক কুরাইশ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করল। সে তাদেরকে বলল, আপনাদের কাজিফত ব্যক্তি মদীনায় বসবাস করছে। তারা মদীনায় মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে বজানের পত্র তাঁর হাতে দিয়ে বললেন : “আমরা ইয়েমেনের শাসকের পক্ষ থেকে আপনাকে বন্দী করে ইয়েমেনে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ পেয়েছি। সম্ভবত আপনি ইয়েমেনে গেলে বজান আপনার পক্ষে খসরু পারভেজের কাছে সুপারিশ করতে পারেন। অন্যথায় আমরা আপনাদের সাথে যুদ্ধ করব এবং সেক্ষেত্রে সাসানী শাসকদের

ক্ষমতার মোকাবেলায় আপনারা পর্যুদস্ত হবেন, আপনাদের ঘর লো ধ্বংস হবে ও পুরুষরা নিহত হবে...।”

মহানবী (সা.) শান্তভাবে তাদের কথা শুনলেন। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাদের দীর্ঘ গোঁফ দেখে তা যে তাঁর অপছন্দ হয়েছে তা বোঝাতে মহানবী বললেন : “আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন শ্মশ্রু দীর্ঘ করার এবং গোঁফ ছোট রাখার।” ২১৬

মহানবী (সা.)- এর শান্ত ও আকর্ষণীয় সৌম্য চেহারা মুবারক এবং ব্যক্তিত্বময় রূপ তাদের ওপর এতটা প্রভাব ফেলেছিল যে, যখন তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তাদের দেহ শিহরিত হচ্ছিল।

মহানবী তাদের বললেন : “আজকে আপনারা যান। আগামীকাল আপনাদের আমার মত জানাব।” ঐ দিনই মহানবী ওহী মারফত জানতে পারলেন, খসরু পারভেজ নিহত হয়েছে। পরের দিন ওই সেনাপতি রাসূলের নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন : “আমার মহান পালনকর্তা আমাকে জানিয়েছেন, খসরু পারভেজকে তার পুত্র শিরাভেই হত্যা করেছে এবং সে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেছে।” যে রাতে খসরু নিহত হয়েছে বলে মহানবী ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা ছিল জমাদিউল আউয়াল মাসের দশম দিন। ২১৭

বজানের প্রেরিত সেনাপতিদ্বয় এ খবর শুনে চমকে উঠে বললেন : “আপনার নবুওয়াতের দাবী অপেক্ষা এ কথা সাসানী সম্রাটকে অধিকতর ক্রোধান্বিত করবে। আমরা এ খবর বজানের নিকট পৌঁছিয়ে এ ব্যাপারে খসরু পারভেজকে জানাতে বলব।”

মহানবী বললেন : “আমি আরো খুশী হব যদি এ কথাটিও তাকে বলেন যে, আমি বলেছি :

إِنَّ دِينِي وَ سُلْطَانِي سَيَلِغُ إِلَى مَنْتَهِي الْخَفِّ وَ الْحَافِرِ

“ আমার ধর্ম ও প্রভাব ঐ পর্যন্ত পৌঁছবে, যেখানে অত্যন্ত তগামী বাহন লো পৌঁছায়।”

অতঃপর মহানবী (সা.) তাঁকে প্রদত্ত এক আরব গোত্রপতির উপহার স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত একটি মূল্যবান কোমরবন্ধ ঐ দুই দূতকে উপহার দিলেন। উভয়ে এতে সন্তুষ্ট হয়ে ইয়েমেনে ফিরে গেল এবং বজানকে মহানবীর বক্তব্য সম্পর্কে জানালো।

বজান বলল : “যদি এ খবর সত্য হয়, তবে নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর নবী এবং আমাদের উচিত তাঁকে অনুসরণ করা।” কিছু সময় অতিক্রান্ত না হতেই শিরাভেইয়ের দূত বজানের জন্য পত্র নিয়ে গেল। তাতে লেখা ছিল :

“ তোমরা জেনে রাখ, আমি খসরু পারভেজকে হত্যা করেছি। জাতির ক্ষোভের কারণে আমি তাকে হত্যা করেছি। কারণ সে পারস্যের অভিজাত ব্যক্তিদের হত্যা করেছিল, সম্মানিতদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। আমার পত্র পৌঁছা মাত্র জনগণ থেকে আমার পক্ষে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ কর। নবুওয়াতের দাবীকারী ব্যক্তিকে তাঁর নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও। আমার পিতার নির্দেশের অনুবর্তী হয়ে তাঁর সঙ্গে কঠোর আচরণ করো না; বরং আমার পরবর্তী নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।”

শিরাভেইয়ের পত্র বজানসহ ইয়েমেনে নিযুক্ত ইরানী বংশোদ্ভূত সকল রাণীয় কর্মকর্তাকে প্রভাবিত করল। ফলে বজান সহ তার কর্মচারীরা রাসূলের নিকট পত্র দিয়ে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা জানাল।

মিশরে ইসলামের দূত

মিশর প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রভূমি, ফিরআউন বংশের শাসকদের রাজধানী এবং কিবতীদের বাসভূমি ছিল। হেজাযের আকাশে ইসলামের সূর্য উদয় কালে মিশর তার স্বাধীনতা হারিয়েছিল। কারণ মুকুকেস রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে মিশরের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিল এ শর্তে যে, বছরে উনিশ মিলিয়ন দিনার কর শোধ করবে।

হাতেব ইবনে আবি বালতায়াহ্ একজন দক্ষ ও সাহসী অশ্বারোহী ছিলেন। ম ১ বিজয়ের ঘটনার সাথে তাঁর নামে বিখ্যাত এক ইতিহাস জড়িত আছে, যা আমরা অষ্টম হিজরীর ঘটনা প্রবাহের আলোচনায় উল্লেখ করব।

তিনি রাসূলের প্রেরিত ছয় দূতের একজন ছিলেন, যাঁরা তাঁর ইসলামের দাওয়াত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সম্রাটদের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব পেয়েছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁকে মিশর শাসনকর্তা মুকুকেসের নিকট পত্র বহন করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দিলেন। মহানবীর পত্রের বাণী ছিল নিম্নরূপ :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى الْمُفَوَّضِ عَظِيمِ الْقِبْطِ، سَلَامٌ عَلَيَّ مِنْ أَتَيْعِ الْهُدَى. أَمَّا بَعْدُ، فَاتَى
أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ، أَسْلَمَ تَسْلَمُ وَ أَسْلَمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ. فَان تَوَلَّيْتَ فَانَّمَا عَلَيْكَ إِثْمُ الْقِبْطِ > وَ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ إِنْ لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ
دُونِ اللَّهِ فَان تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

“ পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। এ পত্র মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে কিবতী সম্রাট মুকুকেসের প্রতি। সত্যপন্থীদের ওপর মহান আল্লাহ্ শাস্তি বর্ষণ করুন। আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করছি। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, যাতে (মহান আল্লাহর শাস্তি হতে) নিরাপত্তা লাভ করতে পারেন। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে আল্লাহ্ আপনাকে দু’টি পুরস্কার দেবেন। আর যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন, তবে মিশরবাসীদের ন্যায়ও আপনার ওপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব! আমরা আপনাদের এমন এক মৌলনীতির দিকে

আহ্বান করছি, যে বিষয়ে আমরা ও আপনারা সমান। আর তা হলো : আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না। আল্লাহকে ছেড়ে আমরা নিজেদের মধ্যকার কাউকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তবে বলে দিন, সাক্ষী থাকুন, আমরা তো (আল্লাহর কাছে) আ সমর্পণকারী।” ২১৮

মহানবীর দূত মিশরে প্রবেশ করে জানতে পারলেন মিশর সম্রাট সমুদ্র তীরবর্তী আলেকজান্দ্রিয়া শহরে একটি সুউচ্চ প্রাসাদে বাস করেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। সেখানে পৌঁছে দ্বীপের ন্যায় ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত সম্রাটের প্রাসাদে নৌকায় পৌঁছলেন। সম্রাট তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। অতঃপর মহানবীর পত্র পড়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। চিন্তার পর মাথা উঠিয়ে মহানবীর দূতকে বললেন : “যদি মুহাম্মদ আল্লাহর নবী হয়ে থাকেন, কিভাবে তাঁর শত্রুরা তাঁকে তাঁর জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করতে পারল এবং তিনি বাধ্য হয়ে মদীনায় গিয়ে বাস করতে লাগলেন? কেন তিনি তাদেরকে অভিশাপ দিলেন না, যাতে তারা তাঁর অভিশাপে ধ্বংস হয়ে যায়?”

মহানবীর প্রশিক্ষিত দূত বললেন : “হযরত ঈসাও আল্লাহর নবী ছিলেন এবং আপনারা তাঁকে নবী বলে মানেন। বনী ইসরাঈল জাতি তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করলে কেন তিনি তাদের অভিশাপ দিলেন না, যাতে তারা ধ্বংস হয়ে যায়?”

মিশর সম্রাট এমন দাঁতভাঙ্গা জবাবের প্রতীক্ষায় ছিলেন না। তাই দূতের এই যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে নীরব হলেন। অতঃপর তাঁর প্রশংসা করে বললেন :

أحسن أنت حكيم جئت من عند حكيم

“ চমৎকার! নিশ্চয়ই আপনি জ্ঞানী এবং একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বের নিকট হতে এসেছেন।” ২১৯

মিশরের শাসনকর্তার অভ্যর্থনায় দূত তাঁর সামনে ইসলাম প্রচারের সাহস পেলেন। তাই বললেন : “আপনার পূর্বে এ ভূখণ্ডে অন্য কেউ (ফিরআউন) শাসন করত। সে মানুষের নিকট নিজেকে খোদা বলে পরিচয় দিত। কিন্তু পরিণতিতে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেছেন। আল্লাহ তা করেছেন এ জন্য যে, তা আপনাদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের কারণ হবে এবং আপনারা তার পথ অনুসরণ করে

যেন অন্যদের জন্য শিক্ষাগ্রহণের উপকরণ না হন। আমাদের নবী মানুষকে পবিত্র এক ধর্মের প্রতি আহ্বান জানান। কুরাইশ মুশরিকরা তাঁর সঙ্গে কঠিন যুদ্ধ করেছে, বিদ্বেষপরায়ণ ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু খ্রিষ্টানরা তাঁর সবচেয়ে নিকটবর্তী। মহান আল্লাহর শপথ! যেমনভাবে হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনভাবে হযরত ঈসাও আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

তাই আপনাদের ইসলাম ও আল্লাহর কিতাব ‘আল কুরআন’ -এর প্রতি আহ্বান করছি, যেমনভাবে আপনারা তাওরাতের অনুসারীদের ইনযীলের প্রতি আহ্বান জানান। যে কেউ কোন নবীর আহ্বান শুনবে, তার উচিত হবে তাঁর অনুসরণ করা। আমি এক নবীর আহ্বান আপনাদের নিকট পৌঁছালাম। আপনার উচিত হবে নিজে ইসলাম গ্রহণ করে স্বজাতিকে এ ধর্ম অনুসরণের আহ্বান জানানো। আমি কখনোই আপনাদের হযরত ঈসার ধর্ম থেকে বেরিয়ে আসতে বলছি না; বরং বলছি তাঁর অনুসৃত রীতি গ্রহণ করুন। তবে জেনে রাখুন, হযরত ঈসার ধর্মের পূর্ণ রূপই হলো ইসলাম।” ২২০

মিশর সম্রাটের সাথে রাসূল (সা.)-এর দূতের সংলাপ শেষ হলো। কিন্তু মুকুকেস তখনও চূড়ান্ত কোন উত্তর প্রদান করেন নি। তাই হাতিব তাঁর জবাব ও পত্র গ্রহণের জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করলেন। একদিন মুকুকেস হাতিবকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে নিয়ে একান্ত সংলাপে বসলেন। মহানবীর ধর্মবিশ্বাস ও পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (সা.)-এর দূত তাঁকে বললেন : “তিনি মানুষকে এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে থাকেন, তাঁর অনুসারীদের প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার, রমজান মাসে রোজা রাখার, আল্লাহর গৃহে হজ্জে যাওয়ার, নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করার নির্দেশ দেন। মৃত প্রাণী ও রক্ত ভক্ষণ হতে নিষেধ করেন; অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আঁ সাতে বারণ করেন...”

হাতিব রাসূল (সা.)-এর জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করলেন এবং তাঁর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বক্তব্য শেষ করলেন। মিশরের শাসনকর্তা তাঁকে বললেন : “নিশ্চয়ই এসব তাঁর

নবুওয়াতের প্রমাণ। আমার ধারণা ছিল, শেষ নবী এখনো আসেন নি। আমি মনে করতাম, তিনি নবিগণের আবির্ভাবের কেন্দ্র সিরিয়ায় আবির্ভূত হবেন, হিজাযে নয়। হে মুহাম্মদের দূত! আপনি জেনে রাখুন, আমি যদি তাঁর ধর্ম মেনেও নিই, কিবতীরা (মিশরের অধিবাসীরা) তা গ্রহণ করবে না। আশা করি, আপনাদের নবীর ক্ষমতার বলয় মিশর পর্যন্ত প্রসারিত হোক এবং তাঁর সঙ্গীগণ এ দেশে অবস্থান গ্রহণ করুন। এভাবে স্থানীয় ক্ষমতামতশালীদের পরাস্ত করে তাদের বাতিল বিশ্বাসের ওপর জয়ী হোন। আমি আপনার নিকট চাই এ কথোপকথনের বিষয় গোপন রাখুন, যাতে কিবতীরা কেউ এ সম্পর্কে জানতে না পারে।” ২২১

মহানবীর প্রতি মুকুকেসের পত্র

মিশর- অধিপতি নিজ আরবী ভাষা বিশেষজ্ঞকে পত্র লেখার জন্য আহবান জানান এবং মহানবীর উদ্দেশে এ পত্র লিখেন :

“ এ পত্র আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদের প্রতি কিবতী সম্রাট মুকুকেসের পক্ষ থেকে। আপনার উপর সালাম ও অভিনন্দন। আমি আপনার পত্র পাঠ করেছি এবং তার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। আমি জানতাম, একজন নবী আবির্ভূত হবেন, কিন্তু আমার ধারণা ছিল, তিনি সিরিয়ায় আসবেন। আমি আপনার দূতকে স্বাগত জানিয়েছি।”

অতঃপর পত্রে তাঁর জন্য প্রেরিত উপহারের উল্লেখ করে সালাম দিয়ে শেষ করেন।^{২২২}

মুকুকেস মহানবী (সা.)- এর প্রতি পত্রে যে ভাষায় কথা বলেছেন এবং যেভাবে তাঁর নাম নিজের নামের পূর্বে উল্লেখ করে সম্মান দিয়েছেন, তাঁর জন্য মূল্যবান উপটোকনসমূহ পাঠিয়েছেন, তদুপরি তাঁর দূতের প্রতি যে বিশেষ সম্মান দেখিয়েছেন- এ সবই বাহ্যিকভাবে প্রমাণ করে যে, মুকুকেস আন্তরিকভাবে মহানবীর দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু জাতির পক্ষ থেকে অভ্যুত্থানের আশংকা ও ক্ষমতার প্রতি মোহ তাঁকে ইসলাম গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়া ও ব্যবহারিকভাবে ইসলাম পালন থেকে বিরত রেখেছিল।

হাতেবকে মুকুকেসের বিশেষ রক্ষী দল সিরিয়া^{২২৩} সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়। অতঃপর সিরিয়া থেকে তিনি আরব কাফেলার সাথে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন। মদীনায় পৌঁছে মুকুকেসের পত্র মহানবীর হাতে দিলে তিনি বললেন : “সে তার শাসন ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ঈমান আনে নি। কিন্তু তার এ ক্ষমতা ও নেতৃত্ব বেশি দিন স্থায়ী হবে না; বরং অচিরেই ধ্বংস হবে।”

পরবর্তীতে আরবের একজন দক্ষ রাজনীতিক, রাজনীতির মঞ্চে নিজের পরিপ তা ও বিচক্ষণতার সাক্ষ্যবাহক এবং এ বৈশিষ্ট্য লোর কারণে খ্যাতি লাভকারী মুগীরা ইবনে শো' বা সাকীফ গোত্রের কয়েক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে মিশর অভিমুখে যাত্রা করল। মিশরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির তা কাছ

জানতে চাইলেন, সে কীভাবে মিশরে প্রবেশ করতে সক্ষম হলো। কারণ মুসলিম সেনাদল মিশর যাওয়ার পথ অবরোধ করে রেখেছে। সে বলল : “সমুদ্রপথে এসেছি।” তাকে প্রশ্ন করা হলো : সাকীফ গোত্র কি মুহাম্মদের দাওয়াত গ্রহণ করেছে?” তারা বলল : “আমাদের মধ্যে কেউই ইসলাম গ্রহণ করে নি।” তখন মিশরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জানতে চাইলেন : মুহাম্মদের স্বগোত্র তাঁর সাথে কিরূপ আচরণ করেছে।” সে বলল : “কুরাইশ বংশের যুবকরা তার ধর্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু প্রৌঢ় ও বৃদ্ধরা তা গ্রহণ করে নি।” তাঁরা রাসূলের ধর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে জানতে চাইলেন। মুগীরা বলল : “সে আমাদের এক আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, আমাদের নামায পড়ার এবং যাকাত দেয়ার আদেশ করে। সেই সাথে আদীত্বের সম্পর্ক রক্ষা ও প্রতিশ্রুতি পালন করতে বলে এবং মদপান, ব্যভিচার ও সূদ হতে বিরত থাকার কথা বলে...”।”

মুকুকেস তার কথায় ছেদ টেনে বলেন : “সাকীফ গোত্র জেনে রাখুক, মুহাম্মদ (সা.) ইলাহী নবী এবং তিনি মানবতার পথনির্দেশের জন্য এসেছেন। যদি তাঁর আহ্বান মিশর ও রোমে পৌঁছে, তবে তারা তাঁর অনুসরণ করবে। কারণ হযরত ঈসা (আ.) এরূপ নবীর অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন। তোমরা তাঁর ধর্ম সম্পর্কে যে বর্ণনা দান করছ, তা পূর্বকার অন্যান্য নবীর আনীত বাণীর অনুরূপ। পরিশেষে তিনি বিজয়ী হবেন এবং তাঁর সঙ্গে যুদ্ধকারীদের আমি সাহায্য করব না।”

মুকুকেসের বক্তব্যে মুগীরা সহ সাকীফ গোত্রের লোকেরা অসন্তুষ্ট হলো। তারা নির্লজ্জতার সাথে বলল, যদি পৃথিবীর সবাই তাঁর ধর্ম গ্রহণ করে, তদুপরি তারা তা গ্রহণ করবে না। মুকুকেস তাদের প্রতি অনীহা প্রকাশ করার জন্য তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রইলেন। অতঃপর বললেন : “এরূপ চিন্তা বালসুলভ।” ২২৪

এ বর্ণনাটি ঐতিহাসিক অন্যান্য বর্ণনার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল। কারণ মহানবী (সা.) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শাসনকর্তার প্রতি সপ্তম হিজরীতে পত্র প্রেরণ করেন এবং মুগীরা পঞ্চম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। এমনকি তিনি হৃদয়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের সঙ্গে ছিলেন এবং কুরাইশ প্রতিনিধি উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফীর সঙ্গে মুসলমানদের পক্ষে

বিতর্কে নিয়োজিত হয়েছিলেন। বর্ণিত ঘটনা সত্য হলে তাঁর পক্ষে হৃদয়বিয়ায় থাকার সম্ভব ছিল না।

পরিশেষে উল্লেখ করতে চাই, ঐতিহাসিক ওয়াকিদী মহানবীর পত্রখানা ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত পত্র থেকে বোঝা যায়, এটি ভিত্তিহীন। কারণ ঐ পত্রের বর্ণনা মতে মহানবী (সা.) মিশর সম্রাটকে তাঁর দেশ আক্রমণের হুমকি দিয়ে বলেছেন : “মহান আল্লাহ আমাকে তাঁর দ্বীন প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, যদি কাফেররা দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।”

এ পত্রের বিষয়বস্তু অগ্রহণযোগ্য। কারণ, সে সময় যেখানে মুসলমানদের মার অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানোরই পর্যাপ্ত শক্তি ছিল না, সেখানে মিশরের ন্যায় দূর্বর্তী স্থানে আক্রমণের তো প্রশ্নই উঠে না। তদুপরি কোন শাসনকর্তার নিকট পাঠানো প্রথম পত্রে এরূপ হুমকি প্রদান বিশ্ব মানবতার প্রধান ব্যক্তিত্বের গৃহীত উদারনীতির পরিপন্থী। কারণ তিনি অন্য সবার চেয়ে ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে সচেতন ছিলেন এবং পরিবেশের উপযুক্ততা ও সময়ের দাবীকে বুঝতেন।

স্মৃতিবহুল আবিসিনিয়ায় মহানবীর দূত

আবিসিনিয়া আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। বর্তমানে ‘ইথিওপিয়া’ নামে প্রসিদ্ধ দেশটির আয়তন আঠারো হাজার বর্গ কিলোমিটার ও এর রাজধানী আদিস আবাবা।

এশিয়ার অধিবাসীরা দীন ইসলামের আবির্ভাবের এক শ’ বছর পূর্বে এ দেশের সাথে পরিচিত হয়। পারস্য সম্রাট আনুশিরওয়ানের শাসনামলে ইরানী সেনাদলের আবিসিনিয়া আক্রমণের মাধ্যমে এ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। মুহাজির মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের মাধ্যমে এ যোগাযোগ পূর্ণতা পায়।

মহানবী (সা.) যখন ছয়জন প্রতিনিধিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শাসনকর্তাদের উদ্দেশে পত্রসহ প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন, তখন আবিসিনিয়ার শাসনকর্তার নিকট ইসলামের আহ্বান বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমর ইবনে দ্বামরীকে মনোনীত করেন। তখন আবিসিনিয়ার শাসক ছিলেন নাজ্জাশী। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। এ পত্র নাজ্জাশীর প্রতি মহানবী (সা.)- এর প্রথম পত্র নয়। কারণ ইতোপূর্বে তাঁর কাছে মুসলমান মুহাজিরদের সম্পর্কে বিবরণ দিয়ে তাঁদের সাথে সদাচরণের আহ্বান জানিয়ে তিনি পত্র দিয়েছিলেন। ঐ পত্রখানাও ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে।^{২২৫} কখনো কখনো মুসলমানদের বিষয়ে সুপারিশ করে লিখিত পত্রের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান সম্বলিত পত্রকে এক করে দেখা হয়েছে অথবা মিশ্রিত করা হয়েছে। যখন মহানবী (সা.) আবিসিনিয়ার উদ্দেশে তাঁর দূত প্রেরণ করেন, তখনও একদল মুহাজির মুসলমান নাজ্জাশীর দরবারে আশ্রিত ছিলেন।

আবিসিনিয়ায় প্রেরিত মুহাজিরগণের একাংশ মদীনায় ফিরে এসেছিলেন এবং ঐ ন্যায়পরায়ণ শাসকের সুশাসন ও সদাচরণের সুন্দর স্মৃতি বহন করে এনেছিলেন। তাই আবিসিনিয়া মুসলমানদের জন্য স্মৃতিবহুল স্থান ছিল। আবিসিনিয়ার শাসকের প্রতি প্রেরিত পত্রে আমরা যে বিশেষ কোমল ভাব ও নমনীয়তা লক্ষ্য করি, তার কারণ মুসলমানদের প্রতি তাঁর সহৃদয় আচরণ এবং তাঁর উন্নত নৈতিক বৈশিষ্ট্য, যে সম্পর্কে মহানবী (সা.) পরিচিত ছিলেন।

অন্যান্য শাসকের প্রতি প্রেরিত পত্রে মহানবী আল্লাহর কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করতেন এবং সতর্ক করতেন এ বলে, যদি তারা ঈমান না আনে, তবে আদ জাতির বিপথগামিতার নাহ তাদের উপর বর্তাবে। কিন্তু এ পত্রে এরূপ কোন ভাষা নেই। মহানবী (সা.)- এর পত্রখানা ছিল এরূপ :

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى النجاشي ملك الحبشه، سلام عليك فاني احمد الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، اشهد ان عيسي بن مريم روح الله و كلمته القاها الى مريم البتول الطيبة الحصيئة فحملت بعيسي، حملته من روحه و نفخه كما خلق آدم بيده. و اني ادعوك الى الله وحده لا شريك له و الموالاة علي طاعته، و ان تتبعني و توقن بالذي جائي، فاني رسول الله و اني ادعوك و جنودك الى الله عز و جل، و قد بلغت و نصحت فاقبلوا نصيحتي و السلام علي من اتبع الهدى

“ পরম করুণাময় ও অনন্ত দাতা আল্লাহর নামে। এ পত্র আল্লাহর নবী মুহাম্মদের পক্ষ থেকে আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা নাজ্জাশীর প্রতি। আপনার উপর সালাম। আমি একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি সকল দ্রুটি ও অপূর্ণতা হতে মুক্ত। তাঁর অনুগত বান্দারা তাঁর শাস্তি হতে নিরাপত্তা লাভ করবে এবং তিনি তাঁর বান্দাদের উপর সাক্ষী ও দ্রষ্টা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মারিয়ামের পুত্র ঈসা রুহুল্লাহ্ এবং তিনি পবিত্র ও দুনিয়াবিমুখ নারী মারিয়ামের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী আল্লাহর এক নিদর্শনস্বরূপ। মহান আল্লাহ তাঁর ইলাহী শক্তিতে তাঁকে পিতা ছাড়া মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেছেন, যেমনভাবে আদমকে পিতা-মাতা ছাড়া সৃষ্টি করেছিলেন। আমি আপনাকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি, যাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি চাই, আপনি সবসময় আল্লাহর অনুগত থাকুন। সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনুন, যিনি আমাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আবিসিনিয়ার সম্রাট! জেনে রাখুন, আমি আল্লাহর নবী। আমি আপনাকে ও আপনার সকল অনুসারী ও অনুগতদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। আমি এই পত্রসহ দূত প্রেরণের মাধ্যমে আমার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালন করলাম এবং এর মাধ্যমে আপনাকে উপদেশ দান করলাম। সত্যপন্থীদের প্রতি সালাম।” ২২৬

মহানবী (সা.) সালামের মাধ্যমে এ পত্র শুরু করেছেন। স্বয়ং আবিসিনিয়ার সম্রাটের প্রতি সালাম দিয়েছেন। এটি একটি ব্যতিক্রম। কারণ রোম, ইরান, মিশর প্রভৃতি দেশের শাসকদের প্রতি তিনি

সালাম দেন নি; বরং ‘যারা সত্যের অনুসারী, তাদের উপর সালাম’ - এ কথা দিয়ে পত্র শুরু করেছিলেন, কিন্তু এ পত্রে স্বয়ং প্রতিপক্ষের প্রতি সালাম দিয়েছেন। এভাবে তাঁকে বিশেষ সম্মানিত করেছেন, যা সমসাময়িক অন্যান্য শাসকদের থেকে তাঁর ব্যতিক্রম হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে।

এ পত্রে মহান আল্লাহর কিছুসংখ্যক মহত্বসূচক ও পবিত্রতা জ্ঞাপক গণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর হযরত ঈসার আল্লাহর সমকক্ষ হওয়ার বিষয়টি, - যা খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের সৃষ্ট বাতিল বিশ্বাস, - উল্লেখ করে পবিত্র কুরআন থেকে এর বিপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত ঈসার সৃষ্টিকে হযরত আদমের সৃষ্টির সাথে তুলনা করে বোঝানো হয়েছে, যদি পিতা না থাকে কারো খোদা হওয়ার প্রমাণ হয়, তা হলে হযরত আদমও তা ছিলেন, অথচ তাঁর বিষয়ে কেউই ঐরূপ বিশ্বাস রাখে না।

পত্রের শেষের বাণী উপদেশমূলক ছিল। এর মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে বিশেষভাবে উপস্থাপন থেকে বিরত থাকা হয়েছে।

মহানবী (সা.)- এর দূতের সাথে আবিসিনিয়ার সম্রাটের সংলাপ

মহানবীর দূত বিশেষ অভ্যর্থনার পর সম্রাটের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : “আমার উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আমার নেতার বাণী আপনার নিকট পৌঁছানোর। আপনার পবিত্র প্রকৃতি ও বিবেকের ওপর এই বাণীর যথার্থতা যাচাইয়ের দায়িত্ব দিচ্ছি।

হে ন্যায়পরায়ণ সম্রাট! মুসলমান প্রবাসীদের প্রতি আপনার সহানুভূতিশীল আচরণ ভুলে যাওয়ার মতো নয় এবং আপনার নিবেদিতপ্রাণ ভূমিকা আমাদের এতটা প্রভাবিত করেছে যে, আমরা আপনাকে নিজেদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের একজন বলে জানি। আপনার উপর আমাদের এতটা আস্থা রয়েছে, যেন আপনি আমাদেরই একজন সহযোগী।

আপনাদের ইনযীল অগ্রাহ্যকরণও বিতর্কের উর্ধ্বের এক শক্তিশালী দলিল। এ গ্রন্থ ন্যায়বিচারক, যে তার বিচারের ক্ষেত্রে অন্যায়ের পক্ষ নেয় না। এ ন্যায়ের ধারক সুস্পষ্টভাবে আমাদের নবীর নবুওয়াতের পক্ষে সাক্ষ্য দান করে। যদি আপনি এই বিশ্বজনীন ও সর্বশেষ নবীর

অনুসরণ করেন, তবে মহাকল্যাণ লাভ করতে পারবেন। আর যদি তা গ্রহণ না করেন, তা হলে আপনার উদাহরণ ইহুদীদের মতো হবে, যারা হযরত মূসা (আ.)- এর শরীয়তের রহিতকারী হযরত ঈসা (আ.)- এর শরীয়তকে অস্বীকার করেছিল। তারা রহিত শরীয়তকেই আঁকড়ে ধরেছিল। বর্তমানে ইসলামের শরীয়ত হযরত ঈসার আনীত শরীয়তকে রহিত ঘোষণা করে পূর্ণতম শরীয়ত উপস্থাপন করেছে।”

আবিসিনিয়ার সম্রাট মহানবীর দূতকে বললেন :

“ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেই প্রতিশ্রুত নবী, যাঁর প্রতীক্ষায় আহলে কিতাবরা (পূর্বেকার ইলাহী কিতাবধারীরা) রয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি, যেমনভাবে হযরত মূসা (আ.) হযরত ঈসা (আ.)- এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে হযরত ঈসা (আ.) শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর পরিচিতি লাভের চিহ্নসমূহ সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। আমি তাঁর নবুওয়াতের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এখনো তার উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হয় নি এবং আমার সহযোগীদের সংখ্যাও কম। তাই এ জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে, যাতে সকলে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যদি আমার পক্ষে সম্ভব হতো, তা হলে আমি এখনই আপনাদের নবীর কাছে উপস্থিত হতাম।” ২২৭

মহানবীর প্রতি নাজ্জাশীর পত্র

“ পরম করুণাময় ও অনন্ত দাতা আল্লাহর নামে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের প্রতি নাজ্জাশীর পত্র। যিনি ব্যতীত খোদা নেই এবং যিনি আমাকে ইসলামের প্রতি পরিচালিত ও হেদায়েত করেছেন, তাঁর শান্তি আপনার প্রতি বর্ষিত হোক। হযরত ঈসা (আ.)- এর নবী ও মানুষ হওয়ার বিষয়ে আপনার পত্রে উল্লিখিত প্রমাণসমূহ আমি লক্ষ্য করেছি। আমি তার কোন বিরোধিতা করি না। আপনার ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে জানতে পারলাম। আমার অতিথি মুহাজির মুসলমানদের প্রতি যতটা সম্ভব দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। আমি এ পত্রের মাধ্যমে সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর প্রেরিত এবং সত্যবাদী ব্যক্তি (নবী), যাঁর প্রতি ইলাহী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। আমি আপনার চাচাতো ভাইয়ের (জাফর ইবনে আবী তালিবের) সামনে ইসলাম গ্রহণ ও আপনার আনুগত্যের বাইয়াত করেছি। আমি আমার বাণী এবং ইসলাম গ্রহণের স্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্য নিজ পুত্র রারহাকে পত্রসহ আপনার পবিত্র সমীপে প্রেরণ করছি। আমি সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করছি, আমি শুধু নিজের জিম্মাদার, অন্য কারো নয়। যদি আপনি নির্দেশ দেন, আমি আপনার সমীপে উপস্থিত হব। হে আল্লাহর নবী! আপনার উপর সালাম।” ২২৮

নাজ্জাশী রাসূলের সমীপে বিশেষ উপহার পাঠান এবং মহানবীও তাঁর উদ্দেশে আরো দু’খানা পত্র প্রেরণ করেন।

রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রতি মহানবীর পত্র প্রেরণের গুরুত্ব

তৎকালীন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেকেই হয় তো ভেবেছেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শাসকদের প্রতি পত্র প্রেরণের বিষয়টি প্রচলিত রীতি বিরোধী একটি কাজ। কিন্তু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, মহানবীর পত্র প্রেরণের পেছনে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য ভিন্ন কিছু ছিল না :

প্রথমত ছয়জন দূতকে বিশ্বের বিভিন্ন রুত্বপূর্ণ অঞ্চলের শাসকদের উদ্দেশে সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী দলিলভিত্তিক পত্রসহ প্রেরণ এ লক্ষ্যে ছিল যে, ভবিষ্যতে বিরোধীরা যেন আপত্তি উত্থাপন ও সন্দেহ প্রকাশের সুযোগ না পায়। আজ কারো পক্ষে সন্দেহ পোষণের অবকাশ নেই, মহানবীর আহ্বান বিশ্বজনীন ছিল এবং ইসলাম বিশ্বজনীন হওয়ার কারণেই তিনি সবার প্রতি এ আহ্বান রেখেছিলেন। উপরন্তু এর সপক্ষে পবিত্র কুরআনেও আয়াত রয়েছে। তাঁর নবুওয়াত বিশ্বজনীন প্রমাণের জন্য দূত প্রেরণের বিষয়টি সবচেয়ে বড়।

দ্বিতীয়ত পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ ব্যতীত বাকী সকল শাসনকর্তাই রাসূলের দাওয়াতে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর দূতদের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। খসরু পারভেজ অহংকারী ও স্বৈরাচারী হওয়ার কারণে এর বিপরীত আচরণ করেছিল।

দূত প্রেরণের কারণেই আরবদের মাঝে নবী আবির্ভূত হয়েছেন বলে সবাই জানতে পারে এবং ধর্মীয় মহল লোতে এটি একটি আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়। এ পত্রসমূহ ঘুমন্তদের জাগ্রত করে, অমনোযোগী ও অসচেতনদের নাড়া দেয় এবং বিশ্বের সভ্য জাতি লোকে প্রতিশ্রুত নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে গবেষণা করতে এবং নতুন করে তওরাত ও ইনযীল অধ্যয়নে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে যে সকল ধর্মযাজক, পুরোহিত ও ধর্ম বিশেষজ্ঞ অন্ধত্ব ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর উর্ধ্বে ছিলেন, তাঁরা বিভিন্নভাবে নতুন ধর্ম নিয়ে নিরপেক্ষ গবেষণার সুযোগ পান। তৎকালীন অনেক ধর্মীয় পণ্ডিতই রাসূলের জীবনের শেষ দিকে বা তাঁর ওফাতের পর মদীনায় গিয়ে নতুন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা চালিয়েছেন।

নাজ্জাশীর ওপর মহানবীর পত্রের প্রভাব

নাজ্জাশী মহানবীর প্রেরিত দূতকে উপটৌকন সহ বিদায় করার পর আবিসিনিয়ার বিভিন্ন ধর্মযাজক ও ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে সত্য এ ধর্মের সাথে পরিচিত করানোর জন্য ত্রিশ সদস্যের একদল পণ্ডিত ব্যক্তিকে মদীনার উদ্দেশে প্রেরণ করেন। তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, এই ব্যক্তিবর্গ মহানবীর সরল ও সাধারণ জীবনযাত্রা কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করুন এবং জানুন যে, তিনি তৎকালীন শাসকদের ন্যায় জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করেন না।

নাজ্জাশীর প্রেরিত ধর্মীয় প্রতিনিধিদল মহানবীর সকাশে উপস্থিত হয়ে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করলেন। তিনি হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কিত সূরা মায়িদার একখানা আয়াত পাঠের মাধ্যমে তাঁর বিশ্বাস ব্যাখ্যা করলেন। আয়াতের ভাবার্থ তাদের এতটা প্রভাবিত করল, আপনাপনি তাঁদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল।

আয়াতের অনুবাদ :

“ যখন আল্লাহ বলবেন : হে ঈসা ইবনে মারিয়াম! তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আবার দ্বারা সাহায্য করেছি (শিশু কালে) ও পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে প্রচারজ্ঞান, তওরাত ও ইনযীল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখির প্রতিকৃতির মতো প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার নির্দেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুঁক দিতে, এবং তা আমার আদেশে জীবিত পাখি হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ত ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় দান করতে এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে (জীবিত করে) বের করতে এবং যখন আমি বনী ইসরাঈলকে তোমা হতে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে; অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা বলল : এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছু নয়।” (সূরা মায়িদাহ : ১১০)

এই প্রতিনিধি দল মহানবীর ধর্ম নিয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে গবেষণার পর আবিসিনিয়ায় ফিরে গিয়ে সম্রাটের কাছে প্রতিবেদন পেশ করল।^{২২৯}

ইবনে আসির^{২৩০} প্রতিনিধি দলের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, তারা সবাই সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

কিন্তু যেহেতু ইবনে আসির আবিসিনিয়ার রাজার পত্র মহানবীর (সা.) হাতে পৌঁছেছিল বলেছেন, তাই নিঃসন্দেহে এই প্রতিনিধিদলের বার্তাবাহক তাতে নিমজ্জিত হন নি এবং তাঁর মতে নাজ্জাশীর পুত্র আরস ইবনে আসহাম^{২৩১} তাঁর পত্রবাহক ছিলেন, যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

গাসসানী শাসকের প্রতি মহানবীর পত্র

গাসসান প্রাচীন কাহতানী বংশের আজদ গোত্রের একটি শাখা, যারা দীর্ঘ দিন যাবত ইয়েমেনে বাস করছিল। তাদের কৃষি ভূমি মারাব বাঁধের পানি দ্বারা সিঞ্চিত হতো। ঐ বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর তারা সিরিয়ায় বসবাস শুরু করে। তাদের প্রশাসনিক দক্ষতা স্থানীয় অধিবাসীদেরও তাদের প্রভাবাধীন করে ফেলে এবং তারা ঐ অঞ্চলে গাসসানী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করে। অবশ্য তারা রোম সম্রাটের অধীন ছিল। ইসলাম তাদের শাসনের পতন ঘটানো পর্যন্ত বত্রিশ জন শাসক সিরিয়ার জাওলান, দামেস্ক ও ইয়ারমুক অঞ্চলে শাসনকাজ পরিচালনা করেছে।

সুজা ইবনে ওয়াহাব মহানবীর প্রেরিত (ইসলামের বিশ্বজনীন বার্তাবাহী) ছয়জন দূতের অন্যতম, যিনি গাসসানী শাসকের নিকট পত্র নিয়ে যান। তিনি 'বায়ুজা' নামক স্থানে গাসসানী শাসক হারিস ইবনে আবি শিমরের নিকট রাসূলের পত্র হস্তান্তর করেন, যখন মহানবী (সা.)- এর দূত হারিস শাসিত অঞ্চলে পৌঁছার সময় সে রোম সম্রাটকে অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। রোম সম্রাট প্রতিপক্ষ ও শত্রু ইরানের বিরুদ্ধে জয় লাভের কারণে বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারতের মানত পূরণের লক্ষ্যে কনস্টান্টিনোপল থেকে পায়ে হেঁটে সিরিয়ার উপর দিয়ে জেরুযালেম যাচ্ছিলেন।

এ কারণে গাসসানী শাসকের সাথে সাক্ষাৎ করতে মহানবীর দূতকে কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এ সময়ে তিনি হারিসের অভ্যর্থনা কমিটির প্রধান হাজেরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তাঁকে মহানবীর পবিত্র জীবনপ্রণালী ও তাঁর আনীত মহান ধর্মের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করেন। রাসূলের দূতের আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা অভ্যর্থনা কমিটির প্রধানের মনে আশ্চর্য প্রভাব ফেলে এবং তাঁর চিন্তার জগতে বৈ বিক পরিবর্তন আসে। তিনি এতটা প্রভাবিত হলেন যে, তাঁর চোখ দিয়ে অব্যবহিত ধারায় অশ্রু ঝরছিল। তিনি মহানবীর দূতকে বললেন : “আমি ইনযীল ভালোভাবে পড়েছি এবং শেষ নবীর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পড়েছি। এখনই আমি তাঁর উপর ঈমান আনছি। কিন্তু হারিস যদি তা জানতে পারে, তা হলে আমাকে হত্যা

করবে। হারিস নিজে রোম সম্রাটের ভয়ে ভীত। তাই যদি সে তোমার কথা বিশ্বাসও করে, তবু তা প্রকাশ করার সাহস পাবে না। তা ছাড়া সে সহ তার পূর্বপুরুষ সবাই এ অঞ্চলে রোম সম্রাটের বদান্যতায় শাসনকাজ চালাচ্ছে।”

কয়েক দিন অপেক্ষার পর হারিসের নিকট তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো। সে তখন সিংহাসনে মুকুট পরে বসেছিল। রাসূলের দূত পত্রটি তার হাতে দিলেন। পত্রটি এরূপ :

“ পরম করুণাময় ও দাতা আল্লাহর নামে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে হারিস ইবনে আবি শিমরের প্রতি। সত্যের অনুসারী ও প্রকৃত ঈমানদারদের উপর সালাম। তোমাকে একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর, - যাঁর কোন শরীক নেই, - তাঁর প্রতি আহ্বান করছি। যদি তুমি ঈমান আনয়ন কর, তোমার ক্ষমতা বহাল থাকবে।”

পত্রের শেষ অংশ হারিসকে ক্রোধান্বিত করল। সে বলল : “আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষমতা কারো নেই। আমি অবশ্যই এই নবী দাবীকারীকে গ্রেফতার করব।” অতঃপর মহানবীর দূতকে ভীত করার লক্ষ্যে প্রধান সেনাপতিকে তাঁর সামনে সামরিক মহড়া প্রদর্শনের নির্দেশ দিল। তা ছাড়া নিজেকে প্রদর্শন করার জন্য রোম সম্রাটের নিকট এ মর্মে পত্র দিল যে, এই নবী দাবীকারীকে সে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঘটনাক্রমে গাসসানী শাসকের পত্র নিয়ে যখন দূত রোমের সম্রাটের নিকট পৌঁছল, ঠিক সে সময় মহানবীর অন্যতম দূত দাহিয়া কালবী রোম সম্রাটের সামনে উপস্থিত ছিলেন। রোম সম্রাট মহানবীর আনীত ধর্ম নিয়ে পর্যালোচনা করছিলেন। গাসসানী শাসকের বাড়াবাড়িতে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি তার পত্রের জবাবে লিখলেন : “তোমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন কর। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ইলঙ্গিয়ায় আস।”

النَّاسِ عَلِي دِينَ مَلُوكِهِمْ অর্থাৎ ‘জনসাধারণ শাসকদের ধর্মের অনুবর্তী’ - এ রীতির প্রতিফলন

গাসসানী শাসকের আচরণেও ঘটল। রোম সম্রাটের চিন্তা-পদ্ধতি ও গৃহীত রীতি হারিসের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটালো। সে মহানবীর দূতের প্রতি আচরণ পরিবর্তন করল এবং সম্মানের বিশেষ পোশাক তাঁর হাতে দিয়ে মদীনায় ফিরে রাসূলকে তার সালাম পৌঁছে দিয়ে বলতে বলল, সেও মহানবীর একজন প্রকৃত অনুসারী। কিন্তু মহানবী (সা.) তার টনৈতিক উত্তরে

প্রভাবিত না হয়ে বললেন : “অচিরেই তার শাসন- ক্ষমতার অবসান ঘটবে।” হারিস এ ঘটনার
এক বছর পর অষ্টম হিজরীতে মৃত্যুবরণ করে।

মহানবীর ষষ্ঠ দূতের ইয়ামামায় গমন

মহানবীর ষষ্ঠ দূত বাহরাইন ও নাজদের মধ্যবর্তী ইয়ামামায় প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে ইয়ামামার শাসক হাওয়াত ইবনে আল্লাল হানাফীর নিকট তাঁর পত্র পৌঁছালেন। পত্রের বাণী ছিল নিম্নরূপ :

“ পরম করুণাময় ও দাতা আল্লাহর নামে। সৎপথ প্রাপ্তদের উপর সালাম। আপনি জেনে রাখুন, আমার আনীত দ্বীন তগামী বাহন যে পর্যন্ত পৌঁছায় (পূর্ব- পশ্চিম সকল দিকে), সে পর্যন্ত পৌঁছবে। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, তবেই নিরাপত্তা লাভ করবেন এবং আপনার রাজত্ব টিকে থাকবে।”

ইয়ামামার শাসক খ্রিষ্টান ছিলেন, এজন্য মহানবী (সা.) সেখানে প্রেরণের জন্য এমন এক ব্যক্তিকে দূত মনোনীত করেছিলেন, যিনি দীর্ঘদিন আবিসিনিয়ায় ছিলেন এবং খ্রিষ্টীয় আচার, বিশ্বাস ও ধর্মীয় যুক্তিসমূহ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এই দূতের নাম সুলাইত ইবনে আমর, যিনি মুসলমানরা মায় মুশরিকদের চরম নির্যাতনের শিকার থাকাকালে রাসূলের নির্দেশে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। ইসলামের উন্নত শিক্ষা এবং বিভিন্ন স্থানে সফরে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফলে তাঁর বক্তব্য দানের ক্ষমতা এবং সাহস বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তিনি একজন বাগ্মী ও সাহসী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর যুক্তিপূর্ণ ও আকর্ষণীয় বক্তব্যের মাধ্যমে ইয়ামামার শাসককে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে বলেন : “সেই ব্যক্তিই মহান, যে ঈমানের স্বাদ আনন্দ করেছেন এবং খোদাভীতিকে পাথেয় বানিয়েছেন। যে জাতি আপনার নেতৃত্বে সৌভাগ্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছবে, তার পরিণতি কখনো মন্দ হতে পারে না। আমি আপনাকে সর্বোত্তম বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এবং নিকৃষ্ট বিষয় হতে দূরে থাকার উপদেশ দিচ্ছি। আমি আপনাকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি এবং শয়তানের উপাসনা ও মন্দ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে নিষেধ করছি। আল্লাহর ইবাদতের সুফল চিরস্থায়ী বেহেশ্ত এবং শয়তান ও প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিণতি জাহান্নাম। আমি

যা বলছি, তা ছাড়া অন্য কিছু যদি গ্রহণ করেন, তবে অপেক্ষা করুন পর্দা উন্মোচিত হয়ে মহাসত্য প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত।”

ইয়ামামার শাসকের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল রাসূলের দূতের কথা তার মনে প্রভাব ফেলেছে। সে দূতের কাছে মহানবীর নবুওয়াতের বিষয়ে চিন্তার জন্য কয়েক দিন সময় চাইল। ঘটনাক্রমে সে সময়ে রোম থেকে একজন প্রথম সারির ধর্মযাজক ইয়ামামায় গেলেন। ইয়ামামার শাসক তাঁর কাছে ঘটনা খুলে বললে তিনি বললেন : “কেন তাঁর সত্যায়ন থেকে বিরত রয়েছ?” সে বলল : “আমি আমার রাজত্ব ও ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ভীত।” ধর্মযাজক বললেন : “আমার মনে হয়, তাঁর অনুসরণ করাই কল্যাণকর ও শ্রেয়। কারণ তিনিই সেই আরব নবী, যাঁর সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ.) সংবাদ দিয়েছেন এবং ইনযীলে উল্লিখিত হয়েছে, মুহাম্মদ আল্লাহর নবী।”

ধর্মযাজকের উপদেশমূলক বাণী তাকে মানসিক শক্তি দান করল এবং সে মহানবীর দূতকে ডেকে নিম্নোক্ত (বক্তব্য সম্বলিত) পত্র প্রদান করল : “আপনি আমাকে সবচেয়ে সুন্দর ধর্মের প্রতি আহ্বান করেছেন। আমি আমার জাতির মধ্যে সবচেয়ে বাগ্মী ব্যক্তি ও শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পরিচিত। আরবদের মধ্যে আমার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আমি আপনার ধর্ম অনুসরণে রাজি আছি। তবে এ শর্তে যে, আপনি আমাকে ধর্মীয় বিশেষ মর্যাদা দেবেন এবং আপনার মর্যাদার অংশীদার (প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত) করবেন।”

সে এ পর্যন্ত বলেই ক্ষান্ত হলো না; বরং মাজাআ ইবনে মারারার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দলকে তার বক্তব্য পৌঁছে দেয়ার জন্য মদীনায় প্রেরণ করল এবং তাদেরকে বলে পাঠালো যে, যদি রাসূল তাঁর মৃত্যুর পর তাকে তাঁর স্থলবর্তী করেন, তবে সে ইসলাম গ্রহণ করবে ও তাঁকে সহযোগিতা করবে, নতুবা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তার প্রেরিত প্রতিনিধিরা মহানবীর নিকট উপস্থিত হয়ে শর্তহীন ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে ইয়ামামার শাসকের বাণী তাঁর কাছে পৌঁছাল। মহানবী (সা.) তার কথা শুনে বললেন : “যদি তার ঈমান আনা শর্তাধীন হয়ে থাকে, তবে সে খিলাফত লাভের উপযুক্ত নয়। আল্লাহ আমাকে তার অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন।” ২৩২

মহানবীর অন্যান্য পত্র

মহানবী (সা.) বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকবর্গ ও গোত্রপতিদের নিকট যে পত্রসমূহ দিয়েছেন, তার সংখ্যা অনেক। ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ মহানবীর প্রেরিত উনত্রিশখানা পত্রের বিবরণ উল্লেখ করেছেন। আমরা গ্রন্থের কলেবর যাতে বৃদ্ধি না পায়, সে লক্ষ্যে অন্যসবের উল্লেখ থেকে বিরত থাকছি।

চুয়াল্লিশতম অধ্যায় : সপ্তম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

খাইবরের দুর্ভেদ্য দুর্গ (আশংকার কেন্দ্র)

ইসলামের প্রদীপ- নক্ষত্র মদীনার আকাশে আলো বিকিরণ শুরু করলে মদীনার ইহুদীরা মার কুরাইশদের থেকেও মহানবী ও মুসলমানদের শত্রুর চোখে দেখতে লাগল এবং সর্বশক্তি দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো।

মদীনা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ইহুদীরা তাদের অপতৎপরতা ও মন্দ কর্মের পরিণতিতেই দুর্ভাগ্যে পতিত হয়। তাদের অনেকেই মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হয় এবং কোন কোন গোত্র, যেমন বনী কাইনুকা এবং বনী নাযীর মদীনা থেকে বহিস্কৃত হয়। তারা খাইবর, ওয়াদিউল কুরা বা আযারআতে শামে নতুনভাবে বসতি স্থাপন করে।

মদীনার ৩২ ফারসাখ (প্রায় ২০০ কিলোমিটার) দূরবর্তী খাইবর উপত্যকায় অবস্থিত সমতল ভূমিটি অত্যন্ত উর্বর ছিল। মহানবীর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে ইহুদীরা বসবাস ও আ রক্ষার জন্য সেখানে সাতটি দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করেছিল। ঐ অঞ্চলের ভূমি ও আবহাওয়া কৃষিকাজের জন্য খুবই উপযোগী থাকায় ওখানে বসবাসকারীরা কৃষিকাজের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জনে সক্ষম হয়েছিল, যার দ্বারা তারা আ রক্ষার জন্য অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। তারা এক্ষেত্রে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিল। সেখানকার জনসংখ্যা বিশ হাজারের অধিক ছিল এবং তাদের মধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক সাহসী ও দক্ষ যোদ্ধা ছিল।^{২৩৩}

খাইবরের ইহুদীদের সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল, তারা আরবের সকল গোত্রকে মদীনার ইসলামী সরকার উৎখাতে উস্কানি দিচ্ছিল এবং মুশরিকরা ইহুদীদের অর্থনৈতিক ও যুদ্ধ সরঞ্জামের পৃষ্ঠপোষকতায় আরবের সকল প্রান্ত থেকে মদীনার সন্নিকটে সমবেত হয়েছিল। এর পরিণতিতে খন্দকের (আহযাব) যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যার বিবরণ পাঠকরা পূর্বে পাঠ করেছেন। ঐ যুদ্ধে মহানবীর রণকৌশল ও তাঁর সঙ্গীগণের নিবেদিতপ্রাণ ভূমিকার ফলে আক্রমণকারীরা এক মাস পরিখার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণের পর নিজেদের ঘরে, যেমন খাইবরের ইহুদীরা খাইবরে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হয় এবং ইসলামের কেন্দ্র নিরাপত্তা লাভ করে ও শান্তি ফিরে আসে।

খাইবরের ইহুদীদের কাপুরসোচিত ভূমিকা মহানবীকে বিশৃঙ্খলা ও আশংকার এ কেন্দ্রে আক্রমণ করে তাদের উচ্ছেদ ও নিরস্ত্র করার এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। কারণ, এ আশংকা ছিল, এক ঐয়ে ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এ জাতি আরবের গোত্র লোকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নতুন করে উস্কানী দেবে এবং আহযাবের যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। বিশেষত কুরাইশদের মূর্তিপূজা ও স্বধর্মের প্রতি যতটা গোঁড়ামি ছিল, ইহুদীদের স্বধর্মের প্রতি গোঁড়ামি তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। এ কারণেই এক হাজার মূর্তিপূজকের বিপরীতে একজন ইহুদীও ইসলাম গ্রহণ করে নি। তারা এতটা গোঁড়া ছিল যে, নিজ ধর্ম ত্যাগ করে সত্য ধর্ম গ্রহণে তাদের কোন আগ্রহই ছিল না।

অন্য যে বিষয়টি মহানবীকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেছিল, তা হলো, তিনি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকদের প্রতি মাধুর্যপূর্ণ ভাষায় পত্র দিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। এ প্রেক্ষিতে বিশেষত পারস্য ও রোম সম্রাট ইহুদীদের ব্যবহার করে মুসলমানদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ এবং দীন ইসলামকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার প্রচেষ্টা নিতে পারে এ আশংকায় ইহুদীদের কর্মকাণ্ডের উপর কড়া নজর রাখা এবং তাদেরকে নিরস্ত্র করা প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে এ সম্ভাবনাও ছিল, ইহুদীরা রোম ও পারস্য সম্রাটদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে, যেভাবে ইতোপূর্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সংগঠিত করেছিল। বিশেষত ঐ সময়ে ইরান ও রোমের মধ্যকার যুদ্ধে তারা এক পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করত। এসব দিক চিন্তা করে মহানবী (সা.) দেখলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ বিপজ্জনক অগ্নি নির্বাপন দরকার। এ কাজের জন্য তখনই ছিল উপযুক্ত সময়। কারণ হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণের কোন সম্ভাবনা ছিল না; বরং সেদিক থেকে মদীনা নিরাপদ ছিল। আর সে মুহূর্তে ইহুদীদের সংগঠিত শক্তির উপর আক্রমণ ঘটলে কুরাইশরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। অন্যদিকে আহযাবের যুদ্ধে ইহুদীদের সহযোগী মদীনার উত্তরের গাতফান গোত্রসহ অন্যান্য গোত্র, যারা তাদের সাহায্য করতে পারে, তাদের বিষয়েও মহানবী বিশেষ পরিকল্পনা নিলেন।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে আরব ভূখণ্ডে ইহুদীদের সর্বশেষ কেন্দ্র দখলের লক্ষ্যে মহানবী (সা.) মুসলমানদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বললেন, এ যুদ্ধে শুধু তারাই সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে যারা হৃদয়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছিল। অন্যরা ইচ্ছা করলে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারে, কিন্তু গনীমত থেকে কিছুই পাবে না। রাসূল (সা.) গাইলা লাইসীকে মদীনায় তাঁর স্থলবর্তী করে হযরত আলীর হাতে সাদা পতাকা দিয়ে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। সেনাদল ত গন্তব্যে পৌঁছার জন্য উট চালানোর সময় বিশেষ সঙ্গীত (হিদা) গাওয়ার অনুমতি দিলেন। উটচালক দলের অগ্রগামী ব্যক্তি আমের ইবনে আকওয়া নিম্নোক্ত কবিতা পড়ছিলেন :

والله لولا الله ما اهتدينا
 ولا تــــــصدقنا ولا صلينا
 اننا إذا قوم بغوا علينا
 وان أرادوا فتنة ايــــنا
 فانزلن سنــــكينة علينا
 وثبتت الأقدام ان لاقينا

অর্থাৎ আল্লাহর শপথ, যদি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ না থাকত, তবে আমরা বিপথগামী হতাম। কোন যাকাতও দিতাম না, নামাযও পড়তাম না। আমরা এমন এক জাতি, যদি কেউ আমাদের উপর জুলুম করে বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, আমরা তাদের অধীনতাকে মানি না। আল্লাহ আমাদের তাঁর পথে অবিচল রাখুন এবং আমাদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করুন।

এই কবিতা ও সঙ্গীতের বিষয়বস্তু এ যুদ্ধের উদ্দেশ্যকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছে। এ থেকে বোঝা যায়, ইহুদীরা আমাদের উপর জুলুম করেছে এবং আমাদের ঘরে আন জ্বালিয়েছে বলে আমরা এ ফিতনার কেন্দ্র ধ্বংস করে আন নির্বাপিত করতে সফরের কষ্ট সহ্য করছি। তাঁর সঙ্গীতের বিষয়বস্তু মহানবীকে এতটা খুশী করেছিল যে, তিনি আমেরের জন্য দুআ করেন। এ যুদ্ধেই আমের শাহাদাতের শরবত পান করেন।

মহানবী (সা.) সেনাবাহিনীকে যাত্রার নির্দেশ দেয়ার সময় সামরিক কৌশল গোপন রাখার বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন কেউ তাঁদের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে যেন জানতে না পারে এবং শত্রুরা কিছু বুঝে উঠার পূর্বেই তাদের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালাবেন ও দুর্গ অবরুদ্ধ করবেন। অন্যদিকে শত্রুপক্ষের মিত্ররা যাতে মনে করে, মহানবী (সা.) তাদের উদ্দেশ্যে হয় তো যাত্রা করে থাকবেন। তাই তারা নিজ ঘর থেকে বের হবার সাহস করবে না।

কেউ কেউ যেন এটা মনে করে, মহানবীর উত্তর দিকে পরিচালিত এ অভিযানের উদ্দেশ্য আহযাবের যুদ্ধে ইহুদীদের দুই সহযোগী গোত্র গাতফান ও ফাযারাহ্। তাই রাসূল (সা.) যখন ‘রাজিই’ নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন সেনাদলকে খাইবরের দিকে পরিচালিত করে তাদের ও বনী গাতফান গোত্রের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নেন যাতে এ দুই গোত্রের মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন হয় এবং তারা খাইবরের ইহুদীদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে না পারে। খাইবরের অবরোধ এক মাস স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু এ এক মাসে ঐ গোত্র তাদেরকে সাহায্য করতে পারে নি।^{২৩৪}

ইসলামের মহান নেতা দু’শ’ অশ্বারোহীসহ এক হাজার ছয় শ’ সৈন্য নিয়ে খাইবর অভিযানে যাত্রা করেন।^{২৩৫}

মহানবী (সা.) খাইবরের নিকটবর্তী হলে নিম্নোক্ত দুআ পড়েন, যা তাঁর পবিত্র নিয়্যতের পরিচয় বহন করে :

اللهم ربّ السموات و ما اظللن و ربّ الأرضين و ما اقللن... نسألك خير هذه القرية و خير أهلها و خير ما فيها، و نعوذ بك من شرها و شر أهلها و شر ما فيها

“ হে আল্লাহ, আপনি আকাশ ও যা কিছু তার নিচে রয়েছে, তার পালনকর্তা এবং পৃথিবীসমূহ ও যা কিছু ভারী বস্তু তার উপর রয়েছে, তারও প্রভু। আমি আপনার নিকট এ ভূমি, এর অধিবাসী এবং যা কিছু তাতে রয়েছে, সবকিছুর কল্যাণ কামনা করছি এবং এ ভূমি, এর অধিবাসী এবং এর মধ্যে বিদ্যমান অকল্যাণ হতে আপনার আশ্রয় চাইছি।”^{২৩৬}

এক হাজার ছয় শ’ সাহসী সৈনিক, যারা প্রত্যেকেই যুদ্ধের তীব্র আগ্রহ ও উত্তেজনা নিয়ে এখানে এসেছে, তাঁদের সামনে এভাবে ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রার্থনা প্রমাণ করে মহানবী (সা.)

প্রতিশোধ গ্রহণ এবং দেশ ও ভূমি দখলের মনোবৃত্তি নিয়ে সেখানে যান নি, বরং তিনি গিয়েছেন এ বিপজ্জনক কেন্দ্র, যে কোন মুহূর্তে যা কাফের ও মুশরিকদের ঘাঁটিতে পরিণত হওয়ার আশংকা রয়েছে, তাকে নিরস্ত্র ও শক্তিহীন করতে, যাতে এদিক থেকে ইসলামের অগ্রযাত্রা নিরাপদ থাকে।

রাতে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর পথ অবরুদ্ধ

খাইবরের সাতটি দুর্গের প্রতিটির বিশেষ নাম ছিল; যথাক্রমে নায়েম, কামুস, কুতাইবা, নাসতাত, শা , তীহ এবং মালালিম। কোন কোন দুর্গ কখনো যে সেনাপতির অধীন ছিল, তার নামে অভিহিত হতো, যেমন মারহাবের দুর্গ। অন্যদিকে শত্রুদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিটি দুর্গের পাশে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ছিল, যাতে কেবল লোর প্রহরীরা দুর্গের বাইরের খবরাখবর দুর্গের অভ্যন্তরে সরবরাহ করতে পারে। দুর্গ লো এমনভাবে নির্মিত হয়েছিল, যেন দুর্গের অধিবাসীরা বাইরের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে এবং শত্রুর অবস্থানের ওপর মিনজানিক (পাথর ছোড়ার জন্য বিশেষ কামান) দ্বারা আক্রমণ চালাতে পারে।^{২৩৭}

সাতটি দুর্গে অবস্থানরত বিশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে দুই হাজার যোদ্ধা ছিল। খাদ্য ও পানীয় এতটা সঞ্চিত ছিল যে, তারা সবাই এ দিক থেকে নিশ্চিত ছিল। তাদের দাম লো খাদ্যে পূর্ণ ছিল। এ দুর্গ লো এতটা সুরক্ষিত ছিল যে, ছিদ্র করারও কোন সুযোগ ছিল না। যে কেউ দুর্গের দিকে অগ্রসর হলে পাথরের বা তীরের আঘাতে নিহত বা আহত হতো। তাই এ দুর্গ লো ইহুদী যোদ্ধাদের জন্য শক্তিশালী ঘাঁটি বলে পরিগণিত হতো।

এরূপ শক্তিশালী ও সুসজ্জিত শত্রুর ঘাঁটি দখলের উদ্দেশ্যে আগত মুসলমানদের তা দখল করতে সর্বোচ্চ যুদ্ধকলা ও সূক্ষ্মতম সমরশৈলী অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল। তাই মুসলিম যোদ্ধারা সর্বপ্রথম যে কাজ করলো, তা হলো, রাতে দুর্গের দিকের সকল রুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর পথ অবরোধ করল। এ কাজ এত ত ও গোপনে সম্পাদিত হলো যে, দুর্গ লোর প্রহরীরাও তা টের পেল না। সকালে খাইবরের কৃষকরা দুর্গ হতে কৃষিক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য বের হলে লক্ষ্য করল, ইসলামের সাহসী ও সংগ্রামী যোদ্ধারা সকল পথ অবরোধ করে রেখেছে, তাদের চেহারা

ঈমান ও প্রত্যয়ের চিহ্ন বহন করছে, তাদের শক্তিশালী হাতে রয়েছে ধারালো অস্ত্র। এ অবস্থায় অগ্রসর হলেই বন্দী হতে হবে। তাই এ দৃশ্য দেখামাত্রই তারা এতটা ভীত হলো যে, ত দুর্গের মধ্যে পালিয়ে গেল। ভেতরে প্রবেশ করে সমবেতভাবে সৈন্যদের জানালো, মুহাম্মদ তার সৈন্যদের নিয়ে দুর্গের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাথে সাথে দুর্গের কপাট বন্ধ করা হলো। দুর্গের ভেতরে যুদ্ধ উপলক্ষে জরুরী সভা বসলো। অপরদিকে মহানবী (সা.)-এর চোখ কোদাল, বেলচা, গাঁইতি ইত্যাদির মতো ধ্বংসকারী সরঞ্জামের উপর পড়লে তিনি একে সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করলেন। তাই মুসলিম সেনাদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য বললেন :

الله أكبر خربت خيبر انا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين

“ সর্বশ্রেষ্ঠ তিনিই আল্লাহ, খাইবর ধ্বংস হোক; আমরা যখন এমন জাতির ভূমিতে এসেছি, যাদের সতর্ক করা হয়েছে, তাদের পরিণতি কত মন্দ!”

যুদ্ধাবস্থার জরুরী বৈঠকে ইহুদীরা সিদ্ধান্ত নিল, নারী ও শিশুদের একটি দুর্গে এবং খাদ্যদ্রব্য এক দুর্গে রেখে অন্যান্য দুর্গ থেকে প্রতিরোধ করবে। দুর্গের অভ্যন্তর থেকে যোদ্ধারা পাথর ও তীর দিয়ে আক্রমণ করবে এবং সুযোগ বুঝে দুর্গ থেকে বের হয়ে মুসলমানদের সাথে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হবে। এ যুদ্ধকৌশল তারা যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছিল এবং এ কৌশলে তারা এক মাস ইসলামের দুর্বীর যোদ্ধাদের প্রতিরোধ করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি কখনো কখনো একটি দুর্গ দখলের জন্য মুসলমানরা দশ দিন যুদ্ধ করেছে, কিন্তু কোন ফল হয় নি।

পর পর ইহুদী ঘাঁটির পতন

মুসলমানরা যেখানে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন সে স্থান সামরিক দৃষ্টিতে তেমন রত্নপূর্ণ ছিল না। কারণ, ইহুদী সৈন্যদের আক্রমণের আওতায় ছিলেন তাঁরা। খুব সহজেই ইহুদীরা ঐ স্থানে তাঁদের উপর তীর ও পাথর নিক্ষেপ করতে পারত। এ কারণে মুসলমানদের সাহসী ও অভিজ্ঞ সৈন্য ছবাব ইবনে মুনযার মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বললেন : “আপনি যদি আল্লাহর নির্দেশে এ স্থানে অবস্থান নিয়ে থাকেন, তবে আমার কোন আপত্তি নেই। কারণ আল্লাহর নির্দেশ সকল

পরামর্শ ও পূর্ব অনুমানের উর্ধ্ব। কিন্তু যদি কোন পরিকল্পনা ছাড়া এমনিই এখানে অবস্থান গ্রহণ করে থাকেন, সেক্ষেত্রে সেনাদলের সদস্যদের পরামর্শ দানের সুযোগ দিলে আমার পরামর্শ হলো, এ স্থান শত্রুর নাগালের মধ্যে। কারণ, তাদের দুর্গ ‘নামতাত’ - এর তীরন্দাজদের সামনে কোন ঘর ও খেজুর গাছ না থাকায় সহজেই তারা আমাদের অবস্থানের প্রাণকেন্দ্রে আঘাত হানতে পারবে।” মহানবী (সা.) ইসলামের মহান মৌলনীতি (পরামর্শের নীতি) অনুসারে অন্যদের মতামতের রুত্ব দেয়ার জন্য বললেন : “যদি তোমরা এর থেকে উত্তম স্থান নির্বাচন কর, আমরা ক্যাম্প সরিয়ে সেখানে নিয়ে যাব।” হুবাব ইবনে মুনযার খাইবরের অবস্থান লোর সুবিধা- অসুবিধা পর্যালোচনা করে এমন স্থান নির্বাচন করলেন যা খেজুর বাগানের পশ্চাতে ছিল। ফলে যুদ্ধ ক্যাম্পটি সেখানে সরিয়ে নেয়া হলো। খাইবরের যুদ্ধ চলাকালীন দিনের বেলা মহানবী ও সৈন্যগণ ক্যাম্প থেকে দুর্গের দিকে আসতেন ও রাতে সেখানে ফিরে যেতেন।^{২৩৮}

খাইবরের যুদ্ধের বিস্তারিত ও যথাযথ বিবরণ দেয়া অসম্ভব। কিন্তু ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থসমূহ থেকে মোটামুটিভাবে জানা যায়, মুসলিম সৈন্যরা একটি একটি করে দুর্গ দখলে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁরা চেষ্টা করতেন, যে দুর্গে আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে, তা থেকে অন্য দুর্গ লোকে বিচ্ছিন্ন করতে। এভাবে একটি দুর্গের পতন ঘটানোর পর অপর দুর্গে আক্রমণ করতেন। কিন্তু যে দুর্গ লো মাটির নিচ দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত ছিল এবং যে দুর্গ লোর অভ্যন্তরে সৈন্যরা কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলত, সে লোর দখল প্রক্রিয়া বেশ ধীর গতিতে সম্পন্ন হতো। কিন্তু যে দুর্গ লোর সৈন্যদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হতো বা অন্য দুর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত, সহজেই তার পতন হতো। সেক্ষেত্রে হতাহতের ঘটনাও কম ঘটত।

একদল ঐতিহাসিকের মতে, খাইবরের দুর্গ লোর মধ্যে প্রথম পতন ঘটে নায়েম দুর্গের। মুসলমানদের তা দখলে প্রচুর কষ্ট করতে হয়েছিল। এ দুর্গ দখল করতে ইসলামের এক মহান সৈনিক মাহমুদ ইবনে মাসলামা নিহত হন এবং আরো কয়েক সৈন্য আহত হন। মাহমুদ ইহুদীদের নিষ্কিণ্ড একটি বড় পাথরের আঘাতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেন। অবশ্য ইবনে

আসীরের^{২৩৯} বর্ণনামতে তিনি আহত হওয়ার তিন দিন পর শাহাদাত বরণ করেন। পঞ্চাশ জন আহত সৈনিক ব্যান্ডেজ ও শুশ্রূষার জন্য নির্ধারিত স্থানে স্থানান্তরিত হন।^{২৪০}

বনী গিফার গোত্রের একদল নারী রাসূলের অনুমতিক্রমে খাইবরে এসেছিলেন। তাঁরা আহতদের শুশ্রূষা ও তাঁদের জন্য বৈধ অন্যান্য দায়িত্ব পালনে আত্যাগী ভূমিকা রাখেন এবং এ জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।^{২৪১}

সামরিক পরামর্শসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নায়েম দুর্গের পর কামুস দুর্গকে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলো। এ দুর্গে হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আবিল হুকাইক। এ দুর্গও মুসলিম সেনাদের চরম আত্যাগের বিনিময়ে হস্তগত হলো। ইহুদী নেতা হুইয়াই ইবনে আখতাবের^{২৪২} কন্যা সাফিয়া এ সময় বন্দী হন, যিনি পরবর্তীতে রাসূলের স্ত্রী হয়েছিলেন।

এ দুই দুর্গের পতন মুসলমানদের মানসিক শক্তি কয়েক গণ বাড়িয়ে দিল এবং ইহুদীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হলো। কিন্তু মুসলমানদের খাদ্য-দ্রব্যের রসদ ফুরিয়ে এসেছিল বলে তাঁরা খাদ্যসংকটে পড়েছিলেন। ফলে বাধ্য হয়ে এমন প্রাণীর মাংস খেতে বাধ্য হলেন যা মাকরুহ। যে দুর্গে ইহুদীরা খাদ্য-দ্রব্য মজুদ রেখেছিল, তখনও তা মুসলমানদের দখলে আসে নি।

সংকটের মুহূর্তেও চরম আত্মসংযম

মুসলমানদের উপর ক্ষুধার চাপ তীব্রতর হলে তাঁরা মাকরুহ প্রাণীর মাংস খেতে বাধ্য হচ্ছিলেন। তখন একজন কৃষ্ণাঙ্গ রাখাল, যে ইহুদীদের দুস্বা লোকে দেখাশুনা করত, রাসূলের নিকট এসে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইল। মহানবী (সা.) আকর্ষণীয় বক্তব্যের মাধ্যমে তার কাছে ইসলাম ধর্মকে তুলে ধরলেন। সেও এতে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। সে মহানবীকে বলল : “এ দুস্বা লো আমার তত্ত্বাবধানে আমানত হিসেবে রয়েছে। এখন তো আমার সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। তাই এ দুস্বা লোকে আপনি নিতে পারেন।”

মহানবী (সা.) সহস্রাধিক ক্ষুধার্ত সৈনিকের সামনে সুস্পষ্টভাবে বললেন : “আমাদের ধর্মে আমানতের খেয়ানত অন্যতম বড় অপরাধ ও নাহ। তোমার দায়িত্ব হলো, দুর্গে গিয়ে দুস্বা লোর মালিকের কাছে সে লো ফিরিয়ে দেয়া।” সে রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ মতো কাজ করল।

সে লো ফিরিয়ে দিয়ে সে রাসূলের সৈন্যদলে যোগ দিল। অবশেষে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করে শহীদ হলো।^{২৪৩}

মহানবী (সা.) তাঁর যৌবনে ‘আল আমীন’ বা ‘বিশ্বস্ত’ উপাধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তা শুধু সে সময়েই ছিল না; বরং সারা জীবন তিনি এমনই ছিলেন। সকালে দুর্গ লো থেকে রাখালরা মেষ পাল নিয়ে সবুজ মাঠে যেত এবং সন্ধ্যায় ফিরত, কিন্তু কোন মুসলমানই তা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন নি। কারণ তাঁরা তাঁদের নেতার প্রশিক্ষণে ইসলামের মহান শিক্ষার ছায়ায় তাঁর মতো বিশ্বস্ত ও আমানতদার হিসেবে তৈরি হয়েছিলেন। রাসূল (সা.) শুধু একদিন চরম খাদ্য সংকটে পড়ায় মাত্র দু’টি মেষ গ্রহণের অনুমতি তিনি দিয়েছিলেন, যাতে সৈন্যরা তাঁদের জীবন বাঁচাতে পারেন। যদি সংকট এতটা তীব্র না হতো, তবে কখনোই তা করার অনুমতি দিতেন না। অধিকাংশ সময়ই সৈন্যরা ক্ষুধার কষ্টের কথা বললে তিনি আকাশের দিকে হাত তুলে বলতেন : “যে দুর্গে খাদ্য-দ্রব্য রয়েছে, তা হস্তগত কর।” যুদ্ধের মাধ্যমে হস্তগত করা ছাড়া তাদের সম্পদে হস্তক্ষেপে নিষেধ করতেন।^{২৪৪}

এ সত্ত্বেও সমসাময়িক কোন কোন মধ্যপ্রাচ্যবিদ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইসলামের মহান উদ্দেশ্যকে খাটো করে দেখাতে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এ বিষয়টি প্রমাণের মাধ্যমে যে, মুসলমানরা যুদ্ধের সময় ন্যায়পরায়ণ আচরণ করতেন না এবং ইসলামের যুদ্ধ লো গনীমত লাভ ও লুটপাটের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হতো। কিন্তু এ ঘটনাসহ এরূপ অসংখ্য ঘটনা, যা ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাদের এ মিথ্যা দাবী অসার প্রমাণ করে। কারণ নিজ ত্যাগী সৈন্যদের জীবন-মরণ সমস্যার সময়ও মহানবী ঐ রাখালকে তার ইহুদী মনিবের সম্পদে বিশ্বাসঘাতকতায় নিষেধ করেছেন; অথচ তিনি ইচ্ছা করলেই তা আটক করতে পারতেন।

একে একে দুর্গের পতন

দ্বিতীয় দুর্গ দখলের পর মুসলিম সৈন্যরা ‘ওয়াতিহ্’ এবং ‘সুলালিম’ দুর্গ দখলের যুদ্ধে নিয়োজিত হলেন। কিন্তু মুসলমানরা দুর্গের বাইরের ইহুদীদের ব্যাপক প্রতিরোধের মুখোমুখি হলেন। ফলে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও প্রতিদিন মুসলমানরা ব্যাপক প্রাণহানির সম্মুখীন হচ্ছিলেন এবং কোনরূপ অগ্রগতি ছাড়াই দশ দিনব্যাপী যুদ্ধ অব্যাহত থাকল। মুসলিম সেনাপতিগণ প্রতিদিন ব্যর্থ হয়ে ছাউনীতে ফিরে আসছিলেন। একদিন মহানবী (সা.) হযরত আবু বকরের হাতে যুদ্ধের পতাকা দিয়ে প্রেরণ করলেন। তিনি সেনাদল নিয়ে দুর্গের সামনে যেতেই ব্যাপক আক্রমণের শিকার হয়ে ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। তিনি ও তাঁর অনুগত সৈন্যরা একে অপরকে পরাজয়ের জন্য অভিযুক্ত করতে লাগলেন ও পরস্পরকে ‘পলায়নকারী’ বলে আখ্যায়িত করলেন। পরের দিন হযরত উমরকে অনুরূপ দায়িত্ব দেয়া হলো। তিনিও তাঁর পূর্বসূরি ও বন্ধুর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটালেন। ঐতিহাসিক তাবারীর^{২৪৫} বর্ণনানুসারে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে ইহুদী বীর যোদ্ধা মারহাবের অসাধারণ বীরত্বের বর্ণনা দিয়ে মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করছিলেন। এ অবস্থা দেখে মহানবী (সা.) খুবই অসন্তুষ্ট হন। তিনি তাঁর সেনাদলের সকল সেনাপতি ও সৈন্যকে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে এমন এক মূল্যবান বক্তব্য দিলেন যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। তিনি বক্তব্যের শেষে বললেন :

لاعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله و يحبه الله ورسوله يفتح الله علي يديه ليس بفرار

“ আগামীকাল এ পতাকা এমন এক ব্যক্তির হাতে দেব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তার হাতে দুর্গের পতন ঘটাবেন। সে এমন ব্যক্তি, যে শত্রুর প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নি এবং কখনোই যুদ্ধ হতে পলায়ন করে নি।” ^{২৪৬}

আল্লামা তাবারসী এবং ঐতিহাসিক হালাবী উল্লেখ করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন : “সে শত্রুর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করবে এবং কখনোই পলায়ন করবে না (كزار غير فرار)।” ^{২৪৭}

মহানবী (সা.)-এর এ বাক্য, যে সেনাপতির হাতে জয় আসবে, তাঁর আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব, সাহসিকতা ও বিশেষ মর্যাদার বর্ণনাকারী। তাই সেনাপতি ও সৈন্যগণের মধ্যে রাসূল (সা.)-এর এ বাক্য টান টান উত্তেজনা ও শিহরণ সৃষ্টি করল। একই সাথে তাঁদের মধ্যে আনন্দমিশ্রিত বাসনার উদ্বেক ঘটেছিল ও তাঁরা স্নায়ুর চাপ অনুভব করছিলেন। প্রত্যেকেই আশা করছিলেন^{২৪৮} এ পরম সৌভাগ্য তাঁর ভাগ্যে জুটুক।

রাসূলের বক্তব্য শেষ হলো। রাতের অন্ধকার নেমে এলে মুসলিম সেনারা যাঁর যাঁর তাঁবুতে বিশ্রামের জন্য চলে গেলেন। রাতের প্রহরীরা উঁচু স্থান লোয় দাঁড়িয়ে শত্রুর উপর নজর রাখছিলেন। রাতের প্রহর কাটলে দিগন্তের বুক চিরে সূর্য উদিত হলো। সূর্যের সোনালী রোদে মরু-প্রান্তর আলোকিত হলো। সেনাপতিগণ মহানবী (সা.)-এর চারপাশে সমবেত হলেন। গত দু’দিনের পরাজিত সেনাপতিগণও রাসূলের নির্দেশ শোনার জন্য ঘাড় টান করে রইলেন। এ মহা গর্বের পতাকা কার হাতে দেয়া হবে, তা জানতে তাঁরা উদগ্রীব হয়ে রইলেন।^{২৪৯} উপস্থিত সেনাদলের মধ্যে তখন চরম নীরবতা।

‘আলী কোথায়?’ - মহানবী (সা.)-এর এ কথায় নীরবতা ভঙ্গ হলো। সবাই বললেন, “তিনি চোখের ব্যথায় পীড়িত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন।” তিনি বললেন : “তাকে নিয়ে এসো।”

তাবারী বর্ণনা করেছেন, তাঁকে উঠের পিঠে চড়িয়ে রাসূলের তাঁবুর সামনে আনা হলো। এ থেকে বোঝা যায়, চোখের ব্যথা এতটা তীব্র ছিল যে, তিনি কাতর হয়ে পড়েছিলেন। রাসূল (সা.) তাঁর হাত আলীর চোখে বুলিয়ে দিয়ে দুআ করলেন। রাসূলের হাতের স্পর্শ ও দুআ তাঁর চোখে এতটা বরকত দান করেছিল, জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি আর চোখের ব্যথায় ভোগেন নি। রাসূল তাঁকে যাত্রার নির্দেশ দিয়ে কিছু করণীয় বিষয় সম্পর্কে বললেন, যেমন যুদ্ধ শুরুর পূর্বে দুর্গের ইহুদীদের উদ্দেশে প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে। যদি তারা তা না মানে, তা হলে আ সমর্পণ করে ইসলামী শাসনের অধীনে জিজিয়া দিয়ে স্বাধীনভাবে বাস করার প্রস্তাব দিতে বললেন ও এক্ষেত্রে তাদের নিরস্ত্র করার নির্দেশ দিলেন।^{২৫০} যদি এ প্রস্তাব লোর কোনটিই তারা না মানে, তা হলে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বললেন। সবশেষে নিম্নোক্ত কথা বললেন :

لئن يهـدى الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم

“ যদি আল্লাহ্ তোমার মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে হেদায়েত করেন, তা হলে তা তোমার জন্য লাল রঙের লোম বিশিষ্ট উটের পাল অপেক্ষা উত্তম।” ২৫১

মহানবী (সা.) যুদ্ধের মধ্যেই মানুষের হেদায়েতের চিন্তা করতেন। তাঁর সব যুদ্ধই প্রমাণ করে, তাঁর যুদ্ধ ছিল মানুষের হেদায়েতের জন্য।

খাইবরের মহা বিজয়

পূর্ববর্তী দু'জন সমরনায়ক পরাজিত হয়ে ফিরে এসে মুসলিম সৈন্যদের অপূরণীয় ক্ষতি করেছিলেন। রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে ওয়াতীহ ও সুলালিম দু'টি দখলের লক্ষ্যে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) বর্ম পরে তাঁর তরবারি 'জুলফিকার' হাতে নিয়ে মহাবীরের ন্যায় সাহসিকতার সাথে দুর্গের দিকে যাত্রা করলেন। দুর্গের নিকট পৌঁছে মহানবীর দেয়া পতাকা মাটিতে গাঁথলেন। দুর্গের ফটক খুলে ইহুদী যোদ্ধারা বেরিয়ে এল। প্রথমে মারহাবের ভাই হারিস সামনে এসে বিকট শব্দে হুঙ্কার ছাড়লো। তার হুঙ্কারে ভীত হয়ে হযরত আলী (আ.)-এর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মুসলিম সৈন্যরা কয়েক পা পিছিয়ে গেল। কিন্তু আলী পাহাড়ের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই হারিস রুতর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং সেখানেই মারা গেল।

ভাইয়ের মৃত্যুতে মারহাব অত্যন্ত মর্মান্বিত হলো। সে তৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সামনে এগিয়ে এলো। সে সম্পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত ছিল। সে দেহে ইয়েমেনী বর্ম ও মাথায় পাথরের বিশেষ টুপি পরেছিল। ঐ টুপির উপর বসানো ছিল লৌহ শিরস্ৰাণ। সে আরব যোদ্ধাদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করল :

قد علمت خيبر اتي مرحب
شاكى السلاح بطول مجرب
إن غلب الدهر فأتى أغلب
و القرن عندى بالدماء مخضب

“ খাইবরের দ্বার ও দেয়াল জানে, আমি মারহাব,

আমি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সুসজ্জিত যোদ্ধা।

যদি কাল জয়ী হয়ে থাকে, আমিও বিজয়ী,

যে যোদ্ধাই আমার মুখোমুখি হবে, নিজেকে রক্তে করবে রঙিন।” ২৫২

হযরত আলীও নিজের সামরিক ব্যক্তিত্ব ও শক্তির প্রতি ইশারা করে শত্রুকে তাঁর সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি বললেন :

انا الذى سميتى امى حيدرة ضرغام آجام وليث قسورة
عبل الذراعين غليظ القصرة كليث غابات كربه المنظرة

“ আমি ঐ ব্যক্তি, আমার মাতা যার নাম ‘হায়দার’ (সিংহ) রেখেছেন,

আমি সাহসী যোদ্ধা ও ঝোপের সিংহ।

রয়েছে আমার শক্তিশালী বাহু ও অটল গ্রীবা,

সাহসী সিংহের ন্যায় সবসময় ধ্বংসা ক দৃশ্যের প্রতীক্ষায়।”

উভয় যোদ্ধা কবিতার মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় দান সমাপ্ত করলেন। ইসলাম ও ইহুদী ধর্মের দুই মহাবীরের অস্ত্র ও বর্শার উপর্যুপরি আঘাতের শব্দ দর্শকদের প্রকম্পিত করল। অকস্মাৎ ইসলামের মহা সমরনায়কের বিদ্যুত বেগের প্রচণ্ড আঘাত মারহাবের মস্তক বিদীর্ণ করল। আঘাতটি তার মাথা, পাথর ও লৌহ শিরস্ত্রাণ ভেদ করে দাঁত পর্যন্ত পৌঁছল। এ আঘাত এতটা ভয়াবহ ছিল যে, মারহাবের পেছনে দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ইহুদী যোদ্ধারা ভয়ে দুর্গের ভেতর পালিয়ে গেল। যারা না পালিয়ে আলীর সামনে মোকাবেলার জন্য এলো, সবাই নিহত হলো। তিনি তাদের দুর্গের দ্বার পর্যন্ত ধাওয়া করে এগিয়ে যেতে লাগলেন। এক ইহুদীর বর্শার আঘাতে আলীর ঢাল হাত থেকে পড়ে গেল। সাথে সাথেই তিনি দুর্গের কপাট টান দিয়ে উপড়ে ফেললেন এবং ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলেন। তারা সবাই পালিয়ে গেলে তা মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। আটজন শক্তিশালী মুসলিম যোদ্ধা তা উঠানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। তাঁদের মধ্যে আবু রাফেও ছিলেন।^{২৫৩} আলীর এই অলৌকিক ভূমিকার কারণে যে দুর্গ দখল প্রক্রিয়া দশ দিনে সম্পন্ন হচ্ছিল না, তা এক ঘণ্টার মধ্যে সম্পন্ন হলো। ঐতিহাসিক ইয়াকুবী বলেছেন, খাইবরের দরজা পাথরের তৈরি ছিল, যার দৈর্ঘ্য চার মিটারের একটু বেশি এবং প্রস্থ দু’মিটারের অধিক ছিল।^{২৫৪}

শেখ মুফিদ তাঁর ‘ইরশাদ’ গ্রন্থে বিশেষ সূত্রে স্বয়ং হযরত আলী (আ.) হতে খাইবরের দরজা উপড়ে ফেলার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : “আমি খাইবরের দরজা উপড়ে ফেলে তা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছিলাম। যুদ্ধ শেষ হলে দরজাটিকে ইহুদীরা নিজেদের রক্ষার জন্য যে পরিখা খুঁড়েছিল, তার উপর স্থাপন করলাম পুল হিসেবে ব্যবহারের জন্য। অতঃপর (প্রয়োজন শেষ হলে) তা পরিখার মধ্যে নিক্ষেপ করলাম।” তখন এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করলেন : “আপনি তার কোন ওজন অনুভব করেন নি?” তিনি বললেন : “আমার ব্যবহারের ঢালের মতোই ওজন অনুভব করেছি।” ২৫৫

ইতিহাস ও জীবনী লেখকগণ হযরত আলীর খাইবরের দরজা উপড়ানোর আশ্চর্য ঘটনা এবং ঐ দুর্গ দখলে তাঁর বিরল ভূমিকার বর্ণনা দিয়েছেন। এ কাজ লো কখনোই সাধারণ মানবীয় শক্তির দ্বারা সম্ভব হয় নি। স্বয়ং হযরত আলী (আ.) এ বিষয় ব্যাখ্যা করে সকল সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছেন। তিনি এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে বলেন :

ما قلعتها بقوة بشرية و لكن قلعتها بقوة الهية و نفس بلقاء ربها مطمئنة رضية

“ আমি কখনোই মানবীয় শক্তিতে তা উপড়াই নি; বরং খোদায়ী শক্তি ও মহান আল্লাহর সাক্ষাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের বলে তা করেছি।” ২৫৬

সত্যের বিকৃতি

যদিও ইবনে হিশাম তাঁর ‘সীরাত’ গ্রন্থে এবং আবু জাফর তাবারী তাঁর ‘তারিখ’ গ্রন্থে খাইবরে হযরত আলী (আ.)-এর বিস্ময়কর ও বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের খুঁটিনাটি প্রতিটি দিক উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বর্ণনার শেষে দুর্বল সম্ভাবনা দিয়ে মারহাবের হত্যাকারী মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন : কেউ কেউ বলেছেন, মারহাব মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার হাতে নিহত হয়েছিল। কারণ তিনি ‘নায়েম’ দুর্গ দখলের যুদ্ধে নিহত ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে দায়িত্ব পেয়েছিলেন এবং এ প্রতিশোধ গ্রহণে তিনি সফল হন। এ সম্ভাবনা এতটা দুর্বল ও ভিত্তিহীন যে, ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত ইতিহাসের পরিপন্থী। তাবারী ও ইবনে হিশাম এ কল্পনাপ্রসূত ইতিহাস বিশিষ্ট সাহাবী জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী হতে বর্ণনা করেছেন^{২৫৭} এবং ঘটনার বর্ণনাকারী এ অসত্য বর্ণনা তাঁর উপর আরোপ করেছেন বলা যায়। কারণ হযরত জাবির প্রায় সকল যুদ্ধেই রাসূল (সা.)-এর সঙ্গী হলেও এ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন নি। উপরন্তু এ ঐতিহাসিক কল্পকাহিনীর মধ্যে কয়েকটি রুত্বপূর্ণ সমস্যা রয়েছে।

১. মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা কখনোই এত বড় বীর যোদ্ধা ছিলেন না যে, খাইবর দখল করবেন। কারণ ইতিহাসে তার বীরত্বসূচক কোন ভূমিকার কথা কোথাও বর্ণিত হয় নি। বরং এর বিপরীতে তার ভীরুতার ইতিহাস সবার জানা। তৃতীয় হিজরীতে মহানবী (সা.) তাকে অন্যতম প্রধান ইহুদী ষড়যন্ত্রকারী কা’ব ইবনে আশরাফকে বদর যুদ্ধের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের নতুনভাবে যুদ্ধে জড়াতে উস্কানীমূলক ভূমিকার কারণে হত্যার নির্দেশ দেন। তিনি দায়িত্ব পেয়ে এতটা ভীত হয়েছিলেন যে, তিন দিন খাদ্য ও পানি গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। মহানবী (সা.) তার আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত চেহারা দেখে সমালোচনা করলে তিনি বলেন : “আমি এ কাজ করতে সক্ষম হব কি না সে ভয়ে ভীত।” রাসূল (সা.) তার এ দ্বিধা ও আতঙ্ক লক্ষ্য করে চার ব্যক্তিকে তাঁর সঙ্গে দিলেন এ যুদ্ধের আন প্রজ্বলনের চেষ্টাকারীদের হত্যা করতে। তাঁরা মধ্যরাতে কৌশলে এ কাজ সম্পাদনে সক্ষম হন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা অন্ধকারে এতটা ভীত

ছিলেন যে, শত্রুকে আক্রমণের পরিবর্তে তারই এক সঙ্গীকে আহত করে ফেলেন।^{২৫৮} এমন মানসিক শক্তির ব্যক্তির পক্ষে খাইবরের শ্রেষ্ঠ বীর মারহাবকে হত্যা করা অসম্ভব। তাই এরূপ বর্ণনা অলীক ও কল্পনাপ্রসূত এবং রূপকথার সঙ্গেই তা মানায়!

২. খাইবর বিজয়ী যোদ্ধা শুধু মারহাবের সাথেই যুদ্ধ করেন নি ও তাকে হত্যা করে নি, বরং তিনি তাকে হত্যার পরও কয়েক ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করেছেন। মারহাবকে হত্যার পর যে সকল যোদ্ধা আলীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তারা হলো যথাক্রমে দাউদ ইবনে কাবুস, রাবি ইবনে আবিল হাকীক, আবুল বায়েত, মারা ইবনে মারওয়ান, ইয়াসির খাইবরী এবং দ্বাজিজ খাইবরী।

এ ছয় ব্যক্তি ইহুদীদের শ্রেষ্ঠ বীরদের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা দুর্গ দখলের প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল। তারা নিজেদের বীরত্বগাথা পড়ছিল, আর প্রতিপক্ষকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাচ্ছিল। তাদের সবাই ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর আলীর হাতে নিহত হয়। যদি মারহাবের হত্যাকারী মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা হতেন, তবে তাকে হত্যার পর তার পক্ষে আর মুসলমানদের ছাউনীতে ফিরে আসা সম্ভব হতো না। কারণ এ ছয় যোদ্ধার সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হতো ও তাদেরকে হত্যা করতে হতো। সকল ঐতিহাসিকের বর্ণনা মতে আলীই তাদের হত্যাকারী ছিলেন।

৩. এ কাল্পনিক বর্ণনা মহানবী (সা.) থেকে বহুল সূত্রে (মুতাওয়্যাতির) বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী। কারণ মহানবী (সা.) হযরত আলী (আ.) সম্পর্কে যুদ্ধের পূর্বেই বলেছিলেন : “এমন ব্যক্তির হাতে পতাকা দেব যার হাতে বিজয় আসবে” এবং পরের দিন আলীর হাতে তা অর্পণ করেন। মুসলমানদের বিজয়ের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ছিল মারহাব দ্বাবিরী এবং তার বীরত্ব ও সাহসিকতার কারণেই পূর্বের দু’দিনের সেনাপতিদ্বয় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। যদি মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা তাকে হত্যা করে থাকেন, তবে তাঁর ব্যাপারেই মহানবী (সা.) এ কথা বলতেন, আলীর ব্যাপারে নয়।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক হালাবী বলেছেন : মারহাব যে আলীর হাতে নিহত হয়েছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তেমনি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে আসির বলেছেন : জীবনী লেখকগণ ও হাদীসবেত্তাগণ আলীকে মারহাবের হত্যাকারী বলেছেন এবং মুতাওয়্যাতির (যে বর্ণনা এত অধিক

সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই) সূত্রে তা বর্ণিত হয়েছে। তাবারী ও ইবনে হিশাম খাইবরের ঘটনায় হযরত আলীর পূর্বে দু'জন শীর্ষস্থানীয় সেনাপতির পরাজয় ও পলায়নের ঘটনায় কিছুটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। তাই এমনভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছেন যাতে মহানবী (সা.)-এর বিখ্যাত ও স্মরণীয় ঐ বাণী যে আমীরুল মুমিনীন আলীর ব্যাপারে ছিল, তাতে সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

রাসূল (সা.) বলেছিলেন : ليس بفَرَّارٍ و ارفاءٍ سے (খাইবর বিজয়ী বীর) কখনোই পলায়ন করবে না। এক্ষেত্রে আলী পূর্ববর্তী দুই সেনাপতির মতো নন। কারণ তারা যুদ্ধের ময়দান খালি করে পালিয়েছিলেন। অথচ এ দুই ঐতিহাসিক ঘটনাটি এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, যেন ঐ দুই সেনাপতি তাদের দায়িত্ব ভালোভাবেই পালন করেছিলেন, তবে সফল হন নি।^{২৫৯}

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর গলায় শ্রে ত্বের তিন পদক

এ আলোচনা খাইবর জয়ী মহাবীরের তিনটি শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ দিয়ে শেষ করব। একদিন মুয়াবিয়া সা' দ ইবনে আবী ওয়া সাকে এজন্য সমালোচনা করলেন, কেন তিনি আলীর নিন্দা করেন না। সা' দ ইবনে আবী ওয়া স এর জবাবে বললেন : “যখনই আমি আলীর মর্যাদা লোর মধ্যে তিনটি মর্যাদার কথা স্মরণ করি, তখনই আমার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে, যদি ঐ তিনটি মর্যাদার অন্তত একটি আমার হতো। এ তিনটি মর্যাদা হলো :

১. যেদিন (তাবুকের যুদ্ধে গমনের সময়) মহানবী (সা.) মদীনায় তাঁকে নিজের স্কলবর্তী ঘোষণা করে তাঁর উদ্দেশে বললেন : তোমার মর্যাদা আমার কাছে মূসার নিকট হারুনের মর্যাদার ন্যায়; তবে এতটুকু পার্থক্য যে, আমার পর কোন নবী নেই।

২. মহানবী (সা.) খাইবরের দিন বললেন : কালকে এমন ব্যক্তির হাতে পতাকা দেব যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন। ইসলামের সকল সমরনায়কই সেদিন আকাঙ্ক্ষা করছিলেন এ মর্যাদা তার ভাগ্যে জুটুক। কিন্তু পরদিন মহানবী আলীর হাতে পতাকা দিলেন এবং আলীর অতুলনীয় বীরত্বের কারণে সেদিন আমাদের ভাগ্যে বিজয় জুটেছিল।

৩. যেদিন মহানবী (সা.) নাজরানের খ্রিষ্টানদের সাথে মুবাহলা^{২৬০} করলেন, সেদিন আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইনকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন : اللهم هؤلاء أهلى
অর্থাৎ হে আল্লাহ! এরাই আমার পবিবার।” ^{২৬১}

বিজয়ের কারণ

খাইবরের দুর্গ লো বিজিত হলো। ইহুদীরা মুসলিম সৈন্যদের সামনে আ সর্পণ করল। কিন্তু এ বিজয়ের প্রভাবক কারণসমূহ কি ছিল?

মুসলমানরা এ যুদ্ধে নিম্নোক্ত কারণে জয়লাভে সক্ষম হন :

১. সঠিক পরিকল্পনা ও উপযুক্ত সামরিক কৌশল গ্রহণ;
২. শত্রুদের অভ্যন্তর থেকে তথ্য লাভ;
৩. আমীরুল মুমিনীন আলীর আ ত্যাগ ও অতুলনীয় বীরত্ব।

১. সঠিক পরিকল্পনা ও উপযুক্ত সামরিক কৌশল গ্রহণ

মুসলিম সেনাবাহিনী এমন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেছিল, যাতে ইহুদী ও তাদের সহযোগী গোত্র লোর, যেমন গাতফানের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। গাতফান গোত্রে বিখ্যাত ও সাহসী অনেক যোদ্ধা ছিল। যদি তারা ইহুদীদের সাহায্যে এগিয়ে আসত এবং সমবেতভাবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতো, তবে মুসলমানদের পক্ষে জয়লাভ কঠিন হতো। যখন গাতফান গোত্র মহানবী (সা.) ও তাঁর সঙ্গীগণের যুদ্ধযাত্রার কথা শুনল, সাথে সাথে তারা তাদের মিত্রপক্ষকে সাহায্য করতে পর্যাপ্ত অস্ত্র ও রসদ নিয়ে খাইবরের দিকে অগ্রসর হলো; কিন্তু পশ্চিমদিকে খবর পেলে, মুসলিম সেনাদল তাদের পথ ঘুরিয়ে গাতফান গোত্রকে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। এ জব তাদেরকে এতটা সন্ত্রস্ত করল যে, তারা অর্ধেক পথ হতে নিজেদের আবাসভূমিতে ফিরে গেল এবং খাইবরের যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা সেখান থেকে বের হয় নি।

ঐতিহাসিকগণ এ জব গায়েবী শব্দ ভেসে আসার মাধ্যমে ঘটেছিল বলেছেন। কিন্তু এটি অসম্ভব নয় যে, তা মহানবীর নির্দেশে স্বয়ং গাতফান গোত্রের অভ্যন্তরে আ গোপন করে থাকা মুসলমানদের মাধ্যমে ছড়িয়েছিল। সম্ভবত গাতফান গোত্রের কোন কোন উপগোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তবে তারা নিজেদের কাফের বলে পরিচয় দিত এবং তারাই দক্ষতার সাথে এমন জব

ছড়িয়েছিল, যাতে গাতফান গোত্র তাদের মিত্র খাইবরের ইহুদীদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে না পারে। এরূপ ঘটনা ইতোপূর্বে খন্দকের যুদ্ধেও ঘটেছিল। এক্ষেত্রেও ‘নুআঈম ইবনে মাসউদ’ নামের গাতফান গোত্রের এক মুসলমানের প্রচারিত জবে গাতফান ইহুদীদের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে।

২. গোপন তথ্য সংগ্রহ

মহানবী (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে অত্যন্ত রুত্ব দিতেন। তিনি খাইবর অবরোধের পূর্বেই ‘ইবাদ ইবনে বাশার’ নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে বিশ জনকে খাইবর অভিমুখে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁরা খাইবরের নিকটবর্তী স্থানে এক ইহুদীর দেখা পেয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারলেন, সে একজন ইহুদী গুচর। সাথে সাথেই তাকে গ্রেফতার করে মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত করা হলো। তাকে হত্যার ছমকি দেয়ার ফলে সে ভয়ে ইহুদীদের গোপন সব তথ্য ফাঁস করে দিল। অবশেষে জানা গেল মুনাফিক প্রধান আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের দেয়া তথ্যে তারা মুসলমানদের আগমনের কথা জানতে পেরেছিল। ফলে তারা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। অপরদিকে গাতফান গোত্র হতে সাহায্যের আশ্বাস থাকলেও তা তখনও বাস্তবায়িত হয় নি।

যুদ্ধের দিনে একদল মুসলিম প্রহরী একজন ইহুদীকে গ্রেফতার করে মহানবীর নিকট আনে। তিনি ইহুদীদের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলে : “যদি আমার প্রাণ রক্ষার নিশ্চয়তা দেন, তবে আমি সব বলব।” তাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হলে সে বলে : “আজ রাতে খাইবরের যোদ্ধারা ‘নাশতাত’ দুর্গ থেকে ‘শাক’ দুর্গে স্থানান্তরিত হবে এবং সেখান থেকে আ রক্ষা করবে। হে আবুল কাসেম (মুহাম্মদ)! যদি আপনি কালকে নাশতাত দুর্গ দখল করতে পারেন” , মহানবী (সা.) বললেন : “ইনশাআল্লাহ্।” সে বলল : “তা হলে এর মাটির নিচের প্রকোষ্ঠে পর্যাপ্ত মিনজানিক (পাথর ছোঁড়ার কামান বিশেষ), অস্ত্র ও পাথর বহনের গাড়ী, তরবারি ও ঢাল রয়েছে, যা আপনার হস্তগত হবে। এক্ষেত্রে সে লো ব্যবহার করে শাক দুর্গে আঘাত হানতে পারবেন।” এ তথ্য জানার ফলে পরবর্তী দিনের হামলার লক্ষ্যবস্তু নিশ্চিত হলো এবং

আরো বোঝা গেল, নাশতাত দুর্গ দখলে বেশি সৈন্য নিয়োগ করতে হবে না। এর বিপরীতে শাক দুর্গ দখল করতে হলে সতর্ক থাকতে হবে এবং অধিক সৈন্য ব্যবহার করতে হবে।

অপর একটি দুর্গ দখলে তিন দিনের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর এক ইহুদী ব্যক্তি- সম্ভবত জীবন বাঁচানোর জন্য- এ পরামর্শ দিলো যে, সে ইহুদীদের পানির উৎস সম্পর্কে অবহিত। যদি তা মুসলমানরা বন্ধ করে, তবে তারা খাওয়ার পানির সংকটে পড়বে। অন্য কোন পন্থায় তাদের দুর্বল করা যাবে না এবং এক মাস যুদ্ধ করলেও লাভ হবে না। এক বর্ণনায় এসেছে, মহানবী (সা.) শত্রুর পানির উৎস অবরোধে রাজী হন নি এবং বললেন: “আমি কখনোই কাউকে তৃষ্ণায় কষ্ট দিয়ে হত্যা করা সমর্থন করতে পারি না।” ২৬২

কিন্তু অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি কাফেরদের মানসিক শক্তি দুর্বল করতে সাময়িকভাবে পানি বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পানি বন্ধ করার ফলে তারা এতটা ভীত হয়ে পড়েছিল যে, সংক্ষিপ্ত এক যুদ্ধের পরপরই তারা আ সমর্পণ করে। ২৬৩

৩. হযরত আলী (আ.)- এর ত্যাগ

হযরত আলী (আ.) এ সম্পর্কে বলেছেন : “আমরা ইহুদীদের শক্তিশালী বাহিনী ও লৌহ কঠিন দুর্গের মোকাবেলায় দাঁড়িলাম। তাদের যোদ্ধারা প্রতিদিন দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধের আহ্বান জানাত এবং মুসলমানদের অনেকেই তাদের হাতে নিহত হতো। একদিন মহানবী (সা.) আমাকে দুর্গ অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। আমি তাদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের মুখোমুখি হলাম। তাদের অনেকেই হত্যা করলাম এবং একদল পালিয়ে গেল। তারা দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়ে দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। আমি দুর্গের দরজা উপড়ে ফেলে একাকী ভেতরে প্রবেশ করলাম। কেউ আর আমার সামনে এগিয়ে এলো না। এ পথে আল্লাহ ছাড়া কেউই আমাকে সাহায্য করে নি।”

যুদ্ধের ময়দানে ভালোবাসা ও সহানুভূতি

কামুস দুর্গের পতনকালে ইহুদী নেতা ছয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়া অন্য একজন নারীসহ বন্দী হন। হযরত বিলাল তাঁদের দু'জনকে ইহুদীদের মৃতদেহের পাশ দিয়ে রাসূলের নিকট নিয়ে এলেন। তিনি তাঁদের কথা শুনলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে স্বীয় চাদর দ্বারা সাফিয়ার মাথা

আবৃত্ত করলেন এবং তাঁকে বিশেষ সম্মানসহ সেনা ছাউনীর বিশেষ স্থানে বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর হযরত বিলালের প্রতি অসম্ভব চিন্তে বললেন : “তোমার অন্তর থেকে কি দয়া ও ভালোবাসা উঠে গিয়েছে? কেন এই দুই নারীকে তাদের স্বজনদের মৃতদেহের পাশ দিয়ে এনেছ?” শুধু এটুকু সম্মান দেখিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, বরং তাঁকে স্বীয় স্ত্রীর মহা মর্যাদায় সম্মানিত করলেন। এভাবে তাঁর মানসিক কষ্ট কমানোর চেষ্টা করলেন। মহানবীর সুন্দর ব্যবহার ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণে তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুশয্যায় অন্যান্য স্ত্রীগণের তুলনায় তিনি অধিক ক্রন্দন করেছিলেন।^{২৬৪}

কিনানা ইবনে রবীর মৃত্যুদণ্ড

বনী নাযীর গোত্রের ইহুদীরা মদীনা হতে বহিষ্কৃত হয়ে খাইবরে গিয়ে বসবাস শুরু করল। তারা সেখানে যুদ্ধের ব্যয় বহন, বনী নাযীরের হাতে নিহত ব্যক্তিদের রক্তপণ আদায় ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে সমবায় ব্যাংক গড়ে তুলেছিল। মহানবী (সা.) জানতে পারলেন, এ সমবায় ব্যাংক পরিচালনার দায়িত্ব ছিল সাফিয়ার স্বামী কিনানা ইবনে রবীর হাতে। মহানবী তাকে সামনে উপস্থিত করার নির্দেশ দিলে তাকে আনা হলো। তিনি তাকে এ ব্যাংকের অর্থ কোথায় রাখা হয়েছে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে এ ধরনের ব্যাংকের অস্তিত্বই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করল। ফলে তিনি তাকে আটক রাখার নির্দেশ দিয়ে অর্থ জমা রাখার স্থানটি খুঁজতে বললেন। এক ব্যক্তি বলল : “আমার মনে হয় সে এ সম্পদ ও অর্থ লো একটি পতিত ভবনে লুকিয়ে রেখেছে। আমি তাকে যুদ্ধের সময় ঘন ঘন সেখানে যেতে দেখেছি।” মহানবী (সা.) কিনানাকে পুনরায় তাঁর সামনে আনার নির্দেশ দিলেন। তাকে আনা হলে তিনি বললেন : “আমাকে জানানো হয়েছে, ঐ অর্থ তুমি অমুক স্থানে লুকিয়ে রেখেছ। যদি তা সেখানে পাওয়া যায়, তা হলে তোমার মৃত্যুদণ্ড হবে।” সে ঐ স্থানে অর্থ লুকিয়ে রাখার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। মহানবী ঐ স্থানটি খননের নির্দেশ দিলেন। খননের ফলে বনী নাযীরের অর্থ-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হলো। এখন কিনানের উপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর নিশ্চিত হলো। কারণ সে এ বিষয়টি গোপন করা ছাড়াও পাথর নিক্ষেপ করে মাহমুদ ইবনে মাসলামাকে হত্যা করেছিল। রাসূল (সা.) অন্যান্য ইহুদীদের শিক্ষা

দেয়ার জন্য এবং একজন মুসলমানের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিলেন। তাকে নিহত ব্যক্তির ভাই মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার হাতে অর্পণ করলেন। তিনি তাকে হত্যা করলেন।^{২৬৫} কিনানা এক মুসলিম সেনাপতিকে হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সর্বশেষ আসামী।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমত) বণ্টন

শত্রুর দুর্গ দখল সম্পন্ন ও তাদেরকে নিরস্ত্র করার পর মহানবী শত্রুদের থেকে পাওয়া সকল সম্পদ এক স্থানে জমা করার নির্দেশ দিলেন। তাঁর পক্ষ থেকে একজন সৈন্য চিৎকার করে ঘোষণা করলেন : প্রত্যেক মুসলিম সেনাকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে, সুই-সুতা পরিমাণ শত্রুসম্পদ হস্তগত হলেও বায়তুল মালে জমা দেয়ার। কারণ বায়তুল মালের খিয়ানত ও অন্যায় আ সাতের শাস্তি কিয়ামতে ভয়াবহ হবে।

ইসলামের মহান নেতা আমানতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কড়াকড়ি করতেন। এমনকি আমানত যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেয়াকে ঈমানের এবং তার আ সাৎকে কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতার শামিল মনে করতেন।^{২৬৬} এ কারণে একবার একজন সৈনিকের মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে এরূপ চুরি করা সম্পদ পেয়ে যাওয়ায় তার জানাযার নামায তিনি পড়েন নি। মুসলিম সৈন্যগণ খাইবর হতে ফিরে আসার প্রস্তুতি নেবার দিন এক দাস রাসূলের আসবাসপত্র গোছানোর সময় তীরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

কিভাবে, কোথা থেকে তীর এলো তা দেখার জন্য এদিক-ওদিক খোঁজ করা হলো; কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। এদিকে সবাই বলাবলি করতে লাগল, এ ব্যক্তি রাসূলের আসবাসপত্র গোছানোর সময় তীরবিদ্ধ হয়েছে, তার সৌভাগ্য যে, সে বেহেশ্তবাসী হবে। কিন্তু মহানবী (সা.) বললেন : “আমি এক্ষেত্রে তোমাদের অনুরূপ বিশ্বাস রাখি না। কারণ সে যে চাদর পরে আছে, তা গনীমতের সম্পদ। সে তা অন্যায়ভাবে আ সাৎ করেছে। এ সম্পদ তাকে কিয়ামতের দিন আ নের মতো ঘিরে ধরবে।” এ সময় রাসূলের অপর এক সাহাবী বললেন : “আমি বিনা অনুমতিতে গনীমতের সম্পদ থেকে দু’টি দামী জুতার ফিতা নিয়েছি।” তিনি বললেন : “এখনই তা ফিরিয়ে দাও, নতুবা কিয়ামতের দিন তোমার পা দু’টি আ নে জ্বালানো হবে।”^{২৬৭}

এ ঘটনা লোও কোন কোন মধ্যপ্রাচ্যবিদের দাবীর অসারতা প্রমাণ করে। কারণ তারা ইসলামের যুদ্ধ লো সম্পদ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে ছিল বলে থাকেন এবং এর আধ্যাতিক উদ্দেশ্য গোপন করার

প্রচেষ্টা চালান। অথচ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের হিসাবের ক্ষেত্রে এতটা শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার বিধানের প্রতি রুত্ব দান কোন লুটতরাজ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে কখনোই দেখা যায় না। কোন সম্পদলোভী জাতির নেতা আমানত ফিরিয়ে দেয়া ঈমানের চিহ্ন মনে করে না এবং তার সৈন্যদের এতটা প্রশিক্ষিত করে না যে, জুতার ফিতাও ফিরিয়ে দিতে হয় যাতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রকৃত বণ্টন পদ্ধতি অনুযায়ী তা পাওয়ার সঠিক অধিকারীর হাতে যথাযথ পৌঁছে যায়।

স্মৃতিময় আবিসিনিয়া থেকে কাফেলার প্রত্যাবর্তন

মহানবী (সা.) খাইবরের উদ্দেশ্যে যাত্রার পূর্বে আমার ইবনে উমাইয়াকে নাজ্জাশীর দরবারে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি রাসূলের ইসলামের আহ্বান তাঁর নিকট পৌঁছান এবং আবিসিনিয়ার প্রবাসী মুসলমানদের নিজ ভূমিতে ফিরে আসার ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান। নাজ্জাশী দু'টি জাহাজ দিয়ে তাঁদের প্রেরণ করলেন। তাঁরা মদীনার নিকটবর্তী সমুদ্র উপ লে নোঙ্গর করলেন। তাঁরা মদীনায় পৌঁছে মহানবী (সা.) খাইবরের দিকে যাত্রা করেছেন জেনে সেখানে অপেক্ষা না করে খাইবরের দিকে রওয়ানা হলেন। আবিসিনিয়া প্রত্যাগত মুসলমানরা খাইবরে পৌঁছানোর পূর্বেই সব দুর্গ দখল সম্পন্ন হয়েছিল। রাসূল (সা.) জাফর ইবনে আবী তালিবকে অভ্যর্থনা জানাতে কিছু দূর এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর কপালে চুমু খেয়ে বললেন :

بأيهما أشد سرورا؟ بقدمك يا جعفر أم بفتح الله علي يد أخيك خبير

“ আমি জানি না কোনটিতে বেশি আনন্দিত হয়েছি! দীর্ঘদিন পর তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে, নাকি তোমার ভাই আলীর মাধ্যমে আল্লাহ্ যে ইহুদীদের দুর্গ লোর পতন ঘটিয়েছেন, তাতে।”

অতঃপর বললেন : “আমি আজ তোমাকে কিছু উপহার দেব।” সবাই ভাবলেন হয় তো কোন বস্ত্রগত উপহার তিনি তাঁকে দেবেন, যেমন দামী বস্ত্র বা সোনা- রূপা ইত্যাদি। কিন্তু মহানবী (সা.) কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে তাঁকে বিশেষ এক নামায শিক্ষা দিলেন যা পরবর্তীতে ‘জাফর তাইয়্যার-এর নামায’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।^{২৬৮}

যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা

এ যুদ্ধে মুসলমানদের মৃতের সংখ্যা ২০ জনের অধিক ছিল না। অপর পক্ষে ইহুদীদের নিহতের সংখ্যা এর কয়েক গুণ ছিল। ইতিহাসে ৯৩ জনের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।^{২৬৯}

বিশ্বের সকল খোদায়ী ও মহান ব্যক্তি বিজয়ের মুহূর্তে অসহায় ও দুর্বল শত্রুদের সাথে উন্নত ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করে থাকেন। শত্রুর অন্যায় আচরণকে উপেক্ষা করে তাদের সাথে দয়র্দ্র আচরণ করেন। শত্রু আ সমর্পণ করার সময় থেকেই সহানুভূতির দ্বার তাদের জন্য উন্মোচিত করেন এবং সকল প্রতিশোধের স্পৃহা ও বিদ্বেষকে ভুলে যান।

যে শত্রুরা তাদের প্রচুর অর্থ ও সম্পদ মুশরিকদের পেছনে খরচ করে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে মদীনা আক্রমণে প্রলুব্ধ করেছিল ও এভাবে ইসলামের পতন ঘটাতে চেয়েছিল, খাইবর বিজয়ের পর মুসলমানদের মহান নেতা সেই ইহুদীদের জন্য তাঁর করুণায় মুক্তপক্ষ হলেন। তাদের প্রস্তাবকে তিনি মেনে নিলেন এবং সেখানে তাদের বসবাসের অনুমতি দিলেন। খাইবরের ভূমিও তাদের মালিকানায় থাকল। শুধু তাদের ভূমি থেকে উপার্জিত অর্থের অর্ধেক মুসলমানদের দিতে হবে।^{২৭০} এমনকি ইবনে হিশামের^{২৭১} মতে, এ প্রস্তাব রাসূল (সা.) নিজেই দেন এবং তাদেরকে কৃষিভূমি ও খেজুর বাগানের মালিক ও তত্ত্বাবধায়ক ঘোষণা করেন।

মহানবী (সা.) তাদের সবাইকে হত্যা করতে পারতেন এবং তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার ও ইসলাম গ্রহণে বাধ্যও করতে পারতেন। সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত প্রাচ্যবিদরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ প্রচার চালায় যে, ইসলাম শক্তি ও তরবারির ধর্ম এবং মুসলমানরা পরাজিত জাতি লোকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিল। তা কখনোই সঠিক নয়; বরং তাঁরা সবসময় প্রতিপক্ষকে তাদের ধর্মের মৌলিক বিধি-বিধান ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করতেন। মহানবী (সা.) খাইবরের ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করে থাকলে তা এ কারণে করেছিলেন যে, তারা ইসলামের ও একত্ববাদী ধর্মের জন্য বিপজ্জনক শত্রু হিসেবে পরিগণিত হতো এবং সবসময়ই তারা ইসলামের নব প্রতিষ্ঠিত সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তাই

এক্ষেত্রে তাদের সাথে তিনি বাধ্য হয়েই যুদ্ধ করেন এবং তাদের নিরস্ত্র করে ইসলামী সরকারের অধীনে নিয়ে আসেন এবং এতে মুসলমানরা তাদের হতে নিরাপদ হয় ও তারাও পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য কাজ করার পাশাপাশি ধর্মীয় বিধান পালনের সুযোগ ভোগ করতে থাকে। এমনটি না করা হলে মুসলমানরা সমস্যায় পড়তেন এবং ইসলামের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হতো।

মহানবী (সা.) তাদের কাছ থেকে জিযিয়া (বিশেষ কর) গ্রহণ করেছেন এজন্য যে, তারা যেন ইসলামী সরকারের অধীনে পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে বসবাস করতে পারে। তাদের জীবন ও সম্পদ যেন কোনরূপ হুমকির সম্মুখীন না হয়, তার নিশ্চয়তা বিধান মুসলমানদের দায়িত্ব ছিল। ইসলামী রা ও সরকার তার মুসলমান অধিবাসীদের থেকে যে পরিমাণ অর্থ কর (যেমন : আয়কর, খাজনা ও ভূমিকর প্রভৃতি) হিসেবে গ্রহণ করে থাকে, তার ইহুদী ও খ্রিষ্টান নাগরিকদের থেকে তার চেয়েও কম অর্থ গ্রহণ করে থাকে। এটি যথার্থ হিসেব করেই করা হয়ে থাকে। মুসলমানরা খুমস ও যাকাত দেয়া ছাড়াও ইসলামী রাে র প্রয়োজনে কখনো কখনো নিজের উপার্জন ও মূলধন হতেও খরচ করতে বাধ্য। অন্যদিকে ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা ইসলামের নিরাপত্তার পতাকাতলে জীবন যাপন করবে, তাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত অধিকার লো ভোগ করবে এবং এর বিপরীতে মুসলমানদের মতোই বা তার চেয়ে কম অর্থ জিযিয়া হিসেবে দেবে। তাই এটি অন্যায্য কোন বিষয় নয়। ইসলামী রাে জিযিয়া জোরপূর্বক চাঁদা গ্রহণও নয়।

প্রতি বছর মহানবী (সা.)- এর পক্ষে এক ব্যক্তি খাইবরে উৎপাদনের হিসাব গ্রহণ ও জিযিয়া আদায়ের জন্য যেতেন। যে ব্যক্তিত্বকে তিনি এ দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন, যাঁর সুবিচার ও ন্যায়ানুগ আচরণে ইহুদীরা আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। এ ব্যক্তিত্ব হলেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, যিনি পরবর্তীতে মুতার যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি খাইবরের মোট ফসলে মুসলমানদের নির্ধারিত অংশের বিষয়ে অনেক সময় অনুমান করে বলতেন। ইহুদীরা ভাবত, তিনি হয় তো ভুল করে বেশি বলেছেন। তিনি তখন তাদেরকে বলতেন : “যদি তোমরা মনে কর, আমি ভুল করেছি, তবে যেহেতু উভয়ে সমান সমান পাওয়ার কথা, তাই

আমি যে অনুমান করেছি, তার ভিত্তিতে পূর্বেই তোমাদের অর্থ দিয়ে দেব। ফসল বিক্রির পর দু'ভাগ করে নেয়ার দরকার নেই। পুরোটাই মুসলমানদের হবে, এতে যদি মুসলমানদের ক্ষতিও হয়।” ইহুদীরা তাঁর এ ন্যায্য কথায় বলত, এ ধরনের ন্যায়বিচারের ছায়াতেই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী টিকে রয়েছে।” ২৭২

যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে একখানা তাওরাতও ছিল। ইহুদীরা রাসূলের কাছে তা ফিরিয়ে দেয়ার আবেদন জানালে তিনি বায়তুল মালের (রাণীয় কোষাগারের) দায়িত্বশীলকে তাদের নিকট তা ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

ইহুদীদের একগুঁয়ে আচরণ

মহানবী (সা.)- এর সহানুভূতিসম্পন্ন আচরণের বিপরীতে ইহুদীরা ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা হতে বিরত থাকে নি। তারা তাঁর ও তাঁর সাথীগণের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করতে লাগল। তাদের দু'টি নীল নকশার বিবরণ এখানে পেশ করছি :

১. একদল ইহুদী সম্ভ্রান্ত এক ইহুদীর স্ত্রীকে প্ররোচিত করল মহানবীকে বিষ প্রয়োগ করতে। ঐ নারী এক ব্যক্তিকে রাসূলের এক সাহাবীর নিকট তাঁর পছন্দনীয় খাদ্য বিশেষত দুস্থার কোন্ অংশ তিনি খেতে পছন্দ করেন, তা জানার জন্য পাঠাল। ঐ সাহাবী বললেন, দুস্থার সামনের পায়ের মাংস খেতে তিনি পছন্দ করেন। ঐ ইহুদী নারীর নাম ছিল যাইনাব। সে পুরো একটি দুস্থার কাবাব বানাল ও তার পায়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিষ মিশ্রিত করল। অতঃপর তা রাসূলকে উপহার হিসেবে পাঠালো। রাসূল প্রথম লোকমা মুখে দিয়েই বুঝতে পারলেন, তা বিষ মিশ্রিত এবং সাথে সাথেই তা মুখ থেকে ফেলে দিলেন। কিন্তু তাঁর এক সাহাবী 'বাসার ইবনে বাররা মারুর' কয়েক লোকমা খেয়ে ফেলেছিলেন এবং সাথে সাথেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মহানবী (সা.) যাইনাবকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : "কেন আমার প্রতি এমন অন্যায় ও বিদ্বেষমূলক আচরণ করেছ?" সে শিশুদের ন্যায় অজুহাত দেখিয়ে বলল : "তুমি আমাদের গোত্রকে নাজেহাল করেছ, তাদের অপমানকর অবস্থায় ফেলেছ। তাই ভেবেছিলাম, যদি অত্যাচারী শাসক হয়ে থাক, তা হলে এ বিষমিশ্রিত খাদ্য খেয়ে মৃত্যুবরণ করবে, আর যদি আল্লাহর নবী হয়ে থাক, তবে এ খাদ্য গ্রহণ করবে না।" মহানবী (সা.) তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাকে যারা এ কাজে প্ররোচিত করেছিল, তাদেরকে ধরতে বললেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নবী ছাড়া অন্য কোন শাসকের সাথে যদি এরূপ আচরণ করা হতো, তবে তাদের সবার রক্তে মাটি রঞ্জিত করত ও নির্দোষদের অনেককেও মৃত্যু পর্যন্ত কারাবন্দী করে রাখতো।^{২৭০}

এক ইহুদী নারীর পক্ষ হতে এ ধরনের অপচেষ্টার ফলে মহানবী (সা.)- এর অনেক সাহাবী তাঁর স্ত্রী সাফিয়ার প্রতি সন্দেহপ্রবণ হলেন এবং ভাবলেন, তিনি রাতের অন্ধকারে তাঁর জীবননাশের

অপচেষ্টা চালাতে পারেন। এজন্য খাইবর থেকে মদীনা পর্যন্ত যেখানেই কাফেলা রাত যাপন করেছে, আবু আইউব আনসারী তাঁর তাঁবুর পাশে প্রহরীর ভূমিকা পালন করেছেন। মহানবী (সা.) তাঁর এ প্রহরার বিষয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন। একদিন ভোরে মহানবী তাঁবু হতে বেরিয়ে দেখলেন আবু আইউব আনসারী তাঁবুর বাইরে তরবারি হাতে পায়চারী করছেন। তাঁকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : “যেহেতু আশংকা করছিলাম এই ইহুদী নারী সাফিয়ার অন্তর হতে গোত্রীয় গোঁড়ামী ও কুফরী অপসারিত হয় নি এবং সে আপনার ক্ষতি করতে পারে, সেহেতু সারারাত আপনার তাঁবুর বাইরে পাহারা দিচ্ছিলাম।” মহানবী (সা.) এই নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীর আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর জন্য দুআ করলেন।^{২৭৪}

২. মহানবী (সা.)- এর উদারতা ও ভালোবাসার জবাবে ইহুদীরা তাঁর প্রতি অবিচার ও অকৃতজ্ঞ আচরণ করেছিল। তার অপর একটি নমুনা হলো : একবার রাসূলের পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ ইবনে সাহল খাইবর হতে খাদ্যশস্য মদীনায় আনার দায়িত্ব পেলেন। তিনি মুসলমানদের অংশ পৃথক করার সময় ইহুদীদের নিযুক্ত একদল সন্ত্রাসী তাঁর উপর হামলা চালাল। তারা তাঁর ঘাড়ে এত জোরে আঘাত করল যে, ঘাড় ভেঙে গেল ও তিনি মাটিতে পড়ে মারা গেলেন। তখন তারা তাঁর লাশ নিয়ে একটি নালার মধ্যে নিক্ষেপ করল। অতঃপর ইহুদী নেতারা একদল প্রতিনিধি রাসূলের নিকটে প্রেরণ করে তাঁর মৃত্যু অজ্ঞাত কারণে হয়েছে বলে জানালো। আবদুল্লাহর ভাই আবদুর রহমান ইবনে সাহল তার চাচাতো ভাইদের নিয়ে রাসূলের কাছে এসে তার ভাইয়ের লাশ ইহুদীদের বসতির নিকট পাওয়া গেছে বলে জানায়। যেহেতু আবদুর রহমান কিশোর ছিলেন, সেজন্য তিনি তার কথা থামিয়ে আগে বড়দের কথা বলার সুযোগ দিতে বললেন, যা ইসলামের একটি সামাজিক রীতি। তাঁদের কথা শোনার পর রাসূল বললেন : “তোমরা আবদুল্লাহর হত্যাকারীকে চিনে থাকলে আল্লাহর শপথ করে বল, সে তার হত্যাকারী। সে ক্ষেত্রে আমি তাকে গ্রেফতার করে তোমাদের হাতে অর্পণ করব।” তাঁরা যেহেতু ইসলামের বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং পরহেজগারী ও খোদাভীরুতার পথ অবলম্বনকে নিজেদের পাথেয় করেছিলেন, এতে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হলেও বললেন : “আমরা তো তাঁর

হত্যাকারীকে চিনি না।” রাসূল বললেন : “ইহুদীরা যদি আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তার হত্যাকারীকে তারা চেনে না, তা হলে এই শপথের পরিপ্রেক্ষিতে তারা আবদুল্লাহর রক্তপণ থেকে মুক্ত হবে, তোমরা কি তা মেনে নেবে?” তাঁরা বললেন : “ইহুদীদের শপথ আমাদের কাছে মূল্যহীন।” এ কথা শুনে তিনি ইহুদী গোত্রপতিদের উদ্দেশে এ মর্মে পত্র লেখার নির্দেশ দিলেন যে, যেহেতু তাদের বসতিতে একজন মুসলমানের ক্ষত-বিক্ষত দেহ পাওয়া গেছে, তাই তারা তার রক্তের জিম্মাদার ও এর রক্তপণ তাদেরই দিতে হবে। তারা তাঁর পত্রের জবাবে শপথ করে বলল: “আমরা এ হত্যাকাণ্ড ঘটাই নি এবং তাঁর হত্যাকারী কে, তাও জানি না।” যেহেতু তিনি দেখলেন হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি অসমাধানযোগ্য অবস্থায় পৌঁছেছে, তাই নতুন করে রক্তপাত এড়াতে নিজেই আবদুল্লাহর রক্তপণের অর্থ পরিশোধ করলেন।^{২৭৫}

এভাবে রাসূল (সা.) আবার প্রমাণ করলেন, তিনি কোন যুদ্ধবাজ ও কলহপ্রিয় ব্যক্তি নন। তিনি সাধারণ কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি হলে আবদুল্লাহর হত্যার ব্যাপারটিকে ব্যবহার করে ইহুদীদের শাস্তি করতেন ও তাদের অনেকেরই প্রাণহানি ঘটাতেন। এ কারণেই মহান আল্লাহ তাঁকে পবিত্র কুরআনে মানবের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও তাদের জন্য আল্লাহর রহমতস্বরূপ বলেছেন। তিনি কখনোই দেয়ালে পিঠ না ঠেকলে বা বাধ্য না হলে তরবারি ধারণ করতেন না।^{২৭৬}

কল্যাণমূলক মিথ্যা ২৭৭

‘ হাজ্জাজ ইবনে আলাত’ নামের এক ব্যবসায়ী খাইবরে বাস করত। মার অধিবাসীদের সাথে তার ব্যবসায়িক লেন-দেন ছিল। সে এক ঐয়ে ইহুদী জাতির সাথে মহানবী (সা.)-এর সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ ও ইসলামের চোখ ধাঁধানো মর্যাদা লক্ষ্য করে (যা তার হৃদয়কে আলোকিত করেছিল) রাসূলের নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। সে মাবাসীর কাছে তার পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে চতুরতার সাথে পরিকল্পনা আঁটল। সে মায় প্রবেশ করে দেখল কুরাইশ নেতারা উদ্দিগ্ন অবস্থায় খাইবরের খবরের অপেক্ষায় রয়েছে। তাই সে মায় প্রবেশ করে তাদের কাছে পৌঁছামাত্রই তারা তার উটকে ঘিরে অধৈর্য হয়ে রাসূলের জয়-পরাজয়ের খবর জানতে চাইল। সে তাদের প্রশ্নের জবাবে বলল : “মুহম্মাদ পরাজিত হয়েছে। এ রকম শোচনীয় পরাজয়ের কথা তোমরা কখনো শোন নি। তার সাথীরা হয় নিহত হয়েছে বা বন্দী। সে নিজেও বন্দী হয়েছে। ইহুদীরা তাকে মায় এনে তোমাদের সামনে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।” এই মিথ্যা খবর তাদের এতটা আনন্দিত করল যে, তারা আনন্দে পাখির মতো উড়তে লাগল। অতঃপর হাজ্জাজ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল : “এই সুসংবাদ দেয়ার কারণে আমাকে আমার পাওনা লো দিয়ে দাও যাতে করে অন্যান্য অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা খাইবরে পৌঁছার পূর্বেই আমি মুসলমান বন্দীদের কিনতে পারি।” প্রতারিত মাবাসীরা যত ত সম্ভব তার পাওনা টাকা দিয়ে দিল।

এ খবর রাসূল (সা.)-এর চাচা আব্বাসের কানে পৌঁছলে তিনি চিন্তিত হলেন। তিনি হাজ্জাজের নিকট উপস্থিত হওয়ামাত্রই হাজ্জাজ চোখের ইশারায় জানালো, সে পরে বিস্তারিত জানাবে। মাত্যাগের পূর্বে সে গোপনে আব্বাসের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল : “আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। এই পরিকল্পনা (মিথ্যা খবর ছড়ানো) এজন্য করেছিলাম যে, মায় যাদের কাছে পাওনা ছিল তাদের থেকে তা আদায় করা। প্রকৃত খবর হলো, যেদিন আমি খাইবার থেকে যাত্রা করি, সেদিন সব ক’টি দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে এবং হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়াও মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছেন। আমি মাত্যা থেকে চলে যাওয়ার তিন দিন পর এ সত্য খবর

প্রচার করুন, এর পূর্বে নয়।” তিন দিন পর আব্বাস দামী পোশাক পরে নিজেকে পরিপাটি করে সুগন্ধি মেখে লাঠি হাতে নিয়ে কাবা ঘরের চারদিকে তাওয়াফ করতে লাগলেন। আব্বাসকে আনন্দিত দেখে তারা আশ্চর্যান্বিত হলো। তিনি তাদের বললেন : “এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। হাজ্জাজ তার পাওনা আদায়ের জন্য তোমাদের মিথ্যা খবর দিয়েছে। সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে যেদিন খাইবর থেকে মার দিকে যাত্রা করে, সেদিন মুহাম্মদ (সা.) ও মুসলমানদের ভাগ্যে সবচেয়ে বড় বিজয় ঘটেছে। ইহুদীদের দুর্গ লো দখল হয়েছে এবং তাদেরকে নিরস্ত্র করা হয়েছে। তাদের একদল নিহত ও অপর দল মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছে।” কুরাইশ নেতারা এ খবর শুনে চরম হতাশ হলো। এর কিছুক্ষণ পরই তাদের দূত মুসলমানদের খাইবর বিজয়ের খবর নিয়ে এলো।^{২৭৮}

পঁয়তাল্লিশতম অধ্যায় : সপ্তম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

ফাদাকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ফাদাক একটি আবাদ ও উর্বর অঞ্চলের নাম যা খাইবরের কাছে অবস্থিত (ছিল)। মদীনা থেকে এ অঞ্চলের দূরত্ব ছিল প্রায় ১৪০ কি.মি.। খাইবরের দুর্গ লোর পরই এ অঞ্চলটি হিজায়ের ইহুদীদের বসবাসকেন্দ্র বলে গণ্য হতো।^{২৭৯}

মদীনার উত্তর দিক থেকে নিরাপত্তাজনিত যে শূন্যতা অনুভূত হতো, মুসলিম বাহিনী কর্তৃক খাইবর, ওয়াদিউল কুরা ও তাইমা অঞ্চলের ইহুদীদের দমন করার পর সামরিক শক্তির মাধ্যমে তা পূরণ করা হয়েছিল। এ ভূখণ্ডের ইহুদীদের সামরিক শক্তির অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে- যারা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য প্রত্যক্ষ হুমকি বলে গণ্য হতো- মুহীত নামক দূতকে (মহানবীর পক্ষ থেকে) ফাদাক অঞ্চলের ইহুদী নেতৃবৃন্দের কাছে প্রেরণ করা হয়। 'ইউশা' ইবনে নূন যিনি এ অঞ্চলের ইহুদীদের প্রধান ছিলেন, যুদ্ধ করার চেয়ে সন্ধি ও আ সমর্পণের বিষয়কে অগ্রাধিকার দেন এবং প্রতি বছর ফাদাকের মোট উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক মহানবী (সা.)- এর হাতে অর্পণ এবং ইসলামের পতাকাতলে (ইসলামী রাে র ছায়ায়) বসবাস করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। আর ঠিক একইভাবে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করার এবং এর বিপরীতে ইসলামী রাে ঐ অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন।

যেসব ভূখণ্ড সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে ও যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকার করা হয় সে লোে সর্বসাধারণ মুসলিম উম্মাহর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ঐসব বিজিত অঞ্চলের সার্বিক বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব ইসলাম ও মুসলমানদের শাসনকর্তার (মহানবী বা তাঁর পরে তাঁর খলীফা) হাতে ন্যস্ত। তবে যে অঞ্চল সামরিক অভিযান পরিচালনা এবং সেনাবাহিনী প্রেরণ না করে (বিনা যুদ্ধে) মুসলমানদের হস্তগত হয়, তা স্বয়ং মহানবী (সা.) এবং তাঁর পরে তাঁর স্থলবর্তী ইমামের সাথেই সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে এবং এ ধরনের ভূখণ্ডের সর্বময় ক্ষমতা ও এখতিয়ার কেবল তাঁর হাতেই ন্যস্ত থাকে। তিনি তা দান করে দিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে ভাড়াও দিতে পারেন। এ সংক্রান্ত আরেকটি

বিষয় হচ্ছে, তিনি এ ধরনের সম্পদ থেকে তাঁর নিকটীয়দের বৈধ প্রয়োজনাদি সম্মানজনকভাবেও মেটাতে পারেন।^{২৮০}

মহানবী (সা.) শরীয়তের এ বিধানের ভিত্তিতে ফাদাক তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমা (আ.)- এর কাছে হিবা করেছিলেন। বিদ্যমান সাক্ষ্য- প্রমাণ অনুসারে এ সম্পত্তি হিবা করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল দু'টি বিষয় :

১. মহানবী (সা.)- এর ওফাতের পর মুসলমানদের সার্বিক বিষয়াদি পরিচালনার দায়িত্ব এবং নেতৃত্বভার হযরত আলীর ওপর অর্পিত ছিল; আর এ বিষয়টি বহুবার মহানবী স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন। স্বাভাবিকভাবে এ ধরনের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এক বিরাট ব্যয়েরও প্রয়োজন আছে। হযরত আলী (আ.) এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ ও পালন করার জন্য ফাদাক থেকে লব্ধ আয়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারতেন। (মহানবীর ওফাতের পর) খিলাফত-প্রশাসন এ ধরনের পূর্বাভাসের ব্যাপারে অবগত ছিল বিধায় তাঁর ওফাতের পর প্রথম দিন লোতেই তাঁর আহলে বাইতের হাত থেকে 'ফাদাক' নিজ কর্তৃত্বে নিয়ে যায়।

২. মহানবীর বংশধরগণ, যাঁদের পূর্ণাঙ্গ নমুনা হচ্ছেন হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন, তাঁরা যাতে মহানবীর ওফাতের পর সম্মানজনকভাবে জীবন যাপন করতে পারেন এবং মহানবীর মান-মর্যাদাও যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেজন্য তিনি ফাদাক ভূখণ্ড নিজ কন্যা ফাতিমা (আ.)- এর কাছে হিবা করেছিলেন।

শিয়া মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ এবং কতিপয় সুন্নী আলেম লিখেছেন : যখন

(و آت ذا القربى حقه و المسكين و ابن السبيل)

‘আর আপনি (আপনার) নিকটীয়, দরিদ্র এবং মুসাফিরকে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করুন’^{২৮১}- এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন মহানবী (সা.) নিজ কন্যাসন্তান হযরত ফাতিমাকে ডেকে এনে তাঁর কাছে ফাদাকের স্বত্ব হস্তান্তর করেছিলেন।^{২৮২} এ ঘটনার বর্ণনাকারী হচ্ছেন আবু সাঈদ খুদরী, যিনি মহানবী (সা.)- এর অন্যতম সম্মানিত সাহাবী ছিলেন।

শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সকল মুফাসসির বিশ্বাস করেন, এ আয়াত মহানবী (সা.)-এর নিকটায়ীদের অধিকার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাঁর কন্যা ‘যিলকুবরা’ অর্থাৎ নিকটায়ীদের সবচেয়ে স্পষ্ট বাস্তব নমুনা। এমনকি সন্ধ্যাবেলা যখন ঐ শামদেশীয় লোকটি ইমাম আলী ইবনুল হুসাইন যাইনুল আবেদীন (আ.)-কে বলেছিল : “তুমি তোমার নিজের পরিচয় দাও” , তখন তিনি নিজ পরিচয় তুলে ধরার জন্য উপরিউক্ত আয়াত (সূরা ইসরা : ২৬) তেলাওয়াত করেছিলেন। আর এ বিষয়টি মুসলমানদের মধ্যে এতটা স্পষ্ট ছিল, শামদেশীয় ঐ লোকটি ইমাম যাইনুল আবেদীনের বক্তব্য সত্যায়ন স্বরূপ মাথা নেড়ে তাঁকে এভাবে বলেছিল : “রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে আপনার নিকটায়িতার সম্পর্ক থাকার কারণে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আপনাদের অধিকার প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন।” ২৮৩

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত যে হযরত ফাতিমা যাহরা এবং তাঁর বংশধরগণের শানে অবতীর্ণ হয়েছে, সে ব্যাপারে মুসলিম জ্ঞানীদের মধ্যে ঐকমত্য (ইজমা) রয়েছে। তবে এ আয়াত অবতীর্ণ হবার সময় মহানবী (সা.) ফাদাক ভূখণ্ডটি যে হযরত ফাতিমার উদ্দেশ্যে হিবা করেছিলেন, সে ব্যাপারে শিয়া মুসলিম আলেমদের মধ্যে ঐকমত্য বিদ্যমান আছে এবং কতিপয় সুন্নী আলেমও এ ব্যাপারে শিয়া আলেমদের সাথে একমত প্রকাশ করেছেন।

আব্বাসী খলীফা (যে কারণেই হোক না কেন) হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.)-এর বংশধরগণের কাছে ফাদাক ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মূসা নামক এক বিখ্যাত ঐতিহাসিকের কাছে একটি পত্রে তাঁকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি (ঐতিহাসিক) উপরিউক্ত হাদীস- যা ছিল ঐ আয়াতের শানে নুযূল- খলীফার কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন। আর খলীফা মামুনও হযরত ফাতিমার বংশধরগণের কাছে ফাদাক ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ২৮৪

আব্বাসী খলীফা (মামুন) মদীনার শাসনকর্তার কাছে লিখেছিলেন : “মহানবী (সা.) ফাদাক গ্রামটি স্বীয় কন্যা হযরত ফাতিমাকে হিবা করেছিলেন এবং এটি একটি সন্দোহহীন বিষয়। আর হযরত ফাতিমার বংশধরগণের মধ্যেও এ ব্যাপারে কোন মতভিন্নতা নেই।” ২৮৫

মামুন যেদিন ফাদাক সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য আসনে উপবিষ্ট হলেন, তখন প্রথমে তাঁর হাতে একটি আবেদনপত্র আসে, যার লেখক নিজেকে হযরত ফাতিমা (আ.)- এর পক্ষ সমর্থনকারী বলে পরিচয় প্রদান করেন। মামুন ঐ পত্রটি পড়ে একটু ক্রন্দন করেন এবং বলেন : “হযরত ফাতিমার পক্ষ সমর্থনকারী কে?” তখন এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে নিজেকে হযরত ফাতিমার পক্ষ সমর্থনকারী বলে তুলে ধরলেন।

বিচার অধিবেশনটি তাঁর ও মামুনের মধ্যে একটি বিতর্কসভার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। অবশেষে মামুন নিজেকে দোষী বলে দেখতে পেলেন এবং আদালতের প্রধান বিচারপতিকে হযরত ফাতিমার বংশধরগণের কাছে ফাদাক ভূখণ্ড ফিরিয়ে দেয়ার জন্য একটি পত্র লেখার নির্দেশ দিলেন। উক্ত পত্র লেখা হলো এবং খলীফা মামুন তা অনুমোদন করলেন। ঐ সময় উক্ত বিতর্ক সভায় উপস্থিত দে’বেল দাঁড়িয়ে কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন, যার শুরুতে ছিল নিম্নোক্ত পঙ্ক্তি :

أصبح وجهه الزّمان قد ضحكا برّد مأمون هاشم فـدكا

‘ফুটে উঠেছে হাসির রেখা কালের আননে

বনী হাশিমের কাছে মামুনের

ফাদাক ফিরিয়ে দেয়ার কারণে।’

ফাদাক ভূখণ্ড যে হযরত ফাতিমার বৈধ সম্পত্তি ছিল, তা প্রমাণ করার জন্য যে সব দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে শিয়ারা সে লোর বিন্দুমাত্র মুখাপেক্ষী নয়। কারণ ইসলামের সর্বপ্রধান পরম সত্যবাদী (সিন্দীকে আকবর) আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) বসরার গভর্নর উসমান ইবনে হুনাইফের কাছে লেখা এক পত্রে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ফাদাকের মালিকানা উল্লেখ করে বলেছেন :

بلي كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلمته السماء. فَسَخَّتْ عَلَيْهَا نفوسُ قومٍ، و سَخَّتْ عنها نفوسُ قومٍ آخرين
و نعمَ الحُكْمُ اللهُ

“ হ্যাঁ, যেসব কিছুর ওপর আকাশ ছায়া প্রদান করেছে, সেসবের মধ্যে ফাদাক গ্রামের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূসম্পত্তিও অন্তর্ভুক্ত, যা আমাদের হাতে (কর্তৃত্বে) ছিল। কিন্তু কোন কোন গোষ্ঠী এ ব্যাপারে কার্পণ্য করল। আর একদল উদার ও মহানুভব ব্যক্তি বিশেষ কতিপয় বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। তবে মহান আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।^{২৮৬}

তাই এ স্পষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা কী করে সম্ভব হতে পারে?

মহানবী (সা.)- এর ওফাতের পরে ফাদাকের ইতিহাস

মহানবী (সা.)- এর ওফাতের পর রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য মহানবী (সা.)- এর প্রাণপ্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা যাহরাকে তাঁর বৈধ ভূসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত এবং তাঁর নিযুক্ত কর্মচারী ও শ্রমিকদের সেখান থেকে বহিস্কার করা হয়। তাই তিনি আইনের আশ্রয় নিয়ে প্রশাসনের কাছ থেকে তাঁর বৈধ অধিকার আদায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

প্রথম পর্যায়ে ফাদাক গ্রামটি হযরত ফাতিমা (আ.)- এর কর্তৃত্বাধীন ছিল। আর এ কর্তৃত্ব তাঁর স্বত্বাধিকারী হওয়ার প্রমাণ ছিল। এ সত্ত্বেও ইসলাম ধর্মের বিচার সংক্রান্ত যাবতীয় নীতির বিপক্ষে প্রশাসন তাঁর কাছে সাক্ষী উপস্থিত করার দাবী জানায়। অথচ বিশ্বের কোথাও কোন সম্পদ কারো কর্তৃত্বে বিদ্যমান থাকলে, যাকে পারিভাষিক অর্থে ‘যূল ইয়াদ’ (ذو اليد) বা ‘স্বত্বাধিকারী’

বলা হয়, তার কাছ থেকে কখনো সাক্ষী চাওয়া হয় না। হযরত ফাতিমা বাধ্য হয়ে হযরত আলী (আ.)- এর মতো ব্যক্তিত্ব এবং উম্মে আইমানের মতো নারী, যাঁকে মহানবী (সা.) বেহেশতের নারীগণের অন্তর্ভুক্ত বলে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তাঁকে, এবং বালাযুরীর^{২৮৭} বর্ণনানুযায়ী, মহানবীর আযাদকৃত দাস রাবাহকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য খলীফার কাছে নিয়ে যান। খিলাফত-প্রশাসন তাঁদের সাক্ষ্য প্রদানকে মোটেই রুত্ব দেন নি এবং এভাবে মহানবী (সা.) তাঁর কন্যাকে যে ভূসম্পত্তি হিবা করেছিলেন, তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয়ে যায়।

আয়াতে তাতহীর^{২৮৮} অনুসারে হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.), হযরত আলী (আ.) এবং তাঁদের সন্তানদ্বয় (হাসান ও হুসাইন) সব ধরনের পাপ- পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র; আর যদি এ আয়াত মহানবী (সা.)- এর স্ত্রীগণকে শামিল করে, তবুও তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমা নিশ্চিতভাবে এ আয়াতে বর্ণিত আহলে বাইতের বাস্তব নমুনা হবেন। তবে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, এ বিষয়টিও সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয় এবং তদানীন্তন খলীফা হযরত ফাতিমার এ দাবীকে স্বীকৃতি দেন নি।

শিয়া আলেমগণ বিশ্বাস করেন, খলীফা অবশেষে মহানবীর কন্যার দাবীর কাছে মাথা নত করেছিলেন এবং ফাদাক যে তাঁর বৈধ নিষ্কণ্টক ভূসম্পত্তি, সে ব্যাপারে একটি পত্র লিখে তাঁকে প্রদান করেছিলেন। পত্র নিয়ে ফেরার সময় পথিমধ্যে খলীফার পুরানো বন্ধুর সাথে মহানবীর কন্যা হযরত ফাতিমার সাক্ষাৎ হলে তিনি পত্র লেখার ঘটনা জানতে পারেন। তিনি হযরত ফাতিমা (আ.)- এর কাছ থেকে পত্রটি এনে খলীফার সামনে উপস্থিত করে তাঁকে বলেছিলেন : যেহেতু এ ঘটনার মধ্যে আলীর স্বার্থ আছে, তাই তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। আর উম্মে আইমান একজন মহিলা এবং একজন মহিলার সাক্ষ্যের কোন মূল্য নেই।” এরপর তিনি খলীফার সামনেই উক্ত পত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন।^{২৮৯}

হালাবী তাঁর সীরাত গ্রন্থে এ ঘটনা একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করে বলেছেন : খলীফা হযরত ফাতিমার মালিকানার সত্যায়ন করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ সেখানে তাঁর বন্ধু হযরত উমর এসে উপস্থিত হন এবং বলেন, এ পত্রটি আসলে কী? তখন খলীফা তাঁকে বলেছিলেন : “এ পত্রে আমি ফাতিমার মালিকানা সত্যায়ন করেছি।” তখন হযরত উমর বললেন : “আপনার জন্য (ভবিষ্যতে) ফাদাকের আয়ের প্রয়োজন হবে। কারণ আগামীকাল যদি আরবের মুশরিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তা হলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এত খরচ কোথা থেকে আপনি মেটাবেন?” আর এরপর হযরত উমর উক্ত পত্র নিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন।^{২৯০}

এ কারণেই এখান থেকে একজন শিয়া কালামবিদ আলেমের বক্তব্যের বস্তুনিষ্ঠতা উপলব্ধি করা যায়। তা হলো, ইবনে আবীল হাদীদ বলেছেন : “‘আমি আলী ইবনে নাকী’ নামক একজন ইমামীয়া শিয়া কালামবিদ আলেমকে বলেছিলাম, ফাদাক গ্রামটা এতটা বড় ছিল না এবং ঐ ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে টিকতক খেজুর গাছ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর ঐ সব খেজুর গাছ এতটা মূল্যবান ছিল না যে কারণে ফাতিমার বিরোধীরা এ ভূখণ্ডের ব্যাপারে লোভ করবে।”^{২৯১}

তিনি আমার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন : আপনি এ ব্যাপারে ভুল করছেন। সেখানকার খেজুর গাছ লোর সংখ্যা কুফার বর্তমান খেজুর গাছ লোর চেয়ে কম ছিল না। নিশ্চিতভাবে বলা যায়,

এ উর্বর ভূখণ্ড থেকে মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইত ও বংশধরগণের বঞ্চিত করার কারণ ছিল, আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) পাছে এ ভূখণ্ডের আয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রতিরোধ করার কাজে ব্যবহার করেন এমন আশংকার দিকটি বাস্তবায়নে সক্ষম না হন। এ কারণে শুধু হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.)- কেই ফাদাক থেকে বঞ্চিত করা হয় নি; বরং বনী হাশিম এবং আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণকে তাঁদের ন্যায্য অধিকার অর্থাৎ খলীফাদের শাসনামলে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্থাৎ মালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ (খুমস) থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে যে গোষ্ঠীটি চরম অভাব, দারিদ্র্য ও দূরবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করতে বাধ্য হবে এবং জীবনের চাহিদা মেটাতেই ব্যস্ত থাকবে, তারা কখনোই বিদ্যমান অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার চিন্তা তাদের মাথায় লালন করবে না।^{২৯২}

ইবনে আবীল হাদীদ শারহু নাহজিল বালাগাহ গ্রন্থের ২৮৪ পৃষ্ঠায় পশ্চিম বাগদাদের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন বিখ্যাত শিক্ষক (আলী ইবনুল ফারিকী) থেকে এ বাক্যটি উদ্ধৃত করে বলেছেন : “আমি তাঁকে বললাম : মহানবী (সা.)- এর কন্যা হযরত ফাতিমা (আ.) কি তাঁর দাবীর ক্ষেত্রে সত্যবাদী ছিলেন?” তিনি বলেছিলেন : “হ্যাঁ” । আমি তাকে বললাম, “খলীফা কি জানতেন যে, হযরত ফাতিমা সত্যবাদী?” তিনি বলেছিলেন : “হ্যাঁ।” তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম : “খলীফা কেন তাঁর নিশ্চিত বৈধ অধিকার তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেন নি?” এ সময় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক স্মিত হেসে ভাবগাস্তীর্যের সাথে বলেছিলেন : “খলীফা যদি সত্যবাদী নারী হিসেবে হযরত ফাতিমা (আ.)- এর বক্তব্যসমূহ মেনে নিতেন এবং সাক্ষী না চেয়েই ফাদাক ভূখণ্ড তাঁর কাছে হস্তান্তর করতেন; তা হলে পরের দিন তিনি নিজ স্বামী আলী (আ.)- এর অনু লে এ অবস্থাকে কাজে লাগাতেন এবং বলতেন : খিলাফত আমার স্বামীর সাথে সংশ্লিষ্ট। আর এ অবস্থায় খলীফা আলীর কাছে খিলাফত হস্তান্তর করতে বাধ্য হতেন। কারণ তিনি ফাতিমাকে সত্যবাদী বলে মেনে নিয়েছেন এবং বিশ্বাস করেন। কিন্তু এ ধরনের দাবীর পথ রুদ্ধ করার জন্যই খলীফা হযরত ফাতিমাকে তাঁর বৈধ নিশ্চিত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন।”

ফাদাক ভূখণ্ড থেকে হযরত ফাতিমা (আ.)- এর সন্তান ও বংশধরগণকে বঞ্চিত করার ভিত প্রথম খলীফার সময়েই রচিত হয়েছিল। আর হযরত আলী (আ.)- এর ইন্তেকালের পর মুয়াবিয়া খিলাফতের সার্বিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ফাদাক ভূখণ্ডকে তিন ব্যক্তির (মারওয়ান, আমর ইবনে উসমান ও নিজ পুত্র ইয়াযীদ) মধ্যে বণ্টন করে দেন। মারওয়ানের খিলাফতকালে ফাদাকের সকল অংশ তার হাতে চলে আসে এবং সে তা তার পুত্র আবদুল আযীযকে হিবা করে দেয়। আর সেও তা তার পুত্র উমর ইবনে আবদুল আযীযকে প্রদান করেছিল। বনী উমাইয়্যার খলীফার মধ্যে কেবল উমর ইবনে আবদুল আযীযই মধ্যপন্থী ছিলেন। তাই খলীফা হবার পর তিনি সর্বপ্রথম যে বিদআত বিলোপ করেন, তা ছিল, তিনি ফাদাক ভূখণ্ড হযরত ফাতিমার বংশধরগণের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পরবর্তী খলীফারা বনী হাশিমের হাত থেকে ফাদাক ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং বনী উমাইয়্যার খলীফাদের জীবন অবসান হওয়ার দিন পর্যন্ত ফাদাক তাদের কর্তৃত্বে থেকে গিয়েছিল।

বনী আব্বাসের খিলাফতকালে ফাদাক ভূখণ্ড সংক্রান্ত সমস্যা আরো আশ্চর্যজনক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। যেমন আবুল আব্বাস আস্ সাফফাহ্ (প্রথম আব্বাসী খলীফা) আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসানের কাছে ফাদাক হস্তান্তর করেছিল। তারপর দ্বিতীয় আব্বাসী খলীফা মানসূর আদ দাওয়ানিকী আবার তা কেড়ে নিয়েছিল। তবে তার পুত্র খলীফা মাহদী তা হযরত ফাতিমার বংশধরদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর (মাহদী) মৃত্যুর পর বিভিন্ন রাজনৈতিক স্বার্থে আব্বাসী খলীফা মূসা ও খলীফা হারুনুর রশীদ হযরত ফাতিমার বংশধরদের হাত থেকে ফাদাক কেড়ে নিয়েছিলেন। আর এ অবস্থাটা মামুনের খলীফা হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ফাদাক সংক্রান্ত ন্যায়্য অধিকার এর প্রকৃত স্বত্বাধিকারীগণের কাছে ফিরিয়ে দেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর ফাদাক আবারো অস্থিতিশীল অবস্থার শিকার হয় অর্থাৎ কখনো তা হযরত ফাতিমার বংশধরগণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হতো, কখনো তা তাঁদের কাছে ফেরত দেয়া হতো। বনী উমাইয়্যা ও বনী আব্বাসের খিলাফতকালে অর্থনৈতিক রুত্বের চেয়ে ফাদাকের রাজনৈতিক রুত্বই অধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইসলামের প্রথম যুগের খলীফাগণ ফাদাকের আয়ের

মুখাপেক্ষী ছিলেন। তবে পরবর্তী যুগ লোতে খলীফা ও আমীর- অমাত্যগণ এতটা অর্থ ও ধন- সম্পদের অধিকারী হয়েছিল যে, তাদের আর ফাদাকের আয়ের প্রয়োজন হতো না। এ কারণেই যখন খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয হযরত ফাতিমা (আ.)- এর বংশধরগণের কাছে ফাদাক অর্পণ করেন, তখন বনী উমাইয়্যা তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেছিল : “আপনি এ কাজের দ্বারা ‘শায়খাইন’ অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত উমরকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।” আর এ কারণে তারা তাঁকে ফাদাকের মূল মালিকানা নিজ হাতে রেখে এ ভূসম্পত্তির আয় হযরত ফাতিমার সন্তান ও বংশধরগণের মধ্যে বণ্টন করতে বাধ্য করেছিল।^{২৯৩}

আইনের মানদণ্ডে ফাদাক

ফাদাক সংক্রান্ত বিষয় অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে যায়, মহানবী (সা.)-এর প্রাণপ্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমাকে তাঁর ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ছিল নেহায়েত একটি রাজনৈতিক ব্যাপার। আর এ বিষয়টি তদানীন্তন শাসনকর্তার কাছে অধিক স্পষ্ট ছিল। এ কারণেই মহানবীর কন্যা হযরত ফাতিমা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও বাক-অলংকার সমৃদ্ধ এক অনলবর্ষী বক্তৃতায় বলেছিলেন :

هذا كتاب الله حكما و عدلا و ناطقا و فضلا يقول: يرث من آل يعقوب و ورث سليمان داوود و بين عز و جلّ في ما وزع من الأقساط و شرع من الفرائض
“ মহান আল্লাহর কিতাব কুরআন- যা হচ্ছে ফয়সালাকারী, স্পষ্টভাষী বিচারক এবং মীমাংসাকারী- বলছে : হযরত যাকারিয়া (আ.) মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, মহান আল্লাহ তাঁকে এমন এক সন্তান দিন, যে তাঁর ও ইয়াকুবের বংশধারার উত্তরাধিকারী হবে।^{২৯৪} এ কিতাবে আরো বলা হয়েছে : আর সুলাইমান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।^{২৯৫} মহান আল্লাহ (তাঁর) ইলাহী কিতাব কুরআনে উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশ লো বর্ণনা করেছেন এবং ফারায়েযও স্পষ্ট করে দিয়েছেন।”^{২৯৬}

মহান নবীগণের উত্তরাধিকারী যে তাঁদের সন্তান ও বংশধরগণ- এ সংক্রান্ত উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ের অর্থনির্দেশ এবং যে হাদীস কেবল খলীফাই রেওয়ায়েত করেছেন, সেই হাদীসের ব্যাপারে আলোচনা পর্যালোচনা এ অধ্যায়ের কলেবর বৃদ্ধি করবে। তাই আগ্রহী পাঠকবৃন্দ তাফসীরের গ্রন্থসমূহ পাঠ করতে পারেন। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য ‘ফারাযহায়ী হাসসাসে আয যেন্দেগানীয়ে আলী’ অর্থাৎ ‘হযরত আলীর জীবনের সংবেদনশীল অধ্যায় ও ঘটনাসমূহ’ গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে পারেন।)

ওয়াদিউল কুরা বিজয়

মহানবী (সা.) কেবল এ এলাকায় (ফাদাক) ইসলাম বিরোধী শক্তি লোকেই দমন করেন নি, বরং তিনি ইহুদীদের আরো একটি ঘাঁটি ‘ওয়াদিউল কুরায়’ সামরিক অভিযান পরিচালনা প্রয়োজন বলে মনে করেন। তাই তিনি নিজেই কয়েকদিন সেখানকার ইহুদীদের দুর্গ অবরোধ করে রাখেন এবং বিজয়ের পর খাইবরের অধিবাসীদের সাথে যে ধরনের সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, সে ধরনের একটি চুক্তি ওয়াদিউল কুরার ইহুদীদের সাথেও সম্পাদন করেন। আর এভাবে তিনি সম্পূর্ণ হিজায় অঞ্চলকে ইহুদী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের হাত থেকে মুক্ত করেন এবং তাদের সবাইকে নিরস্ত্র করে মুসলমানদের হেফাযতে আনেন।^{২৯৭}

ছেচল্লিশতম অধ্যায় : সপ্তম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

উমরাতুল কাযা^{২৯৮}

হৃদয়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর মুসলমানগণ এ চুক্তি সম্পাদিত হবার তারিখ থেকে এক বছর অতিক্রান্ত হবার পর পবিত্র ম া নগরীতে প্রবেশ এবং সেখানে তিন দিন অবস্থান করে উমরার আমলসমূহ আঞ্জাম দেবার পর পবিত্র ম া নগরী ত্যাগ করতে পারতেন (হৃদয়বিয়ার শান্তি চুক্তি মোতাবেক)। তখন (এ চুক্তি মোতাবেক) সফর করার সময়, মুসাফিরের সাথে যে অস্ত্র থাকে তা অর্থাৎ তরবারি ছাড়া, অন্য কোন অস্ত্র বহন করার অনুমতি তাঁদের ছিল না।

হৃদয়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হবার পর থেকে পুরো এক বছর কেটে যায়। মুসলমানদের জন্য এ চুক্তি থেকে কল্যাণ লাভ করার সময়ও তখন ঘনিয়ে এসেছিল। মুহাজির মুসলমানগণ, যাঁরা সাত বছর নিজেদের ঘর- বাড়ি ছেড়ে তাওহীদী ধর্ম রক্ষা করার জন্য নিজ মাতৃভূমিতে বসবাস করার পরিবর্তে প্রবাস জীবন বেছে নিয়েছিলেন, আবার মহান আল্লাহর ঘর যিয়ারত, নিকট আ ীয়দের সাথে দেখা- সাক্ষাৎ এবং ফেলে আসা ঘর- বাড়ি পরিদর্শন করার জন্য পবিত্র ম া র উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে যাচ্ছেন। যখন মহানবী (সা.) ঘোষণা করলেন, ‘যারা গত বছর বাইতুল্লাহ যিয়ারত করতে পারে নি, তারা যেন সফরের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়’ , তখন তাঁদের মধ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও সাড়া পড়ে যায় এবং তাঁদের নয়নযুগল আনন্দাশ্রুতে ভরে যায়। বিগত বছরে মহানবী (সা.) ১৩০০ সাহাবী সহকারে পবিত্র ম া র উদ্দেশ্যে যাত্রা করে থাকলেও পরের বছর (হিজরতের সপ্তম বর্ষে) মহানবীর সফর সঙ্গীর সংখ্যা দু’হাজারে উন্নীত হয়েছিল।

তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বড় বড় মুহাজির ও আনসার ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাঁরা সকল ক্ষেত্রে মহানবীর পেছনে পেছনে পা ফেলেছেন। ঠিক একইভাবে ষাটটি উট, যে লোর গলায় কুরবানীর চিহ্ন ছিল, সে লোও তাঁরা নিজেদের সাথে এনেছিলেন। মহানবী (সা.) মদীনার মসজিদ থেকে ইহরাম বাঁধেন এবং অন্যরাও তাঁর অনুসরণ করে সেখান থেকে ইহরাম পরেছিলেন। দু’হাজার লোক ইহরাম পরে ‘লাক্বাইকা’ বলতে বলতে পবিত্র ম া র পথে বের হয়ে যান। এ কাফেলা

এতটা মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের অধিকারী ছিল যে, ইসলাম ধর্মের আধ্যাতিকতা ও প্রকৃত স্বরূপের দিকে আরবের অনেক মূর্তিপূজারী মুশরিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

আমরা যদি বলি, এ সফর আসলে প্রচারের (তাবলীগের) সফর ছিল এবং এ সব ব্যক্তি আসলেই প্রচার-সৈনিক ছিলেন, তা হলে তা কোন বৃথা কথা হবে না। এ সফরের আধ্যাতিক প্রভাব অল্প কিছু দিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই উহুদ যুদ্ধের বীর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এবং আরবদের মধ্যকার ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ আমর ইবনে আসের মতো ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে কঠোর ও পাষাণ শত্রুরা পর্যন্ত এ বিশাল মর্যাদা প্রত্যক্ষ করার পর ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল এবং কিছু সময় গত হওয়ার পর তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

মহানবী (সা.) কুরাইশদের হিংসা ও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। তিনি আশংকা করছিলেন, পবিত্র মায় কুরাইশরা তাঁকে ও তাঁর সাহাবীগণকে আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করতে পারে। আবার অন্য দিকে হৃদয়বিয়ার সন্ধিচুক্তির একটি ধারা অনুসারে অস্ত্র সাথে নিয়ে পবিত্র মায় নগরীতে প্রবেশ করা অনুচিত। তাই সব ধরনের দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য মহানবী (সা.) তাঁর এক সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি বর্ম ও বর্শার মতো প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এবং এক শ' তগামী ঘোড়া সমেত দু'শ' যোদ্ধা সাথে নিয়ে উমরার কাফেলা যাত্রা করার আগে রওয়ানা হয়ে পবিত্র হারাম^{২৯৯} শরীফের কাছে অবস্থিত মারওয়য যাহরান উপত্যকায় অবস্থান নিয়ে মহানবীর আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

মহানবী (সা.)-এর গতিবিধির ওপর নজরদারীরত কুরাইশ গুচররা মারওয়য যাহরান উপত্যকায় অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত দু'শ' অশ্বারোহীর আগমনের ব্যাপারে অবগত হয় এবং কুরাইশ নেতাদের কাছে এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্টও পেশ করে।

মুকরিম ইবনে হাফস কুরাইশদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগাযোগ করে তাঁকে কুরাইশদের আপত্তির কথা জানায়। মহানবী কুরাইশ প্রতিনিধিকে এর জবাবে বলেছিলেন : “আমি ও আমার সাহাবীরা কখনই চুক্তিবিরোধী কোন কাজ করবো না। আমরা

সবাই অস্ত্র ছাড়াই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করব। এ সেনাপতি ও দু’শ’ জন সৈন্য সকল অস্ত্র-শস্ত্র সহ এ এলাকায় (মাররুয যাহরান উপত্যকায়) অবস্থান করবে এবং তারা আর সামনে অগ্রসর হবে না।” মহানবী (সা.) তাঁর এ বাণীর দ্বারা কুরাইশদের বুঝিয়ে দেন যে, যদি তোমরা আমাদের নিরস্ত্র থাকার সুযোগে আমাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাও, তা হলে এসব সাহায্যকারী সৈন্যরা- যারা হারামের বাইরে মোতায়েন আছে- তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের সাহায্যার্থে ত চলে আসবে এবং আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবে। কুরাইশরা মহানবীর দূরদর্শিতার কথা জানতে পারল। তারা মুসলমানদের সামনে পবিত্র ম া নগরীর দরজা খুলে দিল। কাফির-মুশরিকদের নেতারা এবং তাদের অধীনস্থরা ম া নগরী ত্যাগ করে এর আশে-পাশের পাহাড় ও টিলা লোয় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, যাতে মহানবী (সা.) ও তাঁর সফর-সঙ্গীগণের সাথে তারা মুখোমুখী না হয় এবং দূর থেকে তাঁদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ওপর লক্ষ্য রাখতে পারে।

পবিত্র মক্কা নগরীতে মহানবী (সা.)- এর প্রবেশ

মহানবী (সা.) একটি বিশেষ উটের পিঠে আরোহণ করে সফরসঙ্গীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন। তখন তাঁরা তালবীয়া (লাব্বাইকাল্লাহুমা লাব্বাইক) পাঠ করছিলেন। সুশৃঙ্খল এ জামায়াতের মনোজ্ঞ এ লাব্বাইক ধ্বনি এতটা আকর্ষণীয় ছিল যে, তা মক্কার সকল অধিবাসীর ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তাদের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি এক বিশেষ টান ও নমনীয়তা সৃষ্টি করেছিল। আর সেই সাথে মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি মুশরিকদের হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চারও করেছিল। মুসলমানদের ‘লাব্বাইক’ ধ্বনি থেমে গেলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, যিনি মহানবী (সা.)- এর উটের রজ্জু ধরে রেখেছিলেন, বলিষ্ঠ কণ্ঠে ও মধুর সুরে নিম্নোক্ত কাব্য পঙ্ক্তিমাল্য আবৃত্তি করছিলেন :

خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في قبوله

يا ربّ إنّي مؤمن بـقبيله أعرف حقّ الله في قبوله

“ হে মুশরিক ও কাফিরদের সন্তানরা! মহানবী (সা.)- এর জন্য পথ খুলে দাও। তোমরা জেনে রাখ, তিনি সকল কল্যাণের উৎস (অর্থাৎ তাঁকে মেনে নেয়া ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মধ্যেই কেবল কল্যাণ নিহিত আছে)। হে প্রভু! আমি তাঁর বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করা সংক্রান্ত আপনার নির্দেশ সম্পর্কেও আমি জ্ঞাত।” ৩০০

যে উটের উপর মহানবী (সা.) উপবিষ্ট ছিলেন, সেই উটের উপর আরোহণ করেই তিনি পবিত্র মক্কা’বা তাওয়াফ করলেন। এবার তিনি ইবনে রাওয়াহাকে নিম্নোক্ত বিশেষ দুআ তাঁর কণ্ঠে পাঠ এবং অন্যদেরও তাঁর সাথে তা পাঠ করার নির্দেশ দেন :

لا إله إلا الله وحده وحده، صدق وعده، و نصر عبده و أعزّ جنده و هزم الأحزاب وحده

“ কেবল আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। তিনি এক- অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পালন করেছেন (তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তোমরা অর্থাৎ মুসলমানরা শীঘ্রই মহান আল্লাহর ঘর কাবা যিয়ারত করবে), নিজ বান্দাকে (মহানবীকে) সাহায্য করেছেন, তাওহীদের সেনাবাহিনীকে সম্মানিত করেছেন এবং একাই তিনি কুফর ও শিরকের সকল গোষ্ঠীকে পরাজিত করেছেন।”

সেদিন যিয়ারত করার যাবতীয় স্থান এবং মসজিদ, কাবা ও সাফা- মারওয়াহ সহ উমরার যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন করার স্থান মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে। যে স্থান দীর্ঘকাল ধরে শিরক ও পৌত্তলিকতার কেন্দ্র ছিল সেখানে এ ধরনের উষ্ণ তাওহীদের গণ শিরকের নেতাদের ও তাদের অনুসারীদের মনোবল ও মানসিকতার ওপর এমন তীব্র আঘাত হেনেছিল যা পরবর্তীতে সমগ্র আরব উপদ্বীপে মহানবী (সা.)- এর বিজয় নিশ্চিত ও বাস্তবায়িত করেছিল।

যুহরের সময় হলে মহানবী (সা.) ও মুসলমানগণ সামষ্টিকভাবে মসজিদুল হারামে নামায আদায় করলেন এবং মুসলমানদের মুয়াযিন অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে সেখানে আযান দিলেন।

বিলাল হাবাশী, যিনি তাওহীদের আদর্শ গ্রহণ করার অপরাধে দীর্ঘদিন এ নগরীতে নির্যাতিত হয়েছিলেন, মহানবীর নির্দেশে পবিত্র কাবার ছাদের উপর উঠলেন এবং যেখানে মহান আল্লাহর একত্ব এবং মহানবী (সা.)- এর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান সবচেয়ে বড় অপরাধ বলে গণ্য হতো, সেখানে তিনি কানের উপর হাত রেখে আযানের বাক্যসমূহ একের পর এক তাঁর বিশেষ কণ্ঠধ্বনি দিয়ে তেলাওয়াত করছিলেন। উল্লেখ্য, আযানের বাক্যসমূহ সকল মুসলমানের জ্ঞাত ছিল। তাঁর কণ্ঠধ্বনি এবং আযানের প্রতিটি বাক্য শোনার পর মুসলমানদের কণ্ঠে তার পুনরাবৃত্তি ও সত্যায়ন মূর্তিপূজক এবং তাওহীদের শত্রুদের কানে গিয়ে পৌঁছতে থাকে এবং তারা এতটা অসম্পৃষ্ট ও বিরক্ত হয়ে যায় যে, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা ও খালিদ ইবনে উসাইদ বলেই ফেলে : “মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ কারণে যে, আমাদের পিতৃপুরুষরা মৃত্যুবরণ করেছে বলে তাদেরকে এ হাবাশী দাসের কণ্ঠধ্বনি শুনতে হলো না।” সুহাইল ইবনে আমর যখন বিলালের তাকবীর ধ্বনি শুনতে পেল, তখন সে তার মুখমণ্ডল একটি রুমাল দিয়ে ঢেকে ফেলেছিল। তারা

(কুরাইশ নেতারা) বিলালের কণ্ঠে আযান শুনতে পেয়ে ততটা অসন্তুষ্ট হচ্ছিল না। তবে আযানের বাক্যসমূহের অন্তর্নিহিত অর্থ, যা তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আকীদা- বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল, তাদেরকে পীড়া দিচ্ছিল।

মহানবী (সা.) সাফা- মারওয়াহ এ দু'পাহাড়ের মাঝে সাঈ করতে ব্যস্ত ছিলেন। যেহেতু মুনাফিক চক্র এবং পৌত্তলিক মুশরিকরা জব রটিয়েছিল যে, মদীনার জ্বর বা শারীরিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকারী আবহাওয়া মুসলমানদের ধরাশায়ী (জরাব্য্যাধিগ্রস্ত) করে ফেলেছে, সেহেতু মহানবী (সা.) তাঁর সাঈ- এর কিছু অংশে হারওয়াল^{৩০১} করলেন এবং মুসলমানরাও এ অংশে তাঁকে অনুসরণ করে হারওয়াল করল।

সাঈ সমাপ্ত হলে উট লো কুরবানী করা হলো এবং সবাই চুল ছেটে ছোট করে ইহরাম খুলে ফেললেন। মহানবী (সা.) তখন মারওয়াহ যাহরানে অবস্থানরত দু' শ' অশ্বারোহী সৈন্যের কাছে গিয়ে অস্ত্র সংরক্ষণ করার জন্য দু' শ' ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যাতে করে এ সেনাদলও হারাম শরীফে প্রবেশ করে উমরার আমলসমূহ আঞ্জাম দিতে পারে।

উমরার আমল ও আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলো। মুহাজিরগণ নিজেদের ঘর- বাড়িতে গিয়ে আ'ীয়- স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা কয়েকজন আনসারকেও মেহমান হিসেবে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন। এভাবে আনসারগণ মুহাজিরগণকে দীর্ঘ ৮ বছর যে সেবা প্রদান করেছিলেন, মুহাজিরগণ তার খানিকটা পূরণ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

মহানবী (সা.)- এর মক্কা নগরী ত্যাগ

ইসলাম ও মুসলমানদের চোখ ধাঁধানো গৌরব এবং মর্যাদাকর অবস্থা মার অধিবাসীদের মন-মানসিকতা ও আঁকি কবলের ওপর বিস্ময়কর প্রভাব ফেলেছিল। তারা মুসলমানদের আঁকি কশক্তির সাথে বেশি করে পরিচিত হলো। মুশরিক নেতারা বুঝতে পারল, পবিত্র মার নগরীতে মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণের অবস্থান পৌত্তলিক ধর্ম ও মতাদর্শের প্রতি মারবাসীদের আগ্রহ দুর্বল করে ফেলেছে এবং উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করেছে। এ কারণেই হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়কাল শেষ হয়ে যাওয়ার পর, হুওয়াইতিব নামের এক কুরাইশ প্রতিনিধি মহানবী (সা.)- এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল : “চুক্তিপত্রে যে সময় আপনাদের পবিত্র মায় অবস্থান করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা বর্তমানে শেষ হয়ে গেছে। তাই যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের এলাকা ত্যাগ করুন।” কুরাইশ প্রতিনিধির এ স্পষ্ট উক্তির কারণে মহানবী (সা.)- এর কয়েকজন সাহাবী অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তবে মহানবী এমন ধরনের ব্যক্তিত্ব ছিলেন না যে, তিনি চুক্তি মোতাবেক কাজ করার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবেন। মুসলমানদের মধ্যে মদীনার উদ্দেশে যাত্রা করার আহ্বান জানানো হলে সবাই তাৎক্ষণিকভাবে পবিত্র মার হারাম শরীফ ত্যাগ করেন।

মহানবী (সা.)- এর চাচা হযরত আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফযলের বোন মায়মুনা মুসলমানগণের উদ্দীপনাপূর্ণ আবেগ ও অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভগ্নিপতি হযরত আব্বাসের কাছে পত্র পাঠিয়ে বলেছিলেন, তিনি মহানবী (সা.)- এর সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রস্তুত।

মহানবী (সা.) মায়মুনার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন এবং এভাবে কুরাইশদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ও বন্ধন অধিক দৃঢ় করেছিলেন। বয়সের বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও তাঁর প্রতি এক অল্পবয়স্কা তরুণীর ঝোঁক তাঁর (মহানবীর) আধ্যাত্মিক প্রভাবের এক উজ্জ্বল দলিল। এমনকি মহানবী (সা.) কুরাইশ প্রতিনিধির কাছে পবিত্র মায় বিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং ওয়ালীমা অর্থাৎ বিবাহোত্তর ভোজ- সভায় মার নগরীর সকল নেতার অংশগ্রহণের সময় ও সুযোগের আবেদন জানালেন।

কিন্তু কুরাইশ প্রতিনিধি তাঁর এ আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল : “আপনার প্রদত্ত খাদ্যের কোন প্রয়োজন আমাদের নেই।”

মহানবী (সা.) মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা যেন মধ্যাহ্নের আগেই ম া নগরী ত্যাগ করেন এবং দুপুরের পর সেখানে আর কেউ অবস্থান না করেন। তবে তিনি কেবল নিজ দাস আবু রাফেকে ম ায় থেকে গিয়ে সন্ধ্যার সময় মহানবীর নবপরিণীতা বধূকে সাথে নিয়ে মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার আদেশ দেন।^{৩০২}

মুসলমানগণের ম া নগরী ত্যাগ করার পর মহানবী (সা.)- এর শত্রুরা মায়মুনাকে তিরস্কার করে। তবে তাদের তিরস্কার ও ভৎসনা মায়মুনার মনের ওপর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারে নি। কারণ তিনি মহানবীর প্রতি আঁ কভাবে ঝুঁকে পড়েছিলেন বলেই তাঁর সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

এভাবে এক বছর আগে মহানবী সত্য স্বপ্নের ভিত্তিতে মুসলমানদের পবিত্র কাবা যিয়ারত এবং তাদের সামনে পবিত্র ম ার ফটক লো উন্মুক্ত হওয়ার যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হলো।

এ প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়ন প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েছিল সূরা ফাতেহর ২৭তম আয়াত :

(لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم و مقصرين لا تخافون فَعَلِمَ ما لم تعلموا ففعل من دون ذلك فتحاً قريباً)

“ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জান না। এছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদের একটি আসন্ন বিজয়।”

সাতচল্লিশতম অধ্যায় : অষ্টম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

মুতার যুদ্ধ

সপ্তম হিজরী অতিবাহিত হলো। হৃদয়বিয়ার সন্ধির ছায়ায় মুসলমানরা দল বেঁধে একত্রে পবিত্র কাবা যিয়ারত করতে এবং পৌত্তলিকতার প্রাণকেন্দ্রে তাওহীদ বা একত্ববাদের অনু লে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টিকারী োগান দিতে সক্ষম হন। এর ফলে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ^{৩০৩}, আমর ইবনে আস এবং উসমান ইবনে তালহার মতো কতিপয় কুরাইশ নেতার অন্তর ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁরা মদীনায় আগমন করে মহানবী (সা.)- এর কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং ম ার প্রশাসনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন, যার নিষ্প্রাণ কাঠামোই শুধু তখন বিদ্যমান ছিল।^{৩০৪}

কতিপয় সীরাত রচয়িতা পঞ্চম হিজরীতে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও আমর ইবনে আসের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে নিঃসন্দেহে তাঁরা ঐ বছর ইসলাম গ্রহণ করেন নি। কারণ, খালিদ ইবনে ওয়ালীদ হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে সংঘটিত হৃদাইবিয়ার যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনীর একটি অংশের সেনাপতি ছিলেন এবং এ দুই সেনাপতি একই সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হিজরতের অষ্টম বর্ষের প্রথম দিকে হিজাজের বেশিরভাগ অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত শান্ত অবস্থা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাওহীদের আহ্বানধ্বনি অনেক এলাকায় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। উত্তরে ইহুদীদের প্রভাব- প্রতিপত্তি এবং দক্ষিণে কুরাইশদের আক্রমণ যখন আর ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য হুমকি নয়, তখনই মহানবী (সা.) শামের সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতি তাঁর আহ্বান ও প্রচার কার্যক্রম নিয়োজিত করা এবং ঐ দিন লোতে রোম সম্রাটের শাসনাধীন জনসমষ্টিকে ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করার চিন্তা- ভাবনা শুরু করেন। এ কারণেই তিনি হারিস ইবনে উমাইর আ দীকে একটি পত্র সহ শামের শাসনকর্তার দরবারে প্রেরণ করেন। সে সময় শামের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন রোমান সম্রাটের পক্ষ থেকে নিযুক্ত হারিস ইবনে আবী শিমর গাসসানী। মহানবীর দূত শামের সীমান্তবর্তী নগরসমূহে প্রবেশ করলে সীমান্ত অঞ্চল লোর

শাসনকর্তা শুরাহবীল তাঁর আগমনের কথা অবগত হয়ে তাঁকে ‘মুতা’ গ্রামে গ্রেফতার করেন। পূর্ণাঙ্গ জিজ্ঞাসাবাদে মহানবীর দূত স্বীকার করেন, তিনি শামের শাসনকর্তা হারিস আল গাসসানীর কাছে মহানবীর পক্ষ থেকে প্রেরিত পত্রবাহক। সীমান্ত এলাকার শাসনকর্তার আদেশে সব ধরনের মানবীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা লঙ্ঘন করে এই দূতকে হাত-পা বেঁধে হত্যা করা হয়। অথচ সকল আন্তর্জাতিক ও মানবীয় নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর সকল অঞ্চল ও রাতে দূতের জীবনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

মহানবী (সা.) শুরাহবীলের জঘন্য অপরাধ সম্পর্কে অবগত হন এবং দূত নিহত হওয়ায় অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হন। এ ধরনের কাপুরুষোচিত কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি মুসলমানদের অবহিত করেন। আর এ কারণেই তিনি ইসলামের দূতকে হত্যাকারী এই উদ্ধত ও দাস্তিক শাসনকর্তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নিজ সৈন্যদের আহ্বান জানান।

আরো বেদনাদায়ক ঘটনা

এ ঘটনার পাশাপাশি সে সময়ে আরেকটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে যায়। এ ঘটনা শামের সীমান্ত অঞ্চলের ইসলাম প্রচারকদের ধর্ম প্রচার করার স্বাধীনতা হরণকারী অধিবাসী এবং কাপুরুষোচিতভাবে মহানবীর দূতকে হত্যাকারীদের শাস্তি দেয়ার জন্য মহানবীর সিদ্ধান্তকে দৃঢ়তর করেছিল।

হিজরতের অষ্টম বর্ষের রবী মাসে কা’ব ইবনে উমাইর আল গিফারী মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে তাবলীগ (প্রচার কার্য) সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দক্ষতার অধিকারী পনের ব্যক্তিকে নিয়ে ওয়াদীউল কুরার পশ্চাতে অবস্থিত যাত্ ইতলাহ অঞ্চলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে তাওহীদী দীন ও মহানবী (সা.)-এর রিসালত প্রচারের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ইসলামের প্রচার সৈনিকরা ঐ অঞ্চলে আগমন করে ইসলামের শক্তিশালী যুক্তি ও দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে জনগণকে তাওহীদের দিকে আহ্বান জানাতে থাকেন। হঠাৎ ঐ এলাকার জনগণ তাঁদের সাথে তীব্র বিরোধিতা শুরু করে এবং তাঁদের ওপর আক্রমণ চালায়।

মুবাঞ্জিগগণ নিজেদের এক বিশাল জনতার বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ দেখতে পান এবং তাঁরা প্রাণপণে আ রক্ষার চেষ্টা করেন। অবশেষে তাঁরা অপদস্থতা ও বশ্যতা বরণ করার চেয়ে শাহাদাত লাভকেই প্রাধান্য দেন। তাঁদের মধ্যে নিহত ব্যক্তিদের লাশসমূহের মাঝে পড়ে থাকা আহত একজন মধ্যরাতে সে স্থান ত্যাগ করে মদীনার পথে অগ্রসর হন এবং মহানবীকে পুরো ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন।

প্রচারকর্মীদের হত্যাকাণ্ডের এ ঘটনার কারণে মহানবী (সা.) জমাদি মাসে জিহাদের ফরমান জারী করেন এবং তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী সীমা ল নকারী এবং ইসলামের প্রচারকার্যক্রমে বাধাদানকারীদের দমন করার জন্য (এ অঞ্চলের দিকে) প্রেরিত হয়।^{৩০৫}

জিহাদের ফরমান জারী করা হলো। মদীনার সেনাছাউনীতে (জুরফ) তিন হাজার সাহসী যোদ্ধা সমবেত হলেন। মহানবী (সা.) নিজেই সেনাছাউনীতে এলেন এবং বক্তব্য প্রদান করলেন :

“ তোমরা যে জায়গায় যাচ্ছ সেখানে ইসলামের দূতকে হত্যা করা হয়েছে। তাদেরকে তোমরা পুনরায় ইসলামের দাওয়াত দেবে। যদি তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তা হলে তোমরা ইসলামের দূতের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে। আর তা না হলে, তোমরা মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। হে ইসলামের সৈনিকরা! তোমরা মহান আল্লাহর নামে জিহাদ করবে; মহান আল্লাহর শত্রুরা এবং তোমাদের শত্রুরা, যারা শামদেশে বসবাস করছে, তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেবে। যে সব সন্যাসী সমাজের কোলাহল থেকে বিমুখ হয়ে আশ্রম ও উপাসনালয়সমূহে বসবাস করছে, তাদের ওপর চড়াও হবে না। একদল লোকের মন- মগজে স্থাপিত শয়তানের আস্তানা লো তরবারির আঘাতে ধ্বংস করবে। নারী, শিশু ও বৃদ্ধ- বৃদ্ধাদের তোমরা হত্যা করবে না। কখনো তোমরা কোন খেজুর গাছ ও বৃক্ষ কাটবে না এবং কোন ঘর- বাড়িও ধ্বংস করবে না।^{৩০৬}

হে মুজাহিদরা! সেনাবাহিনীর অধিনায়ক আমার পিতৃব্যপুত্র জাফর ইবনে আবী তালিব। তিনি নিহত হলে যাইদ ইবনে হারেসা পতাকা তুলে নেবে এবং সেনাবাহিনী পরিচালনা করবে, আর

সেও নিহত হলে সেনাদলের অধিনায়ক হবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। আর সেও যদি নিহত হয়, তা হলে তোমরা কোন একজনকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নির্বাচিত করবে।”

এরপর সেনাবাহিনীকে যাত্রার নির্দেশ দেয়া হলো এবং মহানবী (সা.) একদল মুসলমানকে সাথে নিয়ে সানীয়াতুল বিদা পর্যন্ত গিয়ে তাদেরকে বিদায় দেন। সেখানে বিদায় দানকারীরা সৈন্যদের বিদায় দিল এবং তারা পূর্ব প্রথা অনুযায়ী বলল : دفع الله عنكم و ردكم سالمين غانمين : “মহান আল্লাহ তোমাদের থেকে শত্রুদেরকে দূরে ঠেলে দিন এবং নিরাপদে ও যুদ্ধের গণীমতসহ তিনি তোমাদের ফিরিয়ে আনুন।”

কিন্তু সেনাদলের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অধিনায়ক ইবনে রাওয়াহা তাদের জবাবে এ কাব্যপঙ্ক্তি আবৃত্তি করলেন :

لَكُنِّي أَسْأَلُ الرَّحْمَانَ مَغْفِرَةً وَضَرْبَةَ ذَاتِ قَرْعٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَا

“ কিন্তু আমি পরম দয়ালু মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং কামনা করছি (তরবারির) প্রচণ্ড এক আঘাত যার ফলে হাতের তালু থেকে রক্ত ঝরবে।” ৩০৭

এ বাক্য আসলে এ অধিনায়কের ঈমানী শক্তির মাত্রা এবং মহান আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণের প্রতি তাঁর তীব্র আগ্রহের প্রমাণ। এ অবস্থায় সবাই দেখতে পায় যে, এ সাহসী অধিনায়ক কাঁদছেন। কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন : “দুনিয়ার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র টান নেই। তবে আমি মহানবী (সা.)- কে এ আয়াত তেলাওয়াত করতে শুনেছি :

(و إن منكم إلا واردها كان علي ربك حتما مقضيا)

- মহান আল্লাহর অবশ্যস্বাবী ফয়সালা এটাই যে, তোমাদের সবাইকে দোযখের উপর আসতেই হবে এবং সেখান থেকে পুণ্যবানরা বেহেশতের দিকে রওয়ানা হবে। ৩০৮

তখন আমার দোযখের উপর আগমন অবশ্যস্বাবী। তবে আমার কাছে স্পষ্ট নয়, দোযখের উপর আমার আগমনের পরিণতি কেমন হবে (অর্থাৎ আমি কি দোযখের উপর আগমন করার পর

সেখান থেকে পুণ্যবানদের সাথে বেহেশতের দিকে রওয়ানা হতে পারব, নাকি দোষখের মধ্যে পতিত হব)?”^{৩০৯}

প্রথম অধিনায়কের ব্যাপারে মত- পার্থক্য

কতিপয় সীরাত রচয়িতা লিখেছেন, প্রথম অধিনায়ক ছিলেন মহানবী (সা.)- এর পালকপুত্র যাইদ ইবনে হারেসা। আর জাফর ও আবদুল্লাহ্ যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় সহকারী ছিলেন। তবে শিয়া গবেষক আলেমগণ এ ধারণার বিপরীতে হযরত জাফর ইবনে আবী তালিবকে এ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বলে জানেন এবং অন্য দু'জন অর্থাৎ যাইদ ও আবদুল্লাহকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় সহকারী অধিনায়ক হিসেবে গণ্য করেন। এখন আমাদের অবশ্যই দেখা উচিত যে, এ দুই অভিমতের মধ্যে কোনটি বাস্তব অবস্থার সাথে খাপ খায়? এ বাস্তবতায় উপনীত হবার জন্য দু'টি পথ আছে। যথা :

১. সামাজিক মর্যাদা এবং তাকওয়া ও জ্ঞানগত পর্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে যাইদ ইবনে হারেসা জাফর আত তাইয়ারের সমকক্ষ ছিলেন না। ইবনে আসীর উসদুল গাবাহ্ গ্রন্থে জাফর তাইয়ার সম্পর্কে লিখেছেন : “তিনি চরিত্র, মন- মানসিকতা, আঁ ক শক্তি, মুখাবয়ব এবং দৈহিক কাঠামোগত দিক থেকে মহানবী (সা.)- এর সদৃশ ছিলেন। তিনি আলী (আ.)- এর ঈমান আনয়নের স্বল্প সময় পরেই মহানবী (সা.)- এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। যেদিন হযরত আবু তালিব (রা.) আলী (আ.)- কে রাসূলের ডান পাশে নামায আদায় করতে দেখলেন সেদিন তিনি জাফরকে বলেছিলেন : “তুমিও তার (মহানবী) বাম পাশে গিয়ে নামায আদায় কর।”

জাফর ঐ দলের নেতা ছিলেন যারা নিজের ধর্ম রক্ষা করার জন্য মায় নিজেদের ঘর- বাড়ী ও জীবনযাত্রা ত্যাগ করে মহানবী (সা.)- এর নির্দেশে হাবাশায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি সেখানে মুহাজিরদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি শক্তিশালী ও কার্যকর যুক্তি উপস্থাপন করে হাবাশার বাদশার অন্তরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেছিলেন। তিনি হযরত ঈসা মসীহ্ এবং তাঁর মা হযরত মারিয়াম সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত তেলাওয়াত করে ঐ সব কুরাইশ প্রতিনিধি, যারা হিজরতকারী মুসলমানদেরকে হিজায়ে ফিরিয়ে আনার জন্য হাবাশায় গিয়েছিল, তাদের মিথ্যাবাদিতা প্রমাণ করেছিলেন। তিনি আশ্রয় গ্রহণকারী মুহাজির

মুসলমানদের পক্ষে হাবাশার বাদশার সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এর ফলে বাদশাহ্ নাজ্জাশী কুরাইশ প্রতিনিধিদেরকে তাঁর দরবার থেকে বের করে দিয়েছিলেন।^{৩১০}

জাফর সেই ব্যক্তি, মহানবী (সা.) খাইবরে হাবাশাহ্ থেকে তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে ১৬ কদম এগিয়ে গিয়ে তাঁকে বরণ করেন এবং তাঁর কাঁধে হাত রেখে তাঁর কপালে চুম্বন করেন। মহানবী (সা.) আনন্দের আতিশয্যে খুব কেঁদেছিলেন এবং বলেছিলেন : “আমি জানি না, হাবাশাহ্ থেকে তোমার আগমন বা তোমার ভাই আলীর হাতে খাইবর বিজয়- এ দু’টি ঘটনার মধ্যে কোনটির জন্য অধিক আনন্দিত হব?”

তিনি সেই মহান ব্যক্তি, যার মৃত্যুর পর তাঁর সাহস, বীরত্ব ও পৌরুষের কথা আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) স্মরণ করেছেন। যখন হযরত আলী (আ.) জানতে পারলেন, আমার ইবনে আস মুআবিয়ার হাতে বাইআত করেছেন এবং তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন যে, তাঁরা আলীর ওপর বিজয়ী হলে মুআবিয়া মিশরের শাসনকাজ আমার হাতে অর্পণ করবেন, তখন আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) এ সংবাদ শুনে অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর চাচা হামযাহ্ এবং ভাই জাফরের বীরত্বের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন : “এ দুই ব্যক্তি জীবিত থাকলে আমার বিজয়ের তারকা উদিত হতো।”^{৩১১}

এ ধরনের অতি রুত্বপূর্ণ মুখ্য চরিত্র, যার খানিকটা এখানে উদ্ধৃত হয়েছে, থাকতে কি বিবেক- বুদ্ধি অনুমতি দেবে যে, মহানবী সর্বাধিনায়কত্বের পদ যাইদকে প্রদান করবেন এবং জাফরকে তাঁর ‘প্রথম সহকারী’ নিযুক্ত করবেন?

২. এ সব সেনাপতির শোকে যে সব শোকগাঁথা বড় বড় মুসলিম কবি রচনা করেছেন, সেসব থেকেও প্রমাণিত হয়, জাফরই ছিলেন এ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং যাইদ ও আবদুল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল সহকারীর পদ। মহানবী (সা.)-এর যুগের কবি হাসসান ইবনে সাবিত অধিনায়কদের শাহাদাতের শোক-সংবাদ পৌঁছানোর পর একটি কাসীদাহ্ পাঠ করেছিলেন, এর মূল পাঠ সীরাতে ইবনে হিশামে উল্লিখিত আছে। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন :

“ মুতার রণাঙ্গনে যে সব অধিনায়ক একের পর এক নিহত হয়েছেন, তাঁরা সবাই মহান আল্লাহর করুণা ও দয়ার মধ্যে নিমজ্জিত। তাঁরা হলেন জাফর, যাইদ ও আবদুল্লাহ যাঁরা একের পর এক মৃত্যুর কারণ লোকে করেছেন বুক পেতে আলিঙ্গন।” ৩১২

এ সব শোকগাঁথা ও কবিতার মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট হচ্ছে কা’ব ইবনে মালেকের কাসীদাহ্ যা তিনি মুতার যুদ্ধের শহীদদের শোকে রচনা করেছিলেন। তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, প্রথম অধিনায়ক ছিলেন জাফর এবং কবি নিজেই মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ জারী করার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। মহানবী (সা.) সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব সর্বপ্রথম জাফরের হাতে অর্পণ করেছিলেন। কবি তাঁর ভাষায় বলেন :

إذ يهتدونى يجعفر ولوائه ————— قدام أولهم فــــنعم الأول

“ঐ সময়ের কথা তোমরা কর স্মরণ

ইসলামের সৈনিকরা প্রথম অধিনায়ক জাফরের পতাকাতলে যখন

জিহাদের ময়দানের দিকে করেছিল গমন।”

ঐ দিন লোর রচনা এ কবিতা লো কালের বিবর্তনে আজও টিকে আছে এবং সংরক্ষিত আছে। এ লো হচ্ছে এ বিষয়ের সবচেয়ে জীবন্ত ও শক্তিশালী প্রমাণ যে, আহলে সুনাতের সীরাত রচয়িতারা এ প্রসঙ্গে যা লিখেছেন, তা আসলে বাস্তবতাবিরোধী। রাবিগণ বিশেষ কতক লো রাজনৈতিক লক্ষ্য- উদ্দেশ্যের জন্য তা জাল করেছেন এবং সীরাত রচয়িতাগণও যাচাই- বাছাই ছাড়াই সে লো তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐসব রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এ গ্রন্থে এখন আলোচনা সম্ভব নয়। অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, ইবনে হিশাম যদিও কাসীদাসমূহ উল্লেখ করেছেন, তবুও তিনি জাফর তাইয়ারকে প্রথম সহকারী বলে গণ্য করেছেন। ৩১৩

মুসলিম ও রোমান সেনাবাহিনীর রণাঙ্গনে অবদান গ্রহণ

রোম তখন ইরানের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধ করার কারণে অত্যন্ত ধরনের গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হয়েছিল। পারস্যের ওপর তাদের বিজয় লোর কারণে উৎফুল্ল থাকা সত্ত্বেও তারা ইসলামের মুজাহিদগণের সাহসিকতা ও বীরত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। উল্লেখ্য, তাঁরা (ইসলামের মুজাহিদগণ) তাঁদের সত্তাগত বীরত্ব ও ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়েই এতসব গৌরব অর্জন করেছিলেন। এ কারণেই, ইসলামের সৈনিকদের যাত্রা করার সময় এবং তাদের প্রস্তুতির কথা রোম-সরকারকে জানানো হয়েছিল। রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস শামদেশে তাঁর নিযুক্ত শাসনকর্তার সাহায্য নিয়ে তিন হাজার সৈন্যের মুসলিম বাহিনীকে মোকাবেলার জন্য বিশাল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন। শামদেশের শাসনকর্তা শুরাহবীল একাই শামের বিভিন্ন গোত্র থেকে এক লাখ যোদ্ধা সংগ্রহ করে নিজ পতাকাতলে সমবেত করেছিল। মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্য সে ঐ বিশাল সেনাবাহিনীকে শামের সীমান্ত লোর দিকে প্রেরণ করে। এমনকি রোমান সম্রাটও পূর্বের তথ্যের ভিত্তিতে এক লাখ সৈন্য নিয়ে রোম থেকে যাত্রা করেন এবং বাস্কা অঞ্চলের মায়াব নামের একটি নগরীতে প্রবেশ করে যাত্রাবিরতি করেন এবং সাহায্যকারী রিজার্ভ বাহিনী হিসেবে সেখানে অবস্থান নেন।^{৩১৪}

মুসলমানদের বিজয় সংক্রান্ত যে সব তথ্য রোমের সমরাধিনায়কদের কাছে পৌঁছতো সে লোর ভিত্তিতেই ক্ষুদ্র একটি সেনাদলকে মোকাবেলার জন্য এত সৈন্য সমাবেশ ও বিশাল সেনাবাহিনীর আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছিল। অথচ তিন হাজার সৈন্য, যত সাহসীই হোক না কেন, তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এ বিশাল সেনাবাহিনীর এক-দশমাংশই যথেষ্ট ছিল।

ঠিক একইভাবে এ দুই সেনাবাহিনীর সামর্থ্য ও যোগ্যতার তুলনামূলক মূল্যায়ন করলে, মুসলিম বাহিনী- কী লোকবল, কী সামরিক কলা-কৌশল- উভয় দিক থেকে রোমান সেনাবাহিনীর চেয়ে বহু গ দুর্বল ছিল। কারণ, রোমান সেনা কর্মকর্তারা ইরান ও রোমের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ লোয় অংশগ্রহণ করার ফলে কতক লো গোপন সামরিক কৌশল ও সাফল্যের গোপন রহস্য আয়ত্ব

করেছিল; অথচ এসব ক্ষেত্রে নবগঠিত মুসলিম সেনাদলের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ প্রাথমিক পর্যায়েই ছিল। অধিকন্তু মুসলিম সেনাবাহিনীর সামরিক অস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম এবং যানবাহন রোমান সেনাবাহিনীর সমকক্ষ ছিল না। আরো রত্নপূর্ণ ব্যাপার হলো, ইসলামী শক্তি ভিন্ন দেশের মাটিতে আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, আর রোমানরা তাদের নিজ ভূ-খণ্ডের সমুদয় সামরিক সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিল এবং তাদের অবস্থান ছিল আ রক্ষামূলক। এ অবস্থায় হামলাকারী বাহিনীকে অবশ্যই এতটা শক্তিশালী হতে হবে যে, তারা সব প্রতি ল পরিস্থিতি উৎরাতে সক্ষম হয়।

এতসব বিবেচনা করেই মুসলিম সেনাবাহিনীর অধিনায়কগণ কয়েক কদম দূরত্বের মধ্যে মৃত্যু প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও পলায়নের চেয়ে প্রতিরোধ, সংগ্রাম ও দৃঢ়পদ থাকাকেই প্রাধান্য দেন এবং এভাবে তাঁদের ঐতিহাসিক সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করেন।

শাম সীমান্তে আক্রমণ করার পর মুসলিম সেনাবাহিনী শত্রুবাহিনীর প্রস্তুতি ও সামরিক ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারে। যুদ্ধ করার পদ্ধতি ও কৌশল ঠিক করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে একটি সামরিক পরামর্শসভার আয়োজন করা হয়। একদল বলেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে পুরো ঘটনা পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব-কর্তব্য জেনে নেবেন। এ অভিমত প্রায় গৃহীত হয়েই গিয়েছিল, ঠিক তেমনি মুহূর্তে সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় সহকারী অধিনায়ক আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (যিনি মদীনা থেকে যাত্রা করার সময় মহান আল্লাহর কাছে শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করেছিলেন) দাঁড়িয়ে অগ্নি বরানো ও তেজোদীপ্ত এক ভাষণ দেন এবং বলেন :

“ মহান আল্লাহর শপথ! আমরা কখনোই অধিক জনবল ও অস্ত্র নিয়ে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করি নি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে যে ঈমান দান করে সম্মানিত করেছেন, সেই ঈমানের আলোকে আমরা শত্রুর মুকাবিলা করতাম ও মুখোমুখী হতাম।

আপনারা সবাই উঠে পড়ুন এবং পথ চলা অব্যাহত রাখুন। আপনারা স্মরণ করুন, বদরের যুদ্ধে মাত্র দু’টি ঘোড়া এবং উহুদের যুদ্ধে মাত্র একটি ঘোড়ার চেয়ে বেশি কিছু আমাদের ছিল না। কিন্তু

এ যুদ্ধে আমরা দু’টি পরিণতির মধ্যে যে কোন একটির অপেক্ষায় আছি : হয় তাদের ওপর আমরা বিজয়ী হব- আর এটা হচ্ছে সেই প্রতিশ্রুতি, যা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দিয়েছেন এবং মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতির কখনো অন্যথা হয় না; - অথবা আমরা শাহাদাত বরণ করব। আর এ অবস্থায় আমরা আমাদের ভাইদের সাথে মিলিত হব।”

এ ভাষণ ইসলামী সেনাবাহিনীর মধ্যে জিহাদের প্রেরণা শক্তিশালী করে এবং তাঁরা তাঁদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন। উভয় সেনাবাহিনী ‘শারীফ’ নামক স্থানে পরস্পর মুখোমুখি হয়। কিন্তু কৌশলগত কারণে ইসলামী বাহিনী খানিকটা পশ্চাদপসরণ করে মুতা অঞ্চলে অবস্থান গ্রহণ করে।

সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জাফর ইবনে আবী তালিব সৈন্যদের বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে প্রতিটি অংশের জন্য একজন অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। আক্রমণ- পা ১ আক্রমণ এবং হাতাহাতি সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। তাঁকে অবশ্যই পতাকা হাতে নিয়ে নিজ সৈনিকদের আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে, অথচ ঐ একই সময় তাঁকে যুদ্ধ ও আ রক্ষাও করে যেতে হবে।

শত্রুদের ওপর আক্রমণ চালানোর সময় বীরগাঁথা আবৃত্তি থেকে আঁ ক সাহস এবং লক্ষ্য অর্জনের পথে তাঁর দৃঢ় ইচ্ছা- শক্তি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। তিনি আক্রমণ করার সময় বলছিলেন:

يا حَبِّذا الْجَنَّةِ وَاقْتَرابها طَيِّبَةً و بـ اِردا شِراؤها
و الرُّومِ رومِ قَد دنا عذابها كـ اِفرة بعيادة اُنسابها
على إِذ لا قيتها ضرابها

“ আমি আনন্দিত যে, প্রতিশ্রুত বেহেশত- ঐ পবিত্র বেহেশত, যেখানে আছে শীতল সুপেয় পানীয়সমূহ- নিকটবর্তী হয়েছে। আর এর বিপরীতে রোমের পতন ও ধ্বংসও নিকটবর্তী হয়ে গেছে- ঐ রোমান জাতি, যারা তাওহীদী ধর্মকে অস্বীকার করেছে এবং আমাদের থেকে যাদের সকল সম্পর্ক ও বন্ধন দূর হয়ে গেছে। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যখনই তাদের মুখোমুখী হব, তখনই তাদের ওপর আঘাত হানব।^{৩১৫}

ইসলামী সেনাদলের প্রথম প্রধান অধিনায়ক (জাফর ইবনে আবী তালিব) প্রাণপণ আক্রমণ চালান এবং প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হন। যখন তিনি নিজেকে শত্রুদের দ্বারা আবেষ্টিত দেখতে পান এবং শাহাদাত বরণের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যান, তখন যাতে করে শত্রুরা তাঁর অশ্ব ব্যবহার করতে না পারে এবং শত্রুদের যাতে তিনি বোঝাতে সক্ষম হন যে, এ জড়জগতের সাথে তিনি তাঁর সর্বশেষ বন্ধনও ছিন্ন করে ফেলেছেন, সেজন্য তিনি ঘোড়া থেকে নিচে নেমে পড়েন এবং এক আঘাতে সেটাকে নিশ্চল করে দেন। এরপর তিনি আ রক্ষা ও আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। ঠিক তখনই তাঁর ডান হাত কর্তিত হয়ে গেলে পতাকা যাতে ভূলুপ্ত না হয়, সেজন্য তিনি তাঁর বাম হাত দিয়ে তা ধরে রাখেন। কিন্তু তাঁর বাম হাতও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তিনি তাঁর দু' বাহু দিয়ে পতাকা ধরে রাখেন। অবশেষে আশিটিরও অধিক আঘাত নিয়ে তিনি মাটিতে পড়ে যান এবং প্রাণত্যাগ করেন।

তখন প্রথম সহকারী অধিনায়ক যাইদ ইবনে হারেসার পালা আসে। তিনি পতাকা কাঁধে নিয়ে অতুলনীয় বীরত্বের সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেন এবং বর্শার অসংখ্য আঘাতে জর্জরিত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় সহকারী অধিনায়ক আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা তখন পতাকা হাতে তুলে নেন এবং অশ্বের উপর আরোহণ করে বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন। যুদ্ধ চলাকালে তাঁর তীব্র ক্ষুধা পেলে ক্ষুধা নিবারণের জন্য এক লোকমা খাদ্য তাঁর হাতে দেয়া হয়। তখনও তিনি কিছুই খান নি; হঠাৎ শত্রুবাহিনীর াবনের মতো প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত আক্রমণের শব্দ তাঁর কানে আসে! তিনি খাদ্যের টুকরাটি সাথে সাথে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শত্রুবাহিনীর কাছে চলে যান এবং শাহাদাত বরণ পর্যন্ত প্রাণপণ যুদ্ধ করতে থাকেন।

दिशाहारा मुसलिम बाहिनी

आर ठिक से समय मुसलिम बाहिनीर दिशाहारा अवस्था शुरू হয়ে যায়। सेनाबाहिनीर सर्वाधिनायक এবং তাঁর দু'জন সহকারী একের পর এক পর্যায়ক্রমে শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু মহানবী (সা.) এ অবস্থা যে ঘটতে পারে, তা আগে থেকে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই সৈন্যদের ওপর अधिनायक निर्वाचन করার दायित्व अर्पण করেছিলেন। এ সময় সাবিত ইবনে আকরাস পতাকা তুলে নিয়ে সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন : “আপনারা একজন अधिनायक निर्वाचित করুন।” তখন সবাই বলেছিল : “আপনি আমাদের अधिनायक हन।” তিনি বললেন : “আমি কখনোই এ दायित्व গ্রहण করব না। আপনারা অন্য কাউকে নির্वाचित করুন।” অতপর সাবিত নিজে এবং সৈন্যরা মিলে খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে, যিনি সদ্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং এ সেনাদলে উপস্থিত ছিলেন, সেনাবাহিনীর अधिनायक नियुक्त করলেন।

তিনি যখন সেনাবাহিনীর अधिनायक निर्वाचित হলেন, সেটি ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল ও জটিল মুহূর্ত। তখন মুসलिम बाहिनीর ওপর ভয়- ভীতি প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেনাবাহিনীর अधिनायक তখন এমন এক সামরিক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, যার কোন পূর্ব নযীর ছিল না। তিনি মাঝরাতে যখন সবদিক ঘন কালো আঁধারে নিমজ্জিত, তখন প্রচণ্ড শোরগোল করে সৈন্যদের স্থান পরিবর্তন করার নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ (পরিকল্পনা ছিল) সেনাদলের ডান বাহু বাম বাহুর জন্য স্থান ছেড়ে দেবে এবং একইভাবে বাম বাহু ডান বাহুর জন্য নিজ স্থান ত্যাগ করবে। একইভাবে সেনাবাহিনীর অগ্রভাগ মধ্যভাগের জায়গায় এবং মধ্যভাগ অগ্রভাগের জায়গায় চলে যাবে। আর এ প্রক্রিয়া প্রভাত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তিনি আরো নির্দেশ প্রদান করেন, সেনাবাহিনীর একটি অংশ মাঝরাতে দূরবর্তী এলাকায় চলে যাবে এবং ভোর হলে তারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ গোণান দিতে দিতে মুসलिम सেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হবে। পুরো এ পরিকল্পনা এজন্য করা হয়েছিল যে, রোমান বাহিনী যেন ভাবে যে, মুসলমানদের জন্য সাহায্যকারী বাহিনী চলে এসেছে। ঘটনাচক্রে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে শক্রবাহিনী পরের দিন মুসলমানদের ওপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকে। তারা নিজেরা বলাবলি করছিল যে,

সাহায্যকারী বাহিনী ছাড়াই এ সেনাদল অতুলনীয় সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে। আর যখন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন তাদের দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও অবিচলতা বহু গ বৃদ্ধি পাবে। এ যুদ্ধে রোমান সেনাবাহিনীর অধিনায়ক একজন মুসলিম সৈন্যের হাতে নিহত হয়েছিল।^{৩১৬}

মুসলমানরা যে পথ ধরে এসেছিলেন, সে পথে তাদের ফিরে যাওয়ার একটা সুযোগ এনে দেয় রোমান বাহিনীর নীরবতা। সবচেয়ে বড় যে সাফল্য মুসলমানরা এ যুদ্ধে অর্জন করেছিলেন, তা ছিল এই, একটি ক্ষুদ্র বাহিনী একটি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সামনে এক বা তিন দিন প্রতিরোধ করেছে এবং অবশেষে প্রাণ নিয়ে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেছে। নতুন সেনাপতির সামরিক কৌশল যেহেতু একটি বিচক্ষণ পদক্ষেপ ছিল, তা মুসলমানদের মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছে এবং এর ফলে তাঁরা নিরাপদে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছেন, সেহেতু তা প্রশংসাযোগ্য।^{৩১৭}

ইসলামের সৈনিকদের মদীনায় প্রত্যাবর্তন

মদীনা প্রবেশের আগেই যুদ্ধের অবস্থা এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর পশ্চাদপসরণ সংক্রান্ত তথ্যসমূহ মদীনায় পৌঁছে গিয়েছিল। তাই মুসলিম জনতা ইসলামের সৈনিকদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ত ছুটে আসে এবং মদীনার সেনাছাউনী অর্থাৎ জুরফ এলাকায় তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে।

নতুন সেনাপতির এ কাজ একটি বিচক্ষণধর্মী রণকৌশল হলেও তা যেহেতু মুসলমানদের গৌরবাক অনুভূতি এবং তাদের চেতনাগত খাঁটি বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে মানানসই হয় নি, সেহেতু মুসলমানদের দৃষ্টিতে তাদের পশ্চাদপসরণ সুন্দর কাজ বলে গণ্য হয় নি। এ কারণেই ‘হে পলাতকরা! কেন তোমরা জিহাদ থেকে পলায়ন করেছ’ - এ ধরনের ভৎসনামূলক ধ্বনি তুলে এবং তাদের মাথা ও মুখমণ্ডলের উপর ধূলো- মাটি নিক্ষেপ করে তাদেরকে বরণ করা হয়েছিল। সাধারণ মুসলিম জনতার আচরণ এদের সাথে এতটা রুঢ় ছিল যে, এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনেক ব্যক্তিই দীর্ঘকাল ঘরে বসে থাকতে এবং প্রকাশ্যে বের না হতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা কখনো ঘরের বাইরে আসলে জনতা তাঁদের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বলত : ‘তিনি ঐ সব ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত, যারা জিহাদ থেকে পলায়ন করেছে’ । ৩১৮

ইতিহাসের বদলে কল্পকাহিনী

মুসলমানদের মধ্যে হযরত আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবী তালিবের উপাধি ‘আসাদুল্লাহ’ (আল্লাহর সিংহ) হওয়ায় কতিপয় লোক তাঁর বরাবরে এক কাল্পনিক নেতা বা বীরকে দাঁড় করিয়ে তাঁর উপাধি ‘সাইফুল্লাহ’ (মহান আল্লাহর তরবারি) দিতে চেয়েছে, আর এ ব্যক্তি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ব্যতীত আর কেউ নন। এ কারণেই তারা বলে, মুতার যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর মহানবী (সা.) তাঁকে ‘সাইফুল্লাহ’ উপাধি প্রদান করেন।

মহানবী যদি তাঁকে অন্য কোন ঘটনা উপলক্ষে এ উপাধি প্রদান করতেন, তা হলে তো কোন কথাই ছিল না। কিন্তু মুতার যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পরের সার্বিক পরিস্থিতি তাঁকে মহানবী (সা.)-এর এ ধরনের উপাধিতে ভূষিত করা মোটেই অপরিহার্য করে না। যে ব্যক্তি এমন এক দলের নেতৃত্বে ছিলেন যাদেরকে জনগণ ‘পলায়নকারী’ বলে অভিহিত করেছে এবং যাদের মাথা ও মুখমণ্ডলের উপর ধূলা-মাটি নিক্ষেপ করে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, সেই ব্যক্তিকে মহানবী ‘সাইফুল্লাহ’ -এর মতো কোন উপাধিতে ভূষিত করবেন, তা কি যথার্থ ও সঙ্গত হবে? তিনি যদি অন্যান্য যুদ্ধে আল্লাহর তরবারির পূর্ণাঙ্গ রূপ ও বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকেন, তা হলেও তিনি মোটেই এ যুদ্ধে এ ধরনের উপাধির বাস্তব বহিঃপ্রকাশ ছিলেন না এবং কেবল এক ধরনের প্রশংসনীয় সামরিক কৌশল ব্যতীত এ যুদ্ধে তাঁর থেকে আর কিছুই প্রকাশ পায় নি। আর তা না হলে, তাঁকে এবং তাঁর অধীন সৈন্যদেরকে মুসলিম জনতা ‘পলায়নকারী’ উপাধিতে ভূষিত করত না। ইবনে সা’দ লিখেছেন : “পশ্চাদপসরণ করার সময় রোমের একদল সৈন্য মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের কয়েকজনকে হত্যা করেছিল।” ৩১৯

‘সাইফুল্লাহ’ উপাধির উপাখ্যান যারা রচনা করেছে, তারা তাদের বক্তব্য দৃঢ় করার জন্য এ বাক্যটিও ছুঁড়ে দিয়েছে : খালিদ যখন অধিনায়কত্ব লাভ করেন, তখন তিনি আক্রমণ করার নির্দেশ দেন এবং তিনি নিজেও বীরবিক্রমে আক্রমণ চালান। তাঁর হাতে ৯টি তরবারি ভেঙে যায়। আর কেবল একটি ঢাল তাঁর হাতে অবশিষ্ট (অক্ষত) ছিল।

এ মিথ্যা গল্প- কাহিনীর রচয়িতারা অবারও উদাসীন থেকেছে যে, খালিদ ও তাঁর অধীন সৈন্যরা যদি যুদ্ধক্ষেত্রে এ ধরনের রণনৈপুণ্য ও দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকতেন, তা হলে মদীনার জনগণ কেন তাঁদেরকে ‘পলায়নকারী’ উপাধিতে ভূষিত করেছিল এবং কেন তারা ধূলা- মাটি নিক্ষেপ করে তাঁদেরকে বরণ করেছিল? এ অবস্থায় তাদের উচিত ছিল দুম্বা জবাই করে এবং গোলাপ জল ও সুগন্ধি ছিটিয়ে তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো।

জাফরের ইন্তেকালে মহানবী (সা.)- এর আকুল কান্না

মহানবী (সা.) তাঁর পিতৃব্যপুত্র জাফরের শাহাদাতে খুব বেশি কেঁদেছিলেন। তিনি জাফরের স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইসকে তাঁর স্বামীর মৃত্যু সংবাদ সম্পর্কে অবগত করান এবং তাঁকে সা না ও সমবেদনা জানানোর জন্য মহানবী (সা.) জাফরের বাড়ীতে যান এবং আসমার দিকে তাকিয়ে বলেন : “আমার সন্তানরা কোথায়?” তখন জাফরের স্ত্রী জাফরের তিন সন্তান আবদুল্লাহ, আউন ও মুহাম্মদকে মহানবীর কাছে ডেকে আনেন। তাঁর সন্তানদের প্রতি মহানবীকে অত্যন্ত স্নেহ ও মমতা প্রদর্শন করতে দেখেই আসমা বুঝে নেন, তাঁর স্বামী মৃত্যুবরণ করেছেন। এজন্যই তিনি জিজ্ঞেস করেন : “মনে হচ্ছে আমার সন্তানরা এতীম হয়ে গেছে? কারণ, আপনি তাদের সাথে এতীমদের প্রতি সম্ভাব্য আচরণ করছেন!” এ সময় মহানবী (সা.) এত বেশি কান্নাকাটি করেন যে, তাঁর পবিত্র দাঁড়ি বেয়ে অশ্রুর ফোঁটা ঝরে পড়ছিল। অতঃপর মহানবী নিজ কন্যা ফাতিমাকে খাবার তৈরি করার নির্দেশ দেন। মহানবী (সা.) জাফরের পরিবারকে তিন দিন আপ্যায়ন করেছিলেন। এ ঘটনার পর মহানবীর হৃদয়ে জাফর ইবনে আবী তালিব ও যাইদ ইবনে হারিসার শোক চিরস্থায়ী হয়ে গিয়েছিল এবং যখনই তিনি নিজ ঘরে প্রবেশ করতেন, তখনই তিনি তাঁদের জন্য ক্রন্দন করতেন।^{৩২০}

আটচল্লিশতম অধ্যায় : অষ্টম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

যাতুস্ সালাসিলের গাযওয়া

যেদিন মহানবী (সা.) মদীনায় হিজরত করেন এবং মদীনাকে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র এবং মুসলমানদের সমাবেশস্থল হিসেবে মনোনীত করেন, সেদিন থেকে তিনি সবসময় শত্রুদের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং তাদের গতিবিধি ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তিনি মুশরিকদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যথার্থ তথ্য লাভ করার ব্যাপারে অনেক বেশি রুত্ব দিতেন। এ কারণেই তিনি শক্তিশালী, দক্ষ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণকে বিভিন্ন ছদ্মনামে পবিত্র মার চারপাশে এবং বিভিন্ন গোত্রের মাঝে প্রেরণ করতেন, যাতে করে তাঁরা তাঁকে যথাসময়ে বিরোধী ও ষড়যন্ত্রকারীদের গৃহীত সিদ্ধান্ত লো সম্পর্কে সতর্ক ও অবহিত করতে পারেন।

এ সব ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হওয়ার ভিত্তিতে তিনি অনেক চক্রান্ত অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতেন এবং শত্রুরা নিজেদের জায়গা থেকে অগ্রসর হওয়ার আগেই স্বয়ং মহানবী বা কোন উর্ধ্বতন মুসলিম সেনাপতির নেতৃত্বে ইসলামের মুজাহিদরা তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দিতেন। এর ফলে ইসলাম শত্রুর হুমকি ও বিপদ থেকে নিরাপদ হয়েছে এবং প্রচুর রক্তপাত ও জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

আজ শত্রুপক্ষের শক্তি, প্রস্তুতির মাত্রা এবং গোপন নীলনকশা ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত (গোয়েন্দা) তথ্য বিজয় ও সাফল্যের অন্যতম কার্যকর কারণ বলে গণ্য হচ্ছে। বিশ্বের বড় বড় রায়ে রই গুচর প্রশিক্ষণ, নিয়োগ, (গোয়েন্দা তৎপরতা আঞ্জাম দেয়ার জন্য) প্রেরণ এবং তাদেরকে কাজে লাগানোর বিশাল সংস্থা ও সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক আছে। এ ব্যবস্থার উদাহক ছিলেন স্বয়ং মহানবী (সা.) এবং তাঁর পরে খলীফাগণ, বিশেষ করে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) বিভিন্ন কাজের জন্য বহু গোয়েন্দা নিয়োগ করতেন। তিনি কোন এলাকায় কোন শাসনকর্তাকে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করলে কতিপয় ব্যক্তিকে এ শাসনকর্তার জীবন-যাত্রা এবং সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাঁর আচরণ এবং কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাঁর কাছে গোপনে রিপোর্ট

দেয়ার জন্য নির্দেশ দান করতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকে তিরস্কার করে ইমাম আলী (আ.) যে সব পত্র লিখেছেন^{৩৩৩} সেসব এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে।

মহানবী (সা.) হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে আশি জন মুহাজিরকে আবদুল্লাহ ইবনে জাহেশর নেতৃত্বে একটি স্থানে গিয়ে তাঁকে কুরাইশদের গতিবিধি ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত করানোর আদেশ দিয়েছিলেন।

মহানবী (সা.) যে উহুদ যুদ্ধে অতর্কিত হামলার শিকার হন নি এবং শত্রুদের আগমনের আগেই তিনি মদীনার বাইরে সেনা মোতায়েন করেছিলেন অথবা আহযাবের যুদ্ধে আরব বাহিনীর আগমনের আগে শত্রুদের আগমন পথে পরিখা খনন করিয়েছিলেন- এ সব কিছুই আসলে কতক লো নিৰ্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, এ সব তথ্য মহানবীর সচেতন ও বিচক্ষণ গোয়েন্দা কর্মকর্তাগণ তাঁর হাতে অর্পণ করতেন এবং এভাবে তাঁরা পতনের হুমকি থেকে তাওহীদী আদর্শ রক্ষা করার ক্ষেত্রে নিজেদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতেন। মহানবী (সা.)- এর বিজ্ঞজ্ঞানোচিত এ কর্মপদ্ধতি মুসলমানদের জন্য এক বিরাট শিক্ষা। এ মূলনীতির আলোকে ইসলাম ধর্মের মহান নেতৃত্বকে অবশ্যই ইসলামী বিশ্বের আনাচে- কানাচে যে সব ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে, সে লো সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত হতে হবে এবং প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হবার আগেই (ফিতনার) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লো নির্বাপিত করতে হবে। যে পথ অবলম্বন করে মহানবী (সা.) উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছেন, তাঁদেরকেও সে পথ অবলম্বন করে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে হবে। আর এ কাজ এ কালে পর্যাপ্ত উপায়- উপকরণ ও সাজ- সরঞ্জাম ছাড়া বাস্তবায়িত হবে না।

যাতুস্ সালাসিলের গায়ওয়ায় শত্রুদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যথার্থ তথ্যাবলী প্রাপ্তির মাধ্যমে ব্যাপক ফিতনার আ ন নির্বাপিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) এ পথ রুদ্ধ করে দিলে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতেন।

এ যুদ্ধে মহানবীর গোয়েন্দা কর্মকর্তাগণ গোপনে রিপোর্ট দেন, ওয়াদী ইয়াবিস নামক এক অঞ্চলে হাজার হাজার লোক পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মকে ডিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে

নিজেদের সমুদয় শক্তি ব্যাবহার করে হয় নিজেরা সবাই এ পথে নিহত হবে অথবা মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহসী ও বিজয়ী সমরাধিনায়ক আলীকে ধরাশায়ী করবে।

আলী ইবনে ইবরাহীম কুমী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন : “ওহীর ফেরেশতা মহানবী (সা.)- কে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত করেন।^{৩২২} কিন্তু শিয়া বিশ্বের গবেষক আলেম মরহুম শেখ আল মুফীদ বলেন : “একজন মুসলমান মহানবী (সা.)- কে এ ধরনের সংবাদ প্রদান করে এবং ওয়াদী আর রামলকে^{৩২৩} এ ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র বলে অভিহিত করে। আর সে আরো জানায় যে, এ গোত্র লো সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা রাতের বেলা অতর্কিতে মদীনা আক্রমণ করে এ কাজ চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করবে।”^{৩২৪}

মহানবী (সা.) মুসলমানদের এ ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে জানানো অত্যাবশ্যিক মনে করেছিলেন। ঐ সময় নামাযের জন্য জনগণের সমবেত হওয়া বা অতি প্রয়োজনীয় বিষয় শোনার সংকেত ছিল الصلاة جامعة - এ বাক্য। মহানবী (সা.)- এর নির্দেশে একজন আহবানকারী একটি উঁচু স্থানে উঠে উচ্চকণ্ঠে এ বাক্য উচ্চারণ করতে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যে জনগণ মসজিদে নববীতে সমবেত হন। মহানবী মিস্বারে আরোহণ করে ভাষণে বলেন : “আল্লাহর শত্রুরা তোমাদের জন্য ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তোমাদেরকে রাতের বেলা অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেবে। এ ফিতনা প্রতিহত করার জন্য একদল লোককে অবশ্যই রুখে দাঁড়াতে হবে।” এ সময় একদল লোক এ কাজের জন্য মনোনীত হলেন এবং আবু বকরের ওপর সেনাদলের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। তিনি সেনাদল নিয়ে বনী সালেম গোত্রের আবাসস্থলের দিকে রওয়ানা হলেন। মুসলিম বাহিনী যে পথ অতিক্রম করল, তা ছিল দুর্গম এবং এ গোত্র এক বিশাল উপত্যকার মাঝে বসবাস করত। মুসলিম সেনাবাহিনী যখন ঐ উপত্যকায় নেমে যেতে চাচ্ছিল, ঠিক তখন তারা বনী সালেম গোত্রের তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় এবং সেনাদলের অধিনায়ক যে পথে এসেছিলেন, সে পথে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখতে পেলেন না।^{৩২৫}

আলী ইবনে ইবরাহীম লিখেছেন : ঐ সম্প্রদায়ের নেতারা হযরত আবু বকরকে এ সামরিক অভিযানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন : “আমি মহানবী (সা.)- এর পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে ইসলাম ধর্ম উপস্থাপন করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি; যদি আপনারা তা গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন, তা হলে আমি আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।” ঐ সময় গোত্রের সর্দাররা তাঁর সামনে তাদের অগণিত লোক প্রদর্শন করে তাঁকে ভীত-সম্ভ্রান্ত করে ফেলে। তিনি ইসলামের মুজাহিদদের যুদ্ধ করার উদ্যম ও স্পৃহা থাকা সত্ত্বেও ফিরে যাবার নির্দেশ দেন এবং সবাই তখন মদীনায় ফিরে যান।

ঐ অবস্থায় মুসলিম সেনাবাহিনীর (মদীনায়) প্রত্যাবর্তন মহানবী (সা.)- কে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ করেছিল। এবার মহানবী সেনাদলটির নেতৃত্ব হযরত উমরের হাতে অর্পণ করেন। এ সময় শত্রুরা প্রথম বারের চেয়ে আরো বেশি সচেতন ছিল এবং তারা উপত্যকার প্রবেশমুখে পাথর ও গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। মুসলিম সেনাদল সেখানে প্রবেশ করা মাত্রই তারা তাদের গুপ্ত স্থান লো থেকে বের হয়ে এসে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে লাগল। তখন সেনাদলটির অধিনায়ক তাঁর সৈন্যদের পশ্চাদপসরণ করার নির্দেশ দিলে তারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে। সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী আরবের ধূর্ত রাজনীতিজ্ঞ আমর ইবনে আস মহানবীর কাছে গিয়ে বলেছিলেন : الحرب

خلدعة “যুদ্ধ হচ্ছে প্রতারণা” ; যুদ্ধে বিজয় কেবল বীরত্ব, সাহস ও বাহুবলের মধ্যেই নিহিত নয়; বরং এর একটি অংশ পরিকল্পনা, কৌশল ও পরিচালনা করার দক্ষতার ওপরও নির্ভরশীল। আমি যদি এবার ইসলামের যোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিই ও পরিচালনা করি, তা হলে আমি সমস্যার জট খুলতে পারব।” মহানবী (সা.) যদিও কতিপয় কারণে তাঁর অভিমতের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন, তবুও (তাঁকে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হলে) পূর্ববর্তী সেনাপতিদ্বয়ের মতো তিনিও একই ভাগ্য বরণ করতেন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) সেনা অধিনায়ক মনোনীত

একের পর এক পরাজয় ও বিফলতা মুসলমানদের নিদারুণ যন্ত্রণার সম্মুখীন করেছিল। মহানবী (সা.) শেষ বারের মতো একটি সেনাদল গঠন করে হযরত আলী (আ.)-কে এ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন এবং তাঁর হাতে পতাকা দিলেন। আলী (আ.) নিজ ঘরে প্রবেশ করে অত্যন্ত কঠিন মুহূর্ত লোতে তিনি যে কাপড় মাথায় বাঁধতেন, তা মাথায় বাঁধলেন এবং স্ত্রী হযরত ফাতিমা (আ.)-কে তাঁর মাথায় তা বেঁধে দেয়ার অনুরোধ করলেন। মহানবী (সা.)-এর কন্যা তাঁর প্রিয় স্বামী অত্যন্ত কঠিন ও ভয়ঙ্কর এক অভিযানে গমন করছেন দেখে খুব কাঁদলেন। মহানবী তাঁকে সা না দিলেন এবং তাঁর চোখের পানি হাত দিয়ে মুছে দিলেন। অতঃপর হযরত আলী (আ.)-এর সাথে আহযাবের মসজিদ পর্যন্ত গিয়ে বিদায় দিলেন। একটি সাদা-কালো বর্ণের ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে দু'টি ইয়েমেনী বস্ত্র পরিধান করে এবং ভারতে নির্মিত বর্শা হাতে নিয়ে হযরত আলী (আ.) যাত্রা শুরু করলেন। তিনি তাঁর চলার পথ সম্পূর্ণ পরিবর্তন করলেন যাতে সৈন্যরা মনে করে যে, তিনি ইরাক অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন। أرسلته كزارا غير فزار 'আমি তাকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে যুদ্ধে প্রেরণ করলাম এ কারণে যে, সে হচ্ছে প্রচণ্ড আক্রমণকারী; সে কখনোই যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না' - এ কথা বলে মহানবী (সা.) আলী (আ.)-কে বিদায় দিলেন। হযরত আলীর ব্যাপারে মহানবীর এ উক্তি থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, পূর্ববর্তী অধিনায়কদ্বয় কেবল পরাজিত হন নি, বরং ইসলামের সামরিক নীতিমালার বিপরীতে তাঁরা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে পশ্চাদপসরণ করেছিলেন।

এ যুদ্ধে আমীরুল মুমিনীনের বিজয় ও সাফল্যের অন্তর্নিহিত কারণ

হযরত আলী (আ.)- এর বিজয় লাভের মূল কারণকে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে ব্যক্ত করা যায় :

১. তিনি শত্রুপক্ষকে তাঁর যাত্রার ব্যাপারে জানতে দেন নি। কারণ তিনি তাঁর যাত্রাপথ পরিবর্তন করেছিলেন যাতে মরুচারী বেদুইন এবং আশ- পাশের গোত্র লো শত্রুদের কাছে তাঁর অগ্রযাত্রার খবর পৌঁছাতে সক্ষম না হয়।

২. তিনি একটি রুত্বপূর্ণ সামরিক কৌশল অর্থাৎ গোপনীয়তা রক্ষার মূলনীতি পূর্ণরূপে পালন করেছিলেন। তিনি রাতের বেলা পথ চলতেন এবং দিনের বেলা কোন স্থানে লুকিয়ে থাকতেন এবং বিশ্রাম নিতেন। উপত্যকার প্রবেশমুখে পৌঁছার আগেই তিনি তাঁর সকল সৈন্যকে বিশ্রাম নেয়ার নির্দেশ দেন। যাতে শত্রুপক্ষ উপত্যকার নিকটে তাঁদের আগমনের কথা জানতে না পারে, সেজন্য তিনি নির্দেশ দেন, সৈন্যরা যেন তাদের ঘোড়া লোর মুখ বেঁধে রাখে। এর ফলে শত্রুপক্ষ হেঁসামতি গুনতে পারবে না। হযরত আলী (আ.) সাথীদের নিয়ে ফজরের নামায আদায় করেন এবং সৈন্যদের পাহাড়ের পেছন থেকে পাহাড়ের চূড়ায় এবং সেখান থেকে উপত্যকার ভেতরের দিকে পরিচালনা করেন। শক্তিশালী ও সাহসী মুসলিম সৈনিকগণ একজন সাহসী ও বীর সেনাধিনায়কের নেতৃত্বে বিদ্যুৎ গতিতে ঘুমন্ত ও নিদ্রালু শত্রুদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে একদলকে বন্দী করেন; আরেকটি দল প্রাণ নিয়ে পলায়ন করে।

৩. আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর অসাধারণ ও অতুলনীয় বীরত্ব : যে সাত জন শত্রুপক্ষীয় বীর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, তিনি তাদেরকে ধরাশায়ী করেছিলেন। তিনি শত্রুদের এতটা বিপর্যস্ত করে দিয়েছিলেন যে, তারা তাদের প্রতিরোধ- ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল এবং প্রচুর গনীরেখে পলায়ন করেছিল।^{৩২৬}

ইসলামের অমিত বীর সেনাপতি অভূতপূর্ব সাফল্য নিয়ে পবিত্র মদীনায় ফিরে এলেন। মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে সাথে নিয়ে মুসলিম বাহিনীকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সেনাবাহিনীর অধিনায়ক মহানবীকে দেখে তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন। তিনি হযরত আলীর পিঠ

চাপড়ে বললেন : “তুমি তোমার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ কর; মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।” এ সময় আলীর দু’চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে গিয়েছিল এবং মহানবী হযরত আলীর ব্যাপারে তাঁর ঐতিহাসিক এ উক্তি করেছিলেন :

يا عليّ لولا أنّي أشفق أن تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت التّصاري في المسيح لقلت فيك اليوم مقالا لا تمرّ بملاء من النّاس إلّا أخذوا التّراب من تحت قدميك

হে আলী! হযরত ঈসা মসীহের ব্যাপারে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় যা বলেছে, আমি যদি আমার উম্মতের মধ্য থেকে কিছু লোক কর্তৃক তোমার ব্যাপারে সেই একই কথা বলার আশংকা না করতাম, তা হলে আমি আজ তোমার ব্যাপারে এমন কথা বলতাম যে, এর ফলে তুমি যেখান দিয়ে যেতে, লোকেরা সেখানে তোমার পায়ের তলা থেকে (বরকত লাভের জন্য) মাটি তুলে নিত।

এ ধরনের আ ত্যাগ এতটা রুত্ববহ ছিল যে, এ ঘটনা উপলক্ষে সূরা আল আদিয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। এ সূরার অভিনব ও আবেগময় শপথসমূহ এ ঘটনার কুরবানীকারী সৈনিকগণের সামরিক মনোবল ও বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেই উল্লিখিত হয়েছে :

(و العاديّات ضبيحاً فالموريات قدحاً فالمغيّرات صبيحاً فأترن به نفعاً فوسطن به جمعاً)

“ ঐসব ধাবমান অশ্বের শপথ! যে লো নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে যুদ্ধের ময়দানের দিকে অগ্রসর হয় এবং পাথরের উপর যে লোর খুরাঘাতে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ ঠিকরে বের হয় ; ভোরের বেলা যে লো বিদ্যুৎ চমকানির মতো শত্রুর ওপর আক্রমণ চালায়, ত গতিতে ধাবমান হওয়ার জন্য বাতাসে ধূলো- মাটি উড়িয়ে দেয় এবং শত্রুদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে।”

একটি জিজ্ঞাসার জবাব

তেল শিল্প জাতীয়করণের বছর লোতে সোভিয়েত ইউনিয়নের চরেরা মার্ক্সবাদ ও নাস্তিক্যবাদী ধ্যান- ধারণা প্রচারের জন্য ময়দান যে কোন ধরনের প্রতিশ্রুততা থেকে মুক্ত দেখতে পেয়ে কখনো কখনো ইসলামী জ্ঞান- বিজ্ঞান ও শিক্ষা- দীক্ষার ব্যাপারে আপত্তি করার জন্য মুখ খুলত এবং সমালোচনা করত। একদিন তাদের এক সদস্য আমাকে (লেখক) সূরা আল আদিয়াতের আয়াতসমূহে যে সব শপথ (কসম) রয়েছে, সেসবের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। তার প্রশ্ন করার

বাচনভঙ্গি থেকে প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, তার দৃষ্টিতে এসব শপথ রুত্বহীন। এ কারণেই সে এ প্রশ্ন করার সময় ঠোঁট বাঁকা করে মাথা নাড়িয়ে বলছিল : “যে সব অশ্ব হাঁপাচ্ছে, টানা টানা শ্বাস নিচ্ছে এবং পাথরের ওপর যে লোর খুরাঘাতে বিদ্যুৎ-ফুলিঙ্গ ঠিকরে বের হচ্ছে, সে লোর নামে শপথ করার কী অর্থ থাকতে পারে?” আমি তার এ প্রশ্নের জবাবে এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম : “‘যুদ্ধরত যোদ্ধাদের অশ্বসমূহের শপথ’ অথবা ‘অশ্বসমূহের খুর ও পাথরের মাঝখান থেকে ঠিকরে বের হওয়া বিদ্যুৎ-ফুলিঙ্গের শপথ’ আসলে যালেমদের বিরুদ্ধে জিহাদের রুত্বকে চিত্রায়িত করে। এই সংগ্রামরত সেনাবাহিনী কেবল কল্যাণপ্রসূ ও মূল্যবানই নয়, বরং তাদের অশ্ব লো এবং সে লোর খুরের তল থেকে ঠিকরে বের হওয়া বিদ্যুৎ-ফুলিঙ্গও পবিত্র; এসব উপায়- উপকরণ ব্যবহার করে মুজাহিদগণ কর্তৃক যালেমদের কোমর ভেঙে দেয়া এবং মানব জাতিকে আত্মসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার চেয়ে আর কোন্ মূল্যবোধ অধিকতর মহান হবে?”

পবিত্র কুরআন এভাবে অর্থাৎ মুজাহিদগণের ঘোড়া লো, এ লোর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ এবং এ লোর খুর থেকে নির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গসমূহকে পবিত্র গণ্য করার মাধ্যমে মুমিনদেরকে যে সব লৌহপ্রাচীরের ভেতর জাতিসমূহ বন্দী হয়ে আছে, সে লো ঠড়িয়ে ফেলার জন্য শক্তি সঞ্চয় করার আহ্বান জানিয়েছে।

মুক্তিদানকারী গোষ্ঠী কেবল নিজেরাই পবিত্র নয়; বরং তাদের অশ্ব লো, সে লোর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ এবং সে লোর খুর থেকে নির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গও মর্যাদার অধিকারী এবং আজ ঐ অশ্ব লো তগামী মোটরযান এবং অশ্ব লোর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ যুদ্ধবিমানের গর্জনকারী শব্দে পরিবর্তিত হয়েছে এবং মহানবী (সা.)-এর রিসালাতের যুগের হাতিয়ার ও উপায়-উপকরণসমূহের ন্যায় সে লোকে পবিত্র ও মর্যাদার আলোকবর্তিকা আচ্ছাদিত করে রেখেছে।^{৩২৭}

এটি ছিল সংক্ষেপে যাতুস্ সালাসিলের গায়ওয়ার ঘটনা যা শিয়া মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণ সহীহ সনদ ও সূত্রে সংরক্ষণ করেছেন। তবে আহলে সুন্নাতে ঐতিহাসিকগণ, যেমন তাবারী^{৩২৮} যাতুস্ সালাসিলের ঘটনা ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন এবং আমরা যা এখানে বর্ণনা করেছি, তার

সাথে এ ঘটনার বেশ পার্থক্য আছে। যাতুস্ সালাসিল দু'টি যুদ্ধেরও নাম হতে পারে, যে লোর প্রতিটি শিয়া- সুন্নী মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে উভয় পক্ষ একটি ঘটনাই বর্ণনা করেছেন এবং অপর ঘটনা বর্ণনা থেকে বিরত থেকেছেন।

উনপঞ্চাশতম অধ্যায় : অষ্টম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

মক্কা বিজয়

ম ১ বিজয় ইসলামের ইতিহাসের সুপাঠ্য ও আকর্ষণীয় অধ্যায়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, আবার একই সাথে তা শিক্ষণীয় এবং তা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ এবং তাঁর মহান চরিত্র স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

ইতিহাসের এ অধ্যায়ে হৃদয়বিয়ার সন্ধিতে যে সব বিষয় সম্পর্কে স্বাক্ষর করা হয়েছিল, সেসবের প্রতি মহানবী (সা.) এবং তাঁর অনুসারীগণের বিশ্বস্ততা স্পষ্ট হয়ে যায়, আর এর বিপরীতে হৃদয়বিয়ার সন্ধিপত্রের ধারাসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কুরাইশ বংশীয় মুশরিকদের কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতাও পরিষ্কার হয়ে যায়।

ইতিহাসের এ অধ্যায় অধ্যয়ন ও মূল্যায়ন করলে শত্রুর সর্বশেষ ও সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি জয় করার ক্ষেত্রে মহানবীর দক্ষতা, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল এবং বিজ্ঞজ্ঞানোচিত রাজনীতি প্রমাণিত হয়ে যায়। এমন প্রতীয়মান হয় যে, এ পবিত্র ব্যক্তিত্ব তাঁর জীবনের একটি অংশ এক রুত্বপূর্ণ সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েছেন এবং একজন চৌকস সমরাধিনায়কের মতো বিজয়-পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করেছেন, যাতে মুসলমানরা অনায়াসে সর্ববৃহৎ বিজয় অর্জন করেছিল।

অবশেষে এ অধ্যায়ে রক্তপিপাসু শত্রুদের জীবন ও ধন-সম্পদ রক্ষার ব্যাপারে মহানবীর মানব দরদী চরিত্র স্পষ্ট হয়ে যায়। এ মহামানব বিশেষ বিচক্ষতা দিয়ে এ মহান বিজয় অর্জিত হবার পর কুরাইশদের যাবতীয় অপরাধ উপেক্ষা করেন এবং সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেন।

হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে কুরাইশ নেতৃবর্গ ও মহানবী (সা.)-এর মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির তৃতীয় ধারা মোতাবেক মুসলমান ও কুরাইশরা যে কোন গোত্রের সাথে মৈত্রীচুক্তি করতে পারবেন। এ ধারার ভিত্তিতে খুযাআহ গোত্র মুসলমানদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং মহানবী তাদের জীবন, ধন-সম্পদ এবং ভূ-খণ্ড রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর বনী কিনানাহ গোত্র, যারা খুযাআহ গোত্রের পুরানো শত্রু এবং প্রতিবেশী ছিল, কুরাইশ গোত্রের সাথে

সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এ ঘটনাপ্রবাহ একটি দশ-সালা চুক্তি- যা আরব উপদ্বীপের সমুদয় অঞ্চলে সামাজিক নিরাপত্তা ও সর্বসাধারণের শান্তি সংরক্ষণকারী ছিল, - সম্পাদিত হবার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

এ চুক্তি মোতাবেক উভয় পক্ষ (কুরাইশ ও মুসলমানরা) একে অপরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করবেন না অথবা তাদের নিজ নিজ মিত্রকে প্রতিপক্ষের মিত্রদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবেন না এবং উস্কানী দেবেন না। এ চুক্তি সম্পাদন করার পর থেকে দু'বছর গত হয় এবং উভয় পক্ষ নিরাপত্তার সাথে ও সুখ-শান্তিতে বসবাস করছিলেন। এর ফলে মুসলমানগণ হিজরতের সপ্তম বর্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা সহ পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফ যিয়ারতের জন্য পবিত্র মক্কা নগরী গমন করেন এবং হাজার হাজার মূর্তিপূজারী মুশরিক শত্রুর চোখের সামনে নিজেদের ইসলামী দায়িত্ব ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আঞ্জাম দেন।

অসহায় মুসলিম প্রচারকগণকে রোম সাম্রাজ্যের যে সব চর কাপুরুষোচিতভাবে হত্যা করেছিল, তাদেরকে দমন ও কঠোর শাস্তি প্রদান করার জন্য হিজরতের অষ্টম বর্ষের জমাদিউল আওয়াল মাসে মহানবী তিন জন উর্দ্ধতন মুসলিম সমরাধিনায়কের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী শামের সীমান্ত অঞ্চলসমূহে প্রেরণ করেন। মুসলিম সেনাবাহিনী এ সমরাভিযান থেকে নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেছিল এবং মাত্র তিন জন অধিনায়ক ও কয়েকজন সৈন্য ছাড়া এ বাহিনীর আর কোন ক্ষতি ও প্রাণহানি ঘটে নি। তবে ইসলামের মুজাহিদগণের কাছ থেকে যে সামরিক সাফল্যের আশা করা হয়েছিল, তা অর্জন ছাড়াই এ সেনাদল মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেছিল এবং তাদের এ অভিযানের বেশিরভাগই 'আঘাত কর ও পালাও' এ কৌশল সদৃশ ছিল। কুরাইশ গোত্রপতিদের মাঝে এ সংবাদ প্রচারিত হবার কারণে তাদের সাহস বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা ভাবল, ইসলামের সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে এবং মুসলমানরা লড়াই করার মনোবল হারিয়ে ফেলেছে। এ কারণে তারা সিদ্ধান্ত নেয়, তারা (বিরাজমান) শান্ত পরিবেশ নষ্ট করে দেবে। প্রথমে তারা বনী বকর গোত্রের^{৩২৯} মাঝে অস্ত্র বিতরণ করে এবং তাদেরকে মুসলমানদের মিত্র খুযাআহ গোত্রের ওপর রাতের আঁধারে আক্রমণ করে তাদের একাংশকে হত্যা

ও আরেক অংশকে বন্দী করার জন্য প্ররোচিত করে। এমনকি তারা এতটুকুতেও সন্তুষ্ট থাকে নি। একদল কুরাইশ রাতের বেলা খুযাআহ্ গোত্রের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। আর এভাবে তারা হৃদয়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে দু'বছর ধরে বিরাজমান শান্ত অবস্থাকে যুদ্ধ ও রক্তপাতে রূপান্তরিত করেছিল।

রাতের বেলা অতর্কিত এ হামলায় খুযাআহ্ গোত্রের ঘুমন্ত বা ইবাদত-বন্দেগীরত একাংশ নিহত এবং আরেক অংশ বন্দী হয়েছিলেন। খুযাআহ্ গোত্রের একদল লোক নিজেদের ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে আরবদের কাছে নিরাপদ আশ্রয়স্থল বলে বিবেচিত পবিত্র ম া নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পবিত্র ম ায় আসা শরণার্থীরা বুদাইল ইবনে ওয়ারকা^{৩৩০} -এর ঘরে গিয়ে নিজ গোত্রের হৃদয়বিদারক কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন।

খুযাআহ্ গোত্রের অত্যাচারিত ব্যক্তির তাদের অত্যাচারিত হওয়ার বিষয়টি মহানবী (সা.)-এর গোচরীভূত করার জন্য নিজেদের গোত্রপতি আমর ইবনে সালিমকে মদীনায় মহানবীর কাছে প্রেরণ করেন। তিনি মদীনায় পৌঁছে সরাসরি মসজিদে নববীতে চলে যান এবং জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক স্বরে খুযাআহ্ গোত্রের অত্যাচারিত অবস্থা ও সাহায্য প্রার্থনার কথা ব্যক্ত করে এমন একটি কবিতা আবৃত্তি করেন এবং মহানবী (সা.) খুযাআহ্ গোত্রের সাথে যে মৈত্রীচুক্তি করেছিলেন তাঁকে সেই চুক্তির মর্যাদা রক্ষার দোহাই দেন এবং মযলুমদের সাহায্য ও তাদের খুনের প্রতিশোধ নেয়ার আহবান জানান।

তিনি কবিতাটির শেষে বলেছিলেন :

هَمَّ بَيْتُونَا بِالْوَتِيرِ هَجْدًا وَقَتْلُونَا رَكْعَةً وَأَسْجِدًا

“ হে নবী! তারা মধ্যরাতে যখন আমাদের একাংশ ওয়াতীর জলাশয়ের কাছে নিদ্রায় আচ্ছন্ন এবং আরেক অংশ রু -সিজদাহরত ছিল, তখন এ অসহায় নিরস্ত্র জনগণের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করেছে।”

এ কবি মুসলমানদের আবেগ- অনুভূতি এবং যুদ্ধ করার সাহস ও মনোবৃত্তি জাগ্রত করার জন্য বারবার বলছিলেন : قُتِلْنَا وَ قَدْ أَسْلَمْنَا “আমরা যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি, তখন (ঈমানের অবস্থায়) গণহত্যার শিকার হয়েছি।”

খুযাআহ্ গোত্রপতির এ ধরনের আবেগধর্মী, মর্মস্পর্শী ও উদ্দীপনা সঞ্চারী কবিতা তার প্রভাব রেখেছিল। মহানবী (সা.) বিশাল মুসলিম জনতার সামনে আমরের দিকে মুখ তুলে বলেছিলেন : “হে আমার ইবনে সালিম! তোমাকে আমি সাহায্য করব।” এ অকাট্য নিশ্চয়তামূলক প্রতিশ্রুতি আমরকে অভিনব প্রশান্তি দিয়েছিল। কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন, মহানবী শীঘ্রই এ ঘটনার কারণ কুরাইশদের থেকে খুযাআহ্ গোত্রের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তবে তিনি কখনোই ভাবতে পারেন নি, পবিত্র মাদীনা বিজয় ও কুরাইশদের অত্যাচারী শাসনের পতনের মধ্য দিয়ে এ কাজের পরিসমাপ্তি হবে।

অল্প সময়ের মধ্যে সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য বুদাইল ইবনে ওয়ারকা খুযাআহ্ গোত্রের এক দল লোককে সাথে নিয়ে মদীনায় মহানবীর কাছে যান এবং তাঁর কাছে খুযাআহ্ গোত্রের তরুণ-যুবকদের হত্যা করার ব্যাপারে বনী বাকর গোত্রের সাথে কুরাইশদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি মাদীনার পথে রওয়ানা হয়ে যান।

মহানবী (সা.)- এর সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্ভিন্ন কুরাইশরা

কুরাইশরা তাদের এ অন্যায়ের ব্যাপারে খুব অনুতপ্ত হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পারে যে, তারা হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির বিপক্ষে একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছে এবং এভাবে তারা এ চুক্তি ভঙ্গ করেছে। এ কারণে তারা মহানবী (সা.)- এর ক্রোধ প্রশমন এবং দশ- সালা চুক্তিটির অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ^{৩৩১} এবং আরেকটি বর্ণনামতে নবায়ন করার জন্য নিজেদের নেতা আবু সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করে, যাতে সে যে কোনভাবে তাদের অন্যায় ও আগ্রাসনের বিষয়টিকে ধামাচাপা দিতে সক্ষম হয়। সে মদীনার পথ ধরে যাত্রা করে এবং ‘আসফান’ নামক স্থানে^{৩৩২} ম ইস্ত খুযাআহ গোত্রের নেতা বুদাইলের সাথে তার দেখা হয়। সে তাঁর কাছে জানতে চায়, তিনি মদীনায় ছিলেন কি না এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কথা মহানবীর কাছে উত্থাপন করেছেন কি না? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, তিনি নিজ গোত্রের লোকদের সা না দেবার জন্য তাদের কাছে গিয়েছিলেন এবং কখনোই তিনি মদীনা গমন করেন নি। তিনি এ কথা বলেই পবিত্র মার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু আবু সুফিয়ান তাঁর উটের মলের মধ্যে মদীনার খেজুরের আঁটি দেখতে পায় এবং তা থেকে নিশ্চিত হয়ে যায়, বুদাইল মহানবীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

আবু সুফিয়ান মদীনায় প্রবেশ করে সরাসরি নিজ কন্যা উম্মে হাবীবার কাছে যায়। উল্লেখ্য, উম্মে হাবীবাহ মহানবী (সা.)- এর স্ত্রী ছিলেন। সেখানে সে মহানবীর তোষকের উপর বসতে চাইলে তার কন্যা তৎক্ষণাৎ তা টিয়ে ফেলেন। আবু সুফিয়ান তার মেয়েকে বলেছিল : “তুমি কি বিছানাকে তোমার পিতার অনুপযুক্ত মনে করেছ, নাকি তোমার পিতাকে এর অনুপযুক্ত ভেবেছ?” তখন পিতার প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন : “এ বিছানা মহানবী (সা.)- এর, আর তুমি একজন কাফির। তাই আমি চাই না, একজন অপবিত্র- কাফির ব্যক্তি মহানবীর পবিত্র বিছানার উপর বসুক।”

এ উক্তি ঐ ব্যক্তির কন্যার যে পুরো বিশটি বছর ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে অনেক লো বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। কিন্তু এ মহীয়সী নারী (উম্মে হাবীবাহ) ইসলামের ক্রোড়ে এবং তাওহীদী আদর্শের ছায়ায় প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন বলে তাঁর মধ্যে ধর্মের প্রতি ভালোবাসা এতোটাই প্রবল ছিল যে, অভ্যন্তরীণ প্রবণতা সত্ত্বেও তিনি পিতা-সন্তানের মধ্যকার আবেগকে তাঁর ধর্মীয় আবেগের কাছে অবনত করিয়েছিলেন।

আবু সুফিয়ান মদীনায় তার একমাত্র আশ্রয়স্থল কন্যার আচরণে খুবই মর্মান্বিত হয়, আর এ কারণেই সে তার বাসগৃহ ত্যাগ করে মহানবীর কাছে উপস্থিত হয়। সে মহানবীর কাছে হৃদয়বিয়ার সন্ধিচুক্তি নবায়ন ও দৃঢ়ীকরণের বিষয়টি উত্থাপন করে। কিন্তু মহানবী কোন কথাই বললেন না। তাঁর নীরবতা প্রমাণ করে, তিনি আবু সুফিয়ানের কথার কোন রুত্ব দেন নি।

আবু সুফিয়ান মহানবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে যোগাযোগ করে যাতে তাঁদের মাধ্যমে আবার মহানবীর সাথে যোগাযোগ করে নিজ উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয়। কিন্তু এসব যোগাযোগ তার কোন উপকারেই আসে নি। অবশেষে সে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)-এর ঘরে গিয়ে তাঁকে বলেছিল : “এ নগরীতে আপনারাই আমার সবচেয়ে নিকটতম আশ্রয়। কারণ আমার সাথে আপনাদের ঘনিষ্ঠ রক্ত-সম্পর্কের আশ্রয়তা আছে। তাই আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি যাতে আপনি মহানবীর কাছে আমার ব্যাপারে সুপারিশ করেন।” হযরত আলী (আ.) তার এ কথার জবাবে বললেন : “মহানবী যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সে ব্যাপারে আমরা কখনোই হস্তক্ষেপ করি না।” সে হযরত আলীর এ কথা শুনে হতাশ হয়ে গেল। হঠাৎ সে আলী (আ.)-এর সহধর্মিনী মহানবীর কন্যা হযরত যাহরা (আ.)-এর দিকে তাকালো। তখন তাঁর নয়নের দ্যুতি হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আ.) তাঁর সামনে খেলায় ব্যস্ত ছিলেন। সে হযরত ফাতিমার আবেগকে নাড়া দেয়ার জন্য বলল : “হে নবীকন্যা! আপনার সন্তানদেরকে আমার অধিবাসীদের আশ্রয় দেয়ার আদেশ দেয়া আপনার পক্ষে কি সম্ভব? আর এর ফলে যতদিন এ পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, ততদিন তাঁরা আরবদের নেতা থাকবেন।” হযরত যাহরা আবু সুফিয়ানের অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন : “এ কাজ

রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং বর্তমানে আমার সন্তানদের এমন অবস্থাও নেই।” সে আবার হযরত আলীর দিকে তাকিয়ে বলল : “হে আলী! আমাকে এ ব্যাপারে কিছু দিক নির্দেশনা দান করুন।” হযরত আলী তাকে বললেন : “আমার চোখে কেবল এ পথ ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না যে, তুমি মসজিদে গিয়ে মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা দানের ঘোষণা দেবে।” আবু সুফিয়ান বলল : “আমি যদি এ কাজ করি, তা হলে কি কোন উপকার হবে?” তিনি বললেন : “খুব একটা উপকার হবে না। তবে এ কাজ করা ছাড়া আর কিছুই আমার দৃষ্টিতে আসছে না।” আবু সুফিয়ান আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর সত্যবাদিতা, সততা ও নির্ভর ব্যাপারে জ্ঞাত ছিল বিধায় সে তাঁর প্রস্তাব মসজিদে নববীতে গিয়ে বাস্তবায়ন করল। এরপর সে মসজিদ থেকে বের হয়ে এসে উটের পিঠে আরোহণ করে মার উদ্দেশে রওয়ানা হলো। মার কুরাইশ নেতাদের কাছে নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রিপোর্ট দেয়ার মাঝে হযরত আলীর প্রস্তাবের ব্যাপারে কথা উঠলে সে বলল : “আমি আলীর প্রস্তাব মোতাবেক মসজিদে গিয়েছি এবং মুসলমানদেরকে আশ্রয় দেয়ার ঘোষণা দিয়েছি।” উপস্থিত ব্যক্তির তাকে জিজ্ঞেস করল : “মুহাম্মদ কি তোমার এ কাজ অনুমোদন করেছে?” সে বলল : “না।” তারা বলল : “আলীর প্রস্তাব ঠা া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কারণ মহানবী তোমার আশ্রয় দানের ঘোষণার প্রতি মোটেই অক্ষিপ করে নি। আর একতরফা চুক্তির কোন কল্যাণ নেই।” অতঃপর তারা মুসলমানদের ক্রোধ প্রশমনের অন্য পথ খুঁজে বের করার জন্য অনেক লো পরামর্শসভার আয়োজন করেছিল।^{৩৩৩}

এক গুপ্তচর আটক

মহানবী (সা.)- এর জীবনেতিহাস থেকে এ পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায় যে, তিনি সব সময় চেষ্টা করতেন যাতে শত্রু সত্যের সামনে আ সমর্পণ করে। আর তিনি কখনোই শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ ও তাকে ধ্বংস করার অভিপ্রায় পোষণ করতেন না।

যে সব যুদ্ধে তিনি নিজে অংশগ্রহণ করতেন, সেসবের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বা যখন তিনি কোন সেনাদলকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করতেন, তখন লক্ষ্য থাকতো শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা, শত্রুপক্ষের সৈন্য সমাবেশ ও সংহতি বিনষ্ট করা এবং তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া। তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে, ইসলাম ধর্ম প্রচারের পথে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা লো দূর করা হলে মুক্ত ও স্বাধীন পরিবেশে ইসলাম ধর্মের শক্তিশালী যুক্তি তার প্রভাব ফেলবেই এবং এ লোক লো- যাদের সামরিক সমাবেশ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, - তাদেরকে যদি নিরস্ত্র করা হয় এবং তারা যুদ্ধরত অবস্থার অবসান ঘটায় ও সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে ইসলামের ওপর বিজয় লাভ করার চিন্তা মনের মধ্যে লালন না করে, তা হলে তারা নিজেদের অজান্তেই মানব প্রকৃতি বা ফিতরাতে দিকনির্দেশনার দ্বারা তাওহীদবাদী ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হবে ও ইসলামের সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

এ কারণেই অনেক পরাজিত জাতি যারা ইসলামের সামরিক শক্তির কাছে পরাজয় বরণ করেছে এবং এরপর বিশৃঙ্খল- মুক্ত পরিবেশে ইসলামের সুমহান শিক্ষার প্রভাবে গভীর চিন্তা- ভাবনা করেছে, তারাই দীন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং একনিষ্ঠভাবে এক- অদ্বিতীয় স্রষ্টার ইবাদতের ধর্ম প্রসার ও প্রচারকাজে আ নিয়োগ করেছে।

আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ম া বিজয়েও এ সত্য পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত হয়েছে। মহানবী (সা.) জানতেন, যদি তিনি পবিত্র ম া জয় করেন এবং শত্রুদের অস্ত্রমুক্ত করে পরিবেশকে মুক্ত ও শান্ত করেন, তা হলে অল্প দিনের মধ্যেই বর্তমানে ইসলাম ধর্মের ভয়ঙ্কর শত্রু এ দলটি সাহায্যকারী ও ইসলাম ধর্মের পথে মুজাহিদ হয়ে যাবে। অতএব, শত্রুর ওপর

অবশ্যই বিজয়ী হতে হবে এবং তাকে পরাভূত করতেই হবে। তবে কখনোই তাদেরকে ধ্বংস করা বাঞ্ছনীয় নয়, আর যতদূর সম্ভব রক্তপাত এড়ানো উচিত। এ পবিত্র লক্ষ্য (বিনা রক্তপাতে শত্রুকে পরাজিত করা) অর্জনের জন্য শত্রুকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করার মূলনীতি ব্যবহার করা উচিত। নিজেদের রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সেনাবাহিনী সংগ্রহ করার চিন্তা-ভাবনা করার আগেই শত্রুপক্ষকে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে নিরস্ত্র করতে হবে।

শত্রুপক্ষকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করার মূলনীতি তখনই বাস্তবায়িত হবে, যখন ইসলামের যাবতীয় সামরিক রহস্য ও গোপনীয়তা সংরক্ষিত থাকবে এবং তা শত্রুর হস্তগত হবে না। মূলনীতিগতভাবে শত্রুপক্ষ জানবে না, মহানবী তাদের ওপর আক্রমণ করবেন কি না। আর যদি আক্রমণের চিন্তা-ভাবনা করা হয়ে থাকে, তা হলে তারা ঘৃণাক্ষরেও অভিযান পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে মুসলিম বাহিনীর যাত্রাকাল ও গতিপথ সম্পর্কে যেন অবগত না হয়। এর অন্যথা হলে এ সামরিক মূলনীতি বাস্তবায়িত হবে না।

পবিত্র মাদীন নগরী বিজয় শিরক ও মূর্তিপূজার সবচেয়ে সুরক্ষিত ও মজবুত দুর্গের পতন এবং কুরাইশদের যালিম প্রশাসন, যা ছিল তাওহীদবাদী ধর্মের প্রচার ও প্রসারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা, তা উচ্ছেদ করার জন্য মহানবী (সা.) রণপ্রস্তুতির কথা ঘোষণা করেন। তিনি মহান আল্লাহর কাছে দুআ করেন, কুরাইশদের গুচররা যেন মুসলিম সেনাবাহিনীর যাত্রা ও গতিবিধি সম্পর্কে অবগত না হয়। মুহররম মাসের শুরুতেই মদীনা নগরীর আশে-পাশের অঞ্চল লো থেকে মদীনায় এক বিশাল সেনাসমাবেশ করা হয় যার বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা লিখেছেন :

তিন শ' অশ্ব ও তিন পতাকা সমেত সাত শ' মুহাজির যোদ্ধা, সাত শ' অশ্ব ও অনেক পতাকা সমেত চার হাজার আনসার যোদ্ধা, এক শ' অশ্ব, এক শ' বর্ম ও তিন পতাকা সহ বনী মাযীনাহ গোত্র থেকে এক হাজার যোদ্ধা, বনী আসলাম গোত্র থেকে ত্রিশটি অশ্ব ও দু'টি পতাকা সহ চার শ' যোদ্ধা; জুহাইনা গোত্র থেকে পঞ্চাশটি অশ্ব ও চারটি পতাকা সহ আট শ

’ যোদ্ধা, বনী কা’ব থেকে তিনটি পতাকা সহ পাঁচ শ’ যোদ্ধা; সেনাদলের অবশিষ্টাংশ গিফার, আমাজা ও বনী সালীম গোত্রের যোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত।^{৩৩৪}

ইবনে হিশাম বলেন : “মুসলিম বাহিনীর সেনাসংখ্যা দশ হাজারে উপনীত হয়।” এরপর তিনি আরো বলেন : “বনী সালীম গোত্র থেকে সাত শ’ এবং আরেকটি বর্ণনানুসারে এক হাজার যোদ্ধা, বনী গিফার গোত্র থেকে চার শ’ যোদ্ধা, আসলাম গোত্র থেকে চার শ’ যোদ্ধা, মাযীনাহ গোত্র থেকে এক হাজার তিন শ’ যোদ্ধা এবং বাকী অংশ মুহাজির, আনসার ও তাঁদের মিত্রগণ এবং বনী তামীম, কাইস ও আসাদ গোত্র থেকে কতিপয় লোকের সমন্বয়ে গঠিত।”

এ অভিযান বাস্তবায়িত করার জন্য পবিত্র ম া অভিমুখী সকল সড়কপথ ইসলামী হুকুমতের সামরিক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাগণের (সার্বক্ষণিক) নযরে রাখা হয়েছিল এবং শক্তভাবে সকল যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল। ইসলামী সেনাবাহিনী যাত্রা শুরু করার প্রাক মুহূর্তে হযরত জিবরীল (আ.) এসে মহানবী (সা.)- কে জানালেন, মুসলমানদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত এক সরলমনা লোক কুরাইশদের কাছে চিঠি লিখেছে এবং ‘সারাহ্’ নামের এক মহিলার সাথে চুক্তি করেছে যে, কিছু অর্থ নিয়ে সে তার চিঠিটা কুরাইশদের কাছে পৌঁছে দেবে। আর সে ঐ চিঠিতে ম া নগরীর ওপর মুসলমানদের অত্যাঙ্গন আক্রমণ চালানোর কথাও ফাঁস করে দিয়েছিল। সারাহ্ ম ার গায়িকা ছিল এবং সে কখনো কখনো কুরাইশদের শোকানুষ্ঠান লোতে শোকগাঁথাও গাইত। বদর যুদ্ধের পরে ম ায় তার কাজের প্রসার ও চাকচিক্য কমে গিয়েছিল। কারণ বদর যুদ্ধে কতিপয় কুরাইশ নেতা নিহত হয়েছিল এবং ম া নগরী জুড়ে তখন শোক ও দুঃখের মাতম চলছিল। এ কারণেই ম ায় তখন গান- বাজনা ও আমোদ- প্রমোদের আসর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কুরাইশদের ক্রোধ ও শত্রুতার আ ন প্রজ্জ্বলিত রাখতে এবং বদর যুদ্ধে নিহতদের প্রতিশোধ গ্রহণের অনুভূতি জনগণের মধ্য থেকে বিদূরিত না হওয়ার লক্ষ্যে শোকগাঁথা গাওয়া সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এ কারণেই বদর যুদ্ধের দু’ বছর পর সে মদীনায় আসে। মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : “তুমি কি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছ?” সে বলেছিল : “না।” মহানবী তখন

বলেছিলেন : “তা হলে তুমি এখানে কেন এসেছ?” সে উত্তরে বলেছিল : “কুরাইশ আমার গোত্র ও বংশ। তাদের একদল নিহত হয়েছে এবং আরেকদল মদীনায় হিজরত করেছে। বদর যুদ্ধের পরে আমার পেশার পসার ও চাকচিক্য হারিয়ে গেছে। তাই আমি অভাবগ্রস্ত হয়ে ও প্রয়োজনের তাকীদেই এখানে এসেছি।” মহানবী তাকে পর্যাপ্ত পোশাক- পরিচ্ছদ ও খাদ্য- দ্রব্য দেয়ার জন্য তাৎক্ষণিক নির্দেশ দিলেন।^{৩৩৫}

সারাহ্ মহানবীর কাছ থেকে আনু ল্য পাওয়া সত্ত্বেও হাতিব ইবনে আবী বালতাআর কাছ থেকে মাত্র দশ দীনার নিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গুচর বৃত্তির দায়ভার গ্রহণ করে এবং মুসলমানদের ম া বিজয়ের প্রস্তুতি গ্রহণের কথা ফাঁস করা তার পত্র কুরাইশদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।^{৩৩৬}

মহানবী (সা.) তাঁর তিন বীরকে ডেকে নিয়ে তাঁদের দায়িত্ব দিলেন, তাঁরা ম ার পথে অগ্রসর হয়ে এ গুচর নারীকে যেখানে পাবেন, সেখানে গ্রেফতার করে তার থেকে ঐ চিঠিটা উদ্ধার করবেন। মহানবী (সা.) এ অভিযানের দায়িত্ব হযরত আলী, যুবাইর ও মিকদাদকে প্রদান করেন। তাঁরা ‘রাওয়াতু খাখ্’^{৩৩৭} নামক স্থানে ঐ নারী গুচরকে গ্রেফতার করে তাকে তল্লাশী চালান। কিন্তু তাঁরা তার কাছে কিছুই পেলেন না। অন্যদিকে ঐ নারী গুচরটি হাতিবের কাছ থেকে চিঠি নেয়ার কথা জোরালোভাবে অস্বীকার করে।

তখন হযরত আলী বললেন : “মহান আল্লাহর শপথ! মহানবী কখনোই মিথ্যা বলেন না। তুমি চিঠিটা দিয়ে দাও। নইলে আমরা যে কোনভাবেই হোক, তোমার কাছ থেকে চিঠিটা উদ্ধার করব।”

সারাহ্ বুঝতে পারল, আলী এমন সৈনিক যিনি মহানবীর আদেশ বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হবেন না। এ কারণেই সে হযরত আলীকে বলল : “একটু দূরে যান।” এরপর সে তার চুলের দীর্ঘ বেনীর ভাঁজের ভেতর থেকে চিঠি বের করে হযরত আলীর কাছে হস্তান্তর করে।

দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন মুসলমান, যে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের ক্রান্তিকালে তাদের সাহায্যার্থে ত ছুটে যেত, সে এ ধরনের দুষ্কর্মে হাত দিয়েছে বিধায় মহানবী ভীষণ

অসন্তুষ্ট ও দুঃখিত হয়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি হাতিবকে ডেকে কুরাইশদের এ ধরনের তথ্য প্রদানের ব্যাপারে ব্যাখ্যা চাইলেন। সে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে শপথ করে বলল : “আমার ঈমানে সামান্য পরিমাণ দ্বিধা- সংশয় প্রবেশ করে নি। তবে মহানবী অবগত আছেন, আমি মদীনায় একাকী বসবাস করছি এবং আমার সন্তান- সন্ততি ও আণীয়- স্বজনরা কুরাইশদের চাপ ও নির্যাতনের মধ্যে মায় জীবন- যাপন করছে। আমার এ সংবাদ দেয়ার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কুরাইশরা কিছুটা হলেও যেন তাদের থেকে চাপ ও নির্যাতনের মাত্রা লাঘব করে।”

হাতিবের দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা থেকে বোঝা যায়, মুসলমানদের গোপন বিষয়াদি সংক্রান্ত তথ্য অর্জন করার জন্য কুরাইশ নেতারা মায় তাদের (মুসলমানদের) আণীয়- স্বজনদের চাপের মুখে রাখত এবং তাদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা লাঘব করার ব্যাপারে শর্তারোপ করে বলত যে, তাদেরকে মদীনার মুসলমানদের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত গোপন তথ্যাবলী সংগ্রহ করে তাদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। তার দুঃখ প্রকাশ, ক্ষমা প্রার্থনা ও কারণ দর্শানো যথার্থ ও যুক্তিসংগত না হওয়া সত্ত্বেও মহানবী তার অতীত কর্মকাণ্ড ও অবদানসমূহের মতো কতক লোক কল্যাণের কথা বিবেচনা করে তার অজুহাত গ্রহণ করেন এবং তাকে মুক্ত করে দেন। এমনকি হযরত উমর মহানবী (সা.)- এর কাছে তার শিরচ্ছেদের আবেদন জানালে মহানবী বলেছিলেন : “সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং একদিন সে মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের পাত্র ছিল। এ কারণেই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু এ ধরনের কাজের পুনরাবৃত্তি না ঘটানোর জন্য এ প্রসঙ্গে কয়েক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ).

“ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না...”^{৩৩৮}

মহানবী (সা.)- এর যাত্রা

অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে শত্রুপক্ষকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়ার মূলনীতি রক্ষার জন্য যাত্রার নির্দেশ জারীর মুহূর্ত পর্যন্ত যাত্রা করার সময়কাল, গতিপথ এবং লক্ষ্যস্থল কারো কাছেই স্পষ্ট ছিল না। হিজরতের অষ্টম বর্ষের ১০ রমযান যাত্রার নির্দেশ দেয়া হয়। তবে মদীনার সকল মুসলমানকে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

মহানবী (সা.) মদীনা থেকে বের হওয়ার দিন আবু রহম গিফারী নামের এক লোককে মদীনায তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে রেখে মদীনার অদূরে মুসলিম সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করতে যান। তিনি মদীনা থেকে একটু দূরে ‘কাদীদ’ নামক স্থানে গিয়ে সামান্য পানি আনিয়ে রোযা ভঙ্গ করলেন এবং সবাইকে রোযা ভাঙার আদেশ দিলেন। অনেকেই রোযা ভাঙলেন, কিন্তু অল্প সংখ্যক ব্যক্তি মনে করল যে, তারা রোযা রেখে জিহাদ করলে তাদের পুরস্কার বা সওয়াব আরো বাড়িয়ে দেয়া হবে। সেজন্য তারা রোযা ভঙ্গ করা থেকে বিরত রইল।

এ সব সরলমনা লোক মোটেই ভাবে নি যে, যে নবী রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, সেই নবী আবার তাদেরকে রোযা ভঙ্গ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যদি সৌভাগ্যের নেতা ও সত্যপথ প্রদর্শক হয়ে থাকেন, তা হলে তিনি উভয় অবস্থা এবং উভয় নির্দেশ দানের ক্ষেত্রেও জনগণের সৌভাগ্যই কামনা করবেন এবং তাঁর নির্দেশসমূহের মধ্যে কোন বৈষম্যের অস্তিত্ব নেই।^{৩৩৯}

মহানবী (সা.) থেকে অগ্রগামী হওয়া অর্থাৎ তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়ার এ ধরনের মনোবৃত্তি আসলে সত্য থেকে এক ধরনের বিচ্যুতি এবং তা আসলে মহানবী ও তাঁর শরীয়তের প্রতি এদের পূর্ণ বিশ্বাস না থাকার কথাই ব্যক্ত করে। এ কারণেই পবিত্র কুরআন এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে বলেছে :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدَمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)

“ হে ঈমানদারগণ, তোমরা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না।” (সূরা

হুজুরাত : ১)

আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ম ১ নগরীতে বসবাসরত মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি গোপনে মহানবীকে কুরাইশদের (গৃহীত) সিদ্ধান্ত লোর ব্যাপারে অবহিত করতেন। তিনি খাইবর যুদ্ধের পর ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন; তবে কুরাইশ নেতাদের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। তিনি সর্বশেষ মুসলিম পরিবার হিসেবে পবিত্র ম ১ ত্যাগ করে মদীনায় বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। আর মহানবী (সা.) ম ১ অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার দিন লোয়ই তিনি মদীনার দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং পথিমধ্যে জুহফাহ্ অঞ্চলে মহানবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। ম ১ বিজয়কালে আব্বাসের উপস্থিতি অনেক কল্যাণকর এবং উভয় পক্ষের জন্য উপকারী হয়েছিল। আর তিনি না থাকলে হয় তো কুরাইশদের প্রতিরোধবিহীন অবস্থায় ম ১ বিজয় সম্পন্ন হতো না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে মহানবী (সা.)- এর নির্দেশেই তাঁর ম ১ ত্যাগ করে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করা মোটেই অসম্ভব নয় যাতে করে তিনি এর মধ্যে তাঁর শান্তিকামী ও মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন।

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা প্রদর্শন

মহানবী (সা)- এর উজ্জ্বল জীবনেতিহাস, তাঁর সুমহান নৈতিক চরিত্র ও উন্নত মানসিকতা এবং সমগ্র জীবনব্যাপী তাঁর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা তাঁর জ্ঞাতি-গোত্র ও নিকটাত্মীয়দের কাছে স্পষ্ট ছিল এবং মহানবীর সকল আত্মীয় জানতেন যে, তিনি সমগ্র গৌরবময় জীবনে কখনোই পাপ ও অন্যায়ের পেছনে যান নি, কারো ওপর সামান্যতম যুলুম করার ইচ্ছা করেন নি এবং সত্যের পরিপন্থী কোন কথা তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় নি। এ কারণেই তাঁর সাধারণ জনতার প্রতি আহ্বান বা দীনের দাওয়াত দেয়ার প্রথম দিনেই বনী হাশিমের প্রায় সকল লোক তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁর চারপাশে প্রদীপের কাছে পতঙ্গ যেমন জড়ো হয়, তেমনি সমবেত হয়েছিলেন।

একজন সুবিবেচক প্রাচ্যবিদ^{১৪০} এ ব্যাপারকে মহানবীর পবিত্রতা, স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার প্রতীক বলে বিবেচনা করেছেন এবং বলেছেন : “কোন ব্যক্তি, তা তিনি যতই সতর্ক এবং রক্ষণশীল হোন না কেন, বংশ ও নিকটাত্মীয়-স্বজনদের কাছে ব্যক্তিগত জীবনের সমুদয় দিক গোপন রাখতে সক্ষম নন। মুহাম্মদ মন্দ মন-মানসিকতা ও চরিত্রের অধিকারী হলে তা কখনোই তাঁর নিকটাত্মীয় ও গোত্রের কাছে গোপন থাকত না এবং তারা এত তাড়াতাড়ি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন না ও ঝুঁকে পড়তেন না।”

বনী হাশিমের মধ্যে মাত্র টি কয়েক ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান আনে নি এবং আবু লাহাবের পরে আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও আবদুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়্যা নাম্নী মহানবী (সা.)-এর মাত্র দু’জন আত্মীয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যারা তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছিল এবং তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন তো করেই নি; বরং সত্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং মহানবীকে মত্ৰাতিরিক্ত কষ্ট দিত।

আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস মহানবীর পিতৃব্যপুত্র এবং তাঁর দুধ-ভাই ছিল এবং মহানবীর নবুওয়াত লাভের আগে তাঁর প্রতি অত্যন্ত মমতা ও ভালোবাসা পোষণ করত। কিন্তু নবুওয়াত

লাভের পর মহানবীর কাছ থেকে সে তার পথকে পৃথক করে ফেলে। উম্মে সালামার ভাই আবদুল্লাহ্ মহানবীর ফুফু ও আবদুল মুত্তালিবের কন্যা আতিকার পুত্র ছিল।

সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার এ দু'ব্যক্তিকে ম া ত্যাগ করে মুসলমানদের সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। মহানবী (সা.) যখন ম া বিজয়ের জন্য যাত্রা করছেন, তখন পশ্চিমধ্যে 'সানীয়াতুল উকাব' বা 'নাবকুল উকাব' - এ মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। মহানবীর সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দানের ব্যাপারে তাদের শত পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও মহানবী তাদের কথা মেনে নেন নি। এমনকি উম্মে সালামাহ্ অত্যন্ত আবেগপূর্ণ কণ্ঠে সুপারিশ করলেন। কিন্তু মহানবী তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন : “এটা ঠিক যে, আবু সুফিয়ান আমার পিতৃব্যপুত্র; কিন্তু সে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিটি আমার কাছে অনেক অযৌক্তিক আবদার করেছিল^{৩৪১} এবং সে নিজেও অন্যদের ঈমান আনার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মহানবীর মন-মানসিকতা এবং তাঁর আবেগ-অনুভূতি উদ্দীপ্ত করার পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) তাদের দু'জনকে বললেন : “আপনারা মহানবীর সামনে গিয়ে দাঁড়ান এবং ইউসুফের ভাইয়েরা নিজেদের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য যে কথা তাঁকে বলেছিল, আপনারাও তাঁকে তা বলুন।”

ইউসুফের ভাইয়েরা ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছিল :

(لقد آثرك الله علينا و إن كنا لحاطئين)

“ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং (নিশ্চয়ই) আমরা পাপী।”

(সূরা ইউসুফ : ৯১)

হযরত ইউসুফ (আ.) এ বাক্য শোনার পর তাদেরকে নিম্নোক্ত কথা বলে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন :

(لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم و هو أرحم الراحمين)

“ আজ তোমাদের থেকে জবাবদিহি আদায় করা হবে না। মহান আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন এবং তিনিই সবচেয়ে দয়ালু।” (সূরা ইউসূফ : ৯২)

এরপর হযরত আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) আরো বললেন : “যদি আপনারা প্রথম বাক্য উচ্চারণ করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই দ্বিতীয় বাক্যের দ্বারা এর জবাব দেবেন; কারণ তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি কখনোই মানতে প্রস্তুত নন যে, অন্য কোন ব্যক্তি তাঁর চেয়ে অধিকতর মিষ্টভাষী হোক।” যে পথ হযরত আলী (আ.) তাদেরকে দেখিয়েছিলেন, সে পথই তারা অবলম্বন করলেন। মহানবীও হযরত ইউসূফ (আ.)-এর মতো তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। তারা দু’জনই তখন থেকেই জিহাদের পোশাক পরিধান করেন। তারা তাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাওহীদী আদর্শ ও দ্বীন ইসলামের ওপর অটল থেকেছেন। অতীত জীবনের ক্ষতিপূরণ করার উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ান একটি কাসীদাহ রচনা করেন যা নিম্নরূপ :

لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل الّلات خيل محمد

فكالممدج الحيران أظلم ليله فهذا أولي حين أهدي فاهتدي

- তোমার জীবনের শপথ, যেদিন আমি পতাকা কাঁধে বহন করছিলাম, যাতে করে লাতের (মাস্জু জাহিলী যুগের একটি মূর্তির নাম) বাহিনী মুহাম্মদের বাহিনীর ওপর হয় জয়যুক্ত, সেদিন আমি ছিলাম রাতের উদাস্ত পথিকের মতো, যে আঁধারে পথ চলে। তবে এখন হচ্ছে ঐ সময় যখন আমাকে পথ প্রদর্শন করানো হবে; অতএব, আমি সুপথ প্রাপ্ত হব।^{৩৪২}

ইবনে হিশাম লিখেছেন : মহানবী (সা)-এর পিতৃব্যপুত্র আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তাঁর কাছে নিম্নোক্ত বার্তা পাঠিয়ে বলেছিলেন : “যদি আপনি আমার ঈমান আনার ব্যাপারে স্বীকৃতি না দেন, তা হলে আমি আমার শিশুপুত্রের হাত ধরে মরু-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াব (এবং সেখানে বাকী জীবন কাটিয়ে দেব)।^{৩৪৩}

উম্মে সালামাহ্ মহানবী (সা.)- এর আবেগকে উদ্দীপ্ত করার জন্য তখন বললেন : “আমরা আপনার কাছ থেকে বারবার শুনেছি : إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُئُ مَا كَانَ قَبْلَهُ “নিশ্চয়ই ইসলাম মানুষকে তার অতীত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় (অর্থাৎ তার অতীত জীবনের পাপকে মুছে দেয়)।” আর এ কারণেই মহানবীও তাঁদের দু’জনকে গ্রহণ করে নিলেন।^{৩৪৪}

ইসলামী সেনাবাহিনীর আকর্ষণীয় রণকৌশল

মাররুয যাহরান ম া নগরী থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মহানবী (সা.) পূর্ণ দক্ষতার সাথে পবিত্র ম ার প্রান্তসীমা পর্যন্ত দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী পরিচালনা করেন। ঐ সময় কুরাইশ ও তাদের গুরচরা এবং ঐ সব ব্যক্তি, যারা তাদের স্বার্থে কাজ করত, কখনকালেও ইসলামী সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা সম্পর্কে অবগত ছিল না। মহানবী ম াবাসীদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার, ম া নগরীর বাসিন্দাদের প্রতিরোধ করা ছাড়াই আ সমর্পণ এবং এ বিশাল ঘাঁটি ও পবিত্র কেন্দ্র বিনা রক্তপাতে জয় করা সম্ভব করে তোলার জন্য নির্দেশ দেন, মুসলিম সৈন্যরা উঁচু উঁচু এলাকায় গিয়ে আ ন জ্বালাবে। তিনি অধিক ভীতি সৃষ্টির জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক পৃথকভাবে আ ন জ্বালানোর নির্দেশ দেন, যাতে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার একটি (উজ্জ্বল) রেখা সব লো পাহাড় ও উঁচু এলাকা ছেয়ে ফেলে।

কুরাইশ ও তাদের মিত্ররা সবাই তখন গভীর নিদ্রামগ্ন। অন্যদিকে আ নের লেলিহান শিখায় উঁচু এলাকা লো বিশাল অগ্নিকুণ্ডের রূপ দান করেছিল এবং ম াবাসীদের বাড়ি লোকে আলোকিত করে ফেলেছিল। এর ফলে ম াবাসীদের অন্তরে ভীতির সৃষ্টি হয় এবং উঁচু এলাকা লোর দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

তখন আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং হাকীম ইবনে হিশামের ন্যায় ম ার কুরাইশ নেতারা প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য ম ার বাইরে এসে অনুসন্ধান কাজে মনোনিবেশ করে।

জুহফাহ থেকে মহানবী (সা.)- এর সাথে সর্বক্ষণ পথ চলার সাথী আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব চিন্তা করলেন, ইসলামী সেনাবাহিনী কুরাইশদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হলে কুরাইশ বংশীয় বহু লোক নিহত হবে। তাই শ্রেয়তর হবে যদি তিনি উভয় পক্ষের কল্যাণার্থে কোন ভূমিকা পালন করেন এবং কুরাইশদের আ সমর্পণে উদ্বুদ্ধ করেন।

তিনি মহানবীর সাদা খচ্চরের উপর আরোহণ করে রাতের বেলা পবিত্র ম ার পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকেন, যাতে তিনি ম া নগরী অবরোধের কথা কুরাইশ নেতাদের গোচরীভূত করেন

এবং তাদেরকে ইসলামী সেনাবাহিনীর সংখ্যাধিক্য ও তাঁদের বীরত্বব্যঞ্জক মনোবল ও সাহসিকতা সম্পর্কে জ্ঞাত করেন এবং বোঝাতে সক্ষম হন যে, আ সমর্পণ ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই।

তিনি দূর থেকে আবু সুফিয়ান ও বুদাইল ইবনে ওয়ারকার কথোপকথন শুনতে পেলেন। তারা বলছিল :

আবু সুফিয়ান : আমি এ পর্যন্ত এত প্রকাণ্ড আ ন এবং এত বিশাল সেনাবাহিনী দেখি নি!

বুদাইল ইবনে ওয়ারকা : তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত খুযাআহ গোত্র হবে।

আবু সুফিয়ান : যারা এত প্রকাণ্ড আ ন প্রজ্বলিত করছে এবং এত বড় সেনাছাউনী স্থাপন করেছে, তাদের চেয়ে খুযাআহ গোত্র সংখ্যায় অতি অল্প।

এরই মধ্যে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব সেখানে এসে তাদের কথা থামিয়ে দিয়ে আবু সুফিয়ানকে সম্বোধন করে বললেন : “আবু হানযালাহ (আবু সুফিয়ানের উপনাম)!” আবু সুফিয়ান আব্বাসের কণ্ঠধ্বনি চিনতে পেরে বলল : “আবুল ফযল (আব্বাসের উপনাম)! আপনি কী বলেন?” আব্বাস তখন বললেন : “মহান আল্লাহর শপথ! এ অগ্নিকুণ্ড ও শিখা লোর সবই মুহাম্মদের সৈন্যদের। তিনি এক শক্তিশালী সেনাদল নিয়ে কুরাইশদের কাছে এসেছেন এবং কখনোই এ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কুরাইশদের হবে না।”

আব্বাসের এ কথা লো আবু সুফিয়ানের গায়ে তীব্র কম্পন সৃষ্টি করে। তখন তার শরীর থরথর করে কাঁপছিল এবং তার দাঁতে খিল লাগার উপক্রম হয়েছিল। সে হযরত আব্বাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল : “আমার পিতা- মাতা তোমার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক! এখন উপায় কী?”

আব্বাস বললেন : “একমাত্র উপায় হচ্ছে এটাই যে, তুমি আমার সাথে মহানবীর সকাশে সাক্ষাৎ করতে যাবে এবং তাঁর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করবে; আর তা না হলে কুরাইশদের জীবন হুমকির সম্মুখীন।”

অতঃপর তিনি তাকে খচ্চরের পিঠে বসিয়ে ইসলামী সেনাশিবিরের দিকে গমন করেন এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের জন্য আবু সুফিয়ানের সাথে আসা ঐ দু'ব্যক্তি পবিত্র মায় ফিরে গেল।

আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের উদ্যোগ ইসলামের স্বার্থে এসেছিল এবং তা কুরাইশদের চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ আবু সুফিয়ানকে ইসলামের ক্ষমতা ও মুসলিম সেনাবাহিনী সম্পর্কে এতটা ভীত-সন্ত্রস্ত করেছিল যে, একমাত্র আ সমর্পণ ছাড়া আর কিছুই তার মাথায় আসছিল না। এসব কিছুর উর্ধ্বে তিনি আবু সুফিয়ানকে পবিত্র মায় ফিরে যেতে বাধা দেন, রাতের বেলা তাকে মুসলিম সেনাশিবিরে নিয়ে আসেন, সব দিক থেকে তার পথ আটকে দেন এবং তাকে আর মায় ফিরে যেতে দেন নি। কারণ, মায় প্রত্যাবর্তন করার পর চরমপন্থী কুরাইশদের প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে কয়েক ঘণ্টা প্রতিরোধ করার জন্য নির্বোধের ন্যায় তার হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করার সম্ভাবনা ছিল।

মুসলিম সেনাশিবিরের মাঝখান দিয়ে আবু সুফিয়ানসহ আব্বাসের গমন

মহানবী (সা.)-এর পিতৃব্য আব্বাস মহানবীর বিশেষ খচ্চরটির পিঠে বসা ছিলেন এবং আবু সুফিয়ানকে নিজের সাথে রেখেছিলেন। তিনি আবু সুফিয়ানকে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের প্রজ্জ্বলিত প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড লোর মাঝখান দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। যেসব সেনারক্ষী হযরত আব্বাস ও মহানবীর বিশেষ খচ্চর চিনত তারা তাঁর পথ অতিক্রম করার ব্যাপারে বাধা দেয় নি; বরং তারা তাঁর জন্য পথ খুলে দিচ্ছিল।

পশ্চিমমুখে খচ্চরের পিঠে হযরত আব্বাসের পেছনে বসা আবু সুফিয়ানের উপর দৃষ্টি পড়লে হযরত উমর তাকে সেখানেই হত্যা করতে চাইলেন। কিন্তু মহানবীর চাচা তাকে নিরাপত্তা দান করায় তিনি এ চিন্তা ত্যাগ করেন। অবশেষে মহানবীর তাঁবুর অদূরে আব্বাস ও আবু সুফিয়ান খচ্চরের পিঠ থেকে নামেন। মহানবীর চাচা অনুমতি নিয়ে তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করেন এবং তাঁর উপস্থিতিতে হযরত আব্বাস ও হযরত উমরের মধ্যে ভীষণ বিতর্ক হয়। উমর পীড়াপীড়ি করছিলেন যে, আবু সুফিয়ান মহান আল্লাহর শত্রু এবং এখনই তাকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু

আব্বাস বলছিলেন : “আমি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি এবং আমার নিরাপত্তা প্রদানের প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং তা সম্মানিত বলে বিবেচনা করতে হবে।” মহানবী (সা.) এক কথায় এ বিতর্কের অবসান ঘটান এবং হযরত আব্বাসকে নির্দেশ দেন, তিনি আবু সুফিয়ানকে সারা রাত একটি তাঁবুতে আটকে রাখবেন এবং সকালে তাকে তাঁর কাছে উপস্থিত করবেন।

মহানবী (সা.) সকাশে আবু সুফিয়ান

হযরত আব্বাস সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আবু সুফিয়ানকে মহানবীর কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁর চারপাশ মুহাজির ও আনসারগণ ঘিরে রেখেছিলেন। তাঁর দৃষ্টি আবু সুফিয়ানের উপর পড়লে তিনি বললেন : “মহান আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই- এ সত্য তোমার উপলব্ধির কি এখনো সময় হয় নি?” আবু সুফিয়ান তাঁর উত্তরে বলেছিল : “আমার পিতা- মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি আপনার নিজ আ'ীয়- স্বজনদের ব্যাপারে কতখানি ধৈর্যশীল, উদার এবং দয়াবান! আমি এখন বুঝেছি, যদি মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবুদ থাকত, তা হলে সে আমাদের স্বার্থে একটা কিছু অবশ্যই করত।” মহান আল্লাহর একত্বের ব্যাপারে আবু সুফিয়ানের স্বীকারোক্তির পর মহানবী বললেন : “আমি যে মহান আল্লাহর নবী, তা তোমার জানার সময় কি এখনো হয় নি?” আবু সুফিয়ান তখন পূর্বের উক্তির পুনরাবৃত্তি করে বলল : “আপনি আপনার নিজ জ্ঞাতি ও আ'ীয়- স্বজনদের ব্যাপারে কতখানি ধৈর্যশীল, উদার ও দয়াবান! আমি এখন আপনার রিসালাতের ব্যাপারেই চিন্তা করছি।” আব্বাস আবু সুফিয়ানের দ্বিধাগ্রস্ততা দেখে মর্মান্বিত হলেন এবং বললেন : “যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ না কর, তা হলে তোমার প্রাণ হুমকির সম্মুখীন হবে। তোমার উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মহান আল্লাহর একত্ব ও মুহাম্মদ (সা.)- এর রিসালাতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া।” আবু সুফিয়ান তখন মহান আল্লাহর একত্ব ও রাসূলুল্লাহর রিসালাতের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

আবু সুফিয়ান ভয়- ভীতির মাঝে ঈমান আনয়ন করেছিল এবং এ ধরনের ঈমান আনা কখনোই মহানবী (সা.) এবং তাঁর দীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল না। তবে কতিপয় কল্যাণের ভিত্তিতে আবু সুফিয়ানের মুসলমানের কাতারভুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যিক হয়ে গিয়েছিল, যাতে করে ম'ার অধিবাসীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পথে বিদ্যমান সবচেয়ে বড় বাধা এভাবে অপসারিত হয়ে যায়। কারণ আবু সুফিয়ান, আবু জাহল, ইকরামাহ, সাফওয়া ইবনে উমাইয়্যা সহ

কয়েকজনের মতো কতিপয় (প্রভাবশালী) ব্যক্তি বহু বছর ধরে (২১ বছর) এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিল এবং কোন ব্যক্তি ইসলামের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা বা এ ধর্মের প্রতি নিজের আগ্রহের কথা প্রকাশ করার সাহস পর্যন্ত পেত না। আবু সুফিয়ানের বাহ্যিক ইসলাম গ্রহণ তার নিজের জন্য সুফল বয়ে না আনলেও মহানবী (সা.) এবং যেসব ব্যক্তি তার কর্তৃত্বাধীন ছিলেন এবং তার সাথে যাঁদের আশ্রয়তার সম্পর্ক ছিল, তাঁদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর হয়েছিল।

এ সত্ত্বেও মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানকে ছেড়ে দেবার নির্দেশে প্রদান করলেন না। কারণ মদীনা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আবু সুফিয়ানের উস্কানীমূলক তৎপরতায় হাত দেয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। এ কারণে তিনি কতিপয় প্রমাণবশত একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় তাকে আটকে রাখার জন্য হযরত আব্বাসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত আব্বাস তখন মহানবীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন : “যে আবু সুফিয়ান নেতৃত্ব, মর্যাদা ও গৌরব খুব পছন্দ করে, এখন তার অবস্থা যখন এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, তখন এ মহা ঘটনা প্রবাহে তাকে (অন্তত) একটা মর্যাদা দান করুন।”

দীর্ঘ বিশ বছর যাবত আবু সুফিয়ান ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর বড় বড় আঘাত হানা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) কিছু কল্যাণের ভিত্তিতে তাকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং তাঁর মহৎ আশ্রয় পরিচায়ক ঐতিহাসিক বাক্য তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছিলেন :

আবু সুফিয়ান জনগণকে নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারবে যে, যে কেউ মসজিদুল হারামের সীমারেখার মধ্যে আশ্রয় নেবে বা মাটির উপর অস্ত্র ফেলে দিয়ে নিজের নিরপেক্ষ থাকার কথা ঘোষণা দেবে বা আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে (ভিন্ন বর্ণনা মতে হাকিম ইবনে হিয়ামের ঘরে), সে মুসলিম সেনাবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।^{৩৪৫}

পবিত্র মক্কার রক্তপাতহীন আত্মসমর্পণ

মুসলিম সেনাবাহিনী পবিত্র মাক্কায় কয়েক কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে পৌঁছে গেল। মহানবী (সা) প্রতিরোধ ও রক্তপাতের ঘটনা ছাড়াই মাক্কা নগরী জয় করতে এবং শত্রুপক্ষকে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন।

গোপনীয়তা সংরক্ষণ ও শত্রুকে অতর্কিতে আক্রমণ করে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়ার মূলনীতি ছাড়াও এ মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নের ব্যাপারে যেসব কারণ সাহায্য করেছিল এবং অনুমোদন কাজ করছিল, সেসবের মধ্যে এটাও ছিল যে, মহানবীর চাচা আব্বাস একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে কুরাইশদের কাছে যান এবং আবু সুফিয়ানকে (কৌশলে) মুসলিম সেনাশিবিরে নিয়ে আসেন। আর আবু সুফিয়ানকে ছাড়া কুরাইশ নেতারা কোন জোরালো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত না।

আবু সুফিয়ান যখন মহানবী (সা.)-এর অভূতপূর্ব মর্যাদা ও গৌরবের সামনে মাথা নত করল এবং ঈমান আনার ঘোষণা দিল, তখন মহানবী মুশরিকদের আরো হতাশাগ্রস্ত ও ভীত-সন্ত্রস্ত করার ব্যাপারে এ অবস্থার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে চাইলেন। তাই তিনি নির্দেশ দিলেন, তাঁর চাচা আব্বাস যেন আবু সুফিয়ানকে একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় আটকে রাখেন যাতে করে ইসলামের নবগঠিত সেনাবাহিনীর ইউনিটসমূহ নিজেদের বড় বড় অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি সহ তার সামনে দিয়ে প্যারেড করে যেতে পারে। এভাবে সে ইসলামের সামরিক শক্তি সম্পর্কে ধারণা পাবে এবং পবিত্র মাক্কায় ফিরে গিয়ে সেখানকার জনগণকে ইসলামের সামরিক শক্তি সম্পর্কে ভয় দেখাবে এবং তাদের মাথা থেকে প্রতিরোধের সকল চিন্তা দূর করে দেবে।

এখন ইসলামী সেনাবাহিনীর কয়েকটি ইউনিটের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো :

১. খালিদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে বনী সালীম গোত্রের এক হাজার যোদ্ধার দল। তাঁদের দু'টি পতাকা ছিল এবং এর একটি ছিল আব্বাস ইবনে মিরদাসের হাতে এবং অন্যটি মিকদাদের হাতে।

২. যুবাইর ইবনে আওয়ামের নেতৃত্বাধীন পাঁচ শ' যোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত দু'টি ব্রিগেড। তাঁর হাতে একটি কালো পতাকা ছিল। এ দু'টি ব্রিগেডের অধিকাংশ যোদ্ধাই মুহাজির ছিলেন।

৩. আবু যার গিফারীর নেতৃত্বাধীন বনী গিফার গোত্রের তিন শ' যোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত সেনাদল। আবু যারের হাতে এ দলটির পতাকা ছিল।

৪. ইয়াযীদ ইবনে খুসাইবের নেতৃত্বে বনী আসলাম গোত্রের চার শ' যোদ্ধা দ্বারা গঠিত সেনাদল। এ দলের পতাকা ইয়াযীদ ইবনে খুসাইবের হাতে ছিল।

৫. বাশার বিন সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন বনী কা'ব গোত্রের পাঁচ শ' যোদ্ধার দল। এ দলের পতাকা বাশার বিন সুফিয়ান বহন করছিলেন।

৬. মুয়াইনা গোত্রের এক হাজার যোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত দল। এর তিনটি পতাকা ছিল। এ সব পতাকা নুমান ইবনে মাকরা, বিলাল ইবনুল হারিস ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর বহন করছিলেন।

৭. জুহাইনাহ গোত্রের আট শ' যোদ্ধার দল। এর চারটি পতাকা যথাক্রমে মা' বাদ ইবনে খালিদ, নুওয়াইদ ইবনে সাখরা, রা'ফে ইবনে মালীস ও আবদুল্লাহ ইবনে বাদর বহন করছিলেন।

৮. আবু ওয়াকিদ লাইসীর নেতৃত্বে বনী কিনানাহ, বনী লাইস ও যামরাহ গোত্রের আট শ' যোদ্ধার দু'টি দল এবং তাদের পতাকা আবু ওয়াকিদ লাইসীর হাতে ছিল।

৯. বনী আশজা' গোত্রের তিন শ' যোদ্ধার দল, যার দু'টি পতাকার একটি মাকাল ইবনে সিনান ও অপরটি নাঈম ইবনে মাসউদের হাতে ছিল।^{৩৪৬}

এ সেনা ইউনিট লো আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার সময় সে সাথে সাথে হযরত আব্বাসকে সেনা ইউনিট লোর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করছিল এবং তিনিও বেশ উত্তর দিচ্ছিলেন।

যে বিষয়টি এ সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর গৌরব বৃদ্ধি করেছিল, তা ছিল এই, যখনই আব্বাস ও আবু সুফিয়ানের সামনে সেনা ইউনিটসমূহের অধিনায়কগণ প্যারেড করে উপস্থিত হচ্ছিলেন, তখনই তাঁরা তিন বার উচ্চকণ্ঠে তাকবীর দিচ্ছিলেন এবং ইউনিটসমূহের সৈনিকরাও

অধিনায়কদের তাকবীর দেবার পরপরই সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী গান হিসেবে তিন বার উচ্চকণ্ঠে তাকবীর দিতে থাকেন। এ তাকবীর পবিত্র মাহনগরীর উপত্যকাসমূহে এতটা প্রতিধ্বনিত হয় যে, তা মিত্রদের ইসলাম ধর্মের প্রতি আরো অনুরাগী করে তুলে এবং শত্রুদের অন্তর বিদীর্ণ করে ও তাদেরকে ভয়-ভীতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে।

আবু সুফিয়ান একেবারে ধৈর্যহারা হয়ে এমন এক সেনা ইউনিটকে দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল যার মাঝে মহানবী (সা.) থাকবেন। তাই তার সামনে দিয়ে প্রতিটি ইউনিট কুচকাওয়াজ করে অতিক্রম করার সময় হযরত আব্বাসকে জিজ্ঞেস করছিল : “মুহাম্মদ কি এ ইউনিটের মধ্যে আছেন?” তিনি জবাবে বলছিলেন : “না।” অবশেষে এক বিশাল সেনাদল যার সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার, আব্বাস ও আবু সুফিয়ানের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। উল্লেখ্য, এ সেনাদলে বর্ম পরিহিত দু’হাজার সৈন্য ছিল এবং এক নির্দিষ্ট দূরত্বে অসংখ্য পতাকা সেনাদলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের অধিনায়কদের হাতে ছিল। এ সেনা ইউনিটটির নাম ছিল ‘আল কাতীবাতুল খাদরা’ অর্থাৎ ‘সবুজ ব্রিগেড’ যা আপাদমস্তক সশস্ত্র ও যুদ্ধের উপকরণ দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। এ সেনাদলের সৈন্যদের পুরো দেহ বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। কেবল তাদের উজ্জ্বল চোখ লো ছাড়া দেহের আর কোন কিছু দেখা যাচ্ছিল না। এ সেনাদলের মধ্যে তগামী আরবী ঘোড়া ও লাল পশমের উট বেশি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।

মহানবী (সা.) এ সেনাদলের মাঝখানে তাঁর বিশেষ উটের উপর সওয়ার হয়ে পথ চলছিলেন এবং বড় বড় আনসার ও মুহাজির সাহাবী তাঁর চারপাশ ঘিরে রেখেছিলেন। মহানবী তখন তাঁদের সাথে কথোপকথন করছিলেন।

এ সেনাদলের মর্যাদা ও গৌরব আবু সুফিয়ানকে এতটা ভীত করেছিল যে, সে নিজের অজান্তেই আব্বাসের দিকে তাকিয়ে বলে ফেলল : “এ সেনাবাহিনীর সামনে কোন শক্তিই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে না। আব্বাস! তোমার তুপ্পুত্রের রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।”

আব্বাস এ কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে তিরস্কার করে বললেন : “আমার াতুপ্পুত্রের ক্ষমতা ও শক্তির উৎস মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নবুওয়াত ও রিসালাত; আর পার্থিব শক্তি লোর সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই।”

মক্কার পথে আবু সুফিয়ান

এ পর্যন্ত আব্বাস তাঁর ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করেন এবং আবু সুফিয়ানকে মহানবীর সামরিক শক্তি সম্পর্কে সন্ত্রস্ত করে তোলেন। এ সময় মহানবী আবু সুফিয়ানকে মুক্ত করে দেয়ার মধ্যেই কল্যাণ দেখতে পেলেন। কারণ পবিত্র ম া নগরীতে ইসলামী সেনাবাহিনী প্রবেশ করার আগেই সে সেখানে পৌঁছে সেখানকার অধিবাসীদের মুসলমানদের অস্বাভাবিক শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত করবে এবং তাদেরকে সম্ভাব্য মুক্তির পথও দেখাবে। মুক্তির পথ দেখানো ছাড়া কেবল জনগণকে ভয় দেখানোর মাধ্যমে মহানবীর লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে না।

আবু সুফিয়ান ম া নগরীতে ফিরে গেল। জনগণ- যারা আগের রাত থেকেই তীব্র অস্থিরতা ও ভীতির মধ্যে ছিল এবং তার সাথে পরামর্শ না করে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না- তার চারপাশে জড়ো হলো। সে ফ্যাকাসে মুখে কাঁপতে কাঁপতে মদীনার দিকে ইশারা করে জনগণের দিকে তাকিয়ে বলল :

“ দুর্নিবার ইসলামী সেনাবাহিনীর ইউনিটসমূহ পুরো শহর ঘিরে ফেলেছে এবং কিছু সময়ের মধ্যেই শহরে প্রবেশ করবে। তাদের অধিনায়ক ও নেতা মুহাম্মদ আমাকে কথা দিয়েছেন, যে কেউ মসজিদ ও পবিত্র কাবার প্রাঙ্গণে আশ্রয় নেবে বা মাটিতে অস্ত্র ফেলে দিয়ে নিরপেক্ষভাবে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে অথবা আমার বা হকীম ইবনে হিয়ামের ঘরে প্রবেশ করবে, তার জান- মাল সম্মানিত বলে গণ্য হবে এবং বিপদ থেকে রক্ষা পাবে।”

মহানবী (সা.) শুধু এটুকুকেও পর্যাপ্ত মনে করেন নি। পবিত্র ম া নগরীতে প্রবেশ করার পর এ তিন ধরনের আশ্রয়স্থল ছাড়াও আবদুল্লাহ ইবনে খাসআমীর হাতে একটি পতাকা দিয়ে নির্দেশ দিলেন, যেন তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতে থাকেন যে, যে কেউ তাঁর পতাকাতলে সমবেত হবে সেও নিরাপত্তা লাভ করবে।^{৩৪৭}

আবু সুফিয়ান এ বাণী ঘোষণা করার মাধ্যমে পবিত্র ম া র অধিবাসীদের মনোবল এতটা দুর্বল করে দেয় যে, কোন দলের মধ্যে প্রতিরোধ মনোবৃত্তি অবশিষ্ট থাকলেও সার্বিকভাবে তা বিলুপ্ত

হয়ে যায় এবং বিগত রাত থেকে হযরত আব্বাসের মাধ্যমে যে সব পূর্বপ্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল, তা বাস্তবায়িত হয়। আর বস্তুবাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে কুরাইশদের বিনা প্রতিরোধে ম া বিজয় একটা সন্দেহাতীত বিষয় হয়ে যায়। জনগণ ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে যে যেখানে পারল সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিল এবং পুরো শহর জুড়ে ছোটোছুটি, পলায়ন ও আশ্রয় গ্রহণ চলতে লাগল। এভাবে মহানবী (সা.)- এর প্রাজ্ঞ পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে ইসলাম ধর্মের প্রধান শত্রু ইসলামী সেনাবাহিনীর অনু লে সবচেয়ে বড় সেবাটি আনজাম দিয়েছিল।

ইত্যবসরে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ ম াবাসীদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছিল এবং তার স্বামীর প্রতি অত্যন্ত অশোভন উক্তি করছিল। কিন্তু এতে কোন কাজ হয় নি। সব ধরনের চিৎকার আসলে কামারের নেহাইয়ের ওপর মুষ্টিবদ্ধ আঘাতস্বরূপ ছিল। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা, ইকারামাহ ইবনে আবী জাহল এবং সুহাইল ইবনে আমরের (হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে কুরাইশদের বিশেষ প্রতিনিধি) মতো কতিপয় উগ্রবাদী কুরাইশ নেতা শপথ করল, তারা পবিত্র ম া নগরীতে ইসলামী বাহিনীর প্রবেশে বাধা দেবে। আর একদল ম াবাসীও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে খোলা তলোয়ার হাতে ইসলামী সেনাবাহিনীর প্রথম ইউনিটের প্রবেশের পথে বাধা দেয়।

পবিত্র মক্কা নগরীতে ইসলামী সেনাবাহিনীর প্রবেশ

পবিত্র মক্কা নগরীর সড়কসমূহে ইসলামী বাহিনী প্রবেশ করার আগেই মহানবী (সা.) সকল সেনাপতিকে উপস্থিত করে বলেছিলেন : “বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয়ের জন্যই হচ্ছে আমার সকল চেষ্টা- প্রচেষ্টা। তাই নিরীহ জনগণকে হত্যা থেকে তোমাদের অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। তবে ইকরামাহ্ ইবনে আবী জাহল, হাব্বার ইবনে আসওয়াদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে সা'দ ইবনে আবী সারাহ্, মিকয়াস্ হুবাবাহ্ লাইসী, হুয়াইরিস ইবনে নুকাইয, আবদুল্লাহ্ ইবনে খাতাল, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ্, হযরত হামযার ঘাতক ওয়াহশী ইবনে হারব, আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইরী এবং হারিস ইবনে তালাতিলাহ্ নামের দশ জন পুরুষ এবং চার মহিলাকে যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই তাদের হত্যা করতে হবে। উল্লেখ্য, এ দশ ব্যক্তির প্রত্যেকেই হত্যা ও অপরাধ করেছিল বা (ইসলামের বিরুদ্ধে) অতীত যুদ্ধে লোর আন জ্বালিয়েছিল।

এ নির্দেশ সেনাপতি ও সামরিক অধিনায়কগণ তাঁদের নিজ নিজ সকল সৈন্যের কাছে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর কাছে মক্কাবাসীদের আঁক অবস্থা স্পষ্ট হলেও পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করার সময় তিনি সামরিক সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সতর্কতামূলক পরিকল্পনা ছিল এরূপ :

সকল সামরিক ইউনিট এক পথে যী তুওয়ায় পৌঁছে। যী তুওয়ায় একটি উঁচু স্থান, যেখান থেকে পবিত্র মক্কা নগরী, বাইতুল্লাহ্ (কাবা) এবং মসজিদুল হারাম দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সময় মহানবী (সা.) পাঁচ হাজার সৈন্যের একটি সেনা-ব্রিগেড দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। মহানবীর দৃষ্টি পবিত্র মক্কার ঘর-বাড়ি লোর উপর পড়লে তাঁর দু'চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে যায় এবং কুরাইশদের প্রতিরোধ ছাড়াই যে মহান বিজয় অর্জিত হয়েছে, সেজন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মাথা এতটানত করেন যে, তাঁর পবিত্র শূশ্রা উটের উপর স্থাপিত গদি স্পর্শ করেছিল। তিনি সতর্কতা অবলম্বন স্বরূপ তাঁর সেনাবাহিনীকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করেছিলেন। একটি অংশকে পবিত্র মক্কার উঁচু অংশ দিয়ে এবং আরেকটি অংশকে পবিত্র মক্কার নিম্নভূমি দিয়ে পরিচালনা

করেছিলেন। এতটুকু করেও তিনি ক্ষান্ত হন নি। তিনি শহরগামী সকল সড়ক থেকে বেশ কয়েকটি সেনা ইউনিট শহরের দিকে প্রেরণ করেন। সকল সেনা ইউনিট সংঘর্ষ ছাড়াই পবিত্র ম া নগরীতে প্রবেশ করে এবং ঐ সময় শহরের দ্বার লো উন্মুক্ত ছিল। তবে খালিদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বাধীন সেনা ইউনিটের প্রবেশপথের দ্বারে ইকরামাহ ও সুহাইল ইবনে আমরের প্ররোচনায় এক দল লোক মুসলিম সেনা ইউনিটটির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তারা তীর নিক্ষেপ ও তরবারি সঞ্চালন করে মুসলিম সেনা ইউনিটটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল। তবে তাদের বারো বা তের জন নিহত হলে প্ররোচনাকারীরা পালিয়ে যায় এবং অন্যরাও পলায়নে বাধ্য হয়।^{৩৪৮} আবারও আবু সুফিয়ান এ ঘটনায় নিজের অজান্তেই ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের অনু লে কাজ করেছিল। তখনও ভয়- ভীতি তাকে ঘিরে রেখেছিল এবং সে ভালোভাবে জানত যে, বাধাদান কেবল ক্ষতিই বয়ে আনবে। তাই রক্তপাত এড়ানোর জন্য সে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগল : “কুরাইশ গোত্র! তোমরা তোমাদের জীবন বিপদের সমুখীন করো না। কারণ, মুহাম্মদের সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও প্রতিরোধে আসলেই কোন ফায়দা হবে না। তোমরা মাটিতে অস্ত্র ফেলে দিয়ে নিজেদের ঘর- বাড়িতে বসে থাক এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও বা মসজিদুল হারাম ও পবিত্র কাবার প্রাঙ্গণে আশ্রয় নাও। তা হলে তোমাদের জীবন বিপদ থেকে রক্ষা পাবে।” আবু সুফিয়ানের এ বক্তব্য কুরাইশদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। তাই একদল কুরাইশ নিজেদের ঘর- বাড়িতে এবং আরেক দল মসজিদুল হারামের প্রাঙ্গণে আশ্রয় নিয়েছিল।

মহানবী (সা.) আযাখির নামক একটি স্থান থেকে খালিদ ইবনে ওয়ালীদের সেনা ইউনিটের সৈন্যদের তরবারি পরিচালনায় সৃষ্ট ঝলকানির দ্যুতি- যা তখন উঠা- নামা করছিল, - দেখতে পেলেন এবং সংঘর্ষের কারণ জানতে পেয়ে বললেন : قضاء الله خير “মহান আল্লাহর ফয়সালাই সর্বোত্তম।”

মহানবী (সা.)- কে বহনকারী উট পবিত্র ম া নগরীর সবচেয়ে উঁচু এলাকা দিয়ে নগরীতে প্রবেশ করে এবং হুজুন এলাকায় মহানবীর চাচা হযরত আবু তালিবের কবরের পাশে এসে থামে।

বিশ্রাম করার জন্য এখানে একটি বিশেষ তাঁবু স্থাপন করা হয়। কারো বাড়িতে থাকার জন্য জোর
অনুরোধ করা হলেও মহানবী তা গ্রহণ করেন নি।

মূর্তি ভাঙ্গা ও পবিত্র কাবা ধোয়া

যে মাদ্রাসা নগরী বহু বছর যাবত শিরক ও মূর্তিপূজার ঘাঁটি ছিল, তা তাওহীদী আদর্শের (ইসলাম) সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং এ নগরীর সকল অঞ্চল ইসলামের সৈনিকদের অধিকারে আসে। ‘হুজুন’ নামক স্থানে মহানবী (সা.) তাঁর জন্য খাটানো তাঁবুতে কিছু সময় বিশ্রাম করেন। এরপর তিনি উটের পিঠে আরোহণ করে মহান আল্লাহর ঘর (কাবা) যিয়ারত ও তাওয়াফ করার জন্য মসজিদুল হারামের দিকে রওয়ানা হন। তিনি যুদ্ধের পোশাক ও শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিলেন এবং আনসার ও মুহাজিরগণ খুব মর্যাদার সাথে তাঁকে ঘিরে রেখেছিলেন। মহানবীর উটের লাগাম মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার হাতে ছিল এবং তাঁর চলার পথের দু’ধারে মুসলিম ও মুশরিকরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। একদল ক্রোধে ও ভীতিজনিত কারণে হতবাক হয়ে গিয়েছিল এবং আরেক দল আনন্দ প্রকাশ করছিল। মহানবী কতিপয় কারণে উটের পিঠ থেকে নামলেন না এবং উটের পিঠে আরোহণ করেই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন। হাজারে আসওয়াদের (কালো পাথর) সামনে স্থিত হয়ে হাত দিয়ে হাজারে আসওয়াদ ছোঁয়ার পরিবর্তে তাঁর হাতে যে বিশেষ ছড়ি ছিল, তা দিয়ে হাজারে আসওয়াদের দিকে ইশারা করে তাকবীর দিলেন।

মহানবী (সা.)-এর চারপাশ ঘিরে প্রদীপের চারপাশে ঘূর্ণনরত পতঙ্গের মতো আবর্তিত সাহাবীগণ মহানবীকে অনুসরণ করে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দিলেন। তাঁদের তাকবীর-ধ্বনি মাদ্রাসার মুশরিকদের কানে পৌঁছলে তারা নিজেদের বাড়ি এবং উঁচু এলাকা লোয় গিয়ে আশ্রয় নিল। মসজিদুল হারামে এক অভিনব শোরগোল প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং জনগণের তুমুল হর্ষধ্বনির কারণে মহানবী প্রশান্ত মনে ও চিন্তামুক্তভাবে তাওয়াফ করতে পারছিলেন না। জনগণকে শান্ত করার জন্য মহানবী তাদের দিকে এক ইশারা করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র মসজিদুল হারাম জুড়ে সুমসাম নীরবতা নেমে এলো। এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন বুকের মধ্যে বন্দী হয়ে গিয়েছিল (অর্থাৎ মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছিল না)। মসজিদুল হারামের ভেতরে

ও বাইরে অবস্থানরত জনতার দৃষ্টি তখন তাঁর দিকে নিবদ্ধ ছিল। তিনি তাওয়াফ শুরু করলেন। তাওয়াফের প্রথম পর্যায়েই পবিত্র কাবার দরজার উপর স্থাপিত হুবালা, ইসাফ ও নায়েলা নামের কতিপয় বড় বড় প্রতিমার উপর মহানবী (সা.)- এর দৃষ্টি পড়লে তিনি হাতের বর্শা দিয়ে দৃঢ়ভাবে আঘাত করে ঐ প্রতিমা লো মাটিতে ফেলে দিলেন এবং নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন :

(قل جاء الحق و زهق الباطل إِنَّ الباطل كان زهوقاً)

“ আপনি বলে দিন : সত্য (গৌরবের সাথে ও বিজয়ী বেশে) প্রকাশিত হয়েছে এবং মিথ্যা ধ্বংস হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা (প্রথম থেকেই) ভিত্তিহীন ছিল।” (সূরা বনী ইসরাঈল)

মহানবী (সা.)- এর নির্দেশে মুশরিকদের চোখের সামনেই হুবালের প্রতিমা ভেঙে ফেলা হলো। এ বড় মূর্তিটি- যা বছরের পর বছর ধরে আরব উপদ্বীপের জনগণের চিন্তা-চেতনার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল, - তাদের চোখের সামনে ভুলুষ্ঠিত হয়ে গেল। ঠা া করে যুবাইর আবু সুফিয়ানের দিকে মুখ তুলে বললেন : “হুবালা- এ বড় প্রতিমা ভেঙে ফেলা হলো।”

আবু সুফিয়ান অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে যুবাইরকে বলেছিল : “আমাদের থেকে হাত উঠিয়ে নাও তো (অর্থাৎ এ ধরনের কথা আর বলো না)। হুবালের দ্বারা যদি কোন কাজ হতো, তা হলে পরিণামে আমাদের ভাগ্য এমন হতো না।” আর সে বুঝতে পেরেছিল, তাদের ভাগ্য আসলে কখনোই তার হাতে ছিল না।

তাওয়াফ শেষ হলে মহানবী মসজিদুল হারামের এক কোণে একটু বসলেন। তখন পবিত্র কাবার চাবিরক্ষক ছিল উসমান ইবনে তালহা এবং এ পদটি তার বংশে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বহাল ছিল। মহানবী (সা.) হযরত বিলালকে উসমানের ঘরে গিয়ে পবিত্র কাবার চাবি নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিলেন। বিলাল চাবিরক্ষকের কাছে মহানবীর নির্দেশবার্তা পৌঁছে দিলেন। কিন্তু তার মা তাকে মহানবীর কাছে চাবি হস্তান্তরে বাধা দিল এবং বলল : “পবিত্র কাবার চাবি রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের বংশীয় গৌরব এবং আমরা কখনই এ গৌরব হাতছাড়া হতে দেব না।” উসমান মায়ের হাত ধরে নিজের বিশেষ কক্ষে নিয়ে গিয়ে বলল : “আমরা যদি নিজ ইচ্ছায় চাবি না দিই, তা হলে তুমি নিশ্চিত থেকে, বলপ্রয়োগ করে আমাদের থেকে তা নিয়ে নেয়া হবে।” ৩৪৯

চাবিরক্ষক এসে পবিত্র কাবার তালা খুলে দিল। মহানবী (সা.) মহান আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর পেছনে উসামাহ ইবনে যায়েদ ও বিলাল প্রবেশ করলেন এবং স্বয়ং চাবিরক্ষকও প্রবেশ করলো। মহানবী (সা.)- এর নির্দেশে পবিত্র কাবার দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ পবিত্র কাবার সামনে দাঁড়িয়ে জনতাকে দরজার সামনে ভীড় করা থেকে বিরত রাখছিলেন। পবিত্র কাবার অভ্যন্তরীণ প্রাচীর নবীগণের চিত্রকলা দিয়ে পূর্ণ ছিল। মহানবী (সা.)- এর নির্দেশে কাবার প্রাচীর লো যমযম পের পানি দিয়ে ধোয়া হলো এবং কাবার দেয়ালে যে সব চিত্র ছিল, সে লো উঠিয়ে এনে ধ্বংস করা হলো।

মহানবী (সা.)- এর কাঁধে হযরত আলী (আ.)

মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ বলেন : “পবিত্র কাবার ভেতরে বা বাইরে স্থাপিত কিছু প্রতিমা হযরত আলী (আ.) ধ্বংস করেছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আলীকে বললেন : “আলী! তুমি বসে পড়, আমি তোমার কাঁধে উঠে প্রতিমা লো ধ্বংস করব।” হযরত আলী (আ.) পবিত্র কাবার প্রাচীরের পাশে মহানবীকে নিজ কাঁধে উঠালেন। কিন্তু তিনি বেশ ভার ও দুর্বলতা অনুভব করতে লাগলেন। তখন মহানবী হযরত আলীর অবস্থা বুঝতে পেরে তাঁকে কাঁধে উঠার নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী মহানবীর কাঁধে উঠলেন এবং তামা দিয়ে নির্মিত কুরাইশদের সর্ববৃহৎ মূর্তি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। এরপর তিনি অন্যান্য মূর্তিও মাটির উপর ফেলতে লাগলেন।^{৩৫০}

হিজরী নবম শতকের কবিদের অন্তর্ভুক্ত হিল্লার সুবক্তা কবি ইবনে আরান্দাস এ ফযীলত প্রসঙ্গে এক কাসীদায় বলেছেন :

و صُغُوذُ غَارِبِ أَحْمَدَ فَضْلًا لَهُ دُونَ الْقَرَائِمِ وَالصَّحَابَةِ أَفْضَلًا

“ আহমদের কাঁধের উপর আরোহণ তাঁর (আলীর) একটি ফযীলত। আর এ ফযীলত (মহানবীর সাথে) তাঁর আদীত্যতা ও সাহচর্য অপেক্ষাও শ্রেয়।”

মহানবী (সা.)- এর নির্দেশে পবিত্র কাবার দরজা খোলা হলো। তখন তিনি কাবার দরজার উপর হাত রেখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং জনতা তাঁর উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে তাকাচ্ছিল। ঐ অবস্থায় জনগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন :

الحمد لله الذى صدق وعده و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده

“ ঐ মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছেন, নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং নিজেই সকল দল ও গোষ্ঠীকে পরাজিত করেছেন।”

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের একখানা আয়াতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি মহানবীকে তাঁর আপন মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন। এ আয়াত হলো :

(إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ)

“ যিনি আপনার ওপর এ কুরআনের বিধান পাঠিয়েছেন (এবং এ কুরআন প্রচার করতে গিয়ে আপনি নিজ দেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন), তিনিই আপনাকে মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন।” (সূরা কাসাস : ৮৫)

‘ মহান আল্লাহ নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন’ - এ কথা বলার মাধ্যমে মহানবী (সা.) এ গায়েবী প্রতিশ্রুতি যে বাস্তবায়িত হয়েছে, সে ব্যাপারে সবাইকে অবগত করলেন। এভাবে আবারও তিনি তাঁর সত্যবাদিতার কথা প্রমাণ করলেন।

মসজিদুল হারামের প্রাঙ্গণ ও এর বাইরে সর্বত্র নীরবতা বিরাজ করছিল। শ্বাস-প্রশ্বাস যেন বুকের মধ্যে আটকে গিয়েছিল এবং জনগণের মন-মস্তিষ্কের ওপর বিভিন্ন ধরনের চিন্তা-ভাবনা প্রভাব বিস্তার করেছিল। মাবাসী ঐ মুহূর্ত লোয় নিজেদের ঐ সকল অন্যায়, অত্যাচার ও শত্রুতামূলক আচরণের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা করছিল।

এখন ঐ গোষ্ঠী, - যারা বহু বার মহানবীর বিরুদ্ধে রক্তাক্ত যুদ্ধ বাঁধিয়ে তাঁর তরুণ অনুসারী ও সাহাবীগণকে হত্যা করেছিল এবং অবশেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, রাতের আঁধারে তাঁর বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাঁকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে, - এখন তারাই তাঁর শক্তিশালী হাতের মুঠোয় বন্দী হয়ে গেছে এবং মহানবীও তাদের ওপর যে কোন ধরনের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন।

এ লোক লো নিজেদের বড় বড় অপরাধের কথা স্মরণ করে পরস্পর বলাবলি করছিল : “তিনি অবশ্যই আমাদের সবাইকে হত্যা করবেন বা কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে হত্যা এবং কিছুসংখ্যককে বন্দী করবেন। আর তিনি আমাদের নারী ও শিশুদেরও দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করবেন।”

তাদের বিভিন্ন শয়তানী চিন্তায় ব্যস্ত থাকাকালে হঠাৎ মহানবী (সা.) এ কথার মাধ্যমে সকল নীরবতার অবসান ঘটালেন। তিনি বললেন : ماذا تقولون؟ و ماذا تظنون؟ “তোমাদের বক্তব্য কী? কী ধারণা করছ?”

তখন জনগণ হতবাক, অস্থির ও ভীত হয়ে ভাঙা- ভাঙা ও কাঁপা কণ্ঠে মহানবীর সুমহান দয়া, মমত্ববোধ ও আবেগ- অনুভূতির কথা স্মরণ করে বলেছিল : “আমরা আপনার ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করা ছাড়া আর কিছুই ভাবছি না। আমরা আপনাকে আমাদের ‘মহান ভাই’ এবং ‘মহান ভাইয়ের সন্তান’ ছাড়া আর কিছুই মনে করি না।” তাদের আবেগপূর্ণ এ কথা লোর মুখোমুখি হলে স্বভাবগতভাবেই দয়ালু, ক্ষমাশীল ও উদার মহানবী (সা.) বললেন : “আমার ভাই ইউসুফ তাঁর অত্যাচারী ভাইদের যে কথা বলেছিলেন, আমিও তোমাদের সে একই কথা বলব :

(لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم و هو أرحم الراحمين)

আজকের এ দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই; মহান আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন এবং তিনি সবচেয়ে দয়ালু।” (সূরা ইউসুফ : ৯২)

মহানবীর কালাম উচ্চারণের আগে যে বিষয়টি মাবাসীদের বেশ আশাবাদী করেছিল, তা ছিল, মাবাসী নগরীতে প্রবেশ করার সময় একজন মুসলিম সেনা কর্মকর্তা যে গানটি দিয়েছিলেন তার প্রতি মহানবী তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। সে সময় ঐ সেনা কর্মকর্তা বলছিলেন :

اليوم يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ اليَوْمُ تَسْتَحِلُّ الْحَرَمَةَ

“ আজ যুদ্ধের দিন; আজ তোমাদের জান- মাল হালাল গণ্য হবে (তোদেরকে হত্যা ও তাদের ধন- সম্পদ লুণ্ঠন করা হবে)।” মহানবী (সা.) এ ধরনের কবিতা ও গান শুনে খুবই মর্মান্বিত হয়েছিলেন এবং তিনি ঐ সেনা কর্মকর্তার হাত থেকে পতাকা কেড়ে নিয়ে তাঁকে সেনানায়কের

পদ থেকে অপসারণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত আলী (আ.) তাঁর কাছ থেকে পতাকা নেয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। আরেকটি বর্ণনা মতে, ঐ সেনা কর্মকর্তার পুত্র তাঁর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পিতার হাত থেকে পতাকা গ্রহণ করেছিল। এ সেনা কর্মকর্তা ছিলেন খায়রাজ গোত্রপতি সাদ ইবনে উবাদাহ্। এ ধরনের দয়র্দ্র আচরণ, - তাও আবার মার পরাজিত অধিবাসীদের চোখের সামনে- তাদেরকে মহানবীর পক্ষ থেকে সাধারণ ক্ষমা পাওয়ার ব্যাপারে বেশ আশাবাদী করে তুলেছিল। আর সেই মুহূর্তে আবু সুফিয়ান বাইতুল্লাহ্- এ বা আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেয়া বা নিজেদের বাড়িতে দরজা বন্ধ করে অবস্থান রত একদল লোককে নিরাপত্তা প্রদানের ঘোষণা করে।^{৩৫১}

মহানবী (সা.)- এর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

মহানবী (সা.) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বলেন : “তোমরা, হে লোকসকল! অত্যন্ত অনুপযুক্ত স্বদেশবাসী আমাকে আমার বাস্তুভিটা থেকে বহিষ্কার করেছিলে। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলে। কিন্তু এত অপরাধ সত্ত্বেও তোমাদের আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি এবং তোমাদের পা থেকে দাসত্বের শৃঙ্খল আমি খুলে দিচ্ছি ও ঘোষণা করছি :

إذهبوا فأنتم الطلقاء

- যাও, তোমরা মুক্ত জীবন যাপন কর; কারণ তোমরা সবাই মুক্ত।” ৩৫২

হযরত বিলালের আযান

যুহরের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্মের মুয়াযিন (বিলাল) পবিত্র কাবার ছাদে উঠে ঐ সাধারণ সমাবেশে সমগ্র জনতার কানে বলিষ্ঠ কণ্ঠে তাওহীদ ও রিসালাতের ধ্বনি পৌঁছে দিলেন। এক ঐ মুশরিকরা সবাই যে যার মতো মন্তব্য করছিল। তাদের একজন বলল : “অমুকের জন্য সাধুবাদ; কারণ সে মারা গেছে বলেই তাকে আর আযানের ধ্বনি শুনতে হলো না।” ইত্যবসরে আবু সুফিয়ান বলল : “আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলব না। কারণ মুহাম্মদের গোয়েন্দা সংস্থা এত শক্তিশালী যে, আমি ভয় পাচ্ছি মসজিদের এ সব ধূলিকণাও আমাদের কথা- বার্তা তাকে অবগত করবে।”

এ অবিবেচক বৃদ্ধ (আবু সুফিয়ান), জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যার অন্তর ইসলামের আলোয় উজ্জ্বল ও আলোকিত হয় নি, গায়েবী ইলাহী জগৎ থেকে তথ্য লাভ ও বাস্তবতাসমূহ অবগত হওয়া এবং পার্থিব জগতের অত্যাচারী গুচরবৃত্তি অভিন্ন বলেই মনে করত এবং এ দু’টি বিষয়কে লিয়ে ফেলেছিল। গায়েবী বিষয়াদি সম্পর্কে মহানবী (সা.)- এর অবগত হওয়া এমন এক বিষয় যা স্বাভাবিক জাগতিকতার গঞ্জির বাইরে। অন্যদিকে গোপন অবস্থা সম্পর্কে রাজনীতিজ্ঞদের অবগতি ভিন্ন একটি বিষয়, যা কোন গোষ্ঠী বা দলকে কাজে লাগিয়ে তারা অর্জন করে থাকে।

মহানবী (সা.) যুহরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে পবিত্র কাবার চাবি তাঁকে দিয়ে বললেন : “এ পদ তোমাদের বংশের সাথেই সংশ্লিষ্ট এবং তা তোমাদের বংশের জন্যই সংরক্ষিত থাকবে।” মহানবীর কাছ থেকে এ ছাড়া অন্য কিছু আশা করারও ছিল না। ইনি সেই নবী, যিনি মহান আল্লাহর কাছ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত হন জনগণের মাঝে ঘোষণা করার জন্য :

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا)

“ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তোমাদেরকে প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।” (সূরা নিসা : ৫৮)

এমন নবীই এ ধরনের মহা আমানত উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে অবশ্যই অগ্রগামী হবেন। তিনি কখনই সামরিক ক্ষমতা ও বাহুবলের দ্বারা জনগণের অধিকার পদদলিত করেন না এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জনগণকে বলেন : “পবিত্র কাবার চাবি রক্ষণাবেক্ষণ ইবনে তালহার সুনিশ্চিত অধিকার এবং এ ক্ষেত্রে আর কোন ব্যক্তির কোন অধিকার নেই।”

ইত্যবসরে মহানবী (সা.) পবিত্র কাবা সংক্রান্ত সকল পদ বিলুপ্ত করেন। তবে যে সব পদ জনগণের জন্য কল্যাণকর, কেবল সেসব, যেমন পবিত্র কাবার চাবি রক্ষণাবেক্ষণ, পবিত্র কাবার উপর পর্দা বা গিলাফ দেয়া ও হাজীগণকে খাবার পানি সরবরাহ করার পদ ইত্যাদি বহাল রাখেন।

আত্মীয়- স্বজনদের প্রতি মহানবী (সা.)- এর নসীহত

মহানবী (সা.)- এর নিকটায় যাবত যাবে অবগত হন যে, মহানবীর সাথে তাঁদের আত্মীয়তা ও রক্ত- সম্পর্ক তাঁদের কাঁধ থেকে কোন বোঝা তো লাঘব করেই নি; বরং তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে আরো ভারী করেছে, এ কারণেই মহানবী এক ভাষণ দেন, যাতে করে তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, তাঁর সাথে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক যেন ইসলামী রীত- নিয়ম- কানুন অবমাননা ও উপেক্ষা করার কারণ না হয় এবং রা প্রধানের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার সুবাদে তাঁরা যেন কোন ধরনের অসৎ সুযোগ- সুবিধা গ্রহণ না করেন। তাই তিনি হাশিম ও আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের এক সমাবেশে যে কোন ধরনের অবৈধ বৈষম্যের তীব্র নিন্দা এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন:

“ হে হাশিম ও আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! আমি তোমাদের কাছেও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল এবং আমার ও তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও মমতার বন্ধন অটুট। তবে তোমরা ভেবো না যে, কিয়ামত দিবসে কেবল আত্মীয়তার এ সম্পর্ক তোমাদের মুক্তি দিতে সক্ষম। এ কথাটা তোমাদের সবার জানা থাকা উচিত, তোমাদের ও অন্যদের মধ্যে আমার বন্ধু হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে খোদাতীরা এবং যারা কিয়ামত দিবসে ভারী পাপের বোঝা নিয়ে মহান আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে, তাদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং কিয়ামত দিবসে আমার দ্বারা কোন উপকারই সাধিত হবে না। আর আমি ও তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের জন্য (মহান আল্লাহর কাছে) দায়বদ্ধ (وَأَنْ لِّيْ عَمَلِيْ وَ لَكُمْ عَمَلِكُمْ) ” ৩৫৩

মসজিদুল হারামে মহানবী (সা.)- এর ঐতিহাসিক ভাষণ

মসজিদুল হারামে বাইতুল্লাহর চারপাশে এক বিশাল ও মহতী গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মুসলমান ও মুশরিক- শত্রু- মিত্র সবাই পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল এবং ইসলাম ধর্মের মহত্ত্ব ও মহানবী (সা.)- এর মহানুভবতা মসজিদুল হারামকে ঘিরে রেখেছিল। সমগ্র মাদিনার ওপর প্রশান্তির ছায়া বিস্তৃতি লাভ করেছিল। আর তখন মহানবী (সা.)- এর প্রকৃত দাওয়াতের রূপ জনগণের সামনে উপস্থাপন করারও যথার্থ সময় এসে গিয়েছিল। মহানবী (সা.) যে কথা বিশ বছর আগে বলা শুরু করেছিলেন এবং মুশরিকদের অপকর্ম ও দুর্বৃত্তপনার কারণে তা সম্পাদন করতে সক্ষম হন নি, তা আজ সম্পন্ন করার সময় এসে গেল।

মহানবী (সা.) স্বয়ং ঐ পরিবেশেরই সন্তান ছিলেন এবং আরব সমাজের দুঃখ- বেদনা এবং এর উপশম সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ পরিচিতি ও জ্ঞান ছিল। তিনি জানতেন, পবিত্র মাদিনার অধিবাসীদের অধঃপতনের কারণ কী? এ কারণেই তিনি আরব সমাজের ব্যথা- বেদনা লোর উপর হাত বুলিয়ে এ সব বিরানকারী ব্যাধি পূর্ণরূপে নিরাময়ের সংকল্প ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

এখানে আমরা মহানবীর ভাষণের কতক বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক উপস্থাপন করব। উল্লেখ্য, এ ভাষণের প্রতিটি অংশ (মানব জাতির) এক একটি ব্যাধি নিরাময় করার জন্যই বর্ণিত হয়েছে।

১. বংশ- কৌলিন্যের গর্ব

পরিবার, বংশ ও গোত্র নিয়ে বড়াই করার বিষয়টি আরব সমাজের মৌলিক ও সনাতন ব্যাধি লোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরব সমাজে একজন লোকের সবচেয়ে বড় অহংকার ছিল এটাই যে, সে কুরাইশ গোত্রের মতো একটি প্রসিদ্ধ গোত্রোদ্ভূত। মহানবী (সা.) এ কল্পিত মূলনীতিটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার জন্য বললেন :

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَحْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَفَاخُرَهَا بِأَبَائِهَا أَلَا إِنَّكُمْ مِنْ آدَمَ وَ آدَمَ مِنْ طِينِ أَلَا أَنْ خَيْرَ

عِبَادَ اللَّهِ عَبْدَ اتَّقَاهُ

“ হে জনগণ! মহান আল্লাহ্ ইসলাম ধর্মের আলোকে জাহিলী যুগের গর্ব এবং বংশ-গৌরব ও কৌলিন্য তোমাদের মধ্য থেকে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। তোমাদের সবাই আদম থেকে এসেছ (সৃষ্ট হয়েছ) এবং তিনিও কাদামাটি থেকে সৃষ্ট হয়েছেন। সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ সেই ব্যক্তি, যে পাপ ও খোদাদ্রোহিতা থেকে বিরত থাকে (মহান আল্লাহকে ভয় করে)।”

ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি কেবল তাকওয়া, তা জগৎবাসীকে বোঝানোর জন্য ভাষণের এক অংশে মহানবী (সা.) সমগ্র মানব জাতিকে দু’শ্রেণীতে ভাগ করেছেন এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব ঐ ব্যক্তিদের বলে গণ্য করেছেন যাঁরা মুত্তাকী, পরহেজগার। আর এ শ্রেণীবিন্যাসের দ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠত্বের সমুদয় কাল্পনিক মাপকাঠি বাতিল করে দিয়েছেন।

তিনি ভাষণে বলেন :

إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ : مُؤْمِنٌ تَقَىٰ كَرِيمٌ عَلِيٌّ اللَّهُ وَفَاخِرٌ شَقِيٌّ هَيْنَ عَلِيٌّ اللَّهُ

“ মহান আল্লাহর কাছে মানব জাতি দু’শ্রেণীতে বিভক্ত : পরহেজগার মুমিনদের দল- যারা মহান আল্লাহর কাছে সম্মানিত এবং সীমা ল নকারী ও পাপী- যারা মহান আল্লাহর কাছে লাঞ্ছিত।

২. আরব হবার কারণে মর্যাদা ও শ্রে ত্ব

মহানবী (সা.) জানতেন, এ জাতি আরব হওয়া এবং এ জাতির সাথে সংশ্লিষ্টতা ও সম্পর্ককে নিজেদের অন্যতম গৌরব ও মর্যাদা বলে বিশ্বাস করে। আরব জাতীয়তাবাদের গর্ব এদের হৃদয় লোর গভীরে ও রক্ত- মজ্জার মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। তিনি এ ব্যথার উপশম এবং ঠুনকো শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কল্পিত প্রাসাদ ধূলিসাৎ করার জন্য জনগণের দিকে তাকিয়ে বললেন :

أَلَا أَنَّ الْعَرَبِيَّةَ لَيْسَتْ ب <اب> وَالِدٍ وَ لَكِنَّهَا لِسَانَ نَاطِقٍ، فَمَنْ قَصَرَ عَمَلَهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ حَسْبَهُ

“ হে লোকসকল! আরব হওয়া তোমাদের সত্তার অংশ নয়; বরং তা হচ্ছে একটি সাবলীল ভাষা; আর যে কেউ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার ক্ষেত্রে অবহেলা করবে, বংশ-কৌলিন্য তাকে কোথাও (মর্যাদার অবস্থানে) পৌঁছে দেবে না (এবং তার কর্মের দোষ- ত্রুটি ও অপূর্ণতা পূরণ করে দেবে না)।”

এ কথার চেয়ে অধিকতর বলিষ্ঠ ও সাবলীল বক্তব্য পাওয়া যাবে কি?

৩. সমগ্র জাতির জন্য

মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রকৃত আহ্বায়ক সমগ্র মানব জাতির ও মানব সমাজের মধ্যকার সাম্য দৃষ্টীকরণের লক্ষ্যে বললেন :

إِنَّ النَّاسَ مِنْ عَهْدِ آدَمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا مِثْلَ أَسْنَانِ الْمِشْطِ لَا فَضْلَ لِلْعَرَبِيِّ عَلَى الْعَجَمِيِّ وَلَا لِلْأَحْمَرِ عَلَى الْأَسْوَدِ إِلَّا
بِالتَّقْوَى

“ আদম (আ.)- এর যুগ থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতি চিরুণীর দাঁত লোর মতো পরস্পর সমান। অনারবের ওপর আরব জাতির এবং কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া।”

মহানবী (সা.) এ কথার মাধ্যমে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্য থেকে সব ধরনের অবৈধ বৈষম্য (শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকাপ্রসূত পার্থক্য) ও সকল সংকীর্ণতাবোধ বিলুপ্ত করে দিয়েছেন এবং যে কাজ মানবাধিকার ঘোষণার সনদপত্র বা মুক্তি ও স্বাধীনতার সনদ অথবা মানব জাতির সাম্যের প্রবক্তারা এত হৈ চৈ করে এবং ঢাক-ঢোল পিটিয়েও যা সমাপ্ত করতে পারে নি, তা তিনি ঐ অতীত যুগে আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

৪. শত বছরব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং পুরনো শত্রুতা

আরব জাতি ও গোত্র লো অগণিত গৃহযুদ্ধ ও অবিরাম রক্তপাতের কারণে এক শত্রু মনোভাবাপন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছিল এবং সর্বদা তাদের মধ্যে যুদ্ধের দাবানল প্রজ্বলিত হতো। আরব-উপদ্বীপের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর মহানবী (সা.) এ সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ও শান্তির জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ রোগের উপশম আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। মহানবী এ সমস্যা সমাধানের উপায় এর মাঝে দেখতে পেলেন যে, তিনি আপামর জনগণের কাছে আহ্বান জানাবেন যেন তারা জাহিলীয়াতের যুগে যে সব রক্ত ঝরানো হয়েছে ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, সে লো (প্রতিশোধ গ্রহণ করা) থেকে বিরত থাকে এবং এভাবে ঐ যুগের সকল বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘোষণা করে। এর ফলে যে কোন

ধরনের রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ড- যা শান্তি- শৃঙ্খলা নষ্ট করে দেয়, - প্রতিহত করা সম্ভব হবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণ ও আক্রমণ মোকাবেলা করার ধূয়ো তুলে যে সব আক্রমণ, লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবার সম্ভাবনা ছিল, সে লোর চিন্তাও আরবদের মন- মগজ থেকে বের করে দেয়া সম্ভব হবে।

মহানবী (সা.) এ ধরনের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য ঘোষণা করলেন :

أَلَا إِنَّ كَلَّ مَالٍ وَ مَأْتِرَةٌ وَ دَمٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ

“ আমি জাহিলী যুগের প্রাণ ও ধন- সম্পদ সংক্রান্ত যাবতীয় ঝগড়া- বিবাদ এবং কল্পিত গর্ব আমার এ দুই পদতলে রেখে দিলাম এবং সেসব কিছুকে আমি বিলুপ্ত বলে ঘোষণা করছি।”

৫. ইসলামী তত্ত্ব

মহানবী (সা.)- এর ঐ দিনের ভাষণের একটি অংশ মুসলমানদের একতা ও সংহতি এবং পারস্পরিক অধিকারসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এ সব ইতিবাচক বিষয় বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মহানবীর লক্ষ্য ছিল, ইসলাম ধর্মের বাইরে যারা আছে, তারা এ ধরনের একতা ও সৌহার্দ্যবোধ প্রত্যক্ষ করে আন্তরিকতার সাথে ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়বে এবং এ ধর্ম গ্রহণ করবে।

মহানবী (সা.) বললেন :

المسلم أخ المسلم و المسلمون إخوة، و هم يد واحدة علي من سواهم تتكافؤ دماهم يسعي بذمتهم أدناهم

“ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই এবং সকল মুসলমান পরস্পর ভাই এবং অমুসলিমদের বিপক্ষে তারা সবাই একটি হাতের মতো (ঐক্যবদ্ধ)। তাদের সবার রক্ত এক সমান (অর্থাৎ তাদের সবার জীবন- পণ এক ও অভিন্ন। তাই কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে পারবে না), এমনকি মুসলমানদের পক্ষে তাদের মধ্যকার সবচেয়ে ছোট ব্যক্তিও প্রতিশ্রুতি বা চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে।” ৩৫৪

অপরাধীদের গ্রেফতার

এ বিষয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই যে, মহানবী (সা.) করুণা, উদারতা ও ক্ষমার সবচেয়ে বড় নমুনা ছিলেন এবং চরমপন্থী গোষ্ঠী রুঢ় আচরণ প্রকাশ করা সত্ত্বেও তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। তবে ঐ উগ্রবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ছিল, যারা অনেক ভয়াবহ অপরাধ করেছিল এবং এতসব ভয়ঙ্কর অপরাধ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার পর তারা যে মুসলমানদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করবে, তা কখনই কল্যাণকর ও বাঞ্ছনীয় ছিল না। কারণ ভবিষ্যতে এ ধরনের ক্ষমা ঘোষণার যথেষ্ট অপব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক তৎপরতা চালানো হতে পারে।

মুসলমানরা রাস্তা- ঘাটে বা মসজিদুল হারামে এ জঘন্য অপরাধীদের কয়েকজনকে হত্যা করেছিল এবং তাদের মধ্য থেকে দু'জন^{০৫৫} হযরত আলী (আ.)- এর বোন উম্মে হানীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। আলী (আ.) অস্ত্র- শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উম্মে হানীর বাড়ি ঘেরাও করে ফেললেন। উম্মে হানী ঘরের দরজা খুললেন এবং একজন অপরিচিত সেনাপতির মুখোমুখি হলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি নিজের পরিচয় প্রদান করলেন এবং বললেন : “আমি একজন মুসলিম নারী হিসাবে এ দু'ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছি। মুসলিম নারীর আশ্রয়দান মুসলিম পুরুষের মতোই সম্মান পাওয়ার যোগ্য।” হযরত আলী এ সময় যুদ্ধের শিরঞ্জাণ মাথা থেকে উঠিয়ে ফেলেন যাতে উম্মে হানী তাঁকে চিনতে পারেন। বোনের দৃষ্টি তখন ভাইয়ের উপর পড়ল। বহু বছরের ঘটনাবলী এ দু' ভাই- বোনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। সাথে সাথে তাঁর দু'চোখ জলে পূর্ণ হয়ে গেল এবং তিনি ভাইয়ের কাঁধের উপর দু'হাত রাখলেন। অতঃপর তাঁরা দু'জন মহানবী (সা.)- এর কাছে গেলেন এবং মহানবীও এ নারীর প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবী সারাহ, যে প্রথমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং পরে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, সেও ঐ দশ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তবে সে হযরত উসমানের সুপারিশ ও মধ্যস্থতায় মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল।

ইকরামাহ ও সাফওয়ানের কাহিনী

বদর যুদ্ধের পরবর্তী যুদ্ধ লোর অগ্নি প্রজ্বলনকারী ইকরামাহ ইবনে আবি জাহল ইয়েমেনে পলায়ন করে। তবে তার স্ত্রীর সুপারিশে সে মুক্তি পেয়েছিল। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা বিভিন্ন ধরনের জঘন্য অপরাধ ছাড়াও বদর যুদ্ধে নিহত তার পিতা উমাইয়্যার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য এক মুসলমানকে মায় প্রকাশ্য দিবালোকে জনতার চোখের সামনে ফাঁসীতে ঝুলিয়েছিল। এ কারণে মহানবী (সা.) তার রক্ত বৈধ ঘোষণা করেন। সে ঐ সময় শাস্তি পাওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে সমুদ্রপথে হিজায় থেকে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, বিশেষ করে যখন সে জানতে পেরেছিল, ঐ দশ ব্যক্তির তালিকায় তার নামও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উমাইর ইবনে ওয়াহাব মহানবী (সা.)- এর কাছে এসে তার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার আবেদন জানিয়েছিল। মহানবীও তার আবেদন গ্রহণ করেন এবং মায় প্রবেশকালীন পরিহিত তাঁর পাগড়ী তাকে নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে প্রদান করেন। তিনি ঐ প্রতীক নিয়ে জেদায় যান এবং সাফওয়ানকে সাথে নিয়ে মায় প্রত্যাবর্তন করেন। মহানবী (সা.)- এর দৃষ্টি যখন যুগের সবচেয়ে বড় অপরাধীর ওপর পড়ল তখন তিনি পূর্ণ মহানুভবতা সহকারে বললেন : “তোমার প্রাণ ও ধন-সম্পদ সম্মানিত; তবে তোমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা হবে উত্তম।” সে তখন দু’মাসের সময় চায়, যাতে সে ইসলামের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। মহানবী (সা.) তখন বললেন : “আমি তোমাকে দু’মাসের স্থলে চার মাসের ফুরসৎ দিচ্ছি এজন্য যে, তুমি পূর্ণ বিচক্ষণতা, জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে এ ধর্ম গ্রহণ কর।” চার মাস গত হতে না হতেই সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।^{৩৫৬}

এ ঘটনা সংক্ষিপ্ত অধ্যয়ন করলে ইসলাম ধর্মের এক অকাট্য বাস্তবতা- যা স্বার্থান্বেষী প্রাচ্যবিদরা দুর্দমনীয়ভাবে অস্বীকার করে থাকে- স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। শিরকের প্রতিভূরা ও মুশরিক নেতারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছে; আর বাধ্যবাধকতা ও ভীতি প্রদর্শনের তো কোন অস্তিত্বই ছিল না। বরং চেষ্টা করা হয়েছে, সঠিক চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার মাধ্যমেই যেন একমাত্র এ আসমানী ধর্ম গ্রহণ করা হয়।

ম ১ বিজয়ের উল্লেখযোগ্য ও শিক্ষণীয় ঘটনাবলী বর্ণনা করার আগে এখানে নিম্নোক্ত দু'টি আকর্ষণীয় ঘটনার দিকে আমরা ইঙ্গিত করব :

মক্কার মহিলাদের মহানবী (সা.)- এর বাইআত (আনুগত্য)

আকাবার^{৩৫৭} বাইআতের পর মহানবী (সা.) প্রথম বারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে নিম্নোক্ত দায়িত্ব লো পালন করার জন্য মহিলাদের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন :

১. মহান আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করবে না;
২. বিশ্বাসঘাতকতা করবে না;
৩. যিনা বা ব্যভিচার করবে না;
৪. নিজ সন্তানদের হত্যা করবে না;
৫. যে সন্তানরা অন্যদের ঔরসজাত তাদেরকে স্বামীদের সাথে সম্পর্কিত করবে না;
৬. কল্যাণকর কাজসমূহের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)- এর বিরোধিতা করবে না।

বাইআতের আনুষ্ঠানিকতা ঠিক এমনই ছিল : মহানবী (সা.) পানিভর্তি একটি পাত্র আনার নির্দেশ দিলেন। পাত্রটি আনা হলে তিনি তাতে কিছু সুগন্ধি ঢাললেন। অতঃপর তিনি ঐ পাত্রের মধ্যে হাত রাখলেন এবং যে আয়াতে কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের^{৩৫৮} উল্লেখ করা হয়েছে, তা তেলাওয়াত করলেন। তিনি নিজের জায়গা থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং মহিলাদের বললেন : যারা এ শর্তাবলীসহ আমার কাছে বাইআত করতে প্রস্তুত, তারা এ পাত্রে হাত রেখে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের কথা ঘোষণা দেবে।

এ বাইআত গ্রহণের কারণ ছিল এই যে, মাবাসীদের মধ্যে অনেক অপবিদ্র ও অসতী মহিলা ছিল এবং তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা না হলে অশ্লীল কার্যকলাপ গোপনে চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

এদেরই একজন ছিল আবু সুফিয়ানের স্ত্রী মুআবিয়ার মা হিন্দ। তার চারিত্রিক রেকর্ড অত্যন্ত খারাপ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। সে যে বিশেষ ধরনের সহিংসতা ও রুঢ়তা পোষণ করত, সে কারণে সে তার চিন্তা-ভাবনা স্বামী আবু সুফিয়ানের ওপর চাপিয়ে দিত। আবু সুফিয়ান সন্ধি ও

শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ার দিন সে জনগণকে যুদ্ধ ও রক্তপাতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিল (ম ১ বিজয় দিবসে)।

এ নারীর প্রত্যক্ষ উস্কানি উহুদ প্রান্তরে যুদ্ধের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হবার কারণ হয়েছিল এবং তা নির্বাপিত করার জন্য মহানবীকে সত্তর ব্যক্তিকে কুরবানী দিতে হয়েছিল, যাঁদের একজন ছিলেন হামযাহ। এ নিষ্ঠুর হৃদয়ের অধিকারী নারী বিশেষ এক ধরনের হিংস্রতা সহ হযরত হামযার পার্শ্বদেশ ছিঁড়ে তাঁর কলিজা বের করে দাঁত দিয়ে কামড়ে টুকরো টুকরো করেছিল।^{৩৫৯}

প্রকাশ্যে সবার সামনে এ মহিলার মতো নারীদের বাইআত গ্রহণ ছাড়া মহানবী (সা.)- এর আর কোন উপায়ও ছিল না। মহানবী বাইআতের ধারাসমূহ পাঠ করছিলেন। যখন তিনি ‘তারা চুরি করবে না’ - এ ধারায় উপনীত হলেন, তখন হিন্দ- যে নিজের মাথা ও মুখমণ্ডল খুব ভালোভাবে ঢেকে রেখেছিল, - তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল : “হে রাসূলুল্লাহ! আপনি নির্দেশ দিচ্ছেন, মহিলারা যেন চুরি না করে। তবে আমি কী করতে পারি, যখন আমার এক অত্যন্ত কৃপণ ও কঠোর স্বামী আছে। এ কারণেই আমি অতীতে তার অর্থ ও সম্পদে হাত লাগিয়েছি।”

আবু সুফিয়ান দাঁড়িয়ে বলল : “আমি অতীতকে হালাল করে দিলাম। তোমাকেও কথা দিতে হবে যে, তুমি ভবিষ্যতে চুরি করবে না।” মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের কথায় হিন্দকে চিনতে পেরে বললেন : “তুমি কি উতবার কন্যা?” সে বলল : “জী। হে রাসূলুল্লাহ! আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন, তা হলে মহান আল্লাহও আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন।”

মহানবী যখন ‘তারা ব্যভিচার করবে না’ - এ বাক্য উচ্চারণ করলেন, তখন হিন্দ আবারও নিজের জায়গা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে দোষমুক্ত প্রমাণ করার জন্য একটি কথা বলল, যা তার অজান্তেই তার অপবিত্র অন্তরকে ফাঁস করে দিল। সে বলল : “মুক্ত নারী^{৩৬০} কি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়?” মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বয়ং এ ধরনের আ পক্ষ সমর্থন আসলে ব্যক্তির গোপন অন্তরকেই প্রকাশ করে দেয়ার নামান্তর মাত্র। যেহেতু হিন্দ নিজেকে এ ধরনের গর্হিত নোংরা কাজ সম্পন্নকারিণী হিসেবে বিবেচনা করত এবং সে নিশ্চিত ছিল, জনগণ এ কথা^{৩৬১} শোনার মুহূর্তে

তার প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করবে, তাই সে তার থেকে জনগণের দৃষ্টি ফেরানোর জন্য তৎক্ষণাৎ বলেছিল : “মুক্ত নারী কি কখনো অশ্লীলতা ও নোংরামিতে লিপ্ত হয়ে নিজেকে অপবিত্র করতে পারে?” ঘটনাচক্রে জাহিলীয়াতের যুগে তার সাথে যাদের অবৈধ সম্পর্ক ছিল, তারা সবাই তার এ অস্বীকৃতির কারণে খুব আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল ও তারা এতে হেসেছিল। তাদের হাসা এবং হিন্দের আ পক্ষ সমর্থন তার অধিক অপমানের কারণ হয়েছিল।^{৩৬২}

মক্কা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের প্রতিমালয়গুলোর ধ্বংস সাধন

পবিত্র মাক্কার চারপাশে অসংখ্য প্রতিমালয় ছিল, যে লোকের আশ-পাশের গোত্র লোকের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও পবিত্র বলে গণ্য হতো। পবিত্র মাক্কা অঞ্চলে মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিকতার মূলোৎপাটন করার জন্য মহানবী (সা.) মাক্কার আশে-পাশে বেশ কিছু বাহিনী প্রেরণ করেন যাতে তারা প্রতিমালয় লোক ধ্বংস করে। স্বয়ং মাক্কা নগরীতে ঘোষণা করা হয়, কারো ঘরে কোন মূর্তি থাকলে সে যেন তা তৎক্ষণাত্ ভেঙে ফেলে।^{৩৬৩} এ ক্ষেত্রে আমার ইবনে আস ও সা'দ ইবনে যাইদ যথাক্রমে 'সুওয়া' ও 'মানাত' প্রতিমা ধ্বংস করার দায়িত্ব পান।

খালিদ ইবনে ওয়ালীদ, জাযীমাহ বিন আমীর গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া এবং 'উয্যা' নামক মূর্তি ভাঙার জন্য একটি সেনাদলের অধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে ঐ গোত্রের আবাসভূমির দিকে রওয়ানা হন। মহানবী (সা.) তাঁকে রক্তপাত ও যুদ্ধ না করার নির্দেশ দেন এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফকে তাঁর সহকারী নিযুক্ত করেন।

জাহিলীয়াতের যুগে বনী জাযীমাহ গোত্র ইয়েমেন থেকে ফেরার পথে খালিদ ইবনে ওয়ালীদের চাচা ও আবদুর রহমানের পিতাকে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল। আর খালিদ মনে মনে তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতেন। তিনি বনী জাযীমাহ মুখোমুখি হলে তাদের সবাইকে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ও আ রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত দেখতে পেলেন। সেনাদলের অধিনায়ক উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলেন : “তোমরা তোমাদের অস্ত্র মাটিতে ফেলে দাও। কারণ মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিকতার দিন শেষ হয়ে গেছে এবং উম্মুল কুরার (পবিত্র মাক্কা নগরী) পতন হয়েছে এবং সেখানকার সকল অধিবাসী ইসলামের সেনাবাহিনীর কাছে আ সমর্পণ করেছে।”

গোত্রের নেতারা অস্ত্র জমা দিয়ে মুসলিম সেনাদলের কাছে আ সমর্পণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করে। ঐ গোত্রের এক ব্যক্তি বিশেষ বুদ্ধিমত্তার কারণে বুঝতে পারে যে, সেনাদলের অধিনায়কের অসদিচ্ছা রয়েছে। তাই সে গোত্রপতিদের বলল : “আ সমর্পণের পরিণতি হবে বন্দীদশা এবং এরপর মৃত্যু।” অবশেষে গোত্রপতিদের মতই বাস্তবায়িত হলো এবং তারা

ইসলামের সৈনিকদের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করল। এ সময় সেনাদলের অধিনায়ক অত্যন্ত কাপুরুষোচিতভাবে এবং পবিত্র ইসলামের সুস্পষ্ট বিধানের বিপক্ষে ঐ গোত্রের পুরুষদের হাত পেছনের দিকে বেঁধে বন্দী করার আদেশ দেন। অতঃপর ভোরের বেলা বন্দীদের মধ্য থেকে একটি দলকে খালিদের নির্দেশে হত্যা করা হয় এবং আরেক দলকে মুক্তি দেয়া হয়।

খালিদের ভয়ঙ্কর অপরাধের সংবাদ মহানবী (সা.)- এর কাছে পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত মর্মান্ত ও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত আলী (আ.)- কে ঐ গোত্রের কাছে গিয়ে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং নিহত ব্যক্তিদের রক্তমূল্য (দিয়াত) প্রদান করার নির্দেশ ও দায়িত্ব দেন। হযরত আলী (আ.) মহানবীর নির্দেশ বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে এতটা সূক্ষ্মদর্শিতা অবলম্বন করেছিলেন যে, এমনকি গোত্রের কুকুর লো যে কাঠের পাত্রে পানি পান করত এবং খালিদের আক্রমণের কারণে ভেঙে গিয়েছিল, সেটার মূল্যও প্রদান করলেন।

এরপর তিনি সকল শোকসন্তুষ্ট গোত্রপতিকে ডেকে নিয়ে বললেন : “যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং নির্দোষ ব্যক্তিদের রক্তমূল্য কি যথাযথভাবে প্রদান করা হয়েছে?” তখন সবাই বলল : “হ্যাঁ।” এরপর আলী (আ.), ঐ গোত্রের আরো কিছু ক্ষয়- ক্ষতি ঘটে থাকতে পারে, যে ব্যাপারে তারা তখনো জ্ঞাত নয় বা তারা তখনো উপলব্ধি করতে পারে নি বিধায় আরো অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে পবিত্র মায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি মহানবীকে তাঁর কাজের বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রদান করেন। মহানবী তাঁর এ কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এরপর তিনি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের দু’হাত উপরের দিকে তুলে সানুনয় দুআ করলেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرءُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ

“হে আল্লাহ্! আপনি জ্ঞাত থাকুন, আমি খালিদ ইবনে ওয়ালীদে অপরাধের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট এবং আমি কখনো তাকে যুদ্ধের আদেশ দিই নি।” ৩৬৪

হযরত আমীরুল মুমিনীন ঐ গোত্রের অধিবাসীদের মানসিক ও আর্থিক ক্ষয়- ক্ষতির প্রতিকার বিধান করার বিষয়টিও বিবেচনা করেছিলেন। এ কারণে তিনি যে সব ব্যক্তি খালিদের আক্রমণের ফলে ভয় পেয়েছিল, তাদেরকেও কিছু পরিমাণ অর্থ প্রদান করেছিলেন এবং তাদের মনোরঞ্জন

করেছিলেন। মহানবী (সা.) যখন হযরত আলীর এ ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতির কথা জানতে পারলেন, তিনি বলেছিলেন : “হে আলী! আমি তোমার এ কাজ অগণিত লাল পশমবিশিষ্ট উট দিয়েও বিনিময় করব না।^{৩৬৫} হে আলী! তুমি আমার সন্তুষ্টি অর্জন করেছ; মহান আল্লাহও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। হে আলী! তুমি মুসলমানদের পথ প্রদর্শক। ঐ ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে তোমাকে ভালোবাসে এবং তোমার পথে চলে; ঐ ব্যক্তি দুর্ভাগা, যে তোমার বিরোধিতা করে এবং তোমার পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও বিচ্যুত হয়।”^{৩৬৬} “মূসার কাছে হারুন যেমন, আমার কাছে তুমিও ঠিক তেমনি। তবে আমার পর কোন নবী নেই।”^{৩৬৭}

খালিদের আরো এক অপরাধ

এটাই একমাত্র অপরাধ ছিল না যা খালিদ তাঁর বাহ্যিক ইসলামী জীবনে ঘটিয়েছিলেন; বরং হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে তিনি এর চেয়েও জঘন্য অপরাধ করেছিলেন। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ : মহানবী (সা.)- এর ওফাতের পর কতিপয় আরব গোত্র মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল অথবা বিশুদ্ধ অভিমত অনুসারে, হযরত আবু বকরের খিলাফত তারা মেনে নেয় নি এবং এ কারণে তারা যাকাত দেয়া থেকে বিরত থেকেছিল। খলীফা আবু বকর এক সেনাবাহিনীকে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় মুরতাদদের দমনের জন্য প্রেরণ করেন।

খালিদ ইবনে ওয়ালীদ মুরতাদ হয়ে যাওয়ার ধুয়ো তুলে মালিক ইবনে নুওয়াইরার গোত্রের ওপর আক্রমণ করেন। মালিক এবং তাঁর গোত্রের সকল ব্যক্তি আ রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং তারা সবাই তখন বলছিল : “আমরা মুসলমান। তাই আমাদের ওপর আক্রমণ চালানো ইসলামী সেনাবাহিনীর জন্য অনুচিত। খালিদ তাদেরকে ছলে- বলে- কৌশলে নিরস্ত্র করে ফেলে এবং উক্ত গোত্রের প্রধান মালিক ইবনে নুওয়াইরাকে, যিনি একজন মুসলমান ছিলেন, হত্যা এবং তাঁর স্ত্রীর সাথে সীমা ল ন করেন।

এত বড় জঘন্য অপরাধ করা সত্ত্বেও তাঁকে ‘সাইফুল্লাহ’ (আল্লাহর তরবারী) এবং ইসলামের একজন মহান সমরাধিনায়ক বলা কি আসলেই আমাদের জন্য যথাযথ ও শোভনীয় হবে?^{৩৬৮}

পঞ্চাশতম অধ্যায় : অষ্টম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

ছনাইনের যুদ্ধ

মহানবী (সা.)- এর কর্মপদ্ধতি এমন ছিল যে, তিনি কোন একটি অঞ্চল জয় করে সেখানে যতদিন অবস্থান করতেন, ততদিন তিনি স্বয়ং ঐ অঞ্চলের রাজনৈতিক বিষয় এবং জনগণের ধর্মীয় বিষয়াদি দেখা-শোনা করতেন। আর তিনি ঐ এলাকা ত্যাগ করলেই সেখানে বিভিন্ন পদ ও দায়িত্বে যোগ্য ব্যক্তিদের নিযুক্ত করতেন। কারণ এ ধরনের অঞ্চলের অধিবাসীরা উচ্ছেদকৃত পুরনো ব্যবস্থার সাথে পরিচিত ছিল; নব প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের তেমন কোন ধারণাই ছিল না। অন্যদিকে ইসলাম ধর্ম একটি সামরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক তথা ধর্মীয় ব্যবস্থা যার বিধি-বিধান ওহীর পবিত্র উৎসধারা উৎসারিত এবং জনগণকে এ ধর্মের নীতিমালার সাথে পরিচিত করানো এবং তাদের মাঝে তা প্রয়োগ ও প্রচলন করার বিষয়টি যোগ্যতাসম্পন্ন এবং বিশেষ শিক্ষা-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের মুখাপেক্ষী, যাঁরা পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা সহ জনগণকে দীন ইসলামের বিশুদ্ধ নিয়ম-নীতি ও আকীদা-বিশ্বাসের সাথে পরিচিত করাবেন এবং তাদের মাঝে ইসলামের রাজনীতি বাস্তবে প্রয়োগ করবেন।

মহানবী হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের আবাসভূমির উদ্দেশে পবিত্র ম া নগরী ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলে ম াবাসীদের ধর্মীয় শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনা দেয়ার জন্য মুয়ায ইবনে জাবালকে ধর্মশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং অন্যতম যোগ্যতাসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি উত্তাব ইবনে উসাইদ-এর হাতে নগরীর সার্বিক বিষয় পরিচালনা ও মসজিদে নামাযের ইমামতীর দায়িত্ব অর্পণ করেন। মহানবী পবিত্র ম া নগরীতে পনের দিন অবস্থান করার পর হাওয়াযিন গোত্রের আবাসভূমির উদ্দেশে রওয়ানা হলেন।^{৩৬৯}

নজিরবিহীন সেনাবাহিনী

মহানবী (সা.)- এর পতাকাতলে ঐ দিন বারো হাজার সশস্ত্র সৈন্য ছিল। তাদের মধ্যে দশ হাজার সৈন্য মহানবীর সাথে মদীনা থেকে এসেছিল যারা ম া বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিল এবং বাকী দু’

হাজার সৈন্য কুরাইশ বংশীয় তরুণ যুবক, যারা সম্প্রতি (ম ১ বিজয়ের পর) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এ অংশের নেতৃত্বভার ছিল আবু সুফিয়ানের ওপর।

এ ধরনের সেনাবাহিনী সে সময় খুব বিরল ছিল এবং এ সংখ্যাধিক্যই তাদের প্রাথমিক পরাজয়ের কারণ হয়েছিল। কারণ তারা তাদের অতীত ভূমিকার বিপরীতে নিজেদের সৈন্যসংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে অহংকারী হয়ে পড়েছিল এবং সামরিক কৌশলের কথা একদম ভুলেই গিয়েছিল। বিশাল সেনাবাহিনীর উপর হযরত আবু বকরের দৃষ্টি পতিত হলে তিনি বলেছিলেন : “আমাদের সংখ্যা কম নয় এবং আমরা কখনো পরাজিত হবো না। কারণ আমরা শত্রু সৈন্যদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি।” ৩৭০

তবে তিনি মোটেই লক্ষ্য করেন নি, যুদ্ধে জয়ের কারণ কেবল লোকবল ও সৈন্যসংখ্যার আধিক্য নয়; বরং এ কারণটি বিজয়ের অন্যান্য কারণের তুলনায় কম গুরুত্বের অধিকারী। এ সত্যটিই পবিত্র কুরআন এভাবে উল্লেখ করেছে :

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين)

“ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ অনেক স্থানে তোমাদের সাহায্য করেছেন এবং হুনাইন যুদ্ধের দিনে; তোমরা তোমাদের জনসংখ্যার আধিক্যে প্রফুল্ল হয়েছিলে, তবে তা তোমাদের কোন উপকারেই আসে নি এবং যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তোমরা শত্রুদের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।” (সূরা তওবা : ২৫)

তথ্য সংগ্রহ

ম ১ বিজয়ের পরপর হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের মধ্যে এক ধরনের আন্দোলন ও উদ্দীপনা এবং শাখা- গোত্রসমূহের মধ্যে বেশ কিছু বিশেষ ধরনের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যকার আন্তঃ যোগাযোগের কেন্দ্র ছিল মালিক ইবনে আউফ নাসরী নামের এক তরুণ সাহসী বীর যোদ্ধা। তাদের বৈঠক ও পরামর্শের ফলাফল এই দাঁড়াল যে, তাদের কাছে ইসলামী সেনাবাহিনীর আগমনের আগেই তারা নিজেরাই এ বাহিনীর মোকাবেলা করবে এবং মুসলমানরা আক্রমণ

করার আগেই তারা বিশেষ ধরনের সামরিক কৌশল অবলম্বন করে মুসলমানদের ওপর মারণাঘাত হানবে। তারা নিজেদের মধ্য থেকে ত্রিশ বছর বয়স্ক এক নির্ভীক যুবককে তাদের সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করে। এ যুদ্ধে সকল শাখা-গোত্র আঘাতকারী অভিন্ন সামরিক ইউনিটে পরিণত হয়েছিল।

সর্বাধিনায়কের নির্দেশে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল যোদ্ধা তাদের সকল নারী ও পশুসম্পদকে রণাঙ্গনের পেছনে নিয়ে এসেছিল। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলেছিল : “এ সময় এ লোক লো তাদের নারী ও সম্পদ রক্ষার জন্য দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করবে এবং কখনো তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন ও পশ্চাদপসরণ করবে না।” ৩৭১

যুদ্ধ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বৃদ্ধ দুরাইদ ইবনে সাম্মাহ যখন শিশুদের কান্না ও নারীদের চিৎকার শুনতে পেল, সে মালিকের (অধিনায়কের) সাথে ঝগড়া শুরু করে দিল এবং তার এ পদক্ষেপ সামরিক নীতিমালার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যাখ্যাত গণ্য করে বলল : “এ পদক্ষেপের পরিণতি হবে এই যে, যদি তোমরা পরাজয় বরণ কর, তা হলে তোমাদের সকল নারী ও ধন-সম্পদ বিনিময় ছাড়া তোমরা মুসলিম সেনাবাহিনীর কাছে অর্পণ করবে।” কিন্তু মালিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ বৃদ্ধের কথায় কর্ণপাত না করে বলল : “আপনি যেমন নিজে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তেমনি আপনার জ্ঞান-বুদ্ধিও লোপ পেয়েছে এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কৌশলও ভুলে গেছেন।” সময় অতিক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, বৃদ্ধ লোকটির কথাই ঠিক ছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের অংশগ্রহণ কেবল বিপদাপদের মধ্যে হাত-পা আটকে যাওয়া ছাড়া আর কোন সুফল বয়ে আনে নি।

মহানবী (সা.) আবদুল্লাহ আসলামীকে একজন অখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে শত্রুপক্ষের অস্ত্র, রসদপত্র, গতিবিধি ও প্রকৃত উদ্দেশ্য সংক্রান্ত তথ্য লাভের জন্য তাদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি শত্রুসেনাদের মধ্যে ঘোরাফেরা করে মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে এসে বেশ কিছু তথ্য ও প্রতিবেদন পেশ করেন। মালিকও গোপন তথ্যাবলী সংগ্রহ করার জন্য

মুসলমানদের মাঝে তিন জন গুচর প্রেরণ করে। কিন্তু ঐ তিন ব্যক্তি ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে মালিকের কাছে ফিরে গিয়েছিল।

শত্রু বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সামরিক কৌশল এবং অতর্কিত আক্রমণ করে শত্রুপক্ষকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়ার নীতি অবলম্বন করে নিজেদের লোকবলের ঘাটতি পূরণ ও সৈন্যদের দুর্বল মনোভাব চাঙ্গা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং সে অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা করে ইসলামী বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে তাদের সেনা ইউনিট লোর শৃঙ্খলা নষ্ট করার মাধ্যমে মুসলিম সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের সমর পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে চেয়েছিল।

সে এ উদ্দেশ্যে হুনাইন অঞ্চলের দিকে যাওয়ার পথ হিসেবে ব্যবহৃত উপত্যকাটির শেষ প্রান্তে (সৈন্যসহ) অবস্থান গ্রহণ করে এবং নির্দেশ জারী করে যে, বড় বড় পাথরের পেছনে ও পাহাড়-পর্বতের গর্ত ও ফাটল লোর মধ্যে এবং উপত্যকার উঁচু উঁচু জায়গায় সৈন্যরা সবাই লুকিয়ে থাকবে। মুসলিম সেনাবাহিনী এ গভীর ও দীর্ঘ উপত্যকায় প্রবেশ করলে তারা সবাই তাদের নিজ নিজ গোপন স্থান থেকে বের হয়ে মুসলিম বাহিনীর ইউনিট লোর ওপর তীর ও পাথর নিক্ষেপ করতে থাকবে। এরপর একটি বিশেষ দল যথারীতি পাহাড় বেয়ে নীচে নেমে যাবে এবং তীরন্দাজদের সহায়তায় মুসলিম সৈন্যদের হত্যা করবে।

মুসলমানদের যুদ্ধের উপকরণ ও সাজ- সরঞ্জাম

মহানবী (সা.) শত্রুপক্ষের শক্তি ও গোঁয়ারত্বমি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। পবিত্র মাদিনা নগরী থেকে (রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে) যাত্রা করার আগেই তিনি সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাকে ডেকে তার কাছ থেকে এক শ' টি বর্ম ধারণেন এবং সে লোর জামানতেরও প্রতিশ্রুতি দেন এবং তিনি নিজে দু'টি বর্ম পরিধান করেন, মাথায় একটি শিরজ্ঞাণ পরেন এবং তাঁকে উপটোকন হিসেবে দেয়া সাদা খচ্চরটির উপর আরোহণ করে ইসলামী সেনাবাহিনীর পেছনে পেছনে যাত্রা করেন।

সেনাবাহিনী রাতটা উপত্যকার প্রবেশমুখে বিশ্রামে কাটায়। তখনও চারদিক পুরোপুরি উজ্জ্বল হয়ে উঠে নি, ঐ সময় বনী সালীম গোত্র খালিদ ইবনে ওয়ালীদেদের নেতৃত্বে হুলাইনের দিকে পার হয়ে যাওয়ার জন্য উপত্যকায় প্রবেশ করে। মুসলিম সেনাবাহিনীর বৃহত্তর অংশ উপত্যকার মাঝখানে পৌঁছলে হঠাৎ করে তীর নিক্ষেপের শব্দ ও পাথরের পেছনে লুকিয়ে থাকা যুদ্ধবাজ লোকদের উচ্চকণ্ঠের হুঙ্কারধ্বনি মুসলমানদের অন্তরে অতীত ভয়- ভীতির সঞ্চার করে এবং তাদের মাথা ও মুখমণ্ডলের উপর শিলাবৃষ্টির মতো তীর বর্ষিত হতে থাকে। আর তখন ঐ সব তীরন্দাজের ছত্রছায়ায় একদল যোদ্ধা মুসলিম সৈন্যদের আক্রমণ করে বসে।

শত্রুবাহিনীর আকস্মিক আক্রমণ মুসলমানদের হতভম্ব ও ভীত-সম্ব্রম্ব করে ফেলে। তারা নিজেদের অজান্তেই দিক-বিদিক পলায়ন করতে থাকে। আর শত্রুর চেয়ে বরং তারা নিজেরাই মুসলিম বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও সৈন্যদের কাতারসমূহ ভেঙে যাওয়ার জন্য বেশি দায়ী ছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যকার মুনাফিকরা এ ঘটনা ঘটায় কারণে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল। এমনকি আবু সুফিয়ান বলেছিল : “মুসলমানরা লোহিত সাগরের ল পর্যন্ত ছুটতে থাকবে।” আরেক জন মুনাফিক বলল : “যাদু বাতিল হয়ে গেছে।” তৃতীয় মুনাফিক ইসলামের দফা রফা করা এবং মহানবীকে ঐ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মাঝে হত্যা করে তাওহীদের প্রদীপ এবং রিসালাতের প্রজ্বলিত মশাল নিভিয়ে ফেলার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছিল।

অবিচল মহানবী (সা.) এবং একদল ত্যাগী জানবাজ যোদ্ধা

মুসলমানদের পলায়ন- যার প্রধান কারণ ছিল তাদের ভয়- ভীতি ও বিশৃঙ্খল হয়ে যাওয়া, - মহানবীকে ভীষণভাবে ব্যথিত করে। তিনি অনুভব করছিলেন, আর এক মুহূর্তও যদি বিলম্ব করা হয়, তা হলে ইতিহাসের ভিত্তি ধ্বংসে পড়বে। তখন মানব সমাজ তার চলার পথ পরিবর্তন করে ফেলবে এবং মুশরিক বাহিনী তাওহীদবাদী মুসলিম বাহিনীকে সম্পূর্ণ ঠুঁড়ে দেবে। এ কারণেই তিনি তাঁর বাহক পশুর উপর চড়ে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন :

يا أنصار الله و أنصار رسوله أنا عبد الله و رسوله

“ হে মহান আল্লাহর সাহায্যকারীরা! রাসূলের সঙ্গী- সাথীরা! আমি মহান আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত পুরুষ।” এ কথা বলে মহানবী তাঁর বাহক পশুটিকে যুদ্ধের ময়দানের দিকে ধাবিত করলেন। রণাঙ্গনটিকে তখন মালিকের যোদ্ধারা তাদের নিজেদের কসরত স্থলে পরিণত করেছিল এবং একদল মুসলমানকে হত্যা করেছিল। আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.), আব্বাস, ফাযল ইবনে আব্বাস, উসামাহ ও আবু সুফিয়ান ইবনে হারিসের মতো মুষ্টিমেয় আ ত্যাগী যোদ্ধা- যাঁরা যুদ্ধের শুরু থেকে এক মুহূর্তের জন্যও মহানবীর (নিরাপত্তার) ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অবহেলা প্রদর্শন করেন নি এবং তাঁর জীবন রক্ষা করেছিলেন, - তাঁরাও তাঁর সাথে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটে গেলেন।^{৩৭২}

মহানবী (সা.) তাঁর চাচা উচ্চ কণ্ঠস্বরের অধিকারী আব্বাসকে বললেন যেন তিনি উচ্চকণ্ঠে মুসলমানদের আহ্বান জানিয়ে বলেন : “হে আনসারগণ! তোমরা যারা মহানবীকে সাহায্য করেছ, হে ঐ ব্যক্তির! যারা রিদওয়ান বৃক্ষের নীচে মহানবীর হাতে বাইআত করেছিলে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? মহানবী এখানে আছেন।” হযরত আব্বাসের আহ্বান- ধ্বনি যখন তাদের কানে পৌঁছল তখন ধর্মীয় চেতনা ও আ সম্মানবোধ তাদের উদ্দীপ্ত করল। তৎক্ষণাৎ তারা সবাই বলতে লাগল : “লাব্বাইক, লাব্বাইক (আমরা উপস্থিত, আমরা উপস্থিত) এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে তারা মহানবীর কাছে প্রত্যাবর্তন করল।

মহানবীর সুস্থ ও নিরাপদ থাকা সম্পর্কে সবাইকে সুসংবাদ দানকারী হযরত আব্বাসের অবিরাম উদাত্ত আহ্বান- ধ্বনি পলায়নপর সেনাদল লোকে অত অনুশোচনা সহ মহানবীর দিকে ফিরে আসতে এবং শত্রুবাহিনীর সামনে নিজেদের সারিসমূহ সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মুসলমানরা মহানবীর নির্দেশে এবং পলায়নের কলঙ্কচিহ্ন মুছে ফেলার জন্য ব্যাপকভিত্তিক আক্রমণ চালনা করে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শত্রুবাহিনীকে পিছু হটতে ও পলায়ন করতে বাধ্য করে। মহানবীও মুসলমানদের সাহস ও উৎসাহ দেয়ার জন্য বলছিলেন : “আমি মহান আল্লাহর নবী এবং আমি কখনো মিথ্যা বলি না; মহান আল্লাহ আমাকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।” মহানবী (সা.)- এর এই সামরিক পরিকল্পনা হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের যুবক ও যুদ্ধবাজ লোকদের নিজেদের নারী ও পশুসম্পদ লো (রণাঙ্গনে) ফেলে দিয়ে আওতাস, নাখলাহ ও তায়েফের দুর্গ লোয় আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল। এ সময় শত্রুপক্ষের কতিপয় যোদ্ধা নিহত হয়েছিল।

যুদ্ধের গনীমত

ইতিহাসে উল্লেখ আছে, এ যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্য থেকে আট^{৩৭৩} ব্যক্তি নিহত হয়েছিলেন। এর বিপরীতে শত্রুপক্ষের ছয় হাজার ব্যক্তি বন্দী হয়েছিল এবং চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজার দুম্বা ও চার হাজার ওয়াকীয়াহ রৌপ্য (রণাঙ্গনে) ফেলে রেখে তারা পলায়ন করেছিল। মহানবী (সা.) সকল যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধলব্ধ গনীমতসমূহ জিরানাহ (জায়েররিনা) এলাকায় নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন। তিনি যুদ্ধবন্দীদের হেফাজত করার জন্য কয়েক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন এবং যুদ্ধবন্দীদের কতক লো বাড়িতে আশ্রয় দেন। আওতাস, নাখলাহ ও তায়েফ এলাকায় পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়া শত্রুবাহিনীকে পশ্চাদ্ধাবন করে দমন করা পর্যন্ত মহানবী জিরানায় যুদ্ধলব্ধ সম্পদসমূহ যথাযথ সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেন।

একান্নতম অধ্যায় : অষ্টম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

তায়েফ যুদ্ধ

তায়েফ নগরী হিজাযের অন্যতম গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপন কেন্দ্র ও উর্বর এলাকা, যা পবিত্র মক্কানগরীর দক্ষিণ-পূর্বে বারো ফারসাখ দূরত্বে এবং সমুদ্রতল থেকে এক হাজার মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। তায়েফ অঞ্চলে মনোরম আবহাওয়া এবং প্রচুর উদ্যান ও খেজুর বাগান থাকার কারণে তা হিজাযের আমোদ-প্রমোদকারীদের বিনোদন ও অবকাশ যাপনের কেন্দ্র ছিল এবং আছে। আরবের শক্তিশালী ও জনবহুল গোত্র লোর একটি বলে গণ্য সাকীফ গোত্র এ শহরে বসবাস করত।

সাকীফ গোত্রের আরবদের মধ্যে ঐ সব ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা হুনাইন যুদ্ধে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল এবং শোচনীয় পরাজয় বরণ করার পর নিজেদের শহর তায়েফে আশ্রয় নিয়েছিল। উল্লেখ্য, এ তায়েফ নগরীতে সুদৃঢ় ও সুউচ্চ দুর্গসমূহ বিদ্যমান ছিল।

পূর্ণরূপে বিজয় অর্জনের জন্য মহানবী (সা.) হুনাইন যুদ্ধের ফেরারী শত্রুবাহিনীকে পশ্চাদ্ধাবন করার নির্দেশ দেন। এ কারণেই তিনি আবু আমীর আশ'আরী ও আবু মূসা আশ'আরীকে একদল সৈন্য নিয়ে ঐ সব ফেরারী শত্রুর আওতাস এলাকায় আশ্রয় নেয়া একটি অংশকে পশ্চাদ্ধাবন করার দায়িত্ব প্রদান করেন^{৩৭৪} এবং মহানবী নিজে অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে তায়েফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।^{৩৭৫}

তিনি যাত্রাপথে হুনাইন যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলনকারী দুর্গ 'মালিকের দুর্গ' মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। অবশ্য মালিকের দুর্গ আসলে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ধ্বংস করা হয় নি; বরং পশ্চাদপসরণ করার সময় শত্রুর কোন আশ্রয়স্থল না রাখার জন্যই ধ্বংস করা হয়েছিল।

ইসলামী সেনাদলের সারিসমূহ একের পর এক যাত্রা করে এবং তায়েফ নগরীর চারপাশে তাঁবু স্থাপন করে। তায়েফ দুর্গ অত্যন্ত উঁচু এবং এর প্রাচীর ছিল খুবই মজবুত। দুর্গের পর্যবেক্ষণ টাওয়ার লো সম্পূর্ণরূপে দুর্গের বাইরের উপরও নিয়ন্ত্রণ রাখত। দুর্গ অবরোধ শুরু হলো। কিন্তু

তখনো অবরোধ-বলয় পরিপূর্ণ হয় নি। অমনি শত্রুবাহিনী তীর নিক্ষেপ করে মুসলিম সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রায় বাধা দেয় এবং সেই মুহূর্তে একদল মুসলিম সৈন্যকে ধরাশায়ী করে ফেলে।^{৩৭৬}

মহানবী (সা.) সেনাবাহিনীকে পশ্চাদপসরণ এবং শত্রুবাহিনীর তীরের আওতার বাইরে তাঁর লো সরিয়ে নিয়ে স্থাপন করার নির্দেশ দিলেন।^{৩৭৭} সালমান ফার্সী, যাঁর সামরিক পরামর্শ ও পরিকল্পনার কারণে মুসলমানরা খন্দকের যুদ্ধে সুফল লাভ করেছিলেন, মহানবীকে মিনজানিক স্থাপন করে শত্রুর দুর্গের উপর পাথর বর্ষণের প্রস্তাব দিলেন। তখনকার যুদ্ধ-বিগ্রহে মিনজানিক বর্তমানকালের কামানের কাজ আঞ্জাম দিত। মুসলিম সেনাপতিগণ হযরত সালমান ফার্সীর নির্দেশনায় মিনজানিক স্থাপন করে প্রায় বিশ দিন ধরে দুর্গের টাওয়ার লো লক্ষ্য করে এবং দুর্গের অভ্যন্তরে অবিরাম পাথর বর্ষণ করেছিলেন।^{৩৭৮} কিন্তু শত্রুবাহিনী এ সব তীব্র সামরিক পদক্ষেপের বিপরীতে তীর নিক্ষেপ অব্যাহত রাখে এবং এভাবে তারা মুসলিম সৈনিকদের ক্ষতিসাধন করে।

এখন আমাদের দেখা উচিত, কিভাবে ঐ যুদ্ধে মিনজানিক মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল? কেউ কেউ বলেন, সালমান নিজ হাতে এ মিনজানিক তৈরি করেছিলেন এবং তা ব্যবহার করার পদ্ধতি মুসলিম সৈনিকদের শিখিয়েছিলেন। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, খায়বর বিজয়ের সময় এ যুদ্ধাস্ত্র মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল (মুসলমানরা এ যুদ্ধাস্ত্রটি নির্মাণ করেছিলেন) এবং তায়েফ যুদ্ধে তাঁরা তা নিয়ে এসেছিলেন।^{৩৭৯} এটা অসম্ভব নয় যে, সালমান এই মিনজানিক মেরামত করে তা স্থাপন ও ব্যবহার করার পদ্ধতি মুসলমানদের শিখিয়ে থাকতে পারেন। ঐতিহাসিক বিবরণাদি থেকে বোঝা যায়, খায়বর যুদ্ধলব্ধ মিনজানিকটিই একমাত্র মিনজানিক ছিল না। কারণ হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধের সময়ই মহানবী (সা.) দুস গোত্রের প্রতিমালয়সমূহ ধ্বংস করার জন্য তুফাইল ইবনে আমর আদ দূসীকে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর গোত্রের চার শ সৈন্য সহ একটি মিনজানিক ও একটি দু'চাকার গাড়ি সাথে নিয়ে তায়েফে মহানবী (সা.)-

এর সকাশে উপস্থিত হন। শত্রুদের কাছ থেকে দুস গোত্রের মুজাহিদগণ যে সব যুদ্ধাস্ত্র ও যন্ত্রপাতি
গনীমতস্বরূপ অর্জন করেছিলেন, সে লো তায়েফ যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল।^{৩৮০}

দু'চাকা বিশিষ্ট (পশু চালিত) যুদ্ধযানের মাধ্যমে দুর্গ- প্রাচীরে ফাটল সৃষ্টি

শত্রুবাহিনীকে আ সমর্পণ করানোর জন্য সর্বা ক আক্রমণ পরিচালনা অত্যাবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। মিনজানিক স্থাপন করে পাথর নিক্ষেপ করার সময় যুদ্ধের গাড়ি ব্যবহার করে দুর্গের প্রাচীর ভাঙারও সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যাতে মুসলিম যোদ্ধারা দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। কিন্তু দুর্গের দেয়াল ভাঙার ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা ছিল। কারণ দুর্গের টাওয়ার লো এবং দুর্গের সকল অংশ থেকে ইসলামী সেনাবাহিনীর ইউনিট লোর ওপর শিলাবৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল এবং দুর্গ প্রাচীরের নিকটবর্তী হওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এ কাজের জন্য সর্বোত্তম উপায় ছিল যুদ্ধযান, যা ঐ সময় বিশ্বের সুসজ্জিত সেনাবাহিনী লোয় অপূর্ণাঙ্গভাবে বিদ্যমান থাকত। যুদ্ধযান কাঠের তৈরি এবং তা একটা পুরু চামড়া দিয়ে ঢেকে রাখা হতো। শক্তিদর যোদ্ধারা এ গাড়ির ভেতরে অবস্থান নিয়ে তা দুর্গের দিকে চালিয়ে নিয়ে যেত এবং এর ভেতরে থেকেই তারা দুর্গের প্রাচীর ছিদ্র করত বা ভাঙতো। মুসলিম সৈন্যরা বীরত্বের সাথে এ পথে দুর্গপ্রাচীর ভাঙার কাজে মশ ল হন। কিন্তু শত্রুবাহিনী গলিত লোহার টুকরা ও জ্বলন্ত লোহার শলাকা নিক্ষেপ করে যুদ্ধযানের আবরণ পুড়িয়ে ধ্বংস করে গাড়ির আরোহীদের ক্ষতিসাধন করেছিল। শত্রু সেনাদের প্রচেষ্টায় এ রণকৌশলটিও ফলপ্রসূ হলো না এবং বিজয়ও লাভ করা গেল না। মুসলিম বাহিনীর কতিপয় যোদ্ধা আহত ও নিহত হলে অবশেষে তাঁরা এ পদ্ধতি ত্যাগ করতে বাধ্য হন।^{৩৮১}

অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক আঘাত

বিজয় অর্জন শুধু সামরিক পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রজ্ঞাবান সেনাপতি মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক আঘাত হানার মাধ্যমে শত্রুবাহিনীর শক্তি খর্ব করে তাদেরকে আ সমর্পণে বাধ্য করতে পারেন। কখনো কখনো আর্ক ও অর্থনৈতিক আঘাত, শারীরিক আঘাত ও ক্ষয়ক্ষতির চেয়েও শত্রুবাহিনীর জন্য বহু ণ বেশি ক্ষতিকারক হয়ে থাকে। তায়েফ ভূখণ্ড ছিল খেজুর ও আঙুর চাষের ক্ষেত্র এবং সমগ্র হিজায় অঞ্চলে তা উর্বরতার জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। তায়েফবাসী খেজুর ও আঙুরের বাগান লো তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রচুর শ্রম ব্যয় করেছিল বলেই এ সব বাগান ও ক্ষেত- খামার সংরক্ষণ ও টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে তীব্র আগ্রহী ছিল।

মহানবী (সা.) দুর্গে আশ্রয় গ্রহণকারীদের হুমকি দেয়ার জন্য ঘোষণা করলেন, আশ্রয়গ্রহণকারীরা যদি প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে, তা হলে তাদের বাগান ও ক্ষেত- খামারসমূহ ধ্বংস করে ফেলা হবে। শত্রুপক্ষ মহানবীর এ হুমকির প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রক্ষেপ করল না। কারণ তারা ভাবত না যে, একজন দয়ালু নবী এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু হঠাৎ তারা দেখতে পেল, বাগান ও ক্ষেত- খামারসমূহ ধ্বংস করার নির্দেশ জারী করা হয়েছে এবং খেজুর ও আঙুর গাছ কাটা শুরু হয়ে গেছে। এ সময় শত্রুপক্ষের বিলাপ ও অনুনয়- বিনয় শুরু হয়ে গেল। তারা তাদের ও মহানবীর মাঝে যে আর্ীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য মহানবীর কাছে আবেদন জানাল।

তায়েফ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণকারীরাই হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধের আ ন জ্বালিয়েছিল এবং এ দু'যুদ্ধে মহানবীকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল; এ সত্ত্বেও মহানবী শত্রুপক্ষের আবেদন মেনে নিয়ে আবারও যুদ্ধের ময়দানে শত্রুবাহিনীর সামনে তাঁর দয়ার্দ্রপূর্ণ চরিত্র প্রকাশ করে নিজ সাহাবীগণকে গাছ লো কাটা থেকে বিরত থাকার আদেশ দান করলেন।

শত্রুপক্ষের প্রতি মহানবীর আচার- আচরণ ও মন- মানসিকতার যে সব পূর্ব নজির ও অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে, সেসবের ভিত্তিতে আমরা কালবিলম্ব না করে বলতে পারি যে, গাছ কাটার নির্দেশ আসলে নিছক হুমকি প্রদর্শনমূলক পদক্ষেপ ছিল। আর এ পদ্ধতি যদি কার্যকর না- ই হতো, তা হলে মহানবী (সা.) তা অব্যাহত রাখা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতেন।

তায়েফ দুর্গ জয়ের সর্বশেষ প্রচেষ্টা

সাকীফ গোত্র প্রচুর ধন- সম্পদের অধিকারী ছিল। তাই তাদের অনেক দাস- দাসীও ছিল। দুর্গের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং শত্রুপক্ষের সামরিক শক্তি ও যুদ্ধ- প্রস্তুতির মাত্রা জানা এবং তাদের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টির জন্য মহানবী (সা.) এ কথা ঘোষণা করার নির্দেশ দেন যে, শত্রুর দুর্গ থেকে যে দাস- ই বের হয়ে এসে ইসলামী বাহিনীর কাছে আশ্রয় নেবে, সে মুক্তি পাবে। এ পদক্ষেপও কিছুটা ফলপ্রসূ হয়েছিল। প্রায় বিশ জন ক্রীতদাস কৌশলে দুর্গ থেকে পালিয়ে এসে মুসলমানদের সাথে যোগ দিয়েছিল। তাদেরকে জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে জানা গেল, দুর্গের অধিবাসীরা কিছুতেই আ সমর্পণে ইচ্ছুক নয় এবং দুর্গ অবরোধ যদি এক বছরও স্থায়ী হয়, তবুও তারা খাদ্য- পানীয়ের দিক থেকে মোটেই সংকটজনক অবস্থায় পতিত হবে না।

ইসলামী সেনাবাহিনীর মদীনায় প্রত্যাবর্তন

মহানবী (সা.) এ যুদ্ধে সব ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত হলো যে, দুর্গ জয়ের জন্য আরো অধিক প্রচেষ্টা ও ধৈর্যের প্রয়োজন ছিল। ইত্যবসরে সাময়িক পরিস্থিতি এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর হাতে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণাদি তায়েফ এলাকায় এর চেয়ে বেশি অবস্থান করার অনুমতি দিচ্ছিল না। কারণ :

প্রথমত এ অবরোধ চলাকালে তের জন মুসলমান নিহত হয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে সাত জন কুরাইশ, চার জন আনসার ও একজন অন্য গোত্রের ছিলেন। আরো কতিপয় মুসলমানও হুнайন উপত্যকায় শত্রুবাহিনীর ধূর্তামূলক আক্রমণ এবং সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ভেঙে যাওয়ার কারণে প্রাণ হারিয়েছিলেন, যাঁদের নাম ও সংখ্যা দুঃখজনকভাবে সীরাত গ্রন্থসমূহে সংরক্ষণ ও নিবন্ধন করা হয় নি। এ কারণে মুসলিম সেনাবাহিনীর মানসিকতায় এক ধরনের ক্লান্তি ও অবসাদ পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

দ্বিতীয়ত শাওয়াল মাস শেষ হয়ে যিল দ মাস চলে এসেছিল। আর যিল দ মাসে যুদ্ধ করা আরবদের দৃষ্টিতে হারাম ছিল। ইসলাম ধর্মও পরবর্তীতে এ ভালো প্রথাটি আরো সুসংহতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।^{৩৮২} এ কারণেই এ প্রথা সংরক্ষণের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ অবরোধ তুলে নেয়া অত্যাবশ্যিক হয়ে গিয়েছিল, যাতে সাকীফ গোত্রীয় আরবরা মহানবীকে ভালো প্রথা বা সুন্নাত ল নকারী বলে অভিযুক্ত করতে সক্ষম না হয়।

এ ছাড়া হজ্ব অনুষ্ঠানও ঘনিয়ে এসেছিল এবং ঐ বছর (হিজরতের অষ্টম বর্ষ) হজ্ব অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা মুসলমানদের দায়িত্বে চলে এসেছিল। এর আগে হজ্বের যাবতীয় অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিকতা ম আর মুশরিকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো।

সমগ্র আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদের এক সুবিশাল মহতী সমাবেশের সময়কাল হজ্ব মৌসুম ইসলাম ধর্মের প্রচার ও তাওহীদী আদর্শের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করারও সর্বোত্তম মৌসুম বা সময় ছিল। মহানবী (সা.) অবশ্যই প্রথম বারের মতো তাঁর হাতে আসা এ সুযোগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার

করবেন এবং তাঁর চিন্তা- ভাবনাকে এমন সব বিষয়ের দিকে নিবদ্ধ করবেন যেসব দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি দুর্গ জয় করার চেয়েও বহু গ মহান ও রত্বপূর্ণ। এ সব দিক বিবেচনা করে মহানবী (সা.) তায়েফ অবরোধ উঠিয়ে নেন এবং সেনাবাহিনী সাথে নিয়ে জিরানায় চলে যান। এখানে হুনাইন যুদ্ধের গণীমত ও যুদ্ধবন্দীদের রাখা হয়েছিল।

যুদ্ধোত্তর ঘটনাবলী

হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধ সমাপ্ত হলো। কোন ফলাফল অর্জন ছাড়াই মহানবী (সা.), তায়েফ যুদ্ধে যে সব গণীমত অর্জিত হয়েছিল, সে লো (যোদ্ধাদের মধ্যে) বণ্টন করে দেয়ার জন্য জিরানায় ফিরে যান। হুনাইন যুদ্ধে মুসলমানরা যে বিশাল দৃষ্টি আকর্ষণকারী গণীমত লাভ করেছিলেন, তা বিগত যুদ্ধ ও গায়ওয়াসমূহে কখনই ইসলামী বাহিনী অর্জন করতে পারে নি। কারণ মহানবী (সা.) যেদিন জিরানায় ফিরে যান সেদিন গণীমতসমূহ সংরক্ষণ করার কেন্দ্রে ছয় হাজার বন্দী, চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজারের অধিক দুগ্ধা এবং আট শ' বায়ান্ন কিলোগ্রাম রূপা ছিল^{৩৩} এবং সেদিন ইসলামী বাহিনীর ব্যয়ের একটি অংশ এ পথেই মেটানো যেত।

মহানবী (সা.) জিরানাহ্ এলাকায় ১৩ দিন অবস্থান করেন এবং এ সময় তিনি এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে গণীমতসমূহ বণ্টন করেন। কতিপয় যুদ্ধবন্দীকেও মুক্তি দেয়া হয়েছিল এবং তাদেরকে তিনি তাদের আীয়- স্বজন ও পরিচিতদের কাছে অর্পণ করেছিলেন। এখানে তিনি হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলনকারী মালিক ইবনে আউফের আ সমর্পণ ও ইসলাম গ্রহণ করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি তাঁর কর্মপদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাষায় সকল ব্যক্তির অবদানের ব্যাপারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং প্রাজ্ঞ নীতি অবলম্বন করে তাওহীদী আদর্শের প্রতি ইসলামের শত্রুদের হৃদয় আকৃষ্ট করলেন। আর (গণীমত বণ্টন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে) তাঁর ও একদল আনসারের মধ্যে বিরোধের উ ব ঘটে। এক চিত্তাকর্ষক আবেগময় ভাষণ প্রদান করে তিনি সে বিরোধের ইতি টানেন।

গণ- অধিকার প্রতি ১ ও বাস্তবায়ন

মহানবী (সা.)- এর অন্যতম চরিত্রবৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির অবদান ও অধিকার যত সামান্যই হোক, তা উপেক্ষা করতেন না এবং যে কোন ব্যক্তি তাঁর জন্য ভালো কাজ বা উপকার করলে তিনি তাকে তার কয়েক গ বেশি প্রদান করতেন।

মহানবী (সা.) তাঁর শৈশবকাল হাওয়াযিন গোত্রের একটি শাখা বনী সা'দ গোত্রে অতিবাহিত করেছিলেন এবং হালীমা সাদীয়াহ্ নাম্নী এক মহিলা তাঁকে স্তন্যদান করেছিলেন। সেই মহিলা পাঁচ বছর তাঁকে লালন- পালন করেছিলেন।

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বনী সা'দ গোত্র, যাদের একদল নারী ও শিশু এবং কিছু পরিমাণ সম্পদ হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল, নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়। তারা জানত, মুহাম্মদ (সা.) তাদের মাঝে প্রতিপালিত হয়েছেন এবং তাদের স্বগোত্রীয় এক মহিলার স্তন্য পান করেছেন। অন্যদিকে তিনি বিশেষ ধরনের স্নেহ, মমতা, মহানুভবতা ও কৃতজ্ঞতাবোধ সম্পন্ন। তারা যদি এ বিষয়ের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হলে নিঃসন্দেহে তিনি তাদের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেবেন এবং তাদের আশ্রয়-স্বজনদের কাছে ফেরত পাঠাবেন।

এ গোত্রের চৌদ্দ জন সর্দার, যাঁদের প্রত্যেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং যাঁদের নিয়ে গঠিত নেতৃত্বে একজন ছিলেন যুহাইর ইবনে সারদ এবং অপর ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর দুধ চাচা, তাঁরা মহানবীর কাছে এসে আবেদন জানালেন :

“ যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে আপনার দুধ- ফুফু, দুধ- খালা, দুধ- বোন এবং আপনার শৈশবকালের সেবিকারা রয়েছেন। মহানুভবতা ও স্নেহ- মমতার অনিবার্য ফল হচ্ছে এটাই যে, আপনার কাছে এ গোত্রের কতিপয় নারীর যে অধিকার আছে, তা সংরক্ষণ করার খাতিরে আমাদের সকল নারী, পুরুষ ও শিশু যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দিন। আর আপনি যেখানে দয়া ও অনুগ্রহের সাগর, সেখানে আপনার কথা বাদ দিলেও আমরা যদি ইরাক ও শামের নেতা নূমান ইবনে মুনযির বা হারিস ইবনে আবি শিমরের কাছে এ ধরনের অনুরোধ করতাম, তা হলেও তা গৃহীত হবার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী থাকতাম।” মহানবী (সা.) তাদের কথার জবাবে বললেন : “তোমরা কি তোমাদের নারী ও শিশুদের বেশি ভালোবাস, না তোমাদের সম্পদ লো অধিক পছন্দ কর?” তারা সবাই মহানবীর এ প্রশ্নের জবাবে বলল : “কোন কিছুই সাথে কখনোই আমরা আমাদের নারী ও শিশুদের বিনিময় করব না।” মহানবী বললেন : “আমি আমার ও আবদুল মুত্তালিবের

বংশধরদের প্রাপ্য অংশ তোমাদের প্রদান করতে প্রস্তুত আছি। তবে মুহাজির, আনসার ও অন্যান্য মুসলমানের অংশ তাদের নিজেদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তাদেরকে স্বেচ্ছায় তাদের প্রাপ্য অংশ ও অধিকার ত্যাগ করতে হবে।” তখন তিনি তাদেরকে বললেন : “আমি যখন যুহরের নামায পড়ব তখন তোমরা মুসল্লীদের কাতারসমূহের মধ্য থেকে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এ কথা লো বলবে : আমরা মহানবীকে মুসলমানদের কাছে সুপারিশকারী এবং মুসলমানদেরও মহানবীর কাছে মধ্যস্থতাকারী করছি, যাতে আমাদের নারী ও শিশুদের আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। ঠিক তখন আমিও দাঁড়িয়ে যা কিছু আমার ও আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের সাথে সংশ্লিষ্ট, তা তোমাদের প্রদান করব এবং অন্যদের কাছেও অনুরোধ জানাব যে, তারাও যেন তাদের প্রাপ্য অংশ তোমাদের প্রদান করে।

যুহরের নামাযের পর গোত্র-প্রতিনিধিরা মহানবী (সা.)-এর শিখিয়ে দেয়া কথা লোই উপস্থিত মুসল্লীগণকে বলল এবং মহানবী (সা.) নিজের ও তাঁর নিকটায়গণের প্রাপ্য অংশ তাদেরকে দিয়ে দিলেন।” মুহাজির ও আনসারগণও মহানবীকে অনুসরণ করে তাঁদের সংশ্লিষ্ট অংশ তাদেরকে দিয়ে দিলেন। এ সময় আকবা ইবনে হারিস ও উয়াইনাহ ইবনে হিসন-এর মতো কতিপয় ব্যক্তি নিজেদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকে। মহানবী তাদেরকে বললেন: “তোমরা যদি তোমাদের বন্দীদের (তাদের আ'ীয়-স্বজনদের কাছে) দিয়ে দাও, তা হলে আমি প্রত্যেক বন্দীর বিপরীতে (এরপর) প্রথম যুদ্ধে যে সব বন্দী অধিকারে আসবে, তাদের মধ্য থেকে ছয় জনকে প্রদান করব।” ৩৮৪

মহানবী (সা.)-এর বাস্তব পদক্ষেপ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণে কেবল এক বৃদ্ধা, যাকে উয়াইনা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, সে ছাড়া হাওয়াযিন গোত্রীয় সকল যুদ্ধবন্দী মুক্তি পেল। ষাট বছর পূর্বে বনী সা'দ গোত্রের আবাসভূমিতে হালীমা সাদীয়ার হাতে রোপিত একটি ভালো কাজ দীর্ঘ সময় গত হবার পর ফল দান করল^{৩৮৫} এবং ঐ ভালো কাজের ছায়ায় হাওয়াযিন গোত্রের সকল যুদ্ধবন্দী দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেল।

অতঃপর মহানবী তাঁর দুধ- বোন শাইমাকে নিজের কাছে ডেকে মাটির উপর নিজ চাদর বিছিয়ে তার উপর বসালেন এবং তাঁর ও তাঁর পারিবারিক জীবনের খোঁজ- খবর নিলেন। মহানবী (সা.) হাওয়াযিন গোত্রের সকল যুদ্ধবন্দীকে মুক্তিদান করে ইসলাম ধর্মের প্রতি এ গোত্রের আকর্ষণ কয়েক গ বৃদ্ধি করে দিলেন এবং এ গোত্রের সবাই আন্তরিকতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করল। এভাবে তায়েফ তার সর্বশেষ মিত্রও হারাল।

মালিক ইবনে আউফের ইসলাম গ্রহণ

এ সময় মহানবী (সা.) নাসর গোত্রের লৌহমানব ও হুনাইন যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলনকারী মালিক ইবনে আউফের সমস্যা বনী সা'দ গোত্রের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সমাধান করার সুবর্ণ সুযোগ পেলেন এবং তার সদ্যবহারও করলেন, যাতে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং তার মিত্র সাকীফ গোত্রের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। এ কারণে তিনি মালিকের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সবাই তাঁকে বলল : “সে তায়েফে আশ্রয় নিয়েছে এবং সাকীফ গোত্রের সাথে সহযোগিতা করছে।” মহানবী বললেন : “আমার পক্ষ থেকে এ বার্তা তার কাছে তোমরা পৌঁছে দিয়ে বলবে : যদি সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং আমাদের সাথে যোগ দেয়, তা হলে আমি তার আ'ীয়- স্বজনদের (দাসত্ব বন্ধন থেকে) মুক্ত করে দেব এবং তাকেও এক শ' উট প্রদান করব।” হাওয়াযিন প্রতিনিধিরা মহানবী (সা.)- এর বার্তা তার কাছে পৌঁছে দেয়। সে নিজেও সাকীফ গোত্রের অবস্থা নাজুক ও টাল-মাটাল দেখতে পাচ্ছিল এবং অন্যদিকে সে ইসলাম ধর্মের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কেও জ্ঞাত ছিল। তাই সে তায়েফ থেকে বের হয়ে মুসলমানদের সাথে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। কিন্তু সে ভয় পাচ্ছিল, সাকীফ গোত্র তার এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জেনে গিয়ে তাকে দুর্গের অভ্যন্তরে আটকে ফেলতে পারে! সে তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সে তায়েফ থেকে দূরে একটি স্থানে তার জন্য একটি হাওদাবিশিষ্ট উট প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেয়। অতঃপর সে ত সেখান থেকে জিরানায় এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আর মহানবীও তাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে মোতাবেক তার

সাথে আচরণ করলেন এবং তাকে নাসর, সামালাহ ও সালিমাহ গোত্রের মুসলমানদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলেন।

সে তার স্বভাবসুলভ গৌরববোধ ও ইসলাম প্রদত্ত তার মর্যাদার কারণে সাকীফ গোত্রের জীবনযাত্রা সংকীর্ণ করে ফেলেছিল এবং তাদের তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ও দুরবস্থার মধ্যে আপতিত করেছিল।

সে মহানবী (সা.)-এর অনুগ্রহের কাছে নিজেকে অত্যন্ত লজ্জিত মনে করে মহানবীর অতুলনীয় দয়া, মহানুভবতা এবং উন্নত চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে বেশ কিছু কাব্য রচনা করেছিল যেসবের সূচনায় নিম্নোক্ত পঙ্ক্তিটি রয়েছে :

مَا أَنْ رَأَيْتَ وَلَا سَمِعْتَ بِمِثْلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ بِمِثْلِ مُحَمَّدٍ

“ আমি কখনোই সমগ্র মানব জাতির মাঝে মুহাম্মদের সমকক্ষ না কাউকে দেখেছি,
আর না কারো কথা শুনেছি।” ^{৩৮৬}

গনীমত বণ্টন

মহানবী (সা.)- এর সাহাবীগণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুদ্ধলব্ধ গনীমত লো বণ্টন করে দেয়ার ব্যাপারে জোর দিতে লাগল। মহানবী (সা.) তাঁর অনাগ্রহ প্রমাণের জন্য একটি উটের পাশে দাঁড়িয়ে উটের কুঁজের কিছু পশম মুষ্টিবদ্ধ করে জনতার দিকে মুখ করে বলেছিলেন : “তোমাদের যুদ্ধলব্ধ গনীমত লোর মধ্যে কেবল খুমস ব্যতীত আমার আর কোন অধিকার নেই। এমনকি, এ খুমস- যা আমার অধিকার, তাও তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেব। তাই তোমাদের কারো কাছে যে কোন ধরনের গনীমতই থাকুক, যদি তা সুঁই-সূতাও হয়, তবুও সে যেন তা ফেরত দেয়, যাতে ন্যায্যভাবে এ সব গনীমত তোমাদের মাঝে বণ্টন সম্ভব হয়।”

মহানবী (সা.) মুসলমানদের মধ্যে পুরো বাইতুল মাল বণ্টন করে দিলেন এবং বাইতুল মালের খুমস- যা কেবল তাঁর ছিল, তা তিনি কুরাইশ নেতৃবর্গের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন এবং আবু সুফিয়ান ও তার ছেলে মুআবিয়া, হাকিম বিন হিয়াম, হারিস ইবনে হারিস, হারিস ইবনে হিশাম, সুহাইল ইবনে আমর, হুওয়াইতিব ইবনে আবদুল উয়্যা, আলা ইবনে জারিয়াহ্ প্রমুখের মতো ব্যক্তিবর্গ, যারা সবাই বিগত দিন পর্যন্ত কুফর ও শিরকের প্রতিভূ এবং মহানবী (সা.)- এর কঠোর শত্রু ছিল, তাদের প্রত্যেককে এক শ' টি করে উট প্রদান করলেন। একইভাবে পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের চেয়ে যাদের শত্রুতামূলক অবস্থান একটু কম ছিল, তাদের প্রত্যেককে পঞ্চাশটি করে উট দিয়েছিলেন। আর তারা এ ধরনের মূল্যবান দান ও গনীমত লোয় নিজেদের আরো অন্যান্য অংশসহ মহানবীর স্নেহ, ভালোবাসা ও অনুগ্রহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের অজান্তেই ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় এ গোষ্ঠীকে মুআল্লাফাতুল কুলূব^{৩৮৭} (مؤلفۃ القلوب) বলা হয়েছে এবং ইসলাম ধর্মে যাকাত যে সব খাতে ব্যয় করা হয়, সে লোর একটি হচ্ছে এ গোষ্ঠী।

ইবনে সা'দ^{রাঃ} স্পষ্ট লিখেছেন : (মহানবীর) এ সব দান আসলে ঐ খুমস^{রাঃ} থেকে ছিল, যা ব্যক্তিগতভাবে মহানবী (সা.)- এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল (অর্থাৎ মহানবী যুদ্ধলব্ধ গনীমত থেকে যে খুমস পেয়েছিলেন)। আর তিনি অন্যের অধিকার থেকে একটি দীনার নিয়ে তা কখনই এ গোষ্ঠীর হৃদয় জয় করা অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করার পথে ব্যয় করেন নি।

মহানবীর এ ধরনের উদারভাবে দান একদল মুসলমান এবং বিশেষ করে কতিপয় আনসারের কাছে অত্যন্ত দুর্বিষহ বলে মনে হয়েছিল। যারা মহানবীর এ দানসমূহের সুমহান লক্ষ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল না, তারা ভেবেছিল, বংশগত পক্ষপাতিত্ব ও গোঁড়ামি মহানবীকে গনীমতের খুমস নিজ আ'ীয়- স্বজনদের মাঝে বণ্টন করে দিতে প্ররোচিত করেছে! এমনকি 'যুল খুওয়াইসিরা' নামক তামীম গোত্রের এক ব্যক্তি এতটা স্পর্ধা প্রদর্শন করেছিল যে, সে মহানবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেই ফেলল : “আজ আমি আপনার কাজ লো সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করে দেখতে পেলাম, গনীমত বণ্টন করার ক্ষেত্রে আপনি ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করেন নি।”

মহানবী এ লোকটির স্পর্ধামূলক কথায় খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর মুখমণ্ডলে ক্ষোভ ও উষ্ণার চিহ্ন প্রকাশ পেল। তিনি তখন বললেন : “তোমার জন্য আক্ষেপ! আমার কাছে যদি ন্যায়পরায়ণতা না থাকে, তা হলে তা কার কাছে থাকবে?” দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর মহানবীর কাছে তাকে হত্যা করার জন্য আবেদন করলে তিনি বলেছিলেন : “তাকে ছেড়ে দাও। সে ভবিষ্যতে এমন এক দলের নেতা হবে, তীর যেভাবে ধনুক থেকে বের হয়ে যায়, তদ্রূপ তারাও ইসলাম ধর্ম থেকে বের হয়ে যাবে।” ^{৩৯০}

ঠিক যেভাবে মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তদ্রূপ এ লোকটি হযরত আলী (আ.)- এর শাসনামলে খারেজী সম্প্রদায়ের প্রধান হয়েছিল এবং ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক এ গোষ্ঠীর নেতৃত্ব তার হাতে ছিল। তবে অপরাধের আগে অপরাধের শাস্তি দান ইসলাম ধর্মের নীতিমালার বিরোধী বিধায় মহানবী তাকে শাস্তি দেন নি। সা'দ ইবনে উবাদাহ আনসারগণের পক্ষ থেকে তাদের অভিযোগবর্তা মহানবী (সা.)- এর সামনে উপস্থিত করেন। মহানবী তাঁকে বললেন : “তাদের

সবাইকে একটি স্থানে জড়ো কর যাতে আমি তাদেরকে আসল ঘটনা ব্যাখ্যা করে বুঝাতে পারি।” মহানবী ভাবগান্ধীর সাথে আনসারগণের সভায় উপস্থিত হলেন এবং তাদের উদ্দেশে বললেন :

“ তোমরা পথ ঠে ও বিচ্যুত গোষ্ঠী ছিলে, যারা আমার মাধ্যমে সুপথ পেয়েছ। তোমরা দরিদ্র ছিলে; এখন তোমরা সম্ভল ও অভাবশূন্য হয়েছ। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে; এখন তোমরা একে অপরের প্রতি দয়াবান হয়েছ।” সবাই তখন স্বীকার করে বলল : “হে রাসূলুল্লাহ! এ কথা ঠিক।” মহানবী বললেন : “তোমরা আরেকভাবে আমাকে এ কথার জবাব দিতে পার এবং তোমরা আমার অবদানসমূহের বিপরীতে আমার ওপর তোমাদের যে সব অধিকার আছে, সে লো আমার সামনে তুলে ধরে বলতে পার : হে রাসূলুল্লাহ! যেদিন কুরাইশরা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, আমরা সেদিন আপনাকে গ্রহণ করেছি (আপনার নবুওয়াত সত্য বলে স্বীকার করেছি); কুরাইশরা যেদিন আপনাকে সাহায্য করে নি, সেদিন আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি; কুরাইশরা আপনাকে আশ্রয়হীন করলে আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনি যেদিন কপর্দকহীন ছিলেন, সেদিন আমরা আপনাকে আর্থিক সাহায্য করেছি।”

“ হে আনসাররা! আমি সামান্য সম্পদ কুরাইশদের দিয়েছি যাতে করে তারা ইসলাম ধর্মে অটল থাকে, তা থেকে তোমাদের ইসলাম ধর্মের কাছে সঁপে দিয়েছি, সেজন্য কেন তোমরা বিষণ্ণ হয়েছ? তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যেরা উট ও দুগ্ধ নিয়ে যাবে, আর তোমরা নিজেদের সাথে তোমাদের নবীকে নিয়ে যাবে? মহান আল্লাহর শপথ! যদি সমগ্র মানব জাতি এক পথে এবং আনসাররা আরেক পথে চলে, তা হলে আমি আনসারদের পথই বেছে নেব।”

অতঃপর তিনি আনসার এবং তাদের সন্তান- সন্ততিদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। মহানবী (সা.)- এর ভাষণ আনসারগণের অনুভূতিকে এতটা নাড়া দিয়েছিল যে, তাঁরা সবাই কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন : “হে রাসূলুল্লাহ! আমরা আমাদের প্রাপ্ত অংশের ব্যাপারে সন্তুষ্ট আছি এবং আমাদের সামান্যতম অভিযোগও নেই।”

মহানবী (সা.)- এর উমরা পালন

গনীমত বণ্টন করার পর মহানবী (সা.) জিরানাহ্ থেকে উমরা পালন করার উদ্দেশ্যে পবিত্র ম া
গমন করলেন। তিনি উমরার আমলসমূহ আঞ্জাম দেয়ার পর ষিল দ মাসের শেষে বা ষিলহজ্ব
মাসের প্রথম দিকে পবিত্র মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।^{৩৯১}

বায়ান্নতম অধ্যায় : অষ্টম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

কা'ব ইবনে যুহাইরের বিখ্যাত কাসীদাহ

হিজরতের অষ্টম বর্ষের পবিত্র যিল দ মাসের মাঝামাঝিতে মহানবী (সা.) জিরানায় হুনাইন যুদ্ধের গণীমত বণ্টন করার কাজ শেষ করে অবকাশ লাভ করেন। হজ্ব মৌসুমও ঘনিয়ে এল এবং হিজরতের অষ্টম বর্ষ ছিল পবিত্র ম ার ইসলামী হুকুমতের তত্ত্বাবধান ও নেতৃত্বে মুসলমান ও মুশরিক নির্বিশেষে সমগ্র আরব জাতির হজ্ব পালন করার প্রথম বছর। মহতী এ অনুষ্ঠানে মহানবীর অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে হজ্বের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করত এবং তাঁর প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের দ্বারা ঐ মহতী সমাবেশে ইসলাম ধর্মের মৌলিক ও প্রকৃত প্রচার কার্যক্রমের বাস্তবায়নও সম্ভব হতো।

অন্যদিকে ইসলামী হুকুমতের প্রাণকেন্দ্র মদীনায় মহানবী (সা.)- এর বেশ কিছু দায়িত্ব ছিল এবং তিন মাস যাবত তিনি মদীনা নগরীর বাইরে ছিলেন। আর যে সব বিষয় সেখানে সরাসরি তাঁকেই আঞ্জাম দিতে হতো সেসব সম্পূর্ণরূপে তত্ত্বাবধায়কশূন্য হয়ে পড়েছিল। মহানবী সমুদয় দিক পর্যালোচনার পর এক উমরা সম্পন্ন করে পবিত্র ম া ত্যাগ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মদীনায় ফিরে যাওয়ার মধ্যেই কল্যাণ দেখতে পেলেন।

নব্য বিজিত অঞ্চলের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়াদি পরিচালনার জন্য এমন সব ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা প্রয়োজন ছিল যেন মহানবীর অনুপস্থিতিতে কোন সংকটের উ ব না হয়। এ কারণেই একজন সহিষ্ণু ও বুদ্ধিমান যুবক উত্তাব ইবনে উমাইদ, যাঁর জীবন থেকে বিশ বসন্তের অধিক সময় গত হয় নি, তাঁকে মহানবী এক দিরহাম মাসোহারার বিনিময়ে পবিত্র ম ার প্রশাসক ও শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করলেন। এ কাজের মাধ্যমে তিনি কতক লো ভুল ধারণা ভেঙে দিয়েছিলেন। মহানবী এ কাজের দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন, সামাজিক পদ ও দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ও নিযুক্ত হবার বিষয়টি শুধু যোগ্যতার সাথেই সম্পর্কিত এবং অল্প বয়স্ক হওয়া কখনোই একজন যোগ্যতাসম্পন্ন যুবকের সবচেয়ে বড় সামাজিক পদমর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে না। পবিত্র ম ার শাসনকর্তা এক বিশাল জনসমাবেশে জনতার উদ্দেশে বলেছিলেন : “মহানবী (সা.)

আমার জন্য মাসোহারার ব্যবস্থা করেছেন এবং আমি এ কারণে আপনাদের উপটোকন ও সাহায্যের মোটেই মুখাপেক্ষী নই।” ৩৯২

মহানবী (সা.)- এর আরেক সুন্দর নির্বাচন হচ্ছে এই যে, তিনি মুয়ায ইবনে জাবালকে (ম বাসীদের) ধর্মীয় বিধি-বিধান ও পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন।

তিনি সাহাবীগণের মাঝে ফিকহ্ এবং পবিত্র কুরআনের বিধি-বিধান সংক্রান্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এমনকি মহানবী (সা.) যখন তাঁকে ইয়েমেনে বিচারকাজ পরিচালনা করার জন্য দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : “বিচার ফয়সালায় ক্ষেত্রে তোমার দলিল-প্রমাণ কী হবে?” তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন : “মহান আল্লাহর কিতাব।”

মহানবী তখন বললেন : “যদি পবিত্র কুরআনে ঐ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ না থাকে, তা হলে তুমি কিসের ভিত্তিতে বিচারকাজ সম্পন্ন করবে?” তিনি বললেন : “মহানবী (সা.) সম্পাদিত বিচারকাজসমূহের ভিত্তিতে। কারণ আমি বিভিন্ন বিষয়ে আপনার বিচারকাজ পর্যবেক্ষণ করেছি এবং মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছি। যদি এমন কোন ঘটনা ঘটে যার বিষয়বস্তু আপনার কোন একটি বিচারের অনুরূপ হয়, তা হলে আপনার বিচার থেকে সাহায্য নিয়ে তদনুসারে ফয়সালা দেব।”

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তৃতীয় বারের মতো তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : “যদি এমন কোন ঘটনা ঘটে যে ব্যাপারে মহান আল্লাহর কিতাবে কোন স্পষ্ট নির্দেশ নেই এবং আমার পক্ষ থেকেও কোন রায় প্রদান করা হয় নি, তা হলে তুমি কী করবে?” তখন তিনি বলেছিলেন : “আমি ইজতিহাদ করব এবং শরীয়তের মূলনীতি, ন্যায়পরায়ণতা ও সাম্যের (ইনসাফের) ভিত্তিতে বিচার করব।”

তখন মহানবী বলেছিলেন : “মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এজন্য যে, তিনি বিচারকাজ পরিচালনা করার জন্য এমন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করার ক্ষেত্রে তাঁর নবীকে সফল করেছেন, যাঁর কর্মকাণ্ড সন্তোষজনক।” ৩৯৩

কা'ব ইবনে যুহাইর ইবনে আবী সালামার ঘটনা

যুহাইর ইবনে আবী সালামা জাহিলীয়াতের যুগে আরব কবি ও কথাশিল্পীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি 'আল মুআল্লাকাত আস্ সাবআহ' অর্থাৎ 'প্রসিদ্ধ ঝুলন্ত সাত কাব্য' - এর একটির রচয়িতা ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ সাত কাব্য পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হবার আগে পবিত্র কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল এবং সে লো আরব সাহিত্যের গর্ব ও মর্যাদার প্রতীক বলে গণ্য হতো।^{৩৯৪} তিনি মহানবী (সা.)- এর রিসালাত ও নবুওয়াতের আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং বুজাইর ও কা'ব নামের দু' পুত্রসন্তান রেখে গিয়েছিলেন। প্রথম সন্তান (বুজাইর) মহানবীর বিশ্বস্ত অনুরাগী ও গণগ্রাহীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং দ্বিতীয় সন্তান (কা'ব) তাঁর কঠোর শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কা'ব এক শক্তিশালী বংশগত কাব্যপ্রতিভার অধিকারী থাকায় তার কবিতা ও কাসীদায় মহানবীর প্রতি কটাক্ষ করত এবং তাঁর নিন্দা ও গালমন্দ করে একদল লোককে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে উস্কানী দিত।

মহানবী (সা.) ২৪ যিল দ মদীনায় প্রবেশ করেন। কা'ব-এর ভাই মা'বিজয়, তায়েফ অবরোধ এবং মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে মহানবীর সাথে ছিলেন। তিনি নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করলেন যে, মহানবী (সা.) কতিপয় কবি, যারা তাঁর ভাইয়ের মতো তীব্র বিদ্রূপ ও গালিগালাজকারী ছিল এবং জনগণকে ইসলামের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করত, তাদেরকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন এবং তাদের রক্ত মূল্যহীন বলে ঘোষণা করেছেন। অবশেষে ঐ সব কবির একজনকে হত্যাও করা হয়েছে এবং আরো দু'জন কবি পালিয়ে গিয়ে জনদৃষ্টির অন্তরালে আ গোপন করেছে।

বুজাইর কা'বের কাছে একটি চিঠিতে পুরো ঘটনা লিখে জানালেন এবং চিঠির শেষে শুভেচ্ছাস্বরূপ উল্লেখ করলেন, যদি সে মহানবীর প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ অব্যাহত রাখে, তা হলে তাকে হত্যা করা হবে। আর যদি সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে তার অতীত

কর্মের ব্যাপারে অনুশোচনা ও দুঃখ প্রকাশ করে অনুতপ্ত হয়, তা হলে মহানবী অনুতপ্ত ব্যক্তিদের তওবা গ্রহণ করেন এবং তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

কা'ব তার ভাইয়ের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করলেন এবং পবিত্র মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। তিনি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার সময় মহানবী ফজরের নামায পড়ানোর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। কা'ব প্রথম বারের মতো মহানবী (সা.)- এর সাথে নামায আদায় করলেন। অতঃপর তিনি মহানবীর পাশে বসে তাঁর হাতের উপর নিজের হাত রেখে বললেন : “হে রাসূলুল্লাহ! কা'ব তার অতীত কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছে এবং এখন সে একত্ববাদী দীনের প্রতি তার বিশ্বস্ততা প্রকাশ করার জন্য এসেছে। সে যদি নিজে আপনার কাছে উপস্থিত হয়, তা হলে কি আপনি তার তওবা গ্রহণ করবেন?” মহানবী তখন বললেন : “হ্যাঁ।” তখন কা'ব বললেন : “আমিই সে কা'ব ইবনে যুহাইর।”

কা'ব মহানবীর প্রতি তার অতীতের সকল কটুক্তি, নিন্দাবাদ, বিদ্রূপ ও অবমাননার প্রতিকার বিধান করার উদ্দেশ্যে একটি মনোরম কাসীদাহ, যা তিনি আগেই মহানবী (সা.)- এর প্রশংসায় রচনা করে এনেছিলেন, তা মহানবী ও তাঁর সাহাবীগণের সামনে মসজিদে পাঠ করলেন।^{৩৯৫} চমৎকার এ কাসীদা কা'বের সর্বোৎকৃষ্ট কাসীদাসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং যেদিন এ কাসীদা মহানবীর সামনে পাঠ করা হয়েছিল, সেদিন থেকে মুসলমানরা এ কাসীদা মুখস্ত ও প্রচার করার ব্যাপারে যত্ন নিয়েছে। ঠিক একইভাবে মুসলিম জ্ঞানী গী ও আলেমগণের পক্ষ থেকে এ কাসীদার অনেক ব্যাখ্যাও লেখা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ কাসীদা ‘লামিয়াহ’ রীতিতে^{৩৯৬} রচিত। এ কাব্যের মোট পঙ্ক্তির সংখ্যা হচ্ছে ৫৮। এর শুরুতে রয়েছে নিম্নোক্ত পঙ্ক্তি :

بانت سعاد فقلبي اليوم مبتول متيم اترها لم يُفد مكبول

জাহিলীয়াতের যুগের কবিরা, যারা প্রেমিকাকে সম্বোধন করে বা ধ্বংস হয়ে যাওয়া স্মৃতিচিহ্ন উল্লেখ করার মাধ্যমে নিজেদের কাব্য বা কাসীদা শুরু করত, তাদের রীতিতে কা'বও তাঁর এ কাসীদা তাঁর চাচার মেয়ে প্রেমিকা সুয়াদকে সুরণ করে শুরু করেন এবং বলেন :

“ সুয়াদ আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে
এবং আমার হৃদয় আজ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।
আর তার অনুপস্থিতিতে তা হীন ও অপদস্থ;
আর এখনো তার মোহ থেকে আমার হৃদয় মুক্তি পায় নি
এবং তা তার কাছে এখনো বন্দী হয়ে আছে।”

কা'ব তাঁর গর্হিত কার্যকলাপ সম্পর্কে ক্ষমা চেয়ে ও দুঃখ প্রকাশ করে নিম্নোক্ত পঙ্ক্তিতে বলেন :

نُبِّئْتُ أَنَّ الرَّسُولَ أَوْعَدَنِي وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَأْمُولٌ

“ আমাকে জানানো হয়েছে,
রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে (প্রাণনাশের) হুমকি দিয়েছেন,
অথচ রাসূলুল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা করে দেয়াই হচ্ছে কাম্য।”

এরপর তিনি বলেন :

إِنَّ الرَّسُولَ لِلَّهِ لَنُورٍ يُسْتَضَاءُ بِهِ مَهْتَدٍ مِنْ سِيوفِ اللَّهِ مَسْلُولٍ

“ মহানবী এমন এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা
যার আলোকরশ্মির প্রভাবে
বিশ্ববাসী সৎ পথে পরিচালিত হয়
এবং তিনি মহান আল্লাহর উন্মুক্ত তলোয়ারসমূহের অন্তর্ভুক্ত
যা সর্বত্র ও সবসময় পূর্ণরূপে বিজয়ী।” ৩৯৭

শোক ও আনন্দের একাত্মতা

হিজরতের অষ্টম বর্ষের শেষের দিকে মহানবী (সা.) তাঁর জ্যেষ্ঠা^{৩৯৮} কন্যা হযরত যায়নাবকে হারান। তিনি মহানবীর নবুওয়াত লাভের আগেই খালাত ভাই আবুল আসের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং সাথে সাথে তিনি পিতার রিসালতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী শিরক ও পৌত্তলিকতায় বহাল থেকে যায়। সে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং (মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়)। মহানবী (সা.) তাকে মুক্তি দেন এবং এ কারণে শর্ত করেন যে, তাঁর কন্যা যায়নাবকে সে মদীনায় পাঠিয়ে দেবে। সেও তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল এবং (মায় ফিরে গিয়ে) মহানবীর কন্যা যায়নাবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু কুরাইশ নেতৃবর্গ তাঁকে (যায়নাব) মাঝপথ থেকে মায় ফিরিয়ে নেয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়। ঐ লোকটি পথিমধ্যে হযরত যায়নাবের হাওদার কাছে গিয়ে তাঁর হাওদার মধ্যে বর্শা ঢুকিয়ে দেয়। মহানবীর আশ্রয়হীনা কন্যা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁর গর্ভপাত ঘটে। তবে তিনি মদীনায় চলে যাওয়ার ইচ্ছার ওপর অটল থাকেন এবং অত্যন্ত বেদনাক্লিষ্ট ও অসুস্থ শরীরে মদীনায় প্রবেশ করেন। আর (তখন থেকে) তিনি জীবনের অবশিষ্ট সময় অসুস্থতার মধ্যে কাটান এবং হিজরতের অষ্টম বর্ষের শেষভাগে তিনি ইস্তেকাল করেন। এ শোক ও দুঃখ আরেকটি আনন্দের সাথে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কারণ মহানবী (সা.) ঐ বছরের শেষের দিকে, মিশরের শাসনকর্তা মুকুকেস তাঁর (মহানবীর) জন্য যে পরিচারিকা উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন, তাঁর গর্ভে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন- যাঁর নাম তিনি ‘ইবরাহীম’ রেখেছিলেন। যখন ধাত্রী (সালমা) মহানবীকে মহান আল্লাহ্ এক পুত্রসন্তান দিয়েছেন এ সুসংবাদ দিলেন, তখন তিনি তাকে একটি অত্যন্ত মূল্যবান উপহার প্রদান করেছিলেন।

সপ্তম দিবসে মহানবী (শিশুসন্তানের জন্য) একটি দুগ্ধা আকীকা দিলেন এবং নবজাতকের মাথার চুল ছেঁটে তার সম ওজনের রূপা মহান আল্লাহর পথে দান করলেন।^{৩৯৯}

তেপ্পান্নতম অধ্যায় : নবম হিজরীর ঘটনাগ্রবাহ

তাঈ গোত্রের আবাসভূমিতে হযরত আলী (আ.)

আদী ইবনে হাতেমের ইসলাম গ্রহণ

হিজরতের অষ্টম বর্ষ সকল আনন্দ, দুঃখ ও তিক্ততাসহ অতিবাহিত হলো। এ বছর শিরক, পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজার সবচেয়ে বড় ঘাঁটি মুসলমানদের পদানত হয় এবং দীন ইসলামের মহান নেতা পরিপূর্ণ বিজয় সহকারে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইসলামের সামরিক শক্তি আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। আরবের বিদ্রোহী ও উদ্ধত গোত্র লো, যারা ঐ দিন পর্যন্ত ইসলাম ও তাওহীদবাদের এহেন বিজয় সম্পর্কে মোটেই চিন্তা করত না, ধীরে ধীরে এ চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছিল যে, তারা মুসলমানদের নিকটবর্তী হবে এবং তাদের ধর্ম গ্রহণ করবে। এ কারণেই বিভিন্ন আরব গোত্রের প্রতিনিধিরা এবং কখনো কখনো গোত্রীয় নেতাদের নেতৃত্বে আরব গোত্র মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও ঈমান আনার কথা ঘোষণা করতে থাকে। হিজরতের নবম বর্ষে গোত্র লোর প্রতিনিধিরা এত বেশি মদীনায় আসা-যাওয়া করেছিল যে, এ কারণে ঐ বছরের নামকরণ হয়েছিল ‘প্রতিনিধি দল লোর আগমনের বর্ষ’ বা ‘আমুল উফুদ’^{৪০০} (عام الوفود)।

যাইদুল খাইল-এর নেতৃত্বে তাঈ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয় এবং গোত্রপতি কথা বলা শুরু করে। মহানবী যাইদুল খাইল-এর বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তা দেখে বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন : “আরবের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তবে তাদের সম্পর্কে যা শুনেছিলাম, তার চেয়ে তাদেরকে অনেক কম যোগ্যতাসম্পন্নই পেয়েছি। কিন্তু যাইদ সম্পর্কে যা শুনেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন পেয়েছি। তাই তাকে ‘যাইদুল খাইল’ বলার পরিবর্তে ‘যাইদুল খাইর’ (কল্যাণের যাইদ) বলা কতই না উত্তম!”^{৪০১}

এ প্রতিনিধি দলের বৃত্তান্ত^{৪০২} অধ্যয়ন এবং মহানবী (সা.)- এর সাথে তাদের কথোপকথন সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করা হলে স্পষ্ট হয়ে যায়, যুক্তিপ্রমাণ নির্ভর প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলাম আরব উপদ্বীপে প্রসার লাভ করেছিল। অবশ্য যুগের সীমা লঙ্ঘনকারী অত্যাচারী- তাগুতী চক্র আবু সফিয়ান, আবু জেহেলরা ইসলাম ধর্মের স্বাভাবিক প্রচার ও প্রসারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শত্রুদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র নস্যাত করা ছাড়াও এ সব অত্যাচারী চক্রকে ঠাট্টা দিয়ে দেয়ার জন্যও মহানবীর যুদ্ধসমূহ পরিচালিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ তাগুতী চক্র ইসলামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং হিজায়, নজদ ও অন্যান্য এলাকায় ইসলামের প্রচার-সৈনিকগণের প্রবেশের পথে বাধাদান করত। তাগুতীদের উৎখাত এবং প্রচার ও প্রসারের পথে যে সব কাঁটা বিদ্যমান, সে লো উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত কোন ধর্ম ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, শুধু মহানবীই নন, বরং সকল নবীই সর্বাত্মে তাগুতী চক্রকে দমন ও প্রতিবন্ধকতা লো ধ্বংস করার জন্য নিজেদের সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছেন।

পবিত্র কুরআন সূরা নাসর- এ প্রতিনিধি দল লোর আগমন এবং আরব উপদ্বীপে ইসলামের ক্রমবর্ধমান বিজয় প্রসঙ্গে বলেছে :

(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا)

“ যখন মহান আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে; আর আপনি মানুষকে দেখবেন, দলে দলে মহান আল্লাহর দীনে প্রবেশ করছে, তখন আপনি আপনার রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অনুশোচনা গ্রহণকারী।” ^{৪০৩}

আরব গোত্র লোয় এ ধরনের প্রস্তুতি এবং তাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দল লোর আগমন সত্ত্বেও হিজরতের নবম বর্ষে সাতটি সারিয়াহ^{৪০৪} (سرية) এবং একটি গায়ওয়াহ^{৪০৫} (غزوة) সংঘটিত হয়েছিল।

যড়যন্ত্র লো নস্যোৎ করার জন্য এবং তখনও আরব গোত্র লোর মধ্যে যে সব বড় বড় মূর্তি ও প্রতিমা পূজার প্রচলন ছিল, সে লো ভাঙার জন্য প্রধানত এসব সারিয়াহ্ পরিচালনা করা হয়েছিল। এ সব সারিয়ার অন্যতম হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের সারিয়াহ্। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে তিনি তাঈ গোত্রের আবাসভূমির দিকে গমন করেন। হিজরতের নবম বর্ষে মহানবী (সা.)-এর গায়ওয়াসমূহের মধ্য থেকে তাবুকের গায়ওয়াহ্ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ গায়ওয়ায় মহানবী এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনা ত্যাগ করে তাবুক সীমান্ত অঞ্চলের দিকে যাত্রা করেন এবং শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হওয়া ও রক্তপাত ছাড়াই পবিত্র মদীনা নগরীতে ফিরে আসেন। তবে তিনি ভবিষ্যতের জন্য সীমান্ত শহর ও নগরী লো জয় করার পথ সুগম করেন।

প্রতিমালয় ও মন্দিরের ধ্বংস সাধন

মহানবী (সা.)- এর প্রধান ও মৌলিক দায়িত্ব ছিল তাওহীদী দীনের প্রসার এবং সব ধরনের দ্বিত্ববাদ ও শিরকের মূলোৎপাটন। তিনি প্রথম পর্যায়ে পথ ষ্ট ও মূর্তিপূজকদের সুপথ প্রদর্শনের জন্য যুক্তি ও দলিল- প্রমাণ উপস্থাপন করতেন এবং সুস্পষ্ট দলিল- প্রমাণ উত্থাপন করে শিরক ও পৌত্তলিকতা যে ভিত্তিহীন, সে ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তাঁর যুক্তি- প্রমাণ তাদের ওপর কার্যকরী প্রভাব রাখছে না এবং তারাও নিজেদের এক ঐমিতে অটল থাকছে বলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলে কেবল তখনই শক্তি প্রয়োগ এবং আঁকি রোগে আক্রান্ত, স্বেচ্ছায় ঔষধ সেবন থেকে বিরত এ সব ব্যক্তির ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে তাদের রোগ নিরাময়ের অধিকার তিনি নিজেই প্রদান করতেন।

একালে দেশের কোন একটি অঞ্চলে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হলে এবং একদল লোক নিজেদের পশ্চাদপদ ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এ রোগের প্রতিষেধক টীকা নেয়া থেকে বিরত থাকলে এসব সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী ব্যক্তি, যারা না জেনে- শুনে নিজেদের এবং অন্যদের স্বাস্থ্য ও জীবন মারা ক হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে, তাদের উপর শক্তি প্রয়োগ ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করে তাদেরকে প্রতিষেধক টীকা দেয়ার অধিকার নিঃসন্দেহে দেশের জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কর্তৃপক্ষ নিজেদের অবশ্যই প্রদান করবে।

মহানবী (সা.) ইলাহী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আলোকে বুঝতে পেরেছিলেন, মূর্তিপূজা কলেরার জীবাণুর মতো মহৎ চারিত্রিক গাবলী ও মর্যাদাবোধ নষ্ট করে দেয় এবং মানব জাতিকে উচ্চ স্থান থেকে নিচে ফেলে দেয়। আর এভাবে তা (শিরক ও পৌত্তলিকতা) তাকে পাথর, কাদামাটি ও হীন- নীচ বস্তুর সামনে দুর্বল ও নতজানু করে ফেলে।

সুতরাং তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শিরকের মতো আঁকি ব্যাধির মূলোৎপাটন, সব ধরনের মূর্তিপূজার বিলোপ সাধন এবং এ ব্যাপারে কোন গোষ্ঠী প্রতিরোধ গড়ে তুললে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাদের প্রতিরোধ ঝড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

ইসলামের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে মহানবী (সা.) হিজায়ের চারপাশে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে সকল প্রতিমালয় ধ্বংস এবং হিজায় অঞ্চলে কোন মূর্তি বা প্রতিমার অস্তিত্ব থাকতে না দেয়ার সুযোগ পান।

মহানবী (সা.) আগে থেকেই অবগত ছিলেন, তাঈ গোত্রের একটি বড় প্রতিমা আছে। একদল লোক এর পূজা করে থাকে। এ কারণেই তিনি ১৫০ অশ্বারোহী সৈন্য সহ তাঁর একজন প্রজ্ঞাবান ও রণনিপুণ সমরাদিনায়ককে ঐ গোত্রের প্রতিমালয় ধ্বংস এবং মূর্তিটি ভাঙার দায়িত্ব দিয়ে সেখানে প্রেরণ করলেন। সেনা অধিনায়ক বুঝতে পারলেন, ঐ গোত্র ইসলামী সৈনিকদের এ অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করবে এবং যুদ্ধ ছাড়া এ মিশন বাস্তবায়িত হবে না।

এ কারণে তিনি যে স্থানে ঐ প্রতিমা স্থাপিত ছিল, সে স্থানের উপর খুব ভোরে আক্রমণ চালিয়ে ঐ গোত্রের একদল প্রতিরোধকারী যোদ্ধাকে বন্দী করলেন এবং তাদেরকে যুদ্ধলব্ধ গনীমতের অংশ হিসেবে মদীনায় আনলেন।

আদী ইবনে হাতেম, যিনি পরবর্তীকালে মুজাহিদ মুসলমানদের সারিভুক্ত হয়েছিলেন এবং দানবীর পিতা হাতেমের পর ঐ অঞ্চলের নেতৃত্ব যাঁর হাতে ছিল, ঐ এলাকা থেকে কিভাবে পালিয়ে গিয়েছিলেন তার একটি বিবরণ তিনি দিয়েছেন :

“ আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আগে খ্রিষ্টান ছিলাম এবং মহানবী (সা.) সম্পর্কে অপপ্রচারের শিকার হওয়ায় আমি আমার অন্তরে তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করতাম। হিজায়ে তাঁর বড় বড় বিজয় সম্পর্কে আমি অজ্ঞ ছিলাম না এবং আমি নিশ্চিত ছিলাম, একদিন এ শক্তির তরঙ্গমালা ‘তাঈ ভূ-খণ্ড’ , যার কর্তৃত্ব আমার হাতে ছিল, সেখানে এসেও পৌঁছবে। এ কারণেই যাতে আমি আমার ধর্ম ত্যাগ না করি এবং ইসলামী সেনাবাহিনীর হাতেও বন্দী না হই, সেজন্য আমি আমার দাসদের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তারা যেন আমার তগামী উট লোকে যাত্রার জন্য সর্বদা প্রস্তুত রাখে। যখনই কোন বিপদ আসবে, তখনই প্রস্তুত করে রাখা উপায়- উপকরণ নিয়ে আমি শামের পথে যাত্রা করে মুসলমানদের প্রভাববলয় থেকে দূরে চলে যাব।

অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হওয়ার জন্য আমি সড়ক পথের উপর পর্যবেক্ষণকারীদের নিযুক্ত করেছিলাম যারা ইসলামী সেনাবাহিনীর পায়ের ধূলো বা তাদের পতাকা দেখামাত্রই আমাকে অবহিত করবে।

একদিন হঠাৎ আমার এক দাস এসে বিপদের ঘণ্টা বাজাল এবং আমাকে মুসলিম বাহিনীর আগমন সম্পর্কে অবহিত করল। আমি ঐ দিনই স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের সাথে নিয়ে প্রাচ্যে খ্রিষ্টানদের কেন্দ্র শামদেশ- এর দিকে প্রয়োজনীয় রসদপত্র এবং পথ চলার জন্য প্রস্তুত যাবতীয় উপকরণ সমেত যাত্রা করলাম।

আমার বোন তাঈ গোত্রের মধ্যে থেকে যায় ও বন্দী হয়। মদীনায় স্থানান্তরিত হবার পর মহানবী (সা.)- এর মসজিদের কাছে একটি বাড়ি- যা যুদ্ধবন্দীদের আবাসন কেন্দ্র ছিল, সেখানে আমার বোনকে রাখা হয়েছিল।

সে তার কাহিনী এভাবে বর্ণনা করেছে :

একদিন মহানবী (সা.) মসজিদে নামায আদায় করার জন্য যুদ্ধবন্দীদের আবাসস্থলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মহানবীর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম :

يا رسول الله هلك الوالد و غاب الوافد فامنن عليّ من الله عليك

হে রাসূলুল্লাহ! আমার পিতার মৃত্যু হয়েছে এবং আমার তত্ত্বাবধানকারীও লাপাত্তা হয়ে গেছে। তাই আপনি আমার ওপর করুণা করুন; আল্লাহও আপনার ওপর করুণা করবেন।

মহানবী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার তত্ত্বাবধানকারী কে? তখন আমি বললাম : আদী ইবনে হাতেম। তিনি বললেন : সে কি ঐ ব্যক্তি যে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছ থেকে শামদেশে পালিয়ে গেছে? মহানবী এ কথা বলে মসজিদের দিকে চলে গেলেন।

পরের দিনও আমার ও মহানবীর মাঝে এ কথোপকথনেরই পুনরাবৃত্তি হলো এবং তা নিস্ফল হলো। তৃতীয় দিন আমি মহানবীর সাথে কথা বলতে মোটেই আশাবাদী ছিলাম না। কিন্তু যখন মহানবী ঐ স্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এক যুবককে তাঁর পেছনে দেখলাম, যিনি আমাকে ইঙ্গিত করে বলছিলেন আমি যেন আমার গতকালের কথার পুনরাবৃত্তি করি। ঐ যুবকের

ইঙ্গিতে আশার আলো আমার অন্তর আলোকিত করে দিল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে মহানবীর কাছে আগের কথা লো তৃতীয় বারের মতো পুনরাবৃত্তি করলাম। মহানবী আমার কথার জবাবে বললেন: যাবার ব্যাপারে তুমি তাড়াছড়ো করো না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাকে একজন বিশ্বস্ত লোকের সাথে তোমার মাতৃভূমিতে ফেরত পাঠাব। কিন্তু বর্তমানে তোমার যাত্রার ক্ষেত্র তৈরি হয় নি।

আমার বোন বলেছে : যে যুবক মহানবী (সা.)-এর পেছনে হাঁটছিলেন এবং ইঙ্গিতে আমাকে মহানবীর কাছে আমার কথা লো পুনর্ব্যক্ত করতে বলেছিলেন, তিনি ছিলেন আলী ইবনে আবি তালিব।

একদিন এক কাফেলা, যার মাঝে আমার কিছু আশীযও ছিল, মদীনা থেকে শামদেশে যাচ্ছিল। আমার বোন মহানবীর কাছে তাকে ঐ কাফেলার সাথে শামদেশে তার ভাইয়ের কাছে চলে যাবার অনুমতি দানের জন্য আবেদন জানাল। মহানবী তার আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং তার হাতে সফরের খরচ বাবদ কিছু অর্থ, পথ চলতে সক্ষম একটি সওয়ারী পশু এবং কিছু পোষাক দিলেন। আমি শামে আমার কক্ষে বসেছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, হাওদাসমেত একটি উট আমার বাড়ির সামনে মাটিতে হাঁটু গেঁড়ে বসেছে। আমি তাকালাম এবং আমার বোনকে হাওদার মধ্যে দেখতে পেলাম। আমি তাকে হাওদা থেকে নামালাম এবং বাড়িতে নিয়ে আসলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর আমার বোন অভিযোগ করে বলল, আমি তাকে তাঈ ভূমিতে ফেলে রেখে শামদেশে চলে এসেছি এবং তাকে সাথে আনি নি।

আমি আমার বোনকে বুদ্ধিমতী বলেই জানতাম। তাই একদিন আমি তার সাথে মহানবী (সা.) সম্পর্কে আলোচনা করলাম এবং তাকে বললাম : মহানবীর ব্যাপারে তোমার ধারণা কী? সে জবাবে বলল : তাঁর মধ্যে আমি সুমহান গাবলী প্রত্যক্ষ করেছি এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর সাথে তোমার মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন কল্যাণকর বলে মনে করি। কারণ তিনি যদি প্রকৃত নবী হয়ে থাকেন, তা হলে ঐ ব্যক্তি সম্মানের অধিকারী হবে, যে সবার আগে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে।

আর তিনি যদি সাধারণ শাসনকর্তা হন, তা হলেও তুমি কখনো তাঁর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না; বরং তাঁর ক্ষমতার ছায়ায় তুমি উপকৃত হবে।”

মদীনার উ শে আদী ইবনে হাতেম- এর যাত্রা

আদী বলেন : “আমার বোনের কথা লো আমার মাঝে প্রভাব ফেলেছিল। আমি মদীনার পথে অগ্রসর হলাম। মদীনায় প্রবেশ করে সরাসরি মহানবী (সা.)- এর কাছে উপস্থিত হলাম। তাঁকে মসজিদে পেলাম। আমি তাঁর মুখোমুখি বসে আমার পরিচয় পেশ করলাম। মহানবী আমাকে চিনে তাঁর জায়গা থেকে উঠে পড়লেন এবং আমার হাত ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধা তাঁর পথ আটকে তাঁর সাথে কথা বললেন। আমি দেখলাম, তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সেই বৃদ্ধার কথা শুনছেন এবং তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। তাঁর মহৎ চারিত্রিক গাবলী আমাকে আকৃষ্ট করল। আমি নিজেকে বললাম : তিনি কখনই একজন সাধারণ শাসনকর্তা হতে পারেন না। তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করলে তাঁর অনাড়ম্বর জীবন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর বাড়িতে খেজুর গাছের পাতা দিয়ে নির্মিত যে তোষক ছিল, তা তিনি আমাকে দিয়ে বললেন : এর উপর বসো। হিজায়ের প্রধান ব্যক্তি- যাঁর হাতের মুঠোয় রয়েছে যাবতীয় ক্ষমতা, - তিনি নিজে একটি মাদুর বা খালি মাটির ওপর বসলেন। আমি তাঁর বিনয় দেখে খুবই অবাক হলাম। তাঁর মহৎ চরিত্র, সৎ গাবলী এবং মানব জাতির প্রতি তাঁর অসাধারণ মমত্ববোধ ও সম্মান প্রদর্শন থেকে আমি উপলব্ধি করলাম, তিনি কোন সাধারণ ব্যক্তি ও শাসনকর্তা নন।

এ সময় মহানবী আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে আমার জীবনের বিশেষ দিক সম্পর্কে তথ্য জানিয়ে বললেন : “তুমি কি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রু সী^{৪০৬} ছিলে না? আমি বললাম : হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : কেন তুমি তোমার গোত্রের আয়ের এক-চতুর্থাংশ নিজের জন্য বরাদ্দ করেছিলে? তোমার ধর্ম কি তোমাকে এ কাজের অনুমতি দিয়েছে? আমি বললাম : জী না। আমার গোপন বিষয়াদি সংক্রান্ত তাঁর সঠিক তথ্য প্রদান থেকে আমি নিশ্চিত হলাম, তিনি মহান আল্লাহর প্রেরিত দূত। আমি তখনও এ চিন্তার মধ্যেই নিমগ্ন ছিলাম। ঠিক তখনই আমি তাঁর তৃতীয় কথার মুখোমুখি হলাম। তিনি বলছিলেন : মুসলমানদের দারিদ্র্য ও কপর্দকহীন অবস্থা যেন তোমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাধা না হয়। কারণ, এমন একদিন আসবে যখন বিশ্বের

সম্পদরাজি তাদের দিকে স্রোতের মতো আসতে থাকবে; কিন্তু এ লো সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার জন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আর শত্রুদের আধিক্য ও মুসলমানদের স্বল্পতা যদি তোমার ঈমান আনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে মহান আল্লাহর শপথ, এমন একদিন আসবে যেদিন ইসলামের ব্যাপক প্রসার ও মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে একাকী পথ চলাচলকারী মহিলারা কাদেসীয়াহ্ থেকে মহান আল্লাহর ঘর পবিত্র কাবা যিয়ারত করার জন্য আসবে এবং কেউ তাদের ওপর চড়াও হবে না। আজ তুমি ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অন্যদের হাতে দেখতে পেলেও আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এমন একদিন আসবে যেদিন ইসলামী সেনাবাহিনী কিসরার সকল প্রাসাদ দখল করবে এবং বাবিল (ব্যাবিলন) নগরীও তারা জয় করবে।”

আদী বলেন : “আমি দীর্ঘ জীবন লাভ করার কারণে দেখতে পেয়েছি, ইসলাম প্রদত্ত (সামাজিক) নিরাপত্তার কারণে মহিলারা একাকী প্রত্যন্ত এলাকা লো থেকে মহান আল্লাহর ঘর কাবা যিয়ারত করতে আসতেন এবং কেউই তাদের ওপর চড়াও হতো না। আমি বাবিল শহর মুসলমানদের পদানত হতে দেখেছি। আরো দেখেছি, মুসলমানগণ কিসরার প্রাসাদ ও রাজমুকুট দখল করেছেন। আর আমি তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়ার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করার ব্যাপারেও আশাবাদী অর্থাৎ মদীনা নগরীর দিকে বিশ্বের সম্পদরাজি স্রোতের মতো প্রবাহিত হতে থাকবে; অথচ সে লো সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার ব্যাপারে কেউ আগ্রহ প্রকাশ করবে না।^{৪০৭}

আল্লামা তাবারসী ‘তারা তাদের পণ্ডিত ব্যক্তি ও সন্ন্যাসীদেরকে এবং ঈসা ইবনে মারিয়ামকে মহান আল্লাহর পরিবর্তে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছে’ -^{৪০৮} এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)- এর সাথে আদীর সাক্ষাতের কাহিনীটি বর্ণনা করে বলেছেন : তিনি যখন মহানবী (সা.)- এর নিকট উপস্থিত হন, তখন মহানবী এ আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন। মহানবী ঐ আয়াত তেলাওয়াত শেষ করলে আদী প্রতিবাদের সুরে তাঁকে বললেন : “আমরা কখনই আমাদের পুরোহিত ও সাধু-সন্ন্যাসীদের ইবাদত করি না। তাই আপনি কিভাবে আমাদের সাথে এ কথা সম্পর্কিত করে বলছেন যে, আমরা তাদেরকে আমাদের প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছি?” এ সময়

মহানবী বললেন : “তারা যদি মহান আল্লাহর হালালকে হারাম এবং তাঁর হারামকে হালাল করে, তা হলে কি তোমরা তাদের অনুসরণ করবে?” আদী বললেন : “হ্যাঁ।” তিনি বললেন : “এ কাজটিই হচ্ছে এ বিষয়ের সাক্ষী যে, তোমরা তাদেরকে নিজেদের প্রভু এবং কর্তৃত্বের অধিকারী বলে গ্রহণ করেছ।” ৪০৯

চুয়ান্নতম অধ্যায় : নবম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

তাবুক যুদ্ধ

যে উঁচু ও মজবুত দুর্গ একটি পানির ঝরনার পাশে তৈরি করা হয়েছিল এবং হিজর ও শামের মাঝখানে সিরিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, সেই দুর্গকে ‘তাবুক’ বলা হতো। তখনকার সিরিয়া ‘প্রাচ্য রোমান’ সাম্রাজ্যের একটি উপনিবেশ ছিল। তখন প্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কন্সট্যান্টিনোপল নগরী (অধুনা তুরস্কের ইস্তাম্বুল)। শামদেশের সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা সবাই হযরত ঈসা মসীহ (আ.)-এর অনুসারী ছিল এবং শামের জেলা লোর প্রধানরাও শামদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হতো। আর শামের প্রাদেশিক শাসনকর্তাও সরাসরি রোমান সম্রাটের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করত।

সমগ্র আরব উপদ্বীপে দীন ইসলামের ত প্রসার ও প্রভাব এবং তখনকার মাধ্যম লো ব্যবহার করে হিজায় অঞ্চলে মুসলমানদের আলোকদীপ্ত ব্যাপক বিজয়ের খবর বাইরের জগতে প্রচারিত হতো এবং তা শত্রুদের পৃষ্ঠদেশে কম্পন সৃষ্টি করে তাদেরকে এ থেকে বাঁচার উপায় খুঁজে বের করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করত।

মার পৌত্তলিক প্রশাসনের পতন এবং হিজায়ের বড় বড় নেতা ও গোত্রপতির ইসলামের শিক্ষা ও নীতিমালার অনুসরণ, ইসলামী যোদ্ধাদের বীরত্ব ও আত্যাগ রোমান সম্রাটকে এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনী নিয়ে মুসলমানদের দমন এবং অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদেরকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়ার জন্য প্ররোচিত করে। কারণ ইসলামের অসাধারণ অলৌকিক প্রসার ও প্রভাবের কারণে রোমান সম্রাট নিজ সাম্রাজ্যের ভিত নড়বড়ে ও ধ্বংসের সম্মুখীন দেখতে পেয়েছিল এবং মুসলমানদের সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির কারণে অতি মাত্রায় ভীত হয়ে পড়েছিল।

তদানীন্তন রোম কেবল ইরানের (পারস্য) একমাত্র শক্তিশালী প্রতিপক্ষ বলে গণ্য হতো এবং সবচেয়ে বড় সামরিক শক্তির অধিকারী ছিল। পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লোয় বিজয় লাভ করার কারণে রোম তখন ভীষণ শক্তিমদমত্ত হয়ে পড়েছিল।

চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে গঠিত রোমান বাহিনী সে যুগের সর্বশেষ মডেলের অস্ত্র ও হাতিয়ার সহ সুসজ্জিত হয়ে শামের সীমান্ত অঞ্চল লোয় অবস্থান গ্রহণ করে এবং সীমান্তে বসবাসকারী গোত্র লো, যেমন লাখম, আমিলা, গাসসান ও জায়াম গোত্র রোমানদের সাথে যোগ দিয়ে রোমান বাহিনীর অগ্রবর্তী যোদ্ধাদল হিসাবে বালকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়।^{৪১০}

যে সব কাফেলা হিজায় ও শামের বাণিজ্যিক রুটে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত থাকত, তারাই শামের সীমান্ত এলাকায় রোমান বাহিনীর অবস্থান গ্রহণ করার সংবাদ মহানবী (সা.)-কে প্রদান করেছিল। মহানবী (সা.) এক বিশাল সেনাবাহিনী সহ আগ্রাসীদের উপযুক্ত জবাব দান এবং যে ধর্ম তিনি তাঁর প্রিয় অনুসারীদের রক্তের বিনিময়ে ও তাঁর ব্যক্তিগত ত্যাগ-তীতিষ্কার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বিশ্বব্যাপী যা প্রসার লাভ করতে যাচ্ছে, তা শত্রুবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ থেকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখতে পেলেন না।

এ অপ্রীতিকর সংবাদ এমন এক সময় পৌঁছায়, যখন মদীনা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা তখনও তাদের ফসল গোলায় তুলেন নি। সবেমাত্র খেজুর পাকতে শুরু করেছে এবং মদীনা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল লোয় এক ধরনের দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছিল। তবে দীনদার ব্যক্তিদের কাছে আধ্যাতিক জীবন, সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সংরক্ষণ এবং মহান আল্লাহর পথে জিহাদ সবকিছুর চেয়ে রত্বপূর্ণ ছিল।

সৈন্য সংগ্রহ এবং যুদ্ধের ব্যয়ভার মেটানোর ব্যবস্থা

মহানবী (সা.) শত্রুপক্ষের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সম্পর্কে সার্বিকভাবে অবহিত ছিলেন। এ কারণেই তিনি নিশ্চিত ছিলেন, আধ্যাতিক পুঁজি (মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য জিহাদের মানসিকতা) ছাড়াও এ যুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য এক বিশাল সেনাবাহিনী ও সামরিক শক্তিরও প্রয়োজন আছে। এ উদ্দেশ্যে তিনি বেশ কিছুসংখ্যক লোককে পবিত্র মদীনার আশে-পাশের এলাকা লোয় প্রেরণ করেন যাতে তাঁরা মুসলমানদের মহান আল্লাহর পথে জিহাদের আহ্বান জানান এবং বিত্তশালী মুসলমানরাও যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যুদ্ধের ব্যয়ভার মেটানোর ব্যবস্থা করে দেন।

অবশেষে ত্রিশ হাজার যোদ্ধা যুদ্ধে যোগদান করার জন্য নিজেদের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করেন। মদীনার সেনা সমাবেশকেন্দ্র ‘সানীয়াতুল বিদা’য় এসে তাঁরা সমবেত হন। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে যুদ্ধের ব্যয়ভার অনেকটা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছিল। এ ত্রিশ হাজার যোদ্ধার মধ্যে দশ হাজার আরোহী এবং বিশ হাজার পদাতিক ছিলেন। মহানবী (সা.) নির্দেশ দিলেন প্রতিটি গোত্র যেন অবশ্যই নিজেদের জন্য একটি করে পতাকা নির্বাচন করে।^{৪১১}

যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরতরা বা বিরোধীরা

তাবুক যুদ্ধ ছিল মুনাফিক ও ঈমানের মিথ্যা দাবীদারদের থেকে প্রকৃত আত্মসর্গকারীদের শনাক্ত করার সর্বোৎকৃষ্ট মানদণ্ড। কারণ সাধারণ জনতাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের ঘোষণা তখনই দেয়া হয়েছিল, যখন আবহাওয়া ছিল খুব উষ্ণ। মদীনার ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তখন নিজেদেরকে ফসল মাড়াই ও খেজুর তোলার জন্য প্রস্তুত করেছে। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে তাদের মধ্য থেকে কতিপয় ব্যক্তির বিরত থাকার বিষয়টি তাদের প্রকৃত চেহারা উন্মোচিত করেছে এবং তাদের নিন্দায় বেশ কিছু আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছিল যার সবই সূরা তাওবায় রয়েছে। একদল লোক নিম্নোক্ত কারণ লোর জন্য এ পবিত্র জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছিল :

১. প্রবৃত্তির পূজারী ও রিপূর দাসেরা: মহানবী (সা.) একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি জাদ বিন কাইসকে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়ার প্রস্তাব দেন। সে মহানবীকে বলে : “আমি এমন এক লোক যার মাঝে নারীর প্রতি তীব্র আসক্তি আছে। তাই আমি ভয় পাচ্ছি, রোমীয় নারীদের ওপর আমার দৃষ্টি পড়লে আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারব না।” এ ধরনের শিশুসুলভ অজুহাত শোনার পর মহানবী তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের শরণাপন্ন হলেন। তার (জাদ বিন কাইস) নিন্দা করে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল :

(و منهم من يقول ائذن لي و لا تفتني إلا في الفتنة سقطوا و إن جهنم لمحيطة بالكافرين)

“ এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে : আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলেন না। সাবধান! তারাই ফিতনায় পড়ে আছে। আর নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে।” (সূরা তাওবা : ৪৯)

২. মুনাফিকরা: যে গোষ্ঠীটি বাহ্যত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং ইসলাম দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকৃত হতে পারে নি, তারা বিভিন্নভাবে জনগণকে এ জিহাদে যোগদান থেকে বিরত রাখার

চেষ্ঠা করেছিল। কাখনো কখনো তারা ‘তীব্র গরম আবহাওয়া’ কে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করাত। আর এ কারণে ওহীর মাধ্যমে তাদের এ সব অজুহাতের সমুচিত জবাবও দেয়া হয়েছে :

(قُلْ نَارِ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ)

“ আপনি বলে দিন : জাহান্নাম এ গরম আবহাওয়ার চেয়েও অত্যধিক উষ্ণ, যদি তারা অনুধাবন করত।” (সূরা তাওবা : ৮১)

একদল মুনাফিক মুসলমানদের এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে বলত : “রোমানদের সাথে আরব জাতির যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই এবং অল্প সময়ের মধ্যে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল মুজাহিদকে বন্দিত্বের শিকলে আবদ্ধ করে উন্মুক্ত বাজার লোয় বিক্রি করা হবে।” ^{৪১২}

মদীনায় গোপন গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক আবিষ্কৃত

ইসলাম ধর্মের মহান নেতা মহানবী (সা.) তথ্য লাভ করার ব্যাপারে অপরিসীম রুত্ব প্রদান করতেন এবং যে সব বিজয় তিনি অর্জন করেছিলেন, সেসবের অর্ধেকই ছিল শত্রু ও ফিতনা সৃষ্টিকারীদের অবস্থা সংক্রান্ত তাঁর তথ্য লাভ করার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কারণেই তিনি বহু শয়তানী অপকর্ম ও ইসলাম বিরোধী উস্কানি অঙ্কুরেই নস্যাত্ন করে দিতেন।

মহানবী (সা.)- এর কাছে একটি গোপন গোয়েন্দা তথ্য আসে, ইহুদী সুওয়াইলিমের বাড়ি ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এবং মুনাফিকরা সেখানে জড়ো হয়ে মুসলমানদের জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার নীলনকশা প্রণয়ন করছে। ষড়যন্ত্রকারীরা, যারা আবারও নিজেদের মস্তিষ্কে এ ধরনের শয়তানী চিন্তা শুরু করেছিল, তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য মহানবী (সা.) তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহকে একদল সাহসী সঙ্গী নিয়ে গোপন বৈঠক শুরু হওয়ার সময় ঐ বাড়িতে আন লাগিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের মনে তীব্র ভীতি সৃষ্টি করার দায়িত্ব দেন। ষড়যন্ত্রকারীরা যখন পরস্পর কথোপকথন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নীলনকশা প্রণয়নে মশগুল ছিল, ঠিক তখনই তিনি তাদেরকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়ে ঐ বাড়িতে আন ধরিয়ে দেন। তাদের সবাই তখন আনের প্রজ্বলিত লেলিহান শিখার মধ্যে পালিয়ে যায় এবং পালানোর সময় তাদের এক ব্যক্তির পা ভেঙে যায়। এ কাজ এতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল যে, তা পরবর্তীকালে মুনাফিক গোষ্ঠীর জন্য এক বিরাট শিক্ষায় পরিণত হয়েছিল।^{৪১০}

৩. ক্রন্দনকারী দল: এ পবিত্র জিহাদে অংশগ্রহণের তীব্র আগ্রহ পোষণকারী মহানবী (সা.)- এর একদল সাহাবী তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁদের পবিত্র ধর্মীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য তাঁর কাছে সফর করার বাহন চাইলেন। কিন্তু তাঁরা যখন মহানবীর পক্ষ থেকে না সূচক জবাব পেলেন এবং যেহেতু মহানবীর হাতে এমন কোন বাহন ছিল না, যার উপর চড়ে তাঁরা জিহাদে গমন করবেন, সেহেতু তাঁরা ভীষণভাবে কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁদের মুখমণ্ডলের উপর দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল।

মহানবী (সা.)- এর সাহাবীগণের মধ্যে ষড়যন্ত্রকারী, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এবং (খোঁড়া) অজুহাত পেশকারী ব্যক্তির থেকে থাকলেও তাদের বিপরীতে এমন সব ব্যক্তিও ছিলেন, যাঁরা জিহাদ- যা কখনো কখনো তাঁদের শাহাদাতের কারণ হতো, - তাতে অংশগ্রহণ করতে না পারার জন্য ব্যাকুল হয়ে যেতেন এবং তাঁদের মুখমণ্ডল বেয়ে অশ্রু ঝরত। ইতিহাসের ভাষায় এ গোষ্ঠীকে ‘বাকবাইন’ অর্থাৎ ‘ক্রন্দনকারীরা’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনেও তাঁদের দৃঢ় ঈমান প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে :

(و لا علي الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولّوا و أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون)

“ আর যারা আপনার কাছে এসেছিল এ উদ্দেশ্যে যে, আপনি তাদের হাতে কোন সওয়ারী পশু বা বাহন অর্পণ করবেন এবং আপনিও যখন তাদেরকে বললেন যে, আমার হাতে এমন কোন সওয়ারী পশু বা বাহন নেই, যার উপর তোমাদেরকে বসিয়ে আমি নিয়ে যাব; আর মহান আল্লাহর পথে (জিহাদে) ব্যয় করার মতো তেমন কোন অর্থ বা সম্পদ তাদের হাতে না থাকার দুঃখে তারাও আপনার কাছ থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে ফিরে গেল, তখন তাদের ব্যাপারে কোন অভিযোগ নেই।” (সূরা তাওবা : ৯২)

৪ .ফসল সংগ্রহকারীরা : কা’ব, হিলাল ও মুরারার মতো আরো কিছুসংখ্যক ব্যক্তি দীন ইসলাম ও জিহাদের ব্যাপারে পুরোপুরি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যেহেতু তখনো তারা (ক্ষত থেকে) ফসল সংগ্রহ করেন নি, সেহেতু তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ফসল উঠানোর পর মদীনা থেকে বের হয়ে রণাঙ্গনে ইসলামের মুজাহিদগণের সাথে যোগ দেবেন। তারা পবিত্র কুরআনের ভাষায়^{৪১৪} অমান্যকারী ঐ তিন ব্যক্তি যাঁদেরকে মহানবী (সা.) তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছিলেন, যা অন্যদের জন্যও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছিল।

৫ .আত্মোৎসর্গকারী দল: তাঁরা ছিলেন ঐ সব ব্যক্তি, যাঁরা সফরের উপায়- উপকরণ ও মাধ্যম যোগাড় হয়ে যাওয়ার পর (জিহাদের উদ্দেশ্যে) যাত্রা করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন এবং এ পথে তাঁরা কোন কিছু পরোয়া করেন নি।

এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে হযরত আলী (আ.)- এর বিরত থাকা

হযরত আলী (আ.)- এর অন্যতম গৌরব ও কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তিনি সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)- এর সাথে থেকেছেন এবং একমাত্র তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া সকল ইসলামী যুদ্ধে তাঁর পতাকা বহন করেছেন। মহানবীর নির্দেশে তিনি মদীনায় থেকে যান এবং এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। কারণ মহানবী ভালোভাবেই জানতেন, মুনাফিক চক্র এবং কতিপয় কুরাইশ তাঁর অনুপস্থিতিতে অবস্থা পরিবর্তন করে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমতের পতন ঘটানোর সুযোগ সন্ধান করবে এবং এ সুযোগ তখনই বাস্তবায়িত হবে, যখন মহানবী এবং তাঁর সাহাবীগণ মদীনা থেকে দূরে যাবেন এবং কেন্দ্রের সাথে তাঁদের যোগাযোগ থাকবে না।

তাবুক ছিল (মদীনা থেকে) সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান যেখানে মহানবী (সা.) সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য গমন করেছিলেন। তিনি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী লো পরিষ্কৃতি পরিবর্তন করে দেবে এবং হিজায়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে নিজেদের সমমনা লোকদের জড়ো করে সংগঠিত হবে। তিনি মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমকে মদীনায় তাঁর স্থলবর্তী নিযুক্ত করা সত্ত্বেও হযরত আলীকে বলেছিলেন : “তুমি আমার আহলে বাইত ও নিকটীয় এবং মুহাজিরদের তত্ত্বাবধায়ক এবং এ কাজের জন্য একমাত্র আমি এবং তুমি ছাড়া আর কেউ উপযুক্ত নয়।

মদীনায় আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)- এর উপস্থিতি ষড়যন্ত্রকারীদের খুব অসন্তুষ্ট করেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল, তাঁর উপস্থিতি এবং সার্বক্ষণিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের কারণে তারা তাদের নীল- নকশা বাস্তবায়ন করতে পারবে না। এ কারণেই যাতে হযরত আলী মদীনা নগরী ত্যাগ করেন সেজন্য তারা একটি ফন্দি আঁটে এবং প্রচার করে যে, যদিও মহানবী (সা.) পূর্ণ ইচ্ছা সহকারে হযরত আলীকে জিহাদে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন, কিন্তু পথ অনেক দীর্ঘ হওয়া ও প্রচণ্ড গরম পড়ার কারণে আলী এ পবিত্র জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছেন। হযরত আলী (আ.) মুনাফিকদের এ মিথ্যা অপবাদ খণ্ডনের জন্য মহানবীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে পুরো ঘটনা অবহিত করেন। মহানবী (সা.) তাঁর ঐতিহাসিক উক্তি- যা

মহানবীর পরপরই হযরত আলীর প্রত্যক্ষ ইমামত ও খিলাফত অর্থাৎ ইমাম ও খলীফা হবার বিষয়টির সুস্পষ্ট দলিল- প্রমাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত, - ব্যক্ত করেছিলেন :

“ ভাই আমার, তুমি মদীনায় ফিরে যাও। কারণ আমি ও তুমি ছাড়া আর কেউ মদীনার সার্বিক বিষয় ও পরিস্থিতি রক্ষার জন্য উপযুক্ত নয়। তুমি আমার আহলে বাইত ও নিকটাতীয়দের মাঝে আমার প্রতিনিধি...। তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, মূসার কাছে হারুন যেমন ছিলেন, তুমিও আমার কাছে তেমনই হবে; তবে পার্থক্য এই যে, আমার পর কোন নবী নেই (অর্থাৎ যেমনভাবে হারুন মূসার প্রত্যক্ষ স্থলবর্তী ছিলেন, তেমনি তুমিও আমার পর আমার স্থলবর্তী ও খলীফা)।^{৪১৫}

তাবুকের দিকে ইসলামী সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা

মহানবী (সা.)-এর কর্মপদ্ধতি এই ছিল যে, যে গোষ্ঠী ইসলামের অগ্রগতি ও প্রসারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত বা আক্রমণ ও ধ্বংসসাধন করার ইচ্ছা এবং অন্য কোন অসদুদ্দেশ্য পোষণ করত, তাদেরকে দমন করার অভিযানে যাত্রার সময় তিনি তাঁর সৈন্য ও সেনাপতিদের কাছে নিজ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করতেন না এবং সেনাবাহিনীকে প্রধান যাত্রাপথ বা মহাসড়কের উপর দিয়ে না নিয়ে শাখা-সড়ক পথে (রণাঙ্গনের দিকে) পরিচালনা করতেন। আর এভাবে তিনি শত্রুপক্ষকে তাঁর যাত্রা সম্পর্কে আঁচ করতে দিতেন না এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে হতভম্ব করে ফেলতেন।^{৪১৬}

ইসলামী ভূ-খণ্ডে আক্রমণ পরিচালনার জন্য শাম-সীমান্তে সমবেত রোমীয়দেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেবার ব্যাপারে তিনি যেদিন সর্বসাধারণের মধ্যে যুদ্ধপ্রস্তুতির কথা ঘোষণা করেছিলেন, সেদিন থেকেই তিনি নিজ লক্ষ্য ও গন্তব্যস্থল সুস্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছিলেন এবং এভাবে তিনি চেয়েছিলেন যে, মুজাহিদরা জিহাদের সফরের রুত্ব ও তা যে কষ্টকর, সে ব্যাপারে জ্ঞাত থাকেন এবং এ অভিযানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ রসদপত্র নিজেদের সাথে নেন।

এছাড়াও ইসলামী সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য মহানবী নিরুপায় হয়ে মদীনা থেকে বহু দূরে বসবাসরত তামীম, গাতফান ও তাঈ গোত্রের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি উল্লিখিত গোত্র লোর সর্দারদের কাছে বেশ কিছু পত্র লিখেছিলেন এবং পবিত্র মাদীনার নগরীর তরুণ শাসনকর্তা উত্তাব ইবনে উসাইদের কাছেও পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ঐ সব গোত্রের লোকদেরকে এবং পবিত্র মাদীনার যুবকদের এ পবিত্র জিহাদে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন।^{৪১৭} আর কখনোই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গোপন রেখে এ ধরনের সাধারণ আহ্বান বাস্তবায়ন মোটেই সম্ভব নয়। কারণ পুরো ব্যাপারটা গোত্রের সর্দারদের কাছে উত্থাপন করে তাদেরকে রুত্ব অনুধাবন করানো অত্যাবশ্যিক হয়ে গিয়েছিল, যাতে তারা তাদের লোকদের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ রসদপত্র অর্পণ করে।

মহানবী (সা.)- এর সামনে সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ ও সামরিক মহড়া

ইসলামী সেনাবাহিনীর রণাঙ্গনের উদ্দেশে যাত্রার সময় হয়ে এল। মহানবী (সা.) সেদিন মদীনার সেনা সমাবেশকেন্দ্রে ইসলামী বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন। একদল ঈমানদার ও আ ত্যাগী ব্যক্তি- যাঁরা সুশীতল ছায়ায় আরাম- আয়েশে জীবন- যাপন, ব্যবসা- বাণিজ্য ও ধন- সম্পদ পুঞ্জীভূত করার ওপর লক্ষ্য অর্জনের পথে কষ্ট সহ্য করা ও মৃত্যুবরণকে অগ্রাধিকার প্রদান করে আবেগ- উদ্দীপনা সহকারে ও ঈমানে পরিপূর্ণ অন্তর নিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছিলেন, - সত্যিই তাঁদের কুচকাওয়াজের জাঁকালো দৃশ্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল এবং তা দর্শকদের মন- মানসিকতার ওপর অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

মালিক ইবনে কাইসের ঘটনা

ইসলামী সেনাবাহিনীর রণাঙ্গন যাত্রার পর যেদিন আবহাওয়া খুবই উষ্ণ ছিল, সেদিন মালিক ইবনে কাইস (আবু খাইসামাহ) সফর শেষে মদীনায় ফিরে আসেন। মদীনা শূন্য দেখে তিনি ইসলামী সেনাদলের রণাঙ্গন যাত্রার ব্যাপারে অবহিত হন। এ সময় তিনি তাঁর বাগানবাড়িতে প্রবেশ করে তাঁর সুন্দরী স্ত্রীকে দেখতে পান, সে বাগানের মাঝখানে তাঁর জন্য একটি শামিয়ানা খাটিয়ে রেখেছে। তিনি স্ত্রীর সুশ্রী মুখমণ্ডলের দিকে একটু তাকালেন এবং তাঁর জন্য যে খাবার ও পানীয় প্রস্তুত রাখা হয়েছিল, তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন! তিনি এ সময় মহানবী (সা.) এবং তাঁর সঙ্গী- সাথীগণ- যাঁরা এ উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে মহান আল্লাহর পথে মৃত্যু ও জিহাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন- তাঁদের করুণ অবস্থার কথা কিছুটা চিন্তা করলেন। অতঃপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি খাদ্য- পানীয় ও শামিয়ানা ব্যবহার করবেন না এবং একটি সওয়ারী পশুর উপর আরোহণ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুজাহিদগণের সাথে যোগ দেবেন। এ কারণে তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন : “এটা কখনই ন্যায়সঙ্গত আচরণ নয় যে, আমি আমার স্ত্রীর সান্নিধ্যে শামিয়ানার নিচে আরামে বিশ্রাম করব, উপাদেয় খাবার খাব এবং শীতল ও সুপেয় পানি পান করব, আর আমার নেতা প্রখর রোদের মধ্যে জিহাদের ময়দানের দিকে যেতে থাকবেন। না, এ কাজ ইনসাফ, মৈত্রী ও বন্ধুত্বের নীতি থেকে অনেক দূরে। ঈমান ও ইখলাস

(নিষ্ঠা) আমাকে এ ধরনের কাজে লিপ্ত হবার অনুমতি দেয় না।” এ কথা বলেই তিনি সামান্য পাথেয় নিয়ে বের হয়ে গেলেন এবং পশ্চিমধ্যে ইসলামী সেনাবাহিনী থেকে পিছিয়ে পড়া আমর ইবনে ওয়াহাবের সাথে মিলিত হলেন। আর মহানবী (সা.) যখন তাবুক এলাকায় প্রবেশ করলেন তখনই তাঁরা দু’জন তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন।^{৪১৮}

এই ব্যক্তি শুরুতে মহানবী (সা.)- এর সাথে একত্রে জিহাদের ময়দানে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন না করলেও পরিণতিতে প্রশংসনীয় আত্মত্যাগের কারণে নিজেকে সৌভাগ্যের কোলে সঁপে দিতে পেরেছিলেন। তিনি কখনোই ঐ গোষ্ঠীর মতো ছিলেন না, যাদের দোরগোড়ায় সৌভাগ্য এসে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও যোগ্যতা না থাকার কারণে নিজেদের সৌভাগ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে দুর্ভাগ্য কবলিত করে এবং নিজেদের পথ ষ্টতার মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করে।

উদাহরণস্বরূপ, মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মহানবীর সেনা সমাবেশকেন্দ্রে মহানবীর সাথে এ জিহাদে যোগদানের জন্য তাঁর স্থাপন করেছিল। কিন্তু সে অপবিত্র ও ইসলাম ধর্মের শত্রু ছিল বিধায় সেনাবাহিনীর রণাঙ্গনে যাত্রার মুহূর্তে সে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য নিজ লোকজন সহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে। মহানবী (সা.) তার নিফাক (কপটতা) সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন এবং জিহাদে তার যোগদান তেমন কল্যাণকর মনে করেন নি বলে তার এহেন আচরণের ব্যাপারে মোটেই রুত্ব দেন নি।

সফরের কষ্ট

মদীনা থেকে তাবুক যাত্রার পথে ইসলামী সেনাবাহিনী প্রভূত কষ্টের শিকার হয়েছিল। এ কারণেই এ সেনাবাহিনীর নামকরণ করা হয়েছিল ‘জাইশুল উসর’ অর্থাৎ ‘কষ্ট ও দুর্ভোগের সেনাবাহিনী’। তাদের ঈমান ও আগ্রহ তাদের এ সব কষ্ট সহজ করে দিয়েছিল। ইসলামী বাহিনী সামূদ জাতির ভূ-খণ্ডে উপনীত হলে তপ্ত হাওয়া প্রবাহিত হওয়ার কারণে মহানবী (সা.) একটি কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে রেখেছিলেন এবং তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘর-বাড়ি ও জনপদ ত অতিক্রম করেছিলেন। তখন তিনি সঙ্গী-সাথীগণকে বলেছিলেন : “নাফরমানীর জন্য মহান আল্লাহর শাস্তিপ্রাপ্ত সামূদ জাতির শেষ পরিণতি সম্পর্কে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করবে এবং তোমাদের অবশ্যই জানা থাকা উচিত, কোন ঈমানদারেরই নিশ্চিত হওয়া অনুচিত যে, তার শেষ পরিণতি সামূদ জাতির মতো হবে না।” এ ভূ-খণ্ডে বিরাজমান মৃত্যুপুরীর নীরবতা, ধ্বংসপ্রাপ্ত ও গভীর নীরবতার মধ্যে নিমজ্জিত বিরান এ ঘর-বাড়ি লো অন্যান্য জাতির জন্য দৃষ্টান্ত, শিক্ষা, সতর্কবাণী ও উপদেশে পরিণত হয়েছে।

অতঃপর তিনি নির্দেশ দিলেন, ইসলামী সেনাবাহিনী যেন এ ভূ-খণ্ডের পানি পান না করে এবং তা দিয়ে খাবার ও রুটি প্রস্তুত না করে। আর যদি তারা এ স্থানের পানি দিয়ে কোন খাবার তৈরি বা আটা খামীর করে থাকে, তা হলে তারা যেন তা চতুষ্পদ জন্তুদের দিয়ে দেয়।

ইসলামী বাহিনী এ নির্দেশ লাভ করার পর মহান নেতার নেতৃত্বে পথ চলা অব্যাহত রাখে। রাতের একটি অংশ অতিবাহিত হলে তারা একটি পের কাছে পৌঁছে। উল্লেখ্য, হযরত সালেহ (আ.)-এর উঁী এ প থেকে পানি পান করত। মহানবী (সা.) সবাইকে সেখানে যাত্রা-বিরতি ও অবতরণ করে বিশ্রাম নেয়ার নির্দেশ দেন।

সতর্কতামূলক নির্দেশাবলী

মহানবী (সা.) ঐ ভূ-খণ্ডের মারা ক দূষিত রায়ু ও প্রবল ঝড়- যা কখনো কখনো মানুষ ও উটকে উড়িয়ে নিয়ে বালুর স্তূপের নিচে চাপা দিত, - সম্পর্কে পূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিলেন। সেজন্য তিনি সকল উটের হাঁটু বেঁধে রাখার নির্দেশ দেন এবং রাতের বেলা কাউকে বিশ্রামের স্থান থেকে বাইরে যেতে নিষেধ করেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও প্রমাণিত হয়েছিল, মহানবী (সা.)- এর এ সব সতর্কতামূলক নির্দেশ অত্যন্ত কল্যাণকর ছিল। কারণ বনী সায়েদা গোত্রের দু'ব্যক্তি নির্দেশ অমান্য করে নিজেদের বিশ্রামাগার থেকে রাতের বেলা বের হলে প্রচণ্ড মরুঝড়ে একজন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায় এবং আরেকজনকে তা পাহাড়ের বুকে নিক্ষেপ করে। মহানবী (সা.) ঘটনাটা জানতে পারলেন এবং ঐ দু'ব্যক্তির নির্দেশ ল ন এবং মৃত্যু তাঁকে খুব ব্যথিত করে।^{৪১৯}

ইসলামী বাহিনীর নিরাপত্তা সংরক্ষণের দায়িত্বভার প্রাপ্ত একটি সেনাদলের^{৪২০} অধিনায়ক আব্বাদ ইবনে বশীর মহানবীকে রিপোর্ট প্রদান করলেন, ইসলামী মুজাহিদরা তীব্র পানি সংকটের মধ্যে পড়েছে এবং তাদের জমাকৃত পানি প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ কারণে কতিপয় লোক মূল্যবান উট যবেহ করে পেটের ভেতরে সঞ্চিত পানি ব্যবহার করছে এবং কেউ কেউ মহান আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালার কাছে আ সমর্পণ করে জ্বলন্ত হৃদয় নিয়ে তাঁর পক্ষ থেকে মুক্তির জন্য প্রতীক্ষা করছে।

যে দ্রষ্টা মহানবীকে সাহায্য ও বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তিনি আবারও তাঁকে ও তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী- সাথীগণকে সাহায্য করলেন। াবনের মতো মুষলধারে বৃষ্টিপাত শুরু হলো এবং তা সবার পানির তৃষ্ণা মিটিয়ে দিল। রসদপত্র সংগ্রহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা এবং সৈন্যরা সবাই নিজেদের ইচ্ছা মতো পানি সংগ্রহ করলেন।

মহানবী (সা.)- এর গায়েব সংক্রান্ত জ্ঞান ও তথ্য

এতে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই যে, পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট কালাম^{৪২১} অনুসারে মহানবী (সা.) গায়েব অর্থাৎ লোকচক্ষুর অন্তরালের জগৎ সম্পর্কে খবর দিতে এবং পর্দার অন্তরালের রহস্যাবলী- যা মানব জাতির কাছে গোপন রয়েছে, - সে লো উন্মোচন করতে সক্ষম ছিলেন। তবে মহানবীর এ জ্ঞান সীমিত ছিল এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এ কারণেই এটা সম্ভব যে, কখনো কখনো সবচেয়ে সরল বিষয় সম্পর্কে তাঁর কোন তথ্য জানা নাও থাকতে পারে, যেমন কখনো কখনো তিনি ঘরের চাবি বা টাকা- পয়সা হারিয়ে ফেলতে পারেন এবং কোথায় তা রেখেছেন বা হারিয়েছেন, তা তাঁর জানা নাও থাকতে পারে। আবার কখনো কখনো তিনি সবচেয়ে জটিল ও দুর্বোধ্য গায়েবী বিষয় সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে বিশ্ববাসীদের বুদ্ধিমত্তাকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিতেও সক্ষম। মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলেই তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালের বিষয়াদি সম্পর্কে তথ্য জ্ঞাপন করবেন। আর তা না হলে সাধারণ মানুষের মতো তাঁরও কোন তথ্য থাকবে না।^{৪২২}

পৃথিবীতে মহানবী (সা.)- এর উট হারিয়ে যায়। মহানবীর একদল সাহাবী সেই উটের খোঁজে বের হন। তখন এক মুনাফিক দাঁড়িয়ে বলেছিল : “তিনি বলেন : আমি মহান আল্লাহর নবী এবং আমি ঊর্ধ্বজগতের তথ্য প্রদান করি। অথচ এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, নিজের উট কোথায় আছে, তা তিনি জানেন না!” এ কথা মহানবীর কানে পৌঁছায়। তিনি একটি বলিষ্ঠ ভাষণ প্রদান করে সত্য উন্মোচন করে বলেছিলেন :

و ابني و الله ما اعلم الا ما علمني الله و قد دلتني الله عليها وهي من هذا الوادي في شعب كذا قد حبستها شجرة
بزماتها فانطلقوا حتى تأتوني بها

- মহান আল্লাহর শপথ! তিনি যা আমাকে শিখিয়েছেন, কেবল তা-ই আমি জানি। এখন মহান আল্লাহ আমাকে উট কোথায় আছে দেখিয়েছেন। উট এ মরু এলাকার অমুক উপত্যকায় আছে এবং ওটার রশি একটি গাছের সাথে জড়িয়ে গেছে এবং এর ফলে সে আর হাটতে পারছে

না। তোমরা ওখানে গিয়ে উীটিকে নিয়ে এস।^{৪২৩} তৎক্ষণাৎ কয়েকজন লোক যে স্থানটির ব্যাপারে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, সেখানে গেলেন এবং তিনি যেভাবে বলেছিলেন, ঠিক সেভাবে তাঁরা উীটিকে পেয়েছিলেন।

গায়েরী জগৎ সম্পর্কে আরেক তথ্য প্রদান

হযরত আবু যার গিফারী (রা.)- এর উট পথ চলা বন্ধ করে দেয় এবং এর ফলে তিনি ইসলামী সেনাবাহিনী থেকে পিছে পড়ে যান। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন এবং ভাবলেন, সম্ভবত উটটি দাঁড়িয়ে যাবে এবং আবার তা পথ চলা শুরু করবে। কিন্তু তাঁর অপেক্ষায় কোন ফল হলো না। এ কারণে তিনি উটটিকে ঐ স্থানে ফেলে রেখে সফরের সাজ- সরঞ্জাম পিঠে নিয়ে পথ চলা শুরু করলেন, যাতে তিনি যত শীঘ্র সম্ভব মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হতে পারেন। ইসলামী বাহিনী মহানবীর নির্দেশে বিশ্রামের জন্য একটি স্থানে যাত্রাবিরতি করে। হঠাৎ অত্যন্ত ভারী বোঝা পিঠে নিয়ে পথ চলা এক ব্যক্তির মুখমণ্ডল দূর থেকে পরিদৃষ্ট হলো। একজন সাহাবী মহানবীকে এ ঘটনা জানালে তিনি বলেছিলেন : সে আবু যার; মহান আল্লাহ্ আবু যারকে ক্ষমা করুন; সে একাকী পথ চলে, একাকী মৃত্যুবরণ করবে এবং একাকী পুনরুত্থিত হবে।

ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পরবর্তী যুগ বা বছর লোয় মহানবী (সা.)- এর এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে বাস্তব প্রমাণিত হয়েছে। কারণ তিনি জনবসতি থেকে দূরে অবস্থিত রাবযার মরুপ্রান্তরে নিজ কন্যার পাশে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় ইন্তেকাল করেছিলেন।^{৪২৪}

তাবুক যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)- এর প্রদত্ত এ ভবিষ্যদ্বাণী দীর্ঘ ২৩ বছর পর বাস্তবায়িত হয়েছিল। স্বাধীনচেতা- মুক্তমনা ও বেহেশতী ব্যক্তি সত্য বলা এবং জনগণকে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করার আহবান জানানোর অপরাধে ‘রাবযা’ এলাকায় নির্বাসিত হয়েছিলেন। সেখানে ধীরে ধীরে তিনি দৈহিক শক্তি ও স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেন এবং তীব্রভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত লো অতিবাহিত করা কালে তাঁর স্ত্রী তাঁর নূরানী মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে তীব্র দুঃখ ও কষ্ট সহকারে কাঁদছিলেন এবং স্বামীর কপালের ঘামের বিন্দু লো মুছে দিচ্ছিলেন। হযরত আবু যার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : “তুমি কেন কাঁদছ?” স্ত্রী উত্তর দিলেন : “এ কারণে

কাঁদছি যে, আপনি এখন মারা যাবেন এবং যে কাপড় দিয়ে আপনাকে কাফন দেব, তা আমার কাছে নেই।”

দিকচক্রবাল রেখার উপর অস্তগামী সূর্যের মতো অতি কষ্টে স্নিত হাসির রেখা হযরত আবু যারের ওষ্ঠদ্বয়ের উপর ফুটে উঠল। তিনি বললেন : “শান্ত হও। কেঁদো না। একদিন আমি মহানবী (সা.)-এর কয়েকজন সাহাবীর সাথে তাঁর সান্নিধ্যে বসেছিলাম। মহানবী আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন : তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি এক মরু এলাকায় একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে এবং একদল মুমিন তাকে দাফন করবে।

ঐ সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সবাই জনগণের মাঝে জনপদে মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন আমি ছাড়া তাঁদের মধ্যকার আর কোন ব্যক্তিই জীবিত নেই। তাই আমি নিশ্চিত, মহানবী (সা.) যে ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সেই ব্যক্তিটি আমি। আমার মৃত্যুর পর ইরাকের হাজীদের যাত্রাপথে বসে থাকবে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে একদল মুমিন আসবে। তখন তাদেরকে আমার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করবে।

হযরত আবু যারের স্ত্রী বললেন : “এখন হজ্ব কাফিলাসমূহের গমনাগমনের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।” হযরত আবু যার তখন বললেন : “তুমি রাস্তার উপর লক্ষ্য রাখবে। মহান আল্লাহর শপথ! না আমি মিথ্যা বলছি আর না আমি মিথ্যা শুনেছি।” এ কথা বলার পরপরই হযরত আবু যারের প্রাণপাখি উর্ধ্বলোকের বেহেশতের দিকে পাখা মেলে উড়ে যায়।^{৪২৫}

হযরত আবু যার সত্য বলেছিলেন। মুসলমানদের একটি কাফিলা তগতিতে সামনে এগিয়ে আসছিল, যাঁদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হুজর ইবনে আদী ও মালিক আশতারের মতো বড় বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ দূর থেকে এক অতদৃশ্য দেখতে পেলেন। একটি নিস্প্রাণ দেহ রাস্তার পাশে পড়ে আছে এবং তার কাছে একজন মহিলা ও একটি ছোট ছেলে কাঁদছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ঐ দু’জনের কাছে গিয়ে লাগাম টেনে সওয়ারী পশুকে থামালে কাফিলার অন্যান্য সদস্যও তাঁকে অনুসরণ করে সেখানে উপস্থিত হন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ

যখনই ঐ মৃতদেহের দিকে তাকালেন, তখনই তাঁর দৃষ্টি তাঁর দীনী ভাই ও বন্ধু আবু যারের উপর স্থির হয়ে গেল।

তাঁর নয়নযুগল অশ্রুসজল হয়ে গেল। তিনি আবু যারের পবিত্র লাশের কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং তাবুক যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করে বললেন : মহানবী (সা.) সত্য বলেছিলেন : তুমি একাকী পথ চলবে, একাকী মৃত্যুবরণ করবে এবং একাকী কবর থেকে পুনরুজ্জীবিত হবে।^{৪২৬}

অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হযরত আবু যারের জানাযার নামায পড়লেন।^{৪২৭} এরপর তাঁর লাশ দাফন করা হয়। লাশ দাফন শেষ হলে মালিক আশতার তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন :

“ হে প্রভু! এ আবু যার মহানবী (সা.)-এর সাহাবী ছিলেন, যিনি জীবনভর আপনার ইবাদত-বন্দেগী করেছেন; আপনার পথে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন এবং কখনই তিনি সত্য ধর্ম অনুসরণ করার ক্ষেত্রে নিজ আদর্শ, পথ ও পদ্ধতি পরিবর্তন করেন নি। তবে তিনি মুখের ভাষা ও অন্তর দিয়ে দুর্নীতি, অসৎ ও মন্দ কাজের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করেছেন বলে অত্যাচারিত, বঞ্চিত, অপদস্থ এবং নির্বাসিত হয়েছিলেন এবং অবশেষে বিদেশ-বিভূঁইয়ে নির্বাসনের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছেন।”

তাবুক অঞ্চলে ইসলামী সেনাবাহিনীর প্রবেশ

তাওহীদী বাহিনী হিজরতের নবম বর্ষের শাবান মাসের শুরুতে তাবুক অঞ্চলে প্রবেশ করে। তবে রোমান বাহিনীর কোন চিহ্ন তারা সেখানে দেখতে পেল না, যেন রোমের নেতৃবৃন্দ ইসলামের সৈনিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের অতুলনীয় সাহসিকতা, বীরত্ব ও আত্যাগ (যার একটি ক্ষুদ্র নমুনা তারা কাছে থেকে মুতার যুদ্ধে প্রত্যক্ষ করেছিল) সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত হয়েছিল এবং তারা এ বিষয়কে কল্যাণকর বলে বিবেচনা করেছিল যে, তারা তাদের সেনাবাহিনী তাদের রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রত্যাহার করে নিয়ে যাবে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সৈন্য সমাবেশের খবর অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে এমন একটা ভাব দেখাবে যে, কোন সময়ই (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) আক্রমণের চিন্তা তাদের মনে ছিল না; যার ফলে তারা এভাবে আরব উপদ্বীপে যে সব ঘটনা প্রবাহের উৎস হচ্ছিল, সে ব্যাপারে তাদের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়।^{৪২৮}

এ সময় মহানবী তাঁর উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাগণকে একত্রিত করে (এবং তাঁদের সাথে সকল বিষয়ে পরামর্শ করুন)- ইসলামের এ দৃঢ় মূলনীতির ভিত্তিতে শত্রুপক্ষের ভূ-খণ্ডের অভ্যন্তরে অগ্রসর হওয়া বা মদীনা নগরীতে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে তাঁদের সাথে পরামর্শ করলেন।

সামরিক পরামর্শের ফলাফল এই দাঁড়াল যে, তাবুক গমনপথ অতিক্রম করার ক্ষেত্রে ইসলামী বাহিনীকে যে অপরিসীম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, সে কারণে পুনঃ শক্তি সঞ্চয় করার জন্য তারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করবে। অধিকন্তু মুসলিম সেনাবাহিনী তাদের এ সামরিক অভিযানে রোমান বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার সুমহান লক্ষ্য অর্জন করেছিল এবং রোমীয়দের অন্তরে প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার করেছিল। আর এ ভীতি তাদের দীর্ঘকাল পর্যন্ত আক্রমণ ও সামরিক শক্তি পুনর্গঠন থেকে বিরত রাখবে। এতটুকু ফলাফল, যা বেশ কিছু কাল উত্তর দিক থেকে আরব উপদ্বীপের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করছিল, তা ভবিষ্যতে মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা করেন, সে পর্যন্ত আমাদের (মুসলমানদের) জন্য যথেষ্ট ছিল।

পরামর্শ সভার প্রধান পরামর্শদাতাগণ মহানবীর মর্যাদা ও অবস্থান রক্ষা করার জন্য এবং যাতে করে তাঁদের অভিমত প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয়, সেজন্য এ কথাও বলেছিলেন : এ সত্ত্বেও আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে যদি আপনি (শত্রু ভূ-খণ্ডে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে) আদিষ্ট হয়ে থাকেন, তা হলে আপনি যাত্রা শুরু করার আদেশ দান করুন এবং আমরাও আপনার পেছনে আছি।^{৪২৯}

মহানবী (সা.) বললেন : “মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন আদেশ আসে নি। আর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন আদেশ এসে থাকলে আমি তোমাদের সাথে পরামর্শ করতাম না। আমি পরামর্শ সভার অভিমতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এখান থেকেই মদীনায় ফিরে যাব। যে সব শাসনকর্তা সিরিয়া ও হিজায় সীমান্তে বসবাস করত, তারা সবাই খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিল এবং তাদের নিজেদের গোত্র ও আবাসভূমিতে তাদের অভিমতের কার্যকরী প্রভাব ছিল। এ কারণেই এ সম্ভাবনাও ছিল যে, রোমান বাহিনী একদিন তাদের স্থানীয় সেনাশক্তি ব্যবহার করতে পারে এবং তাদের সহায়তা নিয়ে হিজায় আক্রমণ করতে পারে। এ কারণেই এটা অপরিহার্য হয়ে গিয়েছিল যে, মহানবী (সা.) তাদের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করবেন এবং এভাবে তিনি তাদের পক্ষ থেকে হুমকির সম্মুখীন না হওয়ার ব্যাপারে স্বস্তি লাভ করবেন এবং অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবেন।

তিনি তাবুকের কাছে বসবাস রত সীমান্তরক্ষী ও শাসনকর্তাদের সাথে নিজেই যোগাযোগ করেন এবং বেশ কিছু শর্তসাপেক্ষে তাদের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেন। তিনি বেশ কিছু দলকেও তাবুক থেকে দূরে অবস্থিত অঞ্চল লোয় প্রেরণ করেছিলেন যাতে মুসলমানদের জন্য অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

আইলা, আযরু ও জার্বার শাসনকর্তাদের সাথে তিনি নিজে যোগাযোগ করেন এবং তাদের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেন। সমুদ্র তীরবর্তী নগরী আইলা লোহিত সাগরের তীরে নির্মাণ করা হয়েছিল এবং শামের সাথে এ নগরীর তেমন একটা দূরত্ব ছিল না। সেখানকার শাসনকর্তা ইউহান্না ইবনে রৌবাহ্ বুক্রে স্বর্ণনির্মিত ক্রুশ ঝুলিয়ে তাঁর শাসনকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে

তাবুক অঞ্চলে এসে মহানবীকে একটি সাদা খচ্চর উপঢৌকন দিয়েছিলেন এবং মহানবীর প্রতি তাঁর আনুগত্যের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছিলেন। মহানবীও তাঁকে সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং তাঁকে উপঢৌকন প্রদান করেছিলেন।

তিনি খ্রিষ্টধর্মে বহাল থেকে প্রতি বছর তিন শ' দীনার জিযিয়া (প্রত্যেক বিধর্মী নাগরিক ইসলামী হুকুমতের আওতা ও তত্ত্বাবধানে বসবাস করে ইসলামী প্রশাসনকে যে কর প্রদান করে) এবং আইলা অঞ্চল অতিক্রমকারী মুসলমানকে আপ্যায়ন করার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করেন। এ মর্মে উভয় পক্ষের মধ্যে নিম্নরূপ একটি নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় :

“ এটা হচ্ছে মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে ইউহান্না ও আইলার অধিবাসীদের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি। এ চুক্তি মোতাবেক জল ও স্থলপথে ব্যবহৃত তাদের সমুদয় যানবাহন এবং শাম, ইয়েমেন ও সমুদ্র পথে যারা তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে, তাদের সবাইকে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। তবে তাদের মধ্য থেকে যে কেউ কোন অপরাধ করবে এবং আইনবিরোধী কোন কাজ করবে, তার সম্পত্তি তাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। সকল জল ও স্থলপথ তাদের জন্য উন্মুক্ত এবং এ সব পথে তাদের যাতায়াতের অনুমতিও প্রদান করা হলো।^{৪৩০}

এ সন্ধিপত্র থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কোন জাতি মুসলমানদের সাথে আপোষ ও সন্ধি করলে তাদের জন্য সব ধরনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হতো।

মহানবী (সা.) আযরু ও জার্বা অঞ্চলের অধিবাসীদের ন্যায় অন্য সকল সীমান্তবর্তী জনপদ, যাদের ভূ-খণ্ড সৈন্য সমাবেশের দিক থেকে অত্যন্ত রত্নপূর্ণ ছিল, তাদের সাথেও বেশ কিছু চুক্তি সম্পাদন করে উত্তর দিক থেকে ইসলামী রা ও মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন।

দাওমাতুল জান্দাল অঞ্চলে খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে প্রেরণ

দাওমাতুল জান্দাল এক জন- অধ্যুষিত অঞ্চলকে বলা হতো, যা সবুজ গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল এবং সেখানে নহর ও ঝরনার প্রবহমান পানি ছিল। এ অঞ্চলটি একটি শক্তিশালী দুর্গের পাশে অবস্থিত ছিল এবং শামের সাথে এ অঞ্চলের দূরত্ব ছিল প্রায় ৫০ ফারসাখ।^{৪৩১}

তখন উকাইদার ইবনে আবদুল মালিক মাসীহী দাওমাতুল জান্দালের শাসনকর্তা ছিলেন। মহানবী (সা.) আশংকা করছিলেন, রোমান বাহিনী পুনরায় আক্রমণ চালালে দাওমার খ্রিষ্টান শাসনকর্তা তাদেরকে সাহায্য করবে। আর এভাবে আরব উপদ্বীপের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে। এজন্য তিনি বিদ্যমান সেনাশক্তির সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার এবং খালিদের নেতৃত্বে একটি সেনাদল প্রেরণ করে দাওমা অঞ্চলকে (ইসলামী হুকুমতের প্রতি) বশ্যতা স্বীকার করানোর বিষয়কে অত্যাবশ্যিক বিবেচনা করছিলেন।

খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ত একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে দাওমাতুল জান্দালের কাছাকাছি চলে যান এবং দুর্গের বাইরে গোপনে অবস্থান গ্রহণ করেন।

আলোকোজ্জ্বল ঐ চাঁদনী রাতে ভাই হাসসানকে সাথে নিয়ে উকাইদার শিকারের উদ্দেশ্যে দুর্গের বাইরে আসেন। তখনও তিনি দুর্গ থেকে দূরে যান নি; হঠাৎ তিনি তাঁর সঙ্গী- সাথীসহ খালিদের সেনাদলের মুখোমুখি হন। তাদের ও মুসলিম সৈন্যদের মাঝে ছোট একটি সংঘর্ষ হয়। এতে উকাইদারের ভাই নিহত হয়। উকাইদারের সঙ্গীরা দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেয় এবং দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু উকাইদার মুসলিম সেনাদলের হাতে বন্দী হন।

খালিদ তাঁর সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, দুর্গের অধিবাসীরা তাঁর নির্দেশে ইসলামী সেনাদলের জন্য দুর্গের দরজা খুলে দিলে এবং অস্ত্র সমর্পণ করলে তিনি তাঁর দোষ উপেক্ষা করবেন এবং তাঁকে মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর কাছে নিয়ে যাবেন।

উকাইদার মুসলমানদের সত্যবাদিতা এবং চুক্তির প্রতি তাদের নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত থাকার ব্যাপারে জ্ঞাত ছিলেন। এ কারণেই তিনি দুর্গের দরজা খুলে দেয়া ও অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিলেন। দুর্গের

मध्ये विद्यमान अस्त्रं हिल निम्नरूप : चार श' बर्म, पाँच श' तरबारी एवं चार श' वर्षा।
खालिद एसब युद्धलक्ष्ण गनीमत ओ उकाईदारके साथे निले पवित्र मदीनार उद्देशे रओयाना हन।
मदीनाय प्रवेश करार प्रा ाले खालिद उकाईदारेर स्वर्णखचित हाताहीन आलखाल्ला, या तिलि
राजादेर मतो काँधेर उपर बुलिले दितेन एवं या खालिदेर हाते तुले दिलेखिलेन, ता
महानवी (सा.)- एर काछे पाठिले देन। स्वर्णखचित ए रेशमी पोशाकटिले उपर दृष्टि पडले
एकदल दुनिया-अश्वेषी लोकेर चोख छानाबडा हये गिलेखिल। अथच महानवी (सा.) ँ
पोशाकटिले व्यापारे बिन्दुमात्र रूतु ना दिले बलेखिलेन : “बेहेशतबासीदेर पोशाक एर
चेयेओ अधिक शानदार ओ आश्चर्यजनक।”

उकाईदार महानवी (सा.)- एर निकट उपस्थित हलेन एवं इस्लाम धर्म ग्रहणेर व्यापारे अस्वीकृति
जानालेन। तबे तिलि मुसलमानदेर कर प्रदानेर व्यापारे समृति प्रदान करलेन। महानवी (सा.)
ओ तँर माणे एकटि चूक्तिनामा सम्पादित हलो। एरपर महानवी (सा.) तँके अत्यन्त मूल्यवान
उपहार प्रदान करलेन एवं तँके निरापदे दाओमातुल जान्दाले पौँछे देवार जन्य आबाद
इबने विश्रके दायित्व दिलेन।^{४०२}

তাবুক অভিযান মূল্যায়ন

মহানবী (সা.) অত্যন্ত কষ্টকর এ অভিযানে শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হন নি এবং তাদের সাথে কোন সংঘর্ষেও লিপ্ত হন নি। তবে তিনি কিছু আধ্যাতিক ও মনস্তাত্ত্বিক কল্যাণ লাভ করেছিলেন, যেসব হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. এর মাধ্যমে তিনি ইসলামী সেনাবাহিনীর মর্যাদা সমুল্লত করেছিলেন এবং হিজায়ের অধিবাসীদের ও শামের সীমান্ত এলাকা লোর বাশিন্দাদের অন্তরে তাঁর সম্মান ও ক্ষমতা দৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর শত্রু-মিত্র সবাই বুঝতে পেরেছিল, ইসলাম ও মুসলমানদের সামরিক শক্তি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যা বিশ্বের পরাশক্তি লোর মোকাবেলা করতে এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করতে সক্ষম।

বিরুদ্ধাচরণ ও সীমাল ন যে আরব গোত্র লোর অস্তিত্ব ও স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছিল, তাদের মাঝে এ বিষয়টি প্রচারিত হয়ে যাওয়ার কারণে বেশ কিছুকালের জন্য তাদের মন থেকে (ইসলাম ধর্ম ও মহানবীর) বিরুদ্ধাচরণ ও বিদ্রোহ করার চিন্তা উবে গিয়েছিল এবং তারা এ ধরনের চিন্তার ধারে- কাছেও আর যায় নি।

এ কারণেই মদীনা নগরীতে মহানবীর প্রত্যাবর্তনের পর যে সব গোত্র তখনও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নি, তাদের প্রতিনিধিরা মদীনা নগরীতে এসে নিজেদের ইসলাম গ্রহণ এবং মহানবীর প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দিতে থাকে। ফলে হিজরতের নবম বর্ষকে ‘আমুল উফূদ’ (عام الوفود) অর্থাৎ ‘প্রতিনিধি দল লোর বর্ষ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

২. হিজায় ও সিরিয়ার সীমান্তবাসীদের সাথে বেশ কিছু সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে মুসলমানরা আরব উপদ্বীপের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করেছিল এবং নিশ্চিত হতে পেরেছিল যে, ঐ সব অঞ্চলের গোত্রপতি ও নেতারা রোমান সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করবে না।

৩. মহানবী (সা.) কষ্টকর এ অভিযান পরিচালনা করে আসলে পরবর্তী কালে শাম বিজয়ের পথ উন্মুক্ত করেছিলেন এবং সেনাবাহিনীর অধিনায়কগণকে এ ক্ষেত্রে সঠিক পথ প্রদর্শন এবং এ অঞ্চলে বিদ্যমান যাবতীয় সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার সাথে তাঁদেরকে পরিচিত করিয়েছিলেন। আর সে সাথে তখনকার পরাশক্তি লোর মোকাবেলায় কিভাবে সৈন্য পরিচালনা করতে হবে, তাও তিনি তাঁদেরকে শিখিয়েছিলেন। তাই মহানবী (সা.)- এর ওফাতের পর মুসলমানরা সর্বপ্রথম যে অঞ্চল জয় করেছিলেন, তা ছিল শাম ও সিরিয়া।^{৪৩০}

৪. তাবুক অভিযানে গণবাহিনী পুনর্গঠনের সময় মুমিন ও মুনাফিক পরস্পর চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। আর এর ফলে মুসলিম সমাজে ব্যাপক শুদ্ধি প্রক্রিয়াও সাধিত হয়েছিল।

মহানবী (সা.)- কে মুনাফিকদের হত্যার ষড়য

মহানবী (সা.) প্রায় দশ দিন^{৪৩৪} তাবুকে অবস্থান করেছিলেন এবং দাওমাতুল জান্দালে খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে প্রেরণের পর তিনি মদীনার পথে রওয়ানা হন। বারো জন মুনাফিক, যাদের আট জন ছিল কুরাইশ বংশোদ্ভূত এবং বাকী চার জন ছিল মদীনার অধিবাসী, সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, দুই পাহাড়ের মাঝের দুর্গম সরু পথের (গিরিপথ) উপর থেকে মহানবীর মদীনা ও শামের মাঝে পথ চলা উটকে ভীত- সন্ত্রস্ত করে দেবে এবং এভাবে তারা মহানবীকে উপত্যকার গভীরে ফেলে দিতে সক্ষম হবে। মুসলিম সেনাবাহিনী এ গিরিপথের কাছে পৌঁছলে মহানবী (সা.) বললেন : “যে কেউ ইচ্ছা করলে উপত্যকা বা মরু- প্রান্তরের মাঝখান দিয়েও পথ চলতে পারে। কারণ মরু- প্রান্তর বেশ প্রশস্ত। কিন্তু স্বয়ং মহানবী এ গিরিপথ ধরে উঁচুতে উঠে গেলেন এবং পথ চলতে লাগলেন। হযরত হুযাইফা তাঁর উট চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির তার লাগাম ধরে টানছিলেন। তখনও মহানবী গিরিপথ ধরে ততটা উঁচুতে উঠেন নি, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি তাঁর পেছন দিকে তাকিয়ে ঐ আলোকোজ্জ্বল রাতে কতিপয় আরোহীকে দেখতে পেলেন, তারা তাঁকে অনুসরণ করছে এবং তারা যাতে শনাক্ত না হয়ে যায়, সেজন্য তাদের মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছে এবং নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। মহানবী ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের প্রতি ভীতিপ্রদ আওয়াজ দিলেন এবং হযরত হুযাইফাকে লাঠি দিয়ে ঐ সব অনুসরণকারীর উট লোকে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর আওয়াজ, অনুসরণকারীদের অন্তরে প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার করেছিল এবং তারাও বুঝতে পেরেছিল, মহানবী তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তাই তারা তৎক্ষণাৎ যে পথে এসেছিল, সে পথেই ফিরে গিয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছিল।

হুযাইফা বলেন : “আমি তাদের উট লোর চিহ্ন দেখে তাদেরকে চিনতে পেরেছিলাম এবং মহানবী (সা.)- কে বলেছিলাম : আমি আপনার কাছে তাদের পরিচিতি তুলে ধরব, যাতে আপনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। মহানবী (সা.) তখন দয়াদ্রুপূর্ণ কণ্ঠে আমাকে নির্দেশ দিলেন,

আমি যেন তাদের নাম প্রকাশ থেকে বিরত থাকি। সম্ভবত তারা তওবা করতে পারে। তিনি আরো বললেন : “আমি তাদেরকে শান্তি প্রদান করলে বিধর্মীরা বলবে, মুহাম্মদ শক্তি ও ক্ষমতার তুঙ্গে পৌঁছানোর পর নিজ সঙ্গী- সাথীদের গর্দানের ওপর তরবারির আঘাত হেনেছে।” ৪৩৫

নিয়্যত আমলের প্রতিনিধি

স্বদেশে বিজয়ী বেশে সেনাবাহিনীর প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য অপেক্ষা আর কোন দৃশ্যই অধিক জমকালো হয় না। একজন মুজাহিদ যোদ্ধার গৌরব ও মর্যাদা সংরক্ষণকারী এবং তাঁর অস্তিত্বের নিশ্চয়তা বিধায়ক শত্রুর ওপর বিজয়ের চেয়ে আর কোন কিছুই তাঁর কাছে অধিকতর আনন্দদায়ক ও সুমিষ্ট হতে পারে না। ঘটনাক্রমে উভয় বিষয়ই মদীনায় ইসলামের বিজয়ী সেনাদলের প্রত্যাবর্তন মুহূর্তে পরিদৃষ্ট হয়েছিল।

তাবুক ও মদীনার অন্তর্বর্তী দূরত্ব অতিক্রমের পর বিজয়ী মুসলিম বাহিনী পূর্ণ গৌরব ও জাঁকজমক সহ মদীনায় প্রবেশ করল। ইসলামের সৈনিকরা তখন আনন্দ ও উৎসাহ- উদ্দীপনায় আ হারা হয়ে গিয়েছিলেন। সৈনিকদের গৌরব ও শত্রুর ওপর বিজয়ী হবার গর্ব তাদের কথাবার্তা ও আচার- আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। আর এর কারণও স্পষ্ট ছিল। কারণ শক্তিশালী রা , যা নিজের শক্তিদ্বারা প্রতিপক্ষ ইরানকে মাটিতে বসিয়ে দিয়েছিল, সেই শক্তিশালী রা কেই তারা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য ও তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করতে এবং শাম ও হিজায়ের সকল সীমান্তবাসীকে নিজেদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছে।

নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, শত্রুর ওপর বিজয় এমন এক গৌরব- যা এ সেনাবাহিনীর ভাগ্যে জুটেছিল এবং যারা কোন গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়াই মদীনায় বসে থেকেছিল (এবং যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত ছিল) তাদের ওপর এদের গর্ব করা ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত। তবে এ ধরনের চিন্তা- ভাবনা ও বিজয়ী বেশে প্রত্যাবর্তন কম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মাঝে মাত্রাতিরিক্ত গর্বের উ ব ঘটাতে পারত এবং সেই সম্ভাবনাও ছিল। আর তা যুক্তিসংগত কারণবশত মদীনায় থেকে যাওয়া এবং দুঃখ ও আনন্দে আন্তরিকভাবে তাদের শরীকদের প্রতি অবমাননা, অবজ্ঞা ও

ধৃষ্টতা বলে গণ্য হবার সম্ভাবনা ছিল। এ কারণেই মহানবী (সা.) মদীনার কাছাকাছি স্থানে অল্প সময়ের জন্য ইসলামী বাহিনী যাত্রা বিরতি করলে তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন :

إن بالمدينة لأقواما ما سرتهم سيرا و لا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، قالوا : يا رسول الله و هم بالمدينة؟ قال: نعم حسبهم العذر

“ মদীনায় এমন কিছু ব্যক্তি ও দল আছে, যারা এ অভিযানে তোমাদের শরীক ছিল এবং তোমরা যেখানেই পা রেখেছ, তারাও সেখানে পা রেখেছে।” তখন মহানবীকে জিজ্ঞেস করা হলো: “এটা কিভাবে কল্পনা করা সম্ভব যে, তারা মদীনায় অবস্থান করছে, অথচ আমাদের সাথে এ অভিযানে রয়েছে?” তখন তিনি বললেন : “তারা ঐ সব ব্যক্তি, যারা ইসলামের এক সুমহান দায়িত্ব অর্থাৎ জিহাদের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ পোষণ করা সত্ত্বেও কোন যুক্তিসংগত কারণবশত জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছে।^{৪৩৬}

মহানবী (সা.) তাঁর এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের একটি শিক্ষণীয় কর্মসূচী ও নীতির দিকে ইঙ্গিত করেন এবং সেই সাথে তিনি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, পবিত্র চিন্তাধারা ও সদৃষ্টি নেক আমল বা পুণ্যময় কর্মের জ্বলন্তী হয় এবং যে সব ব্যক্তি শক্তি- সামর্থ্য না থাকার কারণে এবং উপায়- উপকরণের অভাবে পুণ্যের কাজ আঞ্জাম দেয়া থেকে বঞ্চিত থাকে, আঁ ক আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করার কারণে তারাও পুণ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যদের শরীক হতে পারবে।

ইসলাম যদি বাহ্য অবস্থা সংস্কার করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়, তা হলে অভ্যন্তরীণ (আঁ ক) অবস্থা সংশোধন ও সংস্কারের ব্যাপারে এ ধর্মের আগ্রহ আরো বেশি হবে। কারণ সকল সংস্কার কার্যক্রমের উৎস হচ্ছে আকীদা- বিশ্বাস এবং চিন্তা- প্রক্রিয়ার সংশোধন এবং আমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড আমাদের চিন্তা- ভাবনা দ্বারা উ ত ও উৎসারিত।

মহানবী (সা.) তাঁর বক্তব্যের দ্বারা মুজাহিদদের অসমীচীন অহংকার বিলুপ্ত করে দিলেন এবং সংগতভাবে বিরত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মর্যাদা রক্ষা করলেন। তবে যে সব লোক বিনা কারণে যুদ্ধে

যোগদান থেকে বিরত ছিল তাদেরকে শিক্ষা দেয়া এবং তাদের বিচরণক্ষেত্র সংকীর্ণ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

নেতিবাচক সংগ্রাম ও প্রতিরোধ

যেদিন মদীনায় সর্বসাধারণ রণপ্রস্তুতি ও সেনা পুনর্গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল সেদিন তিন ব্যক্তি হিলাল, কা'ব ও মুরারাহ্ মহানবীর নিকট উপস্থিত হয়ে এ জিহাদে যোগদান না করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। তাদের অজুহাত ছিল এই যে, তখনও ক্ষেত-খামার ও বাগান থেকে শস্য তোলা, মাড়াই ও সংগ্রহের কাজ শেষ হয় নি এবং তাদের ফসল তোলা ও মাড়াইয়ের কাজ কেবল অর্ধেক সম্পন্ন হয়েছে। তবে তারা মহানবীকে কথা দিয়েছিল যে, কয়েক দিনের ব্যবধানে ফসল ছিয়ে ঠিক করার পর তারা যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগ দেবে। এ ধরনের ধর্ম ও অর্থ, বস্তুগত স্বার্থ এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি নিবন্ধকারী লোকেরা আসলে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। তারা ত অপসূয়মান বস্তুগত আনন্দ উপভোগকে চিন্তাগত ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার পতাকাতলে বাস্তবায়িত মর্যাদাকর মানব জীবনের সমকক্ষ বলে মনে করে, এমনকি কখনো কখনো তারা ঐ সব বস্তুগত আনন্দ ও উপভোগকে মর্যাদাকর মানব জীবনের উপরও প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

মহানবী (সা.) মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর এ ধরনের লোকদের যথোপযুক্ত শাস্তি দান করে সমাজের অন্যান্য সদস্য ও ব্যক্তির মধ্যে এ ব্যাধি সংক্রমণের পথ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারা কেবল এ জিহাদে অংশগ্রহণ তো করেই নি; বরং নিজেদের প্রতিশ্রুতিও পালন করে নি। তারা ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে এতটা মশ ল হয়ে গিয়েছিল যে, মদীনায় বিজয়ী বেশে মহানবীর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ হঠাৎ করেই প্রচারিত হয়ে গেল। এ তিন জন ক্ষতিপূরণের আশায় মহানবীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ত ছুটে এসেছিল এবং অন্যদের মতো তারাও মহানবীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছিল।

মহানবী (সা.) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ঐ গৌরবময় সমাবেশে এবং আনন্দের মধ্যে তিনি ভাষণ দেয়া শুরু করলেন। প্রথম যে কথা তিনি ঐ বিশাল সমাবেশে বলেছিলেন তা হলো :

“হে লোকসকল! এ তিন ব্যক্তি ইসলামের বিধানকে হালকা করে দেখেছে ও উপেক্ষা করেছে এবং তারা আমার সাথে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে অনুসারে কাজ করে নি এবং তারা তাওহীদের

মর্যাদাকর জীবনের ওপর নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছে। সুতরাং এদের সাথে তোমরা তোমাদের যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেল।”

যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরতদের সংখ্যা নব্বই জন হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু এদের অধিকাংশই ছিল মুনাফিক এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে তারা যে অংশগ্রহণ করবে, তা তাদের কাছ থেকে কখনই আশা করা যায় না, সেহেতু এ তিন মুসলমানের ওপরই বয়কট ও তাদেরকে একঘরে করে রাখার মূল চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, এ তিন ব্যক্তির মধ্যে মুরারাহ্ ও হিলাল বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মুসলমানদের মাঝে তাদের সুনাম ছিল।

মহানবী (সা.)-এর প্রাজ্ঞ নীতি, যা তাঁর ধর্ম তথা শরীয়তেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, অতি বিস্ময়কর প্রভাব রেখেছিল। যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে যারা বিরত ছিল, তাদের কেনা-বেচা ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাদের পণ্য-সামগ্রী বিক্রি হতো না। তাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ লোকজনও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল, এমনকি তাদের সাথে কথা বলা ও তাদের কাছে যাতায়াত পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল।

তাদের সাথে জনগণের সম্পর্কচ্ছেদ তাদের আঁ ও মন-মানসিকতার ওপর এতটা চাপ প্রয়োগ করেছিল যে, পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের দৃষ্টিতে তা একটি খাঁচার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না।^{৪৩৭}

এ তিন ব্যক্তি পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা সহ উপলব্ধি করতে পেরেছিল, মুসলমানদের কাতারে সত্যিকারভাবে शामिल হওয়া ছাড়া ইসলামী সামাজিক পরিমণ্ডলে বসবাস মোটেই সম্ভব নয় এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপরীতে সংখ্যাস্বল্পদের জীবন দীর্ঘস্থায়ী হবে না, বিশেষ করে এ সংখ্যাস্বল্পরা যদি উচ্চাভিলাষী, মতলববাজ ও দুরভিসন্ধি সম্পন্ন হয়।

একদিকে এ সব হিসাব-নিকাশ এবং অন্যদিকে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) আকর্ষণ, তাদেরকে পুনরায় প্রকৃত ঈমানের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তারা তওবা করে এবং মহান আল্লাহর দরবারে নিজেদের কাপুরুসোচিত কর্মকাণ্ডের জন্য দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয়। মহান আল্লাহও তাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে বলে মহানবীকে অবগত করেন এবং সাথে

সাথে মহানবীর পক্ষ থেকেও তাদেরকে একঘরে করে রাখার নির্দেশ প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়া
হয়। ৪৩৮

মসজিদে যিরারের ঘটনা

আরব উপদ্বীপে মদীনা ও নাজরান আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের জন্য দু'টি বিশাল কেন্দ্র বলে গণ্য হতো। এ কারণেই আউস ও খায়রাজ গোত্রীয় কিছু আরব ইহুদী ও খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

উহুদ যুদ্ধের একজন বিখ্যাত শহীদ হানযালার পিতা আবু আমীর জাহিলীয়াতের যুগে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি প্রচণ্ডভাবে ঝুঁকে পড়েছিল এবং খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ইসলামের নব তারকা মদীনা থেকে উদিত হয়ে সকল ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিজের মাঝে বিলীন করে দেয়। আবু আমীর খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল। আর তখন থেকেই সে আউস ও খায়রাজ গোত্রের মুনাফিকদের সাথে আন্তরিক সহযোগিতা শুরু করে দেয়। মহানবী (সা.) তার ধ্বংসা ক তৎপরতা সম্পর্কে জ্ঞাত হলে তাকে গ্রহণতার করতে চাইলেন। কিন্তু সে প্রথমে মদীনা থেকে মায় পালিয়ে যায় এবং সেখান থেকে তায়েফে এবং তায়েফের পতন হলে সেখান থেকে সে শামে পালিয়ে যায়। সে সুদূর শাম থেকে মুনাফিক গোষ্ঠীর গোপন নেটওয়ার্ক পরিচালনা করত।

সে বন্ধুদের প্রতি লেখা একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছিল : কুবা গ্রামে তোমরা মুসলমানদের বিপক্ষে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে এবং নামাযের ওয়াক্তে সেখানে জড়ো হবে। ফরয নামায আদায় করার বাহানায় সেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং গোষ্ঠীগত কর্মসূচী ও পরিকল্পনা লো বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে পরস্পর আলোচনা ও মতবিনিময় করবে।

আবু আমীর এ কালের ইসলামের শত্রুদের মতো অনুধাবন করেছিল যে, যে দেশে ধর্ম পূর্ণরূপে প্রচলিত, সেখানে ধর্মের মূলোৎপাটনের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হচ্ছে ধর্মের নামের অপব্যবহার। ধর্মের ক্ষতিসাধন করার জন্য অন্য যে কোন উপাদানের চেয়ে সবচেয়ে বেশি ধর্মের নাম ব্যবহার করা যেতে পারে।

সে খুব ভালোভাবেই জানত, মহানবী (সা.) যে কোন শিরোনামে মুনাফিকদের সমাবেশকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেবেন না। তবে এ কেন্দ্রের গায়ে যদি ধর্মীয় লেভেল আঁটা যায় এবং মসজিদ ও ইবাদতগাহ নির্মাণ করার বহিরাবরণে যদি নিজেদের একটি সমাবেশস্থল নির্মাণ করা যায়, সে ক্ষেত্রে হয় তো বা মহানবী (সা.) তাদেরকে অনুমতি দেবেন।

মহানবী (সা.)- এর তাবুক অভিযানে বের হওয়ার সময় মুনাফিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা মহানবী (সা.)- এর কাছে উপস্থিত হয়ে অন্ধকার ও বর্ষণমুখর রাতে তাদের বৃদ্ধ ও রোগীরা ঘর থেকে কুবা মসজিদের দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে না- এ বাহনায় তাদের মহল্লায় একখানা মসজিদ নির্মাণের অনুমতি চায়। কিন্তু মহানবী (সা.) তাদের আবেদন অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করা সংক্রান্ত কোন কথাই বললেন না এবং এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় অভিযান থেকে ফেরা পর্যন্ত স্থগিত রাখলেন।^{৪৩৯}

মুনাফিক গোষ্ঠী মহানবী (সা.)- এর অনুপস্থিতিতে একটি স্থান নির্বাচন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ স্থানে মসজিদের নামে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে। মহানবী (সা.)- এর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের দিন তারা মহানবীর কাছে এসে আবেদন জানাল, তিনি যেন কয়েক রাকাত নামায আদায় করার মাধ্যমে এ ইবাদতগাহের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ঠিক সেই মুহূর্তে ওহীর ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে মহানবীকে পুরো ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং এ ইমারতকে ‘মসজিদ- ই যিরার’ (مسجد ضرار) বলে অভিহিত করলেন যা রাজনৈতিক শ্রেণীবিভক্তি এবং মসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে।^{৪৪০}

মহানবী (সা.) মসজিদে যিরারের ইমারত ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া, সেখানকার কড়িকাঠ লো জ্বালিয়ে ফেলা এবং বেশ কিছুকাল তা ময়লা- আবর্জনা ফেলার স্থান হিসেবে ব্যবহার করার নির্দেশ জারী করেছিলেন।^{৪৪১}

মুনাফিক- গোষ্ঠীর ললাটের উপর মসজিদে যিরার ধ্বংস করা ছিল এক বিরাট মারণ আঘাত। এরপর থেকে এ গোষ্ঠীর সূত্র ছিন্ন- ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থক আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও তাবুক যুদ্ধের পর দু’মাসের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। তাবুক অভিযান ছিল সর্বশেষ ইসলামী গায্‌ওয়া যাতে মহানবী (সা.) নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি আর কোন সশস্ত্র জিহাদে অংশগ্রহণ করেন নি।

পঞ্চদশম অধ্যায় : নবম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

মদীনায় সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল

তাবুক অভিযান অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছিল এবং মুজাহিদগণ ক্লান্ত দেহে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। যোদ্ধারা এ সামরিক অভিযানে পশ্চিমধ্যে কোন শত্রুর মুখোমুখি হন নি এবং তাদের কোন গনীমতও অর্জিত হয় নি। এ কারণে একদল সরলমনা লোক এ অভিযানকে বৃথা বলে বিবেচনা করত। তবে তারা এ অভিযানের অদৃশ্য ফলাফল সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এ অভিযানের ফলাফল স্পষ্ট হয়ে গেল এবং আরবের সবচেয়ে অনমনীয় গোত্র- যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং মহানবীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে মোটেই প্রস্তুত ছিল না, - মহানবীর নিকট প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে নিজেদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা দিয়েছিল এবং মুসলমানদের জন্য তাদের দুর্গ লোর দরজা লো খুলে দিয়েছিল যাতে তাঁরা এ গোত্রের প্রতিমা ও মূর্তি লো ধ্বংস করে সে লোর স্থানে তাওহীদের পতাকা উড্ডীন করেন।

মূলত অগভীর দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ব্যক্তির সর্বসময় দৃশ্যমান ও তথাকথিত মুষ্টিপূর্ণকারী ফলাফলের ব্যাপারে রুত্ব দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের সৈনিকরা যদি পশ্চিমধ্যে কোন শত্রুর মুখোমুখি হয়ে তাকে হত্যা করতেন এবং তার অর্থ- সম্পদ জব্দ করতেন, তা হলে তারা বলত, যুদ্ধের ফলাফল খুবই উজ্জ্বল ছিল। তবে গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করেন; যে কাজ লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে, সে কাজের প্রশংসা করেন এবং সেটাকে ফলপ্রসূ বলে বিবেচনা করেন।

মহানবী (সা.)- এর লক্ষ্য ছিল সমগ্র আরব জাতির ইসলাম গ্রহণ, সে ক্ষেত্রে তাবুক যুদ্ধ ঘটনাচক্রে বেশ উপযোগী প্রভাব রেখেছিল। কারণ সমগ্র হিজায়ে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল, রোমানরা (যে রোমান জাতি সর্বশেষ যুদ্ধে তদানীন্তন সভ্য বিশ্বের অর্ধেক অংশ যে ইরানী জাতি, - এমনকি ইয়েমেন ও তৎসংলগ্ন এলাকাসমূহের ওপর শাসন ও কর্তৃত্ব করত, - তাদেরকে পরাজিত করে তাদের কাছ থেকে ক্রুশ উদ্ধার করে তা বাইতুল মুকাদ্দাস তথা জেরুজালেমে নিয়ে গিয়েছিল) মুসলমানদের সামরিক শক্তি দেখে ভীত হয়ে মুসলিম

সেনাবাহিনীকে মোকাবেলা থেকে বিরত থেকেছে। এ সংবাদ প্রচারিত হবার ফলে কঠোর (মানসিকতাসম্পন্ন) আরব গোত্র লো, যারা আগের দিন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ এবং মুসলমানদের সাথে সন্ধি করতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না, তারা মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করার চিন্তা শুরু করে এবং তদানীন্তন বিশ্বের পরাশক্তি লো, যেমন রোম ও ইরানের আগ্রাসন থেকে নিরাপদ থাকার জন্য ইসলাম গ্রহণ করার প্রবণতা প্রদর্শন করে।

সাকীফ গোত্রে মতবিরোধ

আরব জাতির মধ্যে সাকীফ গোত্র অবর্ণনীয় ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতা ও এক ঐয়মীর জন্য কুখ্যাত ছিল। এ গোত্র তায়েফের মজবুত দুর্গে আশ্রয় নিয়ে পুরো এক মাস মুসলিম বাহিনীকে বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছিল এবং তাদের কাছে আ সমর্পণ করে নি।^{৪৪২}

সাকীফ গোত্রের একজন নেতা উরওয়াহ ইবনে মাসউদ সাকীফ তাবুক অঞ্চলে ইসলামী বাহিনীর বিরূপ বিজয় সম্পর্কে অবগত হলেন। মহানবী (সা.)-এর মদীনায় প্রবেশের আগেই উরওয়াহ মহানবী সকাশে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মহানবীর কাছে তায়েফ গিয়ে নিজ গোত্রের কাছে একত্ববাদী ধর্মের দাওয়াত প্রদানের অনুমতি চান। মহানবী এ দাওয়াতের পরিণতির ব্যাপারে আশংকা প্রকাশ করে বললেন : “আমি ভয় পাচ্ছি, তুমি এ পথে প্রাণ হারাবে।” তিনি জবাবে বলেছিলেন, তারা তাদের নিজেদের চোখের চেয়েও তাঁকে অধিক ভালোবাসে।

উরওয়াহ ইসলামের যে মহত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তা তখনও তাঁর গোত্র ও গোত্রের অন্য নেতারা বুঝতে পারে নি। তখনও তাদের মন- মগজে মিথ্যার অহংকার বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই তারা প্রথমে ইসলামের প্রচারকারীকে নিজ কক্ষে দাওয়াতরত অবস্থায়ই তীর বর্ষণ করে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করে। শাহাদাত লাভের মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন : “আমার মৃত্যু হচ্ছে একটি অলৌকিক বিষয় যে ব্যাপারে মহানবী (সা.) আমাকে আগেই জানিয়েছিলেন।”

সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল

উরওয়াহ্ ইবনে মাসউদ সাকীফকে হত্যা করার পর সাকীফ গোত্রের অধিবাসীরা অত্যন্ত অনুতপ্ত হলো এবং বুঝতে পারল, যে হিজায়ের সর্বত্র তাওহীদের পতাকা উত্তোলিত হয়েছে, সেখানে তাদের আর বসবাস সম্ভব নয় এবং তাদের সকল চারণক্ষেত্র ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ মুসলমানদের পক্ষ থেকে হুমকির সম্মুখীন হয়ে গেছে। নিজেদের সমস্যা লো পর্যালোচনার জন্য আয়োজিত সভায় তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাদের তরফ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে মহানবীর সাথে আলোচনা এবং কতিপয় শর্তসাপেক্ষে সাকীফ গোত্রের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিষয় ঘোষণার জন্য এক ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করা হবে।

তারা সর্বসম্মতিক্রমে আবদা ইয়ালাইলকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে, যে মদীনায় গিয়ে মহানবীর কাছে তাদের বার্তা পৌঁছে দেবে। কিন্তু সে তাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে : “আমার যাবার পর তোমাদের অভিমত যে পাতে যাবে এবং আমাকেও উরওয়ার মতো পরিণতি ভোগ করতে হবে, তা মোটেই অসম্ভব নয়।” এরপর সে আরো বলেছিল: “সাকীফ গোত্রের আরো পাঁচ ব্যক্তি আমার সাথে থাকলে আমি তোমাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করব। আর এ ছয় ব্যক্তিকে সমানভাবে এ প্রতিনিধি দলের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে।”

আবদা ইয়ালাইলের প্রস্তাব গৃহীত হলো। ছয় ব্যক্তি মদীনার উদ্দেশ্যে তায়েফ নগরী ছেড়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর মদীনা নগরীর অদূরে একটি ঝরনার পাশে যাত্রাবিরতি করে। মুগীরাহ্ ইবনে শুবাহ্ সাকীফ, যে মহানবীর সাহাবীগণের ঘোড়া লো চারণভূমিতে নিয়ে এসেছিল, সে নিজ গোত্রপতিদের ঝরনার পাশে দেখতে পায়। তৎক্ষণাৎ সে তাদের কাছে ত ছুটে যায় এবং তাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জেনে নেয়। অতঃপর মহানবীকে এক াঁয়ে সাকীফ গোত্রের অধিবাসীদের গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য সে ঐ ছয় ব্যক্তির কাছে ঘোড়া লো সোপর্দ করে ত মদীনার পথে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে হযরত আবু বকরের সাথে তার দেখা হলে সে তাঁকে পুরো ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত করে। আবু বকর তাকে অনুরোধ করেন যাতে করে সে তাঁকে সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমনের শুভ সংবাদ মহানবীর কাছে বয়ে নিয়ে

যাবার অনুমতি দেয়। অবশেষে হযরত আবু বকর মহানবীকে সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন সম্পর্কে অবহিত করে বলেন, কতিপয় শর্তসাপেক্ষে এবং (মহানবীর পক্ষ থেকে) একটি প্রতিশ্রুতিপত্র প্রদানের ভিত্তিতে তারা ইসলাম গ্রহণে প্রস্তুত।

মহানবী (সা.) মসজিদে নববীর কাছে সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের থাকা ও আপ্যায়নের জন্য একটি তাঁবু স্থাপন করে খালিদ ইবনে সাঈদ এবং মুগীরাকে এ প্রতিনিধি দলের আপ্যায়ন ও দেখাশোনার নির্দেশ দেন।

প্রতিনিধি দল মহানবীর নিকট উপস্থিত হয়। যদিও মুগীরাহ্ ইবনে শুবাহ্ তাদেরকে বলেছিল যে, তারা যেন জাহিলীয়াতের যুগের অভিবাদন পদ্ধতি পরিহার করে মুসলমানদের ন্যায় সালাম দেয়, কিন্তু অহংকার তাদের অস্থি-মজ্জার সাথে মিশে গিয়েছিল বিধায় তারা জাহিলী যুগের পদ্ধতিতেই মহানবীকে সালাম জানাল এবং তাঁকে ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত সাকীফ গোত্রের বার্তা ও প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করল। অতঃপর তারা আরো বলল : “ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদের কতিপয় শর্ত আছে, যে লো আমরা পরবর্তী বৈঠকে আপনার কাছে পেশ করব।” সাকীফ গোত্র প্রতিনিধি দলের সংলাপ কয়েক দিন ধরে চলতে থাকে। আর মহানবী (সা.) খালিদ ইবনে সাঈদের মাধ্যমে এসব সংলাপের সারবস্তু সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন।

প্রতিনিধি দলের শর্তাবলী

মহানবী (সা.) তাদের অনেক শর্তই মেনে নেন। এমনকি একটি অঙ্গীকারপত্রে তিনি তায়েফ অঞ্চল ও তায়েফবাসীর ভূ-খণ্ডের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন। তবে তাদের কতিপয় শর্ত এতটা অবমাননাকর ছিল যে, এর ফলে মহানবী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাদের একটি অযৌক্তিক শর্ত ছিল। তারা বলেছিল, তায়েফের জনগণ ঐ অবস্থায় তাওহীদী আদর্শ ও ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়বে যখন তায়েফের সবচেয়ে বড় প্রতিমালয় তিন বছরের জন্য এই একই অবস্থায় থাকবে এবং ঐ সময় ধরে সাকীফ গোত্রের প্রধান প্রতিমা ‘লাত’ - এর পূজা করতে দেয়া হবে। কিন্তু তারা মহানবীর ক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে তাদের অবস্থান থেকে সরে এসে পুনরায় আবেদন করল, তাদের প্রতিমালয় ও মন্দির লো এক মাসের জন্য বহাল রাখতে হবে।

যে নবীর মৌলিক লক্ষ্যই হচ্ছে একত্ববাদের প্রসার, প্রতিমালয়ের ধ্বংসসাধন এবং মূর্তিসমূহ ভেঙে ফেলা, তাঁর কাছে এ ধরনের আবেদন পেশ করা ছিল সত্যিই লজ্জাকর। তাদের এ বক্তব্য থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়, তারা এমন এক ইসলাম চাচ্ছে যা তাদের স্বার্থ ও অভ্যন্তরীণ ঝাঁকসমূহের ওপর মোটেই আঘাত হানবে না; আর তা না হলে তারা এ ধরনের ইসলাম মোটেই চাচ্ছে না। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা তাদের আবেদনের অবমাননাকর দিক লো বুঝতে পেরে সাথে সাথে অজুহাত পেশ করে বলল : “আমরা আমাদের গোত্রের বোকা মহিলা ও পুরুষদের মুখ বন্ধ করা এবং তায়েফ ভূ-খণ্ডে ইসলাম ধর্মের আগমনের পথে বিদ্যমান সব ধরনের বাধা অপসারণের জন্য এ ধরনের আবেদন জানিয়েছিলাম। মহানবী যখন এ ধরনের শর্তের ব্যাপারে সম্মত হচ্ছেন না, তখন তিনি যেন প্রতিমা ও মূর্তি লো নিজেদের হাতে ধ্বংস করা থেকে সাকীফ গোত্রের অধিবাসীদের অব্যাহতি দেন এবং অন্য ব্যক্তিদের তায়েফের মূর্তি লো ধ্বংস করার দায়িত্ব প্রদান করেন।” মহানবী এ শর্ত মেনে নেন। কারণ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এটাই ছিল যে, বাতিল উপাস্য লো যেন মানব জাতির মাঝ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়- হোক তা স্বয়ং তায়েফবাসীদের হাতে বা অন্য কোন ব্যক্তির হাতে।

তাদের দ্বিতীয় শর্ত ছিল মহানবী (সা.) যেন তাদের নামায পড়া থেকে অব্যাহতি দেন। তারা ভেবেছিল, মহানবী (সা.) আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নেতাদের মতো মহান আল্লাহর শরীয়ত পরিবর্তন করে দিতে পারেন অর্থাৎ একদলকে আইনের অধীন করতে পারেন এবং আরেক দলকে আইন পালন থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন। অথচ তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অমনোযোগী থেকে গিয়েছিল যে, তিনি ইলাহী ওহীর অনুসারী এবং শরীয়তের বিধান সামান্য খড়-কুটো পরিমাণও কম-বেশি করতে পারেন না।

তাদের প্রদত্ত এ শর্ত থেকে প্রতীয়মান হয়ে যায়, তখনও তাদের মধ্যে নিঃশর্ত আ-সমর্পণের মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয় নি এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি তাদের ঝোঁক এমন সব অবস্থার ফল ছিল, যা তাদেরকে বাহ্যত ইসলাম ধর্মের দিকে ধাবিত করেছিল; আর তা না হলে ইসলামের বিধানসমূহের ক্ষেত্রে বৈষম্যের পথ অবলম্বন অর্থাৎ কিছু বিধান পালন এবং অপর কিছু বিধান ত্যাগ করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। ইসলাম ও ঈমান (মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস) হচ্ছে এক ধরনের অভ্যন্তরীণ ও আর্কি আ-সমর্পণ, যার ছায়ায় মহান আল্লাহর যাবতীয় বিধান আগ্রহ সহকারে মেনে নেয়া ও পালন করা সম্ভব হয়। কেবল এ অবস্থায় ইলাহী বিধানসমূহ পালন করার ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক চিন্তা ও আচরণ মানবা-র্ক ও কল্পনার জগতে প্রবেশ করার পথ খুঁজে পাবে না।

মহানবী (সা.) তাদের এ শর্তের জবাবে বলেছিলেন : لا خير في دين لا صلاة معه : অর্থাৎ যাতে নামায নেই, সে দীনে কোন কল্যাণ নেই।

যে মুসলমান রাত-দিনে নিজ স্রষ্টা ও প্রভুর সামনে বিনয়াবনত হয় না ও মাথা নত করে না এবং তাঁর কথা স্মরণ করে না, সে আসলে মুসলমানই নয়।

উভয় পক্ষ তাদের নিজ নিজ শর্তের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সমঝোতায় উপনীত হলে বেশ কিছু ধারা ও শর্ত সম্বলিত একখানা চুক্তিপত্র মহানবী (সা.) কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল। মহানবী প্রতিনিধি দলকে বিদায় দিলেন যাতে তারা তাদের গোত্রের কাছে প্রত্যাবর্তন করে। (বিদায়ের প্রা-ালে) ঐ ছয় সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের মধ্য থেকে সবচেয়ে তরুণ ব্যক্তি, যিনি মদীনায় অবস্থানকালে

পবিত্র কুরআন ও শরীয়তের বিধান শিক্ষা লাভে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, মহানবী তাঁকে (প্রতিনিধি দলের) প্রধান হিসেবে মনোনীত এবং তায়েফের সাকীফ গোত্রের মাঝে তাঁর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। আর সে সাথে নবনিযুক্ত প্রতিনিধিকে জামাআতে নামায পড়ানোর সময় দুর্বল ও অসুস্থ ব্যক্তিদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামায দীর্ঘায়িত না করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

পরে মুগীরাহ ও আবু সুফিয়ান মহানবী (সা.)- এর পক্ষ থেকে সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে তায়েফ গিয়ে সেখানকার প্রতিমা ও মূর্তি লো ধ্বংস করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। যে আবু সুফিয়ান আগের দিন পর্যন্ত মূর্তি লোর রক্ষক ছিল এবং সে লো সংরক্ষণ করার পথে রক্তবন্যা প্রবাহিত করেছিল, সে কুঠার নিয়ে তায়েফের মূর্তি ও প্রতিমা লো ভেঙে সে লোকে জ্বালানী কাঠের স্তুপে পরিণত করেছিল এবং প্রতিমা লোর অলংকার বিক্রি করে মহানবীর নির্দেশ মতো উরওয়াহ ও তাঁর ভাই আসওয়াদের সকল ঋণ পরিশোধ করেছিল।^{৪৪৩}

ছাপ্পান্নতম অধ্যায় : নবম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

মিনা দিবসের ঘোষণাপত্র

হিজরতের নবম বর্ষের শেষের দিকে ওহীর ফেরেশতা সূরা তাওবার কয়েকখানা আয়াত নিয়ে এসে মহানবী (সা.)-কে দায়িত্ব প্রদান করলেন, তিনি যেন হজ্জের মৌসুমে ৪ ধারা সম্বলিত ঘোষণাপত্র সহ এ আয়াতসমূহ পাঠ করার জন্য এক ব্যক্তিকে পবিত্র মায় প্রেরণ করেন। এ সব আয়াতে মুশরিকদের যে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হয় এবং (চুক্তি সম্পাদনকারীরা যে সব চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে এবং কার্যত লন করে নি, কেবল সে সব চুক্তি ব্যতীত) সকল চুক্তি বাতিল করে দেয়া হয় এবং মুশরিক নেতারা ও তাদের অনুসারীদের স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হয়, চার মাসের মধ্যে তাওহীদী আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমতের সাথে যেন নিজেদের সম্পর্ক ও দায়িত্বটা সুস্পষ্ট করে নেয় এবং তারা যদি এ চার মাস সময়সীমার মধ্যে শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ না করে, তা হলে তাদের থেকে নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হবে।

প্রাচ্যবিদরা যখনই ইসলামের ইতিহাসের এ পর্যায়ে উপনীত হন, তখনই তারা ইসলামের প্রতি তাদের তীক্ষ্ণ আক্রমণ লো চালনা করতে থাকেন এবং (মুশরিকদের প্রতি ইসলাম ও মহানবীর) এ চূড়ান্ত কঠোর আচরণকে আকীদা- বিশ্বাস ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী বিবেচনা করেন। তবে তারা যদি সব ধরনের গোঁড়ামি পরিহার করে ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করতেন এবং এ বিষয়, যা সূরা তাওবা এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হয়েছে, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করতেন, তা হলে সম্ভবত তারা কম ান্তির শিকার হতেন এবং প্রত্যয়ন করতেন যে, এ পদক্ষেপ কখনই আকীদা- বিশ্বাস ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়, যা বিশ্বের সকল বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে সম্মানার্থ। এ ঘোষণাপত্র জারির মূল উদ্দেশ্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

১. জাহিলীয়াতের যুগে আরবদের প্রথা ছিল এই যে, পবিত্র কাবা তাওয়াফ ও যিয়ারতকারী প্রত্যেক ব্যক্তি যে পোশাক পরে কাবা তাওয়াফ করত, তা দরিদ্রকে দান করত এবং তার একটির বেশি পোশাক না থাকলে পোশাক ধার করে তা পরে তাওয়াফ করত, যাতে সে

দরিদ্রকে তার পোশাক দান করতে বাধ্য না হয়। আর ধার করা সম্ভব না হলে তাকে পোশাকবিহীন অবস্থায় তাওয়াফ করতে হতো।

একদিন এক সুন্দরী মহিলা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলে তার একটির বেশি পোশাক না থাকায় তখনকার কুসংস্কারমূলক প্রথা অনুসারে সে বিবস্ত্র হয়ে তাওয়াফ করতে বাধ্য হলো। বলার অপেক্ষা রাখে না, বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে বিশ্বের সবচেয়ে পবিত্র স্থানে এ ধরনের তাওয়াফ, তাও আবার বিবস্ত্র হয়ে, কতই না মারা ক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে!

২. সূরা তাওবা অবতীর্ণ হওয়ার সময় মহানবী (সা.)- এর বে'সাত অর্থাৎ নবুওয়াতের মাকামে আনুষ্ঠানিক সমুল্লতির পর থেকে বিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল এবং এ সময় আরব উপদ্বীপের মুশরিক ও মূর্তিপূজকদের কানে পৌত্তলিকতাবাদ ও মূর্তিপূজায় বাধাদান সংক্রান্ত ইসলামের শক্তিশালী যুক্তি ও দলিল- প্রমাণ পৌঁছে গিয়েছিল; আর ঐ দিন পর্যন্ত মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী শিরক, পৌত্তলিকতা ও মূর্তি পূজা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে জবরদস্তি করে থাকলে একমাত্র অন্ধ গোঁড়ামি ও আক্রোশ ছাড়া এর আর কোন কারণ ছিল না। এ কারণেই তখন সমাজ সংস্কারের জন্য সর্বশেষ ঔষধ প্রয়োগ তথা শক্তি ব্যবহার করে মূর্তিপূজা, শিরক ও পৌত্তলিকতার সকল রূপ ও নিদর্শন ড়িয়ে ফেলা, এ মূর্তিপূজাকে মহান আল্লাহ ও মানুষের সমুদয় অধিকার ল ন বলে গণ্য করা এবং এভাবে মানব সমাজে শত শত মন্দ প্রথার মূলোৎপাটনের সময় এসে গিয়েছিল।

তবে যে সব প্রাচ্যবিদ এ ধরনের পদক্ষেপকে আকীদা- বিশ্বাস ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, যা পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও আধুনিক সভ্যতার মূল ভিত্তি বলে গণ্য, - তার সাথে সাংঘর্ষিক ও পরিপন্থী বলে বিবেচনা করেন, তাঁরা একটি বিষয়ে অমনোযোগী থেকে গেছেন। কারণ আকীদা- বিশ্বাস ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা যে পর্যন্ত ব্যক্তি ও সমাজের সৌভাগ্যের ক্ষতি সাধন না করবে, সে পর্যন্ত তা সম্মানার্থ। এর অন্যথা হলে যুক্তি- বুদ্ধির আলোকে এবং বিশ্বের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির অনুসৃত রীতি অনুসারে এ ধরনের স্বাধীনতার শতকরা এক শ' ভাগ অর্থাৎ পুরোপুরি বিরোধিতা করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যাবে।

উদাহরণস্বরূপ, আজ ইউরোপে মুষ্টিমেয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ যুবক কতক লো স্ত্রী চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে সমাজে নগ্নতাবাদের (Nudism) সমর্থক হয়ে যাচ্ছে এবং দেহের কিয়দংশ আবৃত করাই হচ্ছে) যৌন কামনা-বাসনা কেন্দ্রিক (উত্তেজনা এবং চারিত্রিক অবক্ষয়, দুর্নীতি ও অনাচারের মূল কারণ- এ ধরনের শতকরা এক শ' ভাগ বালসুলভ যুক্তি ও ধারণার ভিত্তিতে গোপন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে সেখানে বিবস্ত্র অবস্থায় আবির্ভূত হচ্ছে। সুস্থ মানব বিবেক ও মন কি অনুমতি দেয় যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার শিরোনামে এ সব তরুণদের হাত আমরা উন্মুক্ত রাখব এবং বলব যে, মতামত, চিন্তা- ভাবনা ও বিশ্বাসের প্রতি অবশ্যই সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, নাকি এ সব তরুণের ও সমাজের কল্যাণের জন্য আমাদের অবশ্যই এ ধরনের বোকামিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা উচিত? এটা শুধু ইসলাম ধর্মের অনুসৃত পন্থাই নয়, বরং বিশ্বের সকল জ্ঞানী যে সব ধ্যান-ধারণা ও কর্মকাণ্ড মানব সমাজের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর, সে লোর বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেন। আর এ সংগ্রাম আসলে অধঃপতিত দল লোর বোকামিপূর্ণ বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

মূর্তিপূজা কতক লো অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও অলীক চিন্তা-ভাবনার চেয়ে বেশি কিছু নয়। উল্লেখ্য, এ সব অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও অলীক চিন্তা-ভাবনা শত শত মন্দ অভ্যাস ও প্রথার প্রবর্তন করে। আর মহানবী (সা.) মূর্তিপূজক ও মুশরিকদের পথ প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন এবং বিশ বছর গত হবার পর এই ফ্যাসাদ ও অনাচারের মূলোৎপাটন করার জন্য সর্বশেষ মাধ্যম হিসেবে সামরিক শক্তি ব্যবহার করার সময় হয়ে গিয়েছিল।

৩. অপর দিকে হজ্ব হচ্ছে সর্ববৃহৎ ইসলামী ইবাদত, সবচেয়ে বড় ধর্মীয় নিদর্শন। আর এ সূরা অবতীর্ণ হবার দিন পর্যন্ত শিরকের প্রতিভূদের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্ম ও মহানবীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে তিনি মুসলমানদের পবিত্র হজ্বের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান যথাযথভাবে ও সব ধরনের জাহিলী রীতি-নীতির বাইরে শিক্ষা দিতে পারেন নি। এ কারণে অত্যাবশ্যিক হয়ে গিয়েছিল যে, এ বিশাল ইসলামী জনসমাবেশে মহানবী (সা.) স্বয়ং অংশগ্রহণ করে ব্যবহারিকভাবে মুসলমানদের এ মহৎ ইবাদত অনুষ্ঠানের শিক্ষা দেবেন। তবে তিনি ঐ অবস্থায়

কেবল এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারতেন, যখন মহান আল্লাহর হারাম শরীফ এবং এর চারপাশের অঞ্চল মুশরিকদের- যারা ইবাদত- বন্দেগীর মাকাম কতক লো প্রস্তর ও কাঠের তৈরি মূর্তির কাছে সোপর্দ করেছিল, - থেকে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যাবে এবং মহান আল্লাহর হারাম তাঁর প্রকৃত বান্দা ও ইবাদতকারীদের জন্য একান্তভাবে নির্দিষ্ট হবে।

৪. মহানবী (সা.)- এর সংগ্রাম বিশ্বাসের স্বাধীনতার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না। আকীদা- বিশ্বাস এমন এক বিষয় যা বলপ্রয়োগ করে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। আকীদা- বিশ্বাসের কেন্দ্র হচ্ছে মানুষের হৃদয়, যা অত্যন্ত দুর্ভেদ্য এবং সহজে বশীভূত হয় না। আর আকীদা- বিশ্বাসের উ ব কতক লো মূল ভিত ও পূর্ব পদক্ষেপের ওপর নির্ভরশীল। এ সব মূল ভিত ও পূর্ব পদক্ষেপ আকীদা- বিশ্বাসের উৎপত্তির প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু মূল ভিত ও নীতিমালার অনুপস্থিতিতে আকীদা- বিশ্বাসের উ ব একেবারে অসম্ভব। সুতরাং আকীদা- বিশ্বাস আসলে বল প্রয়োগের বিষয় নয়। বরং মহানবী (সা.)- এর সংগ্রাম ছিল এই শিরকী আকীদা- বিশ্বাসের বাহ্য অবয়বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আর মূর্তিপূজা ছিল এ শিরকী আকীদা- বিশ্বাসের বাহ্য রূপ ও নিদর্শনস্বরূপ। এ কারণেই মহানবী (সা.) প্রতিমালয় লো ধ্বংস করেছিলেন এবং সকল প্রতিমা ও মূর্তি ভেঙে াড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই তিনি আকীদা- বিশ্বাসের জগৎ ও হৃদয় লোর মধ্যকার বি ব ও আমূল পরিবর্তনের বিষয়কে কালের আবর্তনের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন যা আপনাআপনি এ ধরনের বি ব ও আমূল পরিবর্তন আনয়ন করবে।^{৪৪৪}

উল্লিখিত চার কারণের ভিত্তিতে মহানবী (সা.) হযরত আবু বকরকে ডেকে এনে সূরা তাওবার প্রথম কয়েক আয়াত শিক্ষা দেন এবং চল্লিশ জন মুসলমানকে^{৪৪৫} সাথে নিয়ে ম ার উদ্দেশে যাত্রা এবং যে সব আয়াতে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা উল্লিখিত আছে, ঈদুল আযহার দিনে সেসব (মিনায় হাজীগণের সমাবেশে) পাঠ করার নির্দেশ দেন।

হযরত আবু বকর মহানবী (সা.)- এর নির্দেশে সফরের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং ম ার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এর কিছুক্ষণ পরই ওহীর ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে (বিশেষ নির্দেশ সম্বলিত) এক বাণী (মহানবীর ওপর) অর্পণ করলেন। তা ছিল এই যে,

মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের বিষয়টি স্বয়ং মহানবী বা তাঁর আহলে বাইতভুক্ত কোন ব্যক্তিকে জনগণের কাছে ঘোষণা করতে হবে।^{৪৪৬} এ কারণেই মহানবী (সা.) হযরত আলী (আ.)- কে ডেকে এনে পুরো বিষয়টি তাঁকে জানালেন ও তাঁর বিশেষ সওয়ারী পশুটি তাঁকে দিলেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন যত শীঘ্র সম্ভব মদীনা ত্যাগ করেন, যাতে তিনি পশ্চিমধ্যে হযরত আবু বকরের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছ থেকে আয়াতসমূহ নিয়ে নেন এবং ঈদুল আযহার দিন মিনার বিশাল হজ্ব সমাবেশ, যেখানে আরব উপদ্বীপের সকল অঞ্চল থেকে জনগণ অংশগ্রহণ করবে, সেখানে একটি ঘোষণাপত্র সমেত মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সংক্রান্ত (সূরা তাওবার) আয়াতসমূহ পাঠ করেন।

এ ঘোষণাপত্রের ধারাসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

ক. মহান আল্লাহর ঘরে (কাবা শরীফ) মূর্তিপূজকদের প্রবেশাধিকার নেই;

খ. উলঙ্গাবস্থায় তাওয়াফ নিষিদ্ধ;

গ. এরপর থেকে কোন মূর্তিপূজকই আর হজ্ব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবে না;

ঘ. যারা মহানবী (সা.)- এর সাথে অনাক্রমণ চুক্তি করেছিল এবং পুরো সময় ধরে নিজেদের চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে (চুক্তি রক্ষা করেছে), তাদের চুক্তি এবং চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রাণ ও সম্পদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে। তবে যে সব মুশরিক মুসলমানদের সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় নি বা কার্যত চুক্তি ভঙ্গ করেছে, তাদেরকে এ তারিখ (১০ যিলহজ্ব) থেকে ৪ মাসের সময় দেয়া হচ্ছে, যাতে তারা ইসলামী হুকুমতের সাথে তাদের অবস্থান ও দায়িত্ব স্পষ্ট করে নেয় অর্থাৎ হয় তারা তাওহীদপন্থীদের কাতারভুক্ত হবে এবং শিরক ও দ্বিত্ববাদের সকল নিদর্শন ও বহিঃপ্রকাশের ধ্বংসসাধন করবে অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।^{৪৪৭}

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) একটি কাফেলাকে সাথে নিয়ে মহানবীর বিশেষ সওয়ারী পশুর উপর আরোহণ করে পবিত্র মার উদ্দেশে যাত্রা করেন। এ কাফেলায় জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারীও ছিলেন। ‘জুহফাহ’ নামক স্থানে হযরত আলী (আ.) হযরত আবু বকরের সাথে

মিলিত হয়ে মহানবী (সা.)- এর বার্তা তাঁর কাছে পৌঁছে দিলেন; আর তিনিও হযরত আলীর কাছে আয়াতসমূহ হস্তান্তর করলেন।

শিয়া মুহাদ্দিসগণ এবং কতিপয় সুন্নী মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (আ.) বললেন: “মহানবী (সা.) আপনাকে আমার সাথে ম া গমন বা এখান থেকে মদীনায় ফিরে যাবার ব্যাপারে ইখতিয়ার দিয়েছেন।” হযরত আবু বকর ম া ভিঁমুখে যাত্রা অব্যাহত রাখার চেয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তনকে অগ্রাধিকার দিলেন এবং মদীনায় ফিরে গেলেন। তিনি মহানবী (সা.)- এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : “আপনি আমাকে এমন এক কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচনা করেছিলেন, যা সম্পন্ন করার জন্য অন্যরাও আগ্রহী ছিল এবং সবাই মনে মনে তা সম্পন্ন করার গৌরব অর্জনের ইচ্ছা পোষণ করত। যখন আমি খানিকটা পথ অতিক্রম করেছি, তখনই আপনি আমাকে এ দায়িত্ব থেকে অপসারণ করেছেন। তা হলে কি আমার ব্যাপারে মহান আল্লাহর ওহী অবতীর্ণ হয়েছে?” মহানবী (সা.) তখন তাঁকে সা না দিয়ে বলেছিলেন : “হযরত জিবরীল (আ.) এসে আমার কাছে মহান আল্লাহর নির্দেশবাণী পৌঁছে দিয়ে বলেছেন : আমি এবং যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত, সে ব্যতীত আর কেউ এ কাজ সম্পন্ন করার যোগ্য নয়।”^{৪৪৮} তবে আহলে সুন্নাত বর্ণিত কতিপয় রেওয়াজে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হজ্ব অনুষ্ঠান পরিচালনা করার দায়িত্ব হযরত আবু বকরের উপর ন্যস্ত ছিল এবং হযরত আলী (আ.) কেবল মিনা দিবসে জনসমক্ষে মহানবীর ঘোষণাপত্র এবং (মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের) আয়াতসমূহ পাঠ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।^{৪৪৯}

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) পবিত্র ম া নগরীতে প্রবেশ করলেন। ১০ যিলহজ্ব তিনি জামরা-ই-আকাবার উপর দাঁড়িয়ে সূরা তাওবার প্রথম ১৩ আয়াত পাঠ করলেন। এরপর তিনি দৃঢ় মনোবল সহকারে উচ্চকণ্ঠে মহানবীর ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন, যেন তা সবাই শুনতে পায়। মুসলমানদের সাথে যেসব মুশরিকের কোন চুক্তি ছিল না, তিনি তাদের সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে, তাদেরকে কেবল চার মাসের সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং তাদের উচিত নিজেদের

আবাসস্থল ও চারপাশের পরিবেশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিরক ও মূর্তিপূজার সকল নিদর্শন থেকে মুক্ত ও পবিত্র করা। এর অন্যথা হলে তাদের কাছ থেকে নিরাপত্তা উঠিয়ে নেয়া হবে।

এ সব আয়াত ও এ ঘোষণাপত্রের ফলাফল এই হয়েছিল যে, চার মাস অতিবাহিত হতে না হতেই মুশরিক ও মূর্তিপূজকরা দলে দলে একত্ববাদ অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং হিজরতের দশম বর্ষের মাঝামাঝিতে সমগ্র আরব উপদ্বীপ থেকে মূর্তিপূজা মূলোৎপাটিত হয়ে যায়।

এ ঘটনার ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণে অন্যায় ও পক্ষপাতদুষ্ট গোঁড়ামি

মহান আল্লাহর আদেশে সম্পর্কচ্ছেদ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ পাঠ ও ঘোষণা দানের দায়িত্ব থেকে হযরত আবু বকরকে অপসারণ ও সেস্থলে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর নিযুক্তি নিঃসন্দেহে হযরত আলীর একটি অকাট্য ও অনস্বীকার্য শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু একদল গোঁড়া লেখক এ ঘটনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভুল- স্মিতর শিকার হয়েছেন। আলুসী বাগদাদী তাঁর নিজ তাফসীর গ্রন্থে^{৪৫০} এ ঘটনা বিশ্লেষণ করে লিখেছেন :

“ হযরত আবু বকর স্নেহ, দয়া ও নম্রতার জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। হযরত আলী আঁ ক সাহস ও দৃঢ় মনোবলের ক্ষেত্রে তাঁর ঠিক বিপরীত ছিলেন। যেহেতু সম্পর্কচ্ছেদের আয়াতসমূহ পাঠ ও মুশরিকদেরকে হুমকি প্রদানের ক্ষেত্রে আঁ ক সাহস ও দৃঢ় মনোবলের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি এবং আবু বকরের চেয়ে আলীর মধ্যে এ সব বিষয় অধিক বিদ্যমান ছিল, সেহেতু তাঁর স্থলে আলী দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

এ ধরনের ব্যাখ্যা- যার উৎসই হচ্ছে অন্ধ গোঁড়ামি, - মহানবীর বক্তব্যের সাথে মোটেই খাপ খায় না। কারণ তিনি আবু বকরের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন : “মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, এ আয়াতসমূহ হয় আমি পাঠ করব অথবা আমার আঁ য় কেউ পাঠ করবে।” এ দু’ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ এসব প্রচার করার যোগ্যতা রাখেন না। মহানবীর এ জবাবে স্নেহ, দয়া ও সাহসিকতার বিষয় মোটেই উত্থাপিত হয় নি।

অধিকন্তু স্বয়ং মহানবী (সা.) ছিলেন স্নেহ, করুণা ও মমতার পূর্ণাঙ্গ বহিঃপ্রকাশ।^{৪৫১} সুতরাং এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মহানবীরও সম্পর্কচ্ছেদের আয়াতসমূহের ঘোষণা ও প্রচারের দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়া ছিল অনুচিত। অথচ ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশ ছিল এই যে, সম্পর্কচ্ছেদের আয়াতসমূহ অবশ্যই মহানবী নিজে অথবা তাঁর আহলে বাইতভুক্ত কোন ব্যক্তি প্রচার করবেন।

কেউ কেউ এ ব্যাপারটি আরেকভাবে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, যে কোন চুক্তি বাতিল ও প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে আরবদের প্রথা ছিল এই যে, অবশ্যই চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি নিজে বা তাঁর

কোন নিকটীয় চুক্তি ভঙ্গ ও বাতিলের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। আর তা না হলে চুক্তি বলবৎ থাকবে। যেহেতু হযরত আলী মহানবী (সা.)-এর নিকটীয়গণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সেহেতু এসব আয়াত পাঠ করার দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তায়। তবে এ ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয়। কারণ মহানবী (সা.)-এর নিকটীয়গণের মধ্যে তাঁর চাচা হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবও ছিলেন, মহানবীর সাথে যাঁর আীয়তার সম্পর্ক আলী (আ.)-এর চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। তাই তাঁকে কেন এ দায়িত্ব প্রদান করা হয় নি?

যদি আমরা নিরপেক্ষ মন নিয়ে এ ঐতিহাসিক ঘটনা বিচার করি, তা হলে আমাদের অবশ্যই বলতে হবে, এই অপসারণ ও নিযুক্তি না ছিল ক্ষমতালিপ্সা, আর না ছিল তা মহানবীর সাথে হযরত আলীর আীয়তার সম্পর্ক থেকে উত্থিত। বরং এ পরিবর্তনের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কার্যত যেন ইসলামী হুকুমত ও প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রে হযরত আলীর যোগ্যতা স্পষ্ট হয়ে যায় এবং জনগণও বুঝতে সক্ষম হয় যে, তিনি যোগ্যতা ও মনোবলের দিক থেকে মহানবীর সঙ্গী ও অংশীদার।

আর কিছুকাল পরে যদি রিসালতের সূর্য্য অস্তমিত হয়, তা হলে খিলাফত, প্রশাসন ও রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় তাঁর (আলী) হাতে ন্যস্ত হবে। তিনি ছাড়া আর কোন ব্যক্তি এ কাজের যোগ্য নন এবং মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর এ সব বিষয়কে কেন্দ্র করে কখনোই মুসলমানদের সংকট ও দ্বিধা-বিভক্তির শিকার হওয়া উচিত নয়। কারণ তারা স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছে যে, চুক্তিসমূহ বাতিল ও রহিতকরণ সংক্রান্ত খোদায়ী নির্দেশ মোতাবেক মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত আলী (আ.) দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর চুক্তি বাতিল ও রহিতকরণ হচ্ছে শাসনকর্তা ও পরিচালনাকারীর একান্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিরই অন্তর্ভুক্ত।

সাতান্নতম অধ্যায় : দশম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

পুত্র ইবরাহীমের ইস্তেকালে মহানবী (সা.)- এর শোক

“ প্রিয় ইবরাহীম! তোমার জন্য আমাদের আর কিছু করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ যা ফয়সালা করেন, তা প্রতিহত করা ও ফেরানো অসম্ভব। তোমার পিতার নয়ন তোমার মৃত্যুতে অশ্রুসিক্ত এবং তার হৃদয় শোকসন্তপ্ত ও দুঃখভারাক্রান্ত। তবে যে কথা মহান আল্লাহর ক্রোধ উদ্বেককারী, তা কখনো মুখে উচ্চারণ করব না। আমরা যে তোমার পেছনে আসব (মৃত্যুবরণ করব এবং তোমার সাথে মিলিত হব)- এ সংক্রান্ত মহান আল্লাহর ইলাহী প্রতিশ্রুতি যদি বিদ্যমান না থাকত, তা হলে আমরা তোমার বিয়োগ- ব্যথায় ক্রন্দন করতাম এবং দুঃখভারাক্রান্ত হতাম।”^{৪৫২}

স্নেহাস্পদ পুত্রসন্তান ইবরাহীম (আ.) যখন মহানবী (সা.)- এর কোলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন, তখন তিনি তাঁর সন্তানের ফুলের মতো কোমল ও সুশ্রী মুখমণ্ডলের উপর ওষ্ঠদ্বয় রেখে এ কথা বলেছিলেন। বুকভরা বেদনা ও আবেগ সহ শোকাকর্ষিত বদনে অথচ খোদায়ী ফয়সালা ও নির্ধারণকৃত ভাগ্যের প্রতি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থেকেই তিনি নিজ পুত্রসন্তানকে চির বিদায় দিয়েছিলেন।

সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা আসলে মানবতার সর্বোচ্চ পর্যায়ের ও সবচেয়ে পবিত্র বহিঃপ্রকাশ। আর তা মানুষের আঁক সুস্থতা এবং তার চিত্তের নমনীয়তা ও সৌন্দর্যেরও পরিচায়ক।

মহানবী (সা.) বলতেন : “তোমরা তোমাদের সন্তানদের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করবে (أكرموا أولادكم)^{৪৫৩} কারণ সন্তানবাৎসল্য মহানবী (সা.)- এর প্রশংসনীয় গাবলীরই অন্তর্ভুক্ত।”^{৪৫৪}

বিগত বছর লোয় মহানবী (সা.) কাসিম, তাহির ও তাইয়েব^{৪৫৫} নামের তিন পুত্রসন্তান এবং যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম নামের তিন কন্যাসন্তানের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তাঁদের বিয়োগ- ব্যথায় অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র সন্তান হযরত ফাতিমা (আ.) তাঁর মহতী সহধর্মিনী হযরত খাদীজা (আ.)- এর গর্ভজাত ছিলেন।

মহানবী (সা.) হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে বিভিন্ন দেশে বেশ কয়েকজন দূত প্রেরণ করেছিলেন। তিনি মিসরের শাসনকর্তার কাছেও একটি পত্র পাঠিয়ে তাকে তাওহীদী ধর্মের দিকে আহ্বান করেছিলেন। বাহ্যত মিসরের শাসনকর্তা মহানবী (সা.)-এর আহ্বানে ইতিবাচক সাড়া দেয়নি; তবে ‘মারিয়া’ নাম্নী এক দাসীসহ কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করে মহানবীর পত্রের জবাব দিয়েছিল।

এ দাসী পরবর্তীতে মহানবী (সা.)-এর স্ত্রী হবার গৌরব অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর গর্ভে ‘ইবরাহীম’ নামে মহানবীর এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়েছিল। মহানবী তাঁর এ সন্তানকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ইবরাহীমের জন্ম বেশ কিছুটা হলেও মহানবীর ছয় সন্তান হারানোর বেদনা লাঘব করেছিল এবং তাঁর অন্তরে আশার আলো জ্বালিয়েছিল। কিন্তু আফসোস! এ আলো ১৮ মাস পর নিভে গেল। একটি কাজ সম্পন্ন করার জন্য মহানবী বাড়ীর বাইরে গিয়েছিলেন। কিন্তু যখনই তিনি সন্তানের সংকটাপন্ন অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন, তখনই তিনি ঘরে ফিরে আসেন এবং তাঁকে মায়ের কোল থেকে নিজ কোলে তুলে নেন। ঐ সময় তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে বেদনার চিহ্ন প্রকাশ পায়!

পুত্রের মৃত্যুতে মহানবীর অশ্রুপাত ও দুঃখ প্রকাশ তাঁর মানবীয় আবেগ-অনুভূতিরই নিদর্শনস্বরূপ যা তাঁর মৃত্যুর পরও অব্যাহত ছিল। আবেগ-অনুভূতি এবং শোক প্রকাশ মহানবীর আঁক মানবীয় আবেগ-অনুভূতিগত দিককেই তুলে ধরে, যা আপনাপনি প্রকাশিত হয়েছিল। তবে মহানবী (সা.) যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি বিরোধী কোন কথা বলেন নি, তা ছিল বাস্তবিক পক্ষে মহান আল্লাহর ফয়সালা ও নির্ধারিত ভাগ্যের (তাকদীর) প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও সন্তুষ্টি থাকার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। আর মহান আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য থেকে কারো পক্ষে পলায়ন মোটেই সম্ভব নয়।

একটি ভ্রান্ত ও অবান্তর আপত্তি

আনসার সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত আবদুর রহমান ইবনে আউফ মহানবীকে কাঁদতে দেখে খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন এবং প্রতিবাদের সুরে বলেছিলেন : “আপনি আমাদের মৃতদের ব্যাপারে কাঁদতে নিষেধ করতেন। কিন্তু এখন আপনি কেন আপনার সন্তানের মৃত্যুতে কাঁদছেন?” এখানে লক্ষ্যণীয় যে, আপত্তিকারী ইসলাম ধর্মের সুমহান ভিত্তিসমূহের সাথেই কেবল অপরিচিত ছিলেন না, বরং স্রষ্টা মানুষের অন্তরে (মানব প্রকৃতির মাঝে) যেসব বিশেষ মানবীয় অনুভূতি আমানতস্বরূপ স্থাপন করেছেন, সেসবের ব্যাপারেও সে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন। বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য মানবীয় সহজাত প্রবণতাসমূহ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যথাসময়ে সেসবের প্রকাশ পাওয়াও অত্যাবশ্যিক। যে ব্যক্তি তার আপনজনদের মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হয় না এবং যার হৃদয় বিগলিত ও নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হয় না অর্থাৎ সে যদি তাদের বিয়োগ-ব্যথায় কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে, তা হলে সে এক টুকরো পাথর ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এ ধরনের ব্যক্তিকে ‘মানুষ’ বলে অভিহিত করাও যায় না।

তবে এখানে একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও দৃষ্টি আকর্ষণীয় বিষয় আছে। কারণ এ ধরনের আপত্তি ভিত্তিহীন হওয়ার পাশাপাশি আরো একটি বাস্তবতা উন্মোচিত করে দেয়। তা হলো, তদানীন্তন নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। এ কারণেই একজন নাগরিক পূর্ণ স্বাধীনতা সহ কোন ধরনের ভয়-ভীতি ছাড়াই নিজ নেতার কর্মকাণ্ড ও পদক্ষেপের সমালোচনা করার সাহস পেত। তাই মহানবীও তার আপত্তির উত্তরে বলেছিলেন :

“ আমি কখনোই বলি নি যে, আপনজনদের মৃত্যুতে তোমরা কেঁদো না। কারণ এসব অনুভূতি আসলে সহানুভূতি ও মমতার নিদর্শন। আর যে ব্যক্তির অন্তর অন্যদের অবস্থা দেখে বিদগ্ধ না হয়, সে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া পাবে না।” ৪৫৬

“ তবে আমি বলেছি, তোমাদের আপনজনদের মৃত্যুতে বিলাপ (উচ্চৈঃস্বরে ফরিয়াদ) করো না এবং কুফরী উক্তি ও এমন কথা ব্যক্ত করো না, যা থেকে আপত্তির গন্ধ পাওয়া যায়। আর তোমরা শোক-দুঃখের আতিশয্যে নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র বিদীর্ণ করো না।” ৪৫৭

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) মহানবী (সা.)- এর নির্দেশে ইবরাহীমের মৃতদেহ গোসল দেন এবং কাফনের কাপড় পরান। এরপর মহানবীর একদল সাহাবী ইবরাহীমের লাশ জান্নাতুল বাকী গোরস্তানে বহন করে নিয়ে গিয়ে দাফন করেন।

মহানবী (সা.) ইবরাহীমের কবরের দিকে তাকিয়ে কবরটির এক কোণায় একটি গর্ত দেখতে পান। ঐ গর্তটি ভরাট করার জন্য তিনি মাটির উপর বসে পড়েন এবং নিজ হাতে কবরের উপরিভাগ সমান করে দেন। এরপর তিনি বলেছিলেন : إذا عمل أحدكم فليتقن : “যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কোন কাজ করবে, তখন তার উচিত তা যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়া।” ৪৫৮

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ইবরাহীমের ইন্তেকালের দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। সৃষ্টিজগতের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম- কানুন সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির ধারণা করেছিল, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ ধরনের চিন্তা অলীক ছিল। তবে তা বাহ্যত মহানবী (সা.)- এর সম্পূর্ণ অনু লেই ছিল। আর মহানবী যদি একজন সাধারণ বস্তুবাদী নেতা হতেন, তা হলে তাঁর পক্ষে এ ধরনের স্তম্ভ চিন্তার স্বীকৃতি প্রদান করে এ পথে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার অবকাশ থাকত। (কিন্তু তিনি যেহেতু আধ্যাতিক নেতা ছিলেন, তাই পার্থিব হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এ ধরনের পদ্ধতি কখনই কাজে লাগান নি।)

কিন্তু মহানবী (সা.) এ ধরনের অমূলক ধ্যান- ধারণা খণ্ডন করার জন্য মিস্বারে আরোহণ করে জনগণকে বাস্তবতা অবহিত করলেন এবং বললেন :

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَجْرِيانِ بِأَمْرِهِ مُطِيعَانِ لَهُ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

“ হে লোকসকল! তোমাদের অবশ্যই জানা থাকা উচিত, নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র মহান আল্লাহর নিদর্শনাদির অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে তারা আকাশে প্রদক্ষিণরত এবং তাঁর প্রতি আনুগত্যশীল রয়েছে। তাই কারো মৃত্যুতে বা জন্মগ্রহণ করার কারণে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয় না।” ৪৫৯

যে সব সুযোগ- সন্ধানী ব্যক্তি বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতি কেবল নিজের স্বার্থেই ব্যাখ্যা করে না, বরং তারা সাধারণ জনগণের মূর্খতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও পৌরাণিক কল্প- কাহিনীতে বিশ্বাস থেকে ফায়দা উঠায়, তাদের সম্পূর্ণ বিপরীতে মহানবী (সা.) কখনই সত্য অবস্থা গোপন রেখে জনগণের অজ্ঞতাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেন নি। তিনি যদি সেদিন এ ধরনের স্তম্ভ ধারণার অনুমোদন দিতেন, তা হলে বর্তমান যুগে যখন প্রাকৃতিক জগতের রহস্যাবলী আবিষ্কৃত ও উন্মোচিত হচ্ছে এবং সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ লোর ক্ষেত্রে বস্তুজগতের নিয়ম- কানুনসমূহ স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, তখন সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা এবং এর নিয়মকানুন সৃষ্টিকারী মহান

আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধি এবং সমগ্র মানব জাতির শাশ্বত নেতা হিসেবে দাবী করা তাঁর পক্ষে কস্মিনকালেও সম্ভব হতো না।

মহানবী (সা.)- এর আহ্বান বিশেষ করে আরব জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তাঁর আহ্বান স্থান- কালের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ নয় (অর্থাৎ তা হচ্ছে শাশ্বত ও সর্বজনীন)। তিনি যেমন অতীত কালের মানুষের নেতা ছিলেন, তেমনি তিনি আধুনিক মহাকাশ যুগ এবং প্রকৃতি জগতের রহস্যাবলী আবিষ্কার ও উন্মোচনের যুগের মানুষেরও নেতা। যে কোন বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এতটা দৃঢ় ও যুক্তিপূর্ণ যে, সাম্প্রতিক কালের বৈজ্ঞানিক প্রগতি ও বিবর্তনাদি, যা অতীতের সকল জ্ঞান- বিজ্ঞানকে পরিবর্তন করে দিয়েছে, তাঁর বক্তব্যের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ত্রুটিও বের করতে পারে নি।

আটাল্লতম অধ্যায় : দশম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

মদীনায় নাজরানের প্রতিনিধি দল

সত্তরটি গ্রাম সমেত নাজরান অঞ্চল হিজায ও ইয়েমেন সীমান্তে অবস্থিত। ইসলামের চূড়ান্ত পর্যায়ে আবির্ভাবকালে এ এলাকাটি হিয়াজের একমাত্র খ্রিষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। এ এলাকার অধিবাসীরা বিভিন্ন কারণে মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল।^{৪৬০}

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রা নায়ক ও ধর্মীয় কেন্দ্রসমূহের প্রধানদের কাছে চিঠি- পত্র প্রেরণের পাশাপাশি মহানবী (সা.) নাজরানের আর্চবিশপ আবু হারিসা- এর কাছে ইসলাম ধর্মের দাওয়াত দিয়েছিলেন^{৪৬১} :

“ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া বের প্রভুর নামে, (এ পত্রটি) মহান আল্লাহর নবী মুহাম্মদের পক্ষ থেকে নাজরানের মহামান্য আর্চবিশপের প্রতি। ইসহাক ও ইয়া বের প্রভুর প্রশংসা করছি এবং আপনাদের বান্দাদের (গায়রুল্লাহর) উপাসনা থেকে মহান আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আপনাদেরকে গায়রুল্লাহর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য থেকে বের হয়ে মহান আল্লাহর আধিপত্যে (বেলায়েত) প্রবেশ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আর যদি আপনারা আমার দাওয়াত গ্রহণ না করেন, তা হলে অন্ততঃপক্ষে ইসলামী সরকারকে কর (জিযিয়া) প্রদান করুন (যে, এ কর প্রদান করার দরুন আপনাদের জীবন ও ধন- সম্পদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে)। এর অন্যথা হলে আপনাদের প্রতি সমূহ বিপদ অর্থাৎ যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে।”^{৪৬২}

কিছু কিছু শিয়া ঐতিহাসিক সূত্রে আরো বেশি বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) আহলে কিতাব- এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঐ আয়াত^{৪৬৩} পত্রে লিখেছিলেন, যার মধ্যে এক- অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদতের প্রতি সবাইকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

মহানবী (সা.)- এর প্রেরিত প্রতিনিধি দল নাজরানে প্রবেশ করে তাঁর পত্র নাজরানের প্রধান খ্রিষ্ট ধর্মযাজকের কাছে অর্পণ করেন। আর্চবিশপ ভালোভাবে পত্রটি পাঠ করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য তিনি ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পরামর্শসভার আয়োজন করেন। ঐ পরামর্শসভার একজন সদস্য ছিলেন শুরাহবিল, যিনি বুদ্ধিমত্তা, বিচারক্ষমতা ও দক্ষতার জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি আর্চবিশপের উত্তরে বলেছিলেন : “আমার ধর্ম

বিষয়ক জ্ঞান খুবই কম। সুতরাং অভিমত ব্যক্ত করার অধিকার আমার নেই। আর যদি আপনারা অন্য কোন বিষয়ে আমার সাথে পরামর্শ করতেন, তা হলে আমি আপনাদের সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন পথের সন্ধান দিতাম।

কিন্তু অনন্যোপায় হয়ে একটি বিষয় সম্পর্কে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি যে, আমরা আমাদের ধর্মীয় নেতাদের কাছ থেকে বহু বার শুনেছি যে, একদিন হযরত ইসহাকের বংশধারা থেকে নবুওয়াতের পদ ইসমাঈলের বংশধারায় স্থানান্তরিত হবে। আর ‘মুহাম্মদ’ , যিনি ইসমাঈলের বংশধর, তিনিই যে সেই প্রতিশ্রুত নবী হবেন, তা মোটেই অসম্ভব নয়।”

এ পরামর্শসভা এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করে যে, নাজরানের প্রতিনিধি দল হিসেবে একদল লোক মুহাম্মদ (সা.)- এর সাথে সাক্ষাৎ করে যেসব বিষয় তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার দলিলস্বরূপ সেসব কাছে থেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করার জন্য মদীনায় যাবে।

তাই নাজরানবাসীর মধ্য থেকে ষাটজন সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিকে এ প্রতিনিধি দলের সদস্য নির্বাচিত করা হয়। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন তিনজন ধর্মীয় নেতা যাঁদের পরিচয় নিচে দেয়া হলো :

১. আবু হারিসাহ ইবনে আলকামাহ : নাজরানের প্রধান ধর্মযাজক বা আর্চবিশপ যিনি হিজায়ে রোমের গীর্জাসমূহের স্বীকৃত প্রতিনিধি ছিলেন।

২. আবদুল মসীহ : নাজরানের প্রতিনিধি দলের নেতা, যিনি বিচার- বুদ্ধি, দক্ষতা, কর্মকৌশল ও ব্যবস্থাপনার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

৩. আইহাম : যিনি ছিলেন একজন প্রবীণ ব্যক্তি এবং নাজরানবাসীর সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্ত।^{৪৬৪}

প্রতিনিধি দল রেশমী বস্ত্র নির্মিত অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করে, হাতে স্বর্ণনির্মিত আংটি পরে এবং গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে অপরাহ্নে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে মহানবী (সা.)- কে সালাম জানায়। কিন্তু তিনি তাদের ঘৃণ্য ও অসংযত অবস্থা- তাও আবার মসজিদের অভ্যন্তরে, - দেখে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন। তারা বুঝতে পারে, মহানবী (সা.) তাদের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তারা এর কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না। তাই তারা তৎক্ষণাৎ হযরত উসমান

ইবনে আফফান এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফের সাথে যোগাযোগ করে তাঁদের এ ঘটনা সম্পর্কে জানালে তাঁরা বলেন, এ ব্যাপারে সমাধান আলী ইবনে আবী তালিবের হাতে রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হযরত উসমান ইবনে আফফান এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাদের পূর্ব পরিচিত ছিলেন। প্রতিনিধি দল যখন হযরত আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর কাছে গমন করে তাঁকে ঘটনা সম্পর্কে জানায়, তখন আলী (আ.) তাদেরকে বলেছিলেন : “আপনাদের উচিত আপনাদের এসব জমকালো পোশাক ও স্বর্ণালংকার পাি য়ে সাদা- সিধাভাবে মহানবী (সা.)- এর নিকট উপস্থিত হওয়া। তা হলে আপনাদেরকে যথাযথ সম্মান করা হবে।”

নাজরানের প্রতিনিধি দল সাদামাটা পোশাক পরে এবং সোনার আংটি খুলে রেখে মহানবী (সা.)- এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম জানালে তিনিও সম্মানের সাথে তাদের সালামের জবাব দেন এবং তারা যে সব উপটোকন এনেছিল, সে লোর কিছু কিছু গ্রহণ করেন। আলোচনা শুরু করার আগে প্রতিনিধিরা বলেছিল, তাদের প্রার্থনার সময় হয়েছে। মহানবী (সা.) তাদেরকে মদীনার মসজিদে নববীতে নামায ও প্রার্থনা করার অনুমতি দেন এবং তারা পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে।^{৪৬৫}

নাজরানের প্রতিনিধিদের আলোচনা

কতিপয় সীরাত রচয়িতা, মুহাদ্দিস (হাদীসবিদ) এবং ঐতিহাসিক মহানবী (সা.)- এর সাথে নাজরানের প্রতিনিধিদের আলোচনার মূল বিষয় উদ্ধৃত করেছেন। তবে সাইয়েদ ইবনে তাউস এ আলোচনা এবং মুবাহালার ঘটনার সমুদয় বৈশিষ্ট্য অন্যদের চেয়ে সূক্ষ্ম ও ব্যাপকভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মুত্তালিব শাইবানীর^{৪৬৬} ‘মুবাহালা’ গ্রন্থ এবং হাসান ইবনে ইসমাইলের^{৪৬৭} ‘যিলহজ্ব মাসের আমল’ গ্রন্থ থেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুবাহালার ঘটনার সমুদয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।

তবে এ ক্ষুদ্র পরিসরে এ মহা ঐতিহাসিক ঘটনার সমুদয় দিক, যেসবের প্রতি দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কতিপয় ঐতিহাসিক, এমনকি সামান্য ইঙ্গিত পর্যন্ত করেন নি, সেসব উদ্ধৃত করা

সম্ভব হবে না। আর তাই হালাবী তাঁর সীরাত গ্রন্থে মহানবী (সা.)- এর সাথে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আলাপ- আলোচনা যা উদ্ধৃত করেছেন, তার অংশ বিশেষের প্রতি আমরা ইঙ্গিত করব।^{৪৬৮}

মহানবী (সা.) : “আমি আপনাদেরকে তাওহীদী (একত্ববাদী) ধর্ম, এক- অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর ইবাদত- বন্দেগী এবং তাঁর বিধি- নিষেধ মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি।” এরপর তিনি পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত তাদেরকে তেলাওয়াত করে শুনালেন।

নাজরানের প্রতিনিধিগণ : “আপনি যদি ইসলাম বলতে বিশ্বজাহানের এক- অদ্বিতীয় স্রষ্টা মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকেই বুঝিয়ে থাকেন, তা হলে আমরা আগেই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর বিধি- নিষেধ মেনে চলছি।”

মহানবী (সা.) : “ইসলামের (মহান আল্লাহর প্রতি আ সমর্পণ) কতিপয় নিদর্শন আছে। আর আপনাদের কতিপয় কর্মকাণ্ড বলে দেয় যে, আপনারা ইসলামে যথাযথ বাইয়াত হন নি। আপনারা কিভাবে বলেন যে, আপনারা এক- অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদতকারী, অথচ আপনারা একই সময় ক্রুশের উপাসনা করেন এবং শূকরের মাংস ভক্ষণ থেকে বিরত থাকেন না, আর মহান আল্লাহর পুত্রসত্তানেও বিশ্বাস করেন?”

নাজরানের প্রতিনিধিরা : “আমরা তাঁকে (হযরত ঈসা মসীহ) ‘আল্লাহ’ বলে বিশ্বাস করি; কারণ তিনি মৃতদের জীবিত এবং অসুস্থ রোগীদের আরোগ্য দান করতেন এবং কাদা থেকে পাখি তৈরি করে আকাশে উড়িয়ে দিতেন। আর এ সব কাজ থেকে প্রতীয়মান হয়, তিনি আল্লাহ।”

মহানবী (সা.) : “না, তিনি মহান আল্লাহর বান্দা ও তাঁরই সৃষ্টি, যাকে তিনি হযরত মারিয়াম (আ.)- এর গর্ভে রেখেছিলেন। আর মহান আল্লাহই তাঁকে এ ধরনের ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন।”

একজন প্রতিনিধি : “হ্যাঁ, তিনিই মহান আল্লাহর পুত্র। কারণ তাঁর মা মারিয়াম (আ.) কোন পুরুষের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েই তাঁকে জন্ম দিয়েছিলেন। তাই অনন্যোপায় হয়ে বলতেই হয় যে, তাঁর পিতা হচ্ছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ, যিনি বিশ্বজাহানের স্রষ্টা।”

এ সময় ওহীর ফেরেশতা হযরত জিবরীল (আ.) অবতরণ করে মহানবী (সা.)- কে বললেন : “আপনি তাদেরকে বলে দিন : হযরত ঈসা মসীহর অবস্থা এ দিক থেকে হযরত আদম (আ.)- এর

অবস্থার সাথে সদৃশ যে, তাঁকে তিনি তাঁর অসীম ক্ষমতা দিয়ে বিনা পিতা- মাতায় মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন।^{৪৬৯} তাই পিতা না থাকা যদি তিনি (ঈসা) যে খোদার পুত্র- এ কথার প্রমাণ বলে বিবেচিত হয়, তা হলে হযরত আদম (আ.)- কে এ আসনের জন্য অধিকতর উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা উচিত। কারণ হযরত আদম (আ.)- এর পিতা ছিল না, আর তাঁর মাও ছিলেন না।”

নাজরানের প্রতিনিধিরা : “আপনার বক্তব্য আমাদের সম্বন্ধে করতে পারছে না। আর পথ হচ্ছে এটাই যে, একটি নির্দিষ্ট সময় আমরা পরস্পর মুবাহালা করব এবং যে মিথ্যাবাদী, তার ওপর লানত (অভিশাপ) দেব এবং মহান আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদীকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য প্রার্থনা করব।”^{৪৭০}

তখন ওহীর ফেরেশতা মুবাহালায় আয়াত নিয়ে অবতরণ করে মহানবী (সা.)- কে জানান, যারা তাঁর সাথে অযথা বিতর্কে লিপ্ত হবে এবং সত্য মেনে নেবে না, তাদেরকে মুবাহালা করতে আহ্বান জানাবেন এবং উভয় পক্ষ যেন মহান আল্লাহর কাছে এই বলে প্রার্থনা করেন যে, তিনি মিথ্যাবাদীকে স্বীয় দয়া থেকে দূরে সরিয়ে দেন।

فمن حاجك فيه من بعد ما جئتك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نسائنا و نسائكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين

“ আপনার কাছে সঠিক জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে আপনার সাথে বিতর্ক করে (এবং সত্য মেনে নিতে চায় না) তাকে বলে দিন : এসো, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রসন্তানদের এবং তোমাদের পুত্রসন্তানদের, আমাদের নারীগণকে এবং তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে, অতঃপর আমরা (মহান আল্লাহর কাছে) বিনীতভাবে প্রার্থনা করি এবং মিথ্যাবাদীদের ওপর মহান আল্লাহর অভিশপ্তাৎ করি।” (আলে ইমরান : ৬৩)

মুবাহলার জন্য মহানবী (সা.)

নাজরানের প্রতিনিধিদলের সাথে মহানবী (সা.)- এর মুবাহালা করার ঘটনা ইসলামের ইতিহাসের অত্যন্ত আকর্ষণীয়, তীব্র আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও আশ্চর্যজনক ঘটনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যদিও কতিপয় মুফাসসির ও সীরাত রচয়িতা এ মহাঘটনার যাবতীয় খঁটনাটি দিক বর্ণনা এবং তা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছেন, তথাপি অনেকেই, যেমন আল কাশশাফ গ্রন্থে আল্লামা যামাখশারী^{৪৭১}, তাফসীর গ্রন্থে^{৪৭২} ইমাম ফখরুদ্দীন আল রাযী এবং আল কামিল ফীত তারিখ গ্রন্থে^{৪৭৩} ইবনে কাসীর এ ব্যাপারে লিখেছেন। আল্লামা যামাখশারী বলেন :

মুবাহলার মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। আগে থেকেই মহানবী (সা.) ও নাজরানের প্রতিনিধি দল পরস্পর সমঝোতা করেছিলেন, মদীনা নগরীর বাইরে উন্মুক্ত মরু- প্রান্তরের কোন এক স্থানে ‘মুবাহালা’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। মহানবী (সা.) সাধারণ মুসলিম ও নিজ আীয়- স্বজনদের মধ্য থেকে কেবল চার ব্যক্তিকে এ ঐতিহাসিক ঘটনায় অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত করেন। এ চার ব্যক্তি হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (আ.), হযরত ফাতিমা (আ.), হযরত হাসান (আ.) ও হযরত হুসাইন (আ.) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। কারণ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মধ্যে তখন এ চার জনের ঈমান অপেক্ষা পবিত্রতর ও দৃঢ়তর ঈমানের অধিকারী কোন মুসলমানই ছিলেন না।

মহানবী (সা.) তাঁর বাড়ি ও যে স্থানে ‘মুবাহালা’ অনুষ্ঠিত হবে, সে স্থানটির অন্তর্ভুক্তি দূরত্ব অতিক্রম করলেন। তিনি শিশু ইমাম হুসাইন (আ.)- কে কোলে^{৪৭৪} নিয়েছিলেন এবং ইমাম হাসান (আ.)- এর হাত নিজের হাতের মুঠোয় রেখেছিলেন। আর হযরত ফাতেমা (আ.) তাঁর পশ্চাতে এবং হযরত আলী (আ.) হযরত ফাতিমার পিছে পিছে হাঁটছিলেন। এ অবস্থায় তিনি মুবাহলার ময়দানের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। মুবাহলার ময়দানে প্রবেশের আগেই তিনি তাঁর সাথে মুবাহালায় অংশগ্রহণকারী সঙ্গীদের বলেছিলেন : “যখনই আমি দুআ করব, তখন তোমরাও আমার দুআর সাথে সাথে ‘আমীন’ বলবে।”

মহানবী (সা.)- এর মুখোমুখী হবার আগেই নাজরানের প্রতিনিধি দলের নেতারা একে অপরকে বলতে লাগল : “যখনই আপনারা মুহাম্মদকে প্রত্যক্ষ করবেন, তিনি লোক-লঙ্কর ও সঙ্গী-সাহীদের নিয়ে মুবাহলার ময়দানে আসছেন এবং আমাদের সামনে তাঁর পার্থিব জৌলুস এবং বাহ্যিক শক্তি প্রদর্শন করছেন, তখন তিনি ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী হবেন এবং তাঁর নবুওয়াতের কোন নির্ভরযোগ্যতাই থাকবে না। আর তিনি যদি নিজ সন্তান-সন্ততি ও আপনজনদের সাথে নিয়ে মুবাহলা করতে আসেন এবং সব ধরনের বস্তুগত ও পার্থিব জৌলুস থেকে মুক্ত হয়ে এক বিশেষ অবস্থায় মহান আল্লাহর দরগাহে প্রার্থনা করার জন্য হাত তোলেন, তা হলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তিনি একজন সত্যবাদী নবী এবং তিনি এতটা আ বিশ্বাসে বলীয়ান যে, তিনি কেবল নিজেকেই সম্ভাব্য যে কোন ধ্বংসের মুখোমুখী করতে প্রস্তুত নন, বরং তাঁর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিদেরও ধ্বংসের মুখোমুখী দাঁড় করাতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।”

নাজরান প্রতিনিধি দলের নেতারা যখন পারস্পরিক আলোচনায় মশ ল, ঠিক তখনই চার জনকে সাথে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর নূরানী মুখমণ্ডল হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হলো। স্মর্তব্য, ঐ চার জনের মধ্যে তিন জনই (হযরত ফাতিমা, ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন) ছিলেন তাঁর পবিত্র অস্তিত্ব-বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা। প্রতিপক্ষের সবাই তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিল। আর মহানবী (সা.) তাঁর নিজের সাথে তাঁর কলিজার টুকরা নিষ্পাপ আপনজনদের এবং নিজের একমাত্র কন্যাসন্তানকে মুবাহলার ময়দানে নিয়ে এসেছেন বলে তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে নিজেদের হাতের আঙ্গুল কামড়াতে লাগল। তারা স্পষ্ট বুঝতে পারল, মহানবী (সা.) তাঁর আহবান ও দুআর ব্যাপারে দৃঢ় আস্থা পোষণ করেন। আর তা না হলে একজন দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তি তার আপনজনদের কখনোই আসমানী মুসিবত এবং মহান আল্লাহর শাস্তির মুখোমুখী দাঁড় করাবেন না।

নাজরানের প্রধান ধর্মযাজক তখন বললেন : “আমি এমন সব পবিত্র মুখাবয়ব দেখতে পাচ্ছি যে, যখনই তারা হাত তুলে দুআ করে মহান আল্লাহর দরবারে সবচেয়ে বড় পাহাড়কে উপড়ে ফেলতে বলবেন, তাৎক্ষণিকভাবে তাদের দুআয় সাড়া দান করা হবে। সুতরাং এসব আলোকিত

মুখমণ্ডল এবং সুমহান মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির সাথে আমাদের মুবাহালা করা কখনই ঠিক হবে না। কারণ আমাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয় এবং অষ্টার শাস্তি ব্যাপকতা লাভ করে বিশ্বের সকল খ্রিষ্টানকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারে। তখন পৃথিবীর বুকে একজন খ্রিষ্টানও অবশিষ্ট থাকবে না।” ৪৭৫

মুবাহালা থেকে নাজরানের প্রতিনিধি দল বিরত

প্রতিনিধি দল অবস্থা প্রত্যক্ষ করে পরস্পর পরামর্শ করে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা কখনই মুবাহালায় অংশগ্রহণ করবে না এবং প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জিযিয়া কর হিসেবে প্রদান করতে সম্মত হবে, যদি এ কর বাবদ ইসলামী হুকুমত তাদের জান-মাল সংরক্ষণ করে। মহানবী (সা.) এ ব্যাপারে তাঁর সম্মতির কথা জানিয়ে দেন এবং নির্ধারিত হয় যে, তারা (নাজরানবাসীরা) প্রতি বছর (জিযিয়া কর হিসেবে) কিছু অর্থ প্রদানের বিনিময়ে রাণীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে। এরপর মহানবী (সা.) বললেন : “মহান আল্লাহর শাস্তি নাজরানবাসীদের প্রতিনিধিদের মাথার ওপর ছায়া বিস্তার করেছিল। আর তারা যদি মুবাহালা ও পারস্পরিক অভিশম্পাৎ (মুলাআনাহ) প্রদানের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত, তা হলে তারা তাদের মনুষ্যকৃতি হারিয়ে ফেলত এবং মরু-প্রান্তরে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, তাতে তারা দগ্ধ হতো। আর ইলাহী শাস্তি নাজরান অঞ্চলকে গ্রাস করত।”

হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে : মুবাহালা দিবসে মহানবী (সা.) তাঁর চারজন সাথীকে একটি কালো বর্ণের চাদরের নিচে প্রবেশ করিয়ে এ আয়াত তেলাওয়াত করেছিলেন :

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

“হে আহলে বাইত! নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তোমাদের থেকে সব ধরনের পাপ-পঙ্কিলতা দূর করতে এবং পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান।” (সূরা আহযাব : ৩৩)

এরপর আল্লামা যামাখশারী মুবাহালার আয়াতের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেন এবং আলোচনার শেষে লিখেছেন : মুবাহালার মহাঘটনা এবং এ আয়াতের বিষয়বস্তু ও মর্মার্থ ‘আসহাবে কিসা’ অর্থাৎ মহানবী (সা.) যাঁদেরকে তাঁর চাদরের নিচে স্থান দিয়েছিলেন, তাঁদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় দলিল এবং ইসলাম ধর্মের সত্যতারও এক জীবন্ত সনদ।

সন্ধিপত্রের মূল পাঠ

নাজরানের প্রতিনিধি দল মহানবী (সা.)- এর কাছে তাদের বার্ষিক করের পরিমাণ সন্ধিপত্রে লিপিবদ্ধকরণ এবং মহানবীর পক্ষ থেকে নাজরান অঞ্চলের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করারও আবেদন জানিয়েছিল। আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) মহানবীর নির্দেশে নিম্নোক্ত সন্ধিপত্র লিখেন :

“ পরম করুণাময় ও চিরদয়ালু মহান আল্লাহর নামে। নাজরান অঞ্চল এবং তার উপকণ্ঠের অধিবাসীদের প্রতি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে (এ সন্ধিচুক্তি)। নাজরানবাসীদের সকল সহায়- সম্পত্তি সংক্রান্ত মুহাম্মদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হচ্ছে এই যে, নাজরানের অধিবাসীরা প্রতি বছর দু’হাজার বঙ্গ- প্রতিটির মূল্য যেন ৪০ দিরহামের উর্ধ্বে না যায়, ইসলামী প্রশাসনের কাছে অর্পণ করবে। তারা এ লোর অর্ধেক সফর মাসে এবং বাকী অর্ধেক রজব মাসেও প্রদান করতে পারবে। আর যখনই ইয়েমেনের দিক থেকে যুদ্ধের আ ন প্রজ্জলিত হবে, তখন নাজরানের অধিবাসীরা ইসলামী হুকুমতের সাথে সহযোগিতা স্বরূপ ৩০টি বর্ম, ৩০টি ঘোড়া এবং ৩০টি উট ঋণ বাবদ মুসলিম সেনাবাহিনীর কাছে অর্পণ করবে এবং নাজরান অঞ্চলে এক মাস মহানবীর প্রতিনিধিদের আতিথেয়তা ও আপ্যায়নের দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত থাকবে। যখনই তাঁর পক্ষ থেকে কোন প্রতিনিধি তাদের কাছে যাবেন, তখন তারা অবশ্যই তাঁকে আপ্যায়ন করবে। নাজরান জাতির জান- মাল, ভূ- খণ্ড, এবং তাদের উপাসনাঙ্গলসমূহ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হেফায়তে থাকবে; তবে তা এ শর্তে যে, এখন থেকেই তারা সব ধরনের সুদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে। আর এর অন্যথা হলে তাদের থেকে মুহাম্মদের দায় মুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের বরাবরে তাঁর আর কোন প্রতিশ্রুতি বহাল থাকবে না।” ৪৭৬

এ সন্ধিপত্র একটি লাল চামড়ার উপর লেখা হলে মহানবী (সা.)- এর দু’জন সাহাবী সাক্ষী হিসেবে এর নিচে স্বাক্ষর করলেন। অবশেষে মহানবী (সা.) সন্ধিপত্রের উপর মোহর অঙ্কিত করে তা প্রতিনিধি দলের নেতাদের হাতে অর্পণ করলেন। এ সন্ধিপত্র এক মহান নেতার চূড়ান্ত ন্যায়পরায়ণতার কথাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে এবং মহানবীর হুকুমত যে বিশ্বের অন্য সকল

অত্যাচারী সরকার ও প্রশাসনের মতো ছিল না, তা এ ঘটনা থেকে ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়। উল্লেখ্য, এসব অত্যাচারী সরকার ও প্রশাসন প্রতিপক্ষের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব থেকে অবৈধ ফায়দা হাসিল করে এবং তাদের ওপর বিরাট করে বোঝা চাপিয়ে দেয়। অপর দিকে, ইসলামী হুকুমত (রা) সব সময় শান্তি, ন্যায় এবং মানবীয় মূলনীতিসমূহ বিবেচনায় রেখে কখনই এসবের সীমারেখা অতিক্রম করে না অর্থাৎ এর বহির্ভূত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে না।

শ্রে ত্বের সনদ

মুবাহলার মহা ঘটনা এবং যে আয়াত এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল, তা সব সময় ও সকল যুগে শিয়া মুসলমানদের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের সর্ববৃহৎ সনদ বলে গণ্য হয়েছে। কারণ আয়াতের সকল শব্দ ও অংশ ব্যক্ত করে, মহানবী (সা.)- এর সঙ্গীগণ (হযরত আলী, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন) শ্রেষ্ঠত্বের কোন্ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ আয়াতে হযরত হাসান (আ.) ও হযরত হুসাইন (আ.)- কে মহানবী (সা.)- এর পুত্রসন্তান এবং হযরত ফাতিমা (আ.)- কে মহানবীর আহলে বাইতের সাথে সংশ্লিষ্ট ও এর অন্তর্ভুক্ত ‘একমাত্র নারী’ বলে উল্লেখ করা ছাড়াও স্বয়ং হযরত আলী (আ.)- কে ‘আনফুসানা’ অর্থাৎ ‘আমাদের নিজ সত্তা’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুসলিম বিশ্বের এ সুমহান ব্যক্তিত্বকে মহানবী (সা.)- এর আ ১ (সত্তা) বলে গণ্য করা হয়েছে। যখন এক ব্যক্তি আধ্যাতিকতা ও শ্রেষ্ঠত্বের এমন পর্যায়ে উন্নীত হন যে, মহান আল্লাহ তাঁকে মহানবী (সা.)- এর আ ১ বলে অভিহিত করেন, তখন এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ফযীলত ও মর্যাদা আর কী হতে পারে?

মুবাহলার এ আয়াত^{৪৭৭} বিশ্বের সকল মুসলমানের ওপর আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ নয় কি? ইমামত ও এ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংক্রান্ত আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযীর কালামবিদ্যাভিত্তিক আলোচনা পদ্ধতি সবার কাছে স্পষ্ট। তিনিও (অন্য সবার চেয়ে হযরত আলীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার ক্ষেত্রে) শিয়া মুসলমানদের উপস্থাপিত যুক্তি উল্লেখ করে একটা নগণ্য আপত্তির অবতারণা করে এ বিষয়কেন্দ্রিক আলোচনার ইতি টেনেছেন যে, তাঁর এ ধরনের আপত্তির জবাবও জ্ঞানীদের নিকট অজানা নয়।

আমাদের ইমামগণের বর্ণিত হাদীস ও রেওয়াজে থেকে প্রতীয়মান হয়, মুবাহলা কেবল মহানবী (সা.)- এর সাথেই একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং প্রত্যেক মুসলমানই ধর্মীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে তার বিরোধী পক্ষের সাথে মুবাহলা করতে পারবে। হাদীস গ্রন্থসমূহে মুবাহলা পদ্ধতি এবং এ সংক্রান্ত দু'আর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।^{৪৭৮}

আল্লামা তাবাতাবাই-এর একটি সন্দর্ভে বর্ণিত হয়েছে : “মুবাহালা ইসলাম ধর্মের স্থায়ী মুজিয়াসমূহের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক মুমিন ইসলামের শ্রেষ্ঠ নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইসলামের কোন একটি সত্য প্রমাণের ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষের সাথে মুবাহালায় লিপ্ত হতে এবং মুবাহালা করার সময় মহান আল্লাহর কাছে প্রতিপক্ষকে শাস্তি দান এবং তাকে অপদস্থ করার জন্য দুআও করতে পারবে।^{৪৭৯}

উনষাটতম অধ্যায় : দশম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

মুবাহলার সাল, মাস ও দিন

ইসলামের ইতিহাসে মুবাহলার ঘটনা একটি প্রসিদ্ধ ও মুতাওয়াতির^{৪৮০} ঘটনা। বিভিন্ন উপলক্ষে তাফসীর, ইতিহাস ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এ ঘটনার সারসংক্ষেপ নিচে বর্ণিত হলো :

মহানবী (সা.) বিশ্বের নেতৃবর্গের কাছে পত্র লেখার পাশাপাশি নাজরান অঞ্চলের প্রধান খ্রিষ্ট ধর্মযাজক আবু হারিসার কাছে একটি পত্র লিখেন এবং এ পত্রে তিনি নাজরানবাসীকে ইসলাম ধর্মের দিকে আহ্বান জানান। মহানবীর পত্র আবু হারিসার হাতে পৌঁছলে তিনি কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করেন। অবশেষে পরামর্শসভায় মহানবীর সাথে সরাসরি সাক্ষাতের জন্য মদীনা নগরীতে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

নাজরানের প্রতিনিধি দল মদীনা নগরীতে উপস্থিত হয় এবং অনেক আলোচনার পর মহানবী (সা.) মহান আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকে মুবাহলার প্রস্তাব দেন। অর্থাৎ সবাই মরু-প্রান্তরে গিয়ে মহান আল্লাহর কাছে দুআয় রত হবেন এবং উভয় পক্ষ তাদের প্রতিপক্ষের ওপর লানত দেবেন ও ধ্বংস কামনা করবেন। প্রতিনিধি দল মহানবীর প্রস্তাব মেনে নেন। তবে মুবাহলার দিবসে নাজরানের নেতারা মহানবীকে বিশেষ আধ্যাতিক অবস্থায় তাঁর আপনজনদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় চারজনকে সাথে নিয়ে মুবাহলার ময়দানের দিকে আসতে দেখে মুবাহলা থেকে বিরত হয় এবং সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয় যে, নাজরানের খ্রিষ্টানরা সামান্য কিছু জিযিয়া কর প্রদান করে ইসলামের পতাকাতলে নিজেদের ধর্মমতের ওপর বহাল থাকবে।

আর এটাই হচ্ছে নাজরানের ঘটনা বা মুবাহলার ঘটনার সার-সংক্ষেপ, যা কোন মুফাসসির ও ঐতিহাসিক অস্বীকার করেন নি।

প্রসিদ্ধ মত অনুসারে মুবাহলার সাল

এ প্রসঙ্গে ‘মহানবী (সা.)-এর পত্রাবলী’ গ্রন্থের রচয়িতা বলেন : “মহানবী (সা.) নাজরানবাসীর সাথে যে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, তা যে হিজরতের দশম বর্ষে হয়েছিল এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। আর স্বাভাবিকভাবে মুবাহলার সালও

হিজরতের দশম বর্ষেই হবে। কারণ নাজরানের প্রতিনিধি দলের মুবাহালা থেকে বিরত হওয়ার পরপরই ঐ শান্তিচুক্তিটি লেখা হয়েছিল।”

শান্তিচুক্তি বা সন্ধিপত্রের মূল পাঠ বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।^{৪৮১}

মুবাহালার মাস ও দিন

পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ অভিমত হলো যে, ২৫ যিলহজ্ব হচ্ছে মুবাহালা দিবস। আর মরহুম শেখ তুসীর মতে মুবাহালা দিবস ২৪ যিলহজ্ব এবং তিনি এ ব্যাপারে একটি দুআও বর্ণনা করেছেন।^{৪৮২}

মরহুম সাইয়েদ ইবনে তাউস ‘মুবাহালা দিবস’ প্রসঙ্গে তিনটি অভিমতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, এ প্রসঙ্গে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে সহীহ রেওয়ায়েত হচ্ছে এটাই যে, ২৪ যিলহজ্বই মুবাহালা দিবস। আর কেউ কেউ ২১ যিলহজ্বকে এবং অপর কিছুসংখ্যক ব্যক্তি ২৭ যিলহজ্বকে মুবাহালা দিবস বলে বিশ্বাস করেন।^{৪৮৩}

তিনি তাঁর গ্রন্থের শেষে^{৪৮৪} এতটা বিস্তারিতভাবে মুবাহালার ঘটনা রেওয়ায়েত করেছেন যে অন্য কোন গ্রন্থে এ ঘটনা এত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয় নি এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু নিম্নোক্ত দু’টি গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থদ্বয় হলো :

১. আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মুত্তালিব শাইবানী প্রণীত ‘কিতাব আল মুবাহালা’ (মুবাহালার গ্রন্থ)^{৪৮৫} ।

২. হাসান ইবনে ইসমাইল ইবনে আশনাস প্রণীত ‘আমালি ফিল হিজ্জাহ’ (যিলহজ্ব মাসের আমলের গ্রন্থ)^{৪৮৬} ।

এ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী মুবাহালা দিবস হচ্ছে ২১, ২৪, ২৫ অথবা ২৭ যিলহজ্ব।

আমার (গ্রন্থকার) মতে মুবাহালার সাল ও দিবস সংক্রান্ত এসব অভিমত ঐ সব ঐতিহাসিক বর্ণনা যেসব বেশ নির্ভরযোগ্য এবং যেসবের কিছু অংশ অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত, সেসবের সাথে নিম্নোক্ত কারণসমূহের জন্য খাপ খায় না। কারণ লো হলো :

১. নাজরানের প্রধান খ্রিষ্ট ধর্মযাজকের কাছে মহানবী (সা.)- এর নির্দেশে লিখিত সন্ধিপত্রের শেষে বর্ণিত হয়েছে : *وإن أبيتُم فالجزية* “আর যদি আপনারা (ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান) প্রত্যাখ্যান করেন, তা হলে আপনাদের অবশ্যই জিযিয়া প্রদান করতে হবে।”

পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবায় ‘জিযিয়া’ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। বাহ্যত এটাই মনে হয় যে, মহানবী (সা.) সূরা তাওবার অনুসরণে এ বাক্য তাঁর সন্ধিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর সূরা তাওবা তাবুক যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু আগে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এ যুদ্ধ নবম হিজরীর রজব মাসের পর সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং এটাও সম্ভব হতে পারে, মহানবী (সা.) নাজরানবাসীর উদ্দেশে যে পত্র পাঠিয়েছিলেন, তারা মদীনায় একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে সেই পত্রের জবাব প্রদান করে থাকবে। এ ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে বোঝা যায়, মুবাহালার ঘটনা হিজরতের দশম বর্ষে সংঘটিত হয়েছিল।

২. জীবন চরিত রচয়িতাগণ ঐকমত্য পোষণ করে বলেছেন : মহানবী (সা.) হযরত আলী (আ.)- কে বিচারকাজ পরিচালনা এবং ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান শিক্ষা দেবার জন্য ইয়েমেনে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত আলীও সেখানে বেশ কিছুকাল দায়িত্ব পালন করার জন্য অবস্থান করেছিলেন। মহানবী (সা.) হজ্ব পালন করার জন্য পবিত্র মার উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন জানতে পেরে তিনিও একটি কাফেলাকে সাথে নিয়ে পবিত্র মার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান এবং পবিত্র মায় মহানবী (সা.)- এর নিকট উপস্থিত হয়ে নাজরানবাসী থেকে যে এক হাজার বস্ত্র ‘জিযিয়া’ কর হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তা মহানবী (সা.)- এর হাতে অর্পণ করেন।^{৪৮৭}

এ ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয়, মুবাহালা এবং শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ঘটনাটা সুনিশ্চিতভাবে হিজরতের দশম বর্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

কারণ নাজরানবাসী এ শান্তিচুক্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল, প্রতি বছর তারা দু’হাজার পোশাক মহানবী (সা.)- এর কাছে হস্তান্তর করবে এবং এ লোর অর্ধেক রজব মাসে এবং বাকী অংশ সফর মাসে প্রদান করবে।^{৪৮৮}

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, শান্তিচুক্তি যদি যিলহজ্ব মাসে সম্পাদিত হয়ে থাকে, তা হলে অবশ্যই বলতে হয় এর অর্থ হচ্ছে তা হিজরী দশম বর্ষের পূর্ববর্তী বছর লোর কোন এক যিলহজ্ব মাস হবে।

কারণ এটা কিভাবে বলা সম্ভব হবে যে, এ শান্তিচুক্তি হিজরতের দশম বর্ষে সম্পাদিত হয়েছিল এবং হযরত আলীও তা ঐ বছরই কার্যকর করেছিলেন?

আমরা যদি শান্তিচুক্তি সম্পাদনের মাস ও দিবস সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ অভিমতটি মেনেও নিই, তা হলে হিজরতের দশম বর্ষে এ শান্তিচুক্তি হবার সম্ভাবনা থাকে। তবে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের তারিখ অবশ্যই রজব মাসের আগে হতে হবে। কারণ ধারণা হচ্ছে হযরত আলী (আ.) জিযিয়ার প্রথম অংশ হিজরী দশম সালের রজব মাসে গ্রহণ করেছিলেন।

সংক্ষেপে, আলী (আ.) যে রজব মাসে নাজরানবাসীর কাছ থেকে জিযিয়ার একটি অংশ গ্রহণ করে তা মায় যিলহজ্ব মাসে মহানবী (সা.)-এর কাছে হস্তান্তর করেছিলেন- ইতিহাসের এ ঘটনার দিকে তাকিয়ে আমাদেরকে অবশ্যই নিম্নোক্ত দু'টি অভিমতের একটি গ্রহণ করতে হবে।

ক. আমরা যদি নিশ্চিতভাবে ধরে নিই, এ শান্তিচুক্তি যিলহজ্ব মাসেই সম্পাদিত হয়েছিল, তা হলে অবশ্যই বলতে হবে, এ যিলহজ্ব মাস বলতে অবশ্যই আমাদেরকে হিজরতের দশম বর্ষের পূর্ববর্তী যিলহজ্ব মাস লোকেই বুঝতে হবে (অর্থাৎ তা হতে পারে নবম হিজরীর যিলহজ্ব বা অষ্টম হিজরীর যিলহজ্ব মাস)।

খ. আর আমরা এ শান্তিচুক্তি সম্পাদনের বছরের ব্যাপারে যেমন নিশ্চিত হতে পারি নি, তদ্রূপ এ শান্তিচুক্তি সম্পাদনের দিন ও মাসের ব্যাপারেও যদি নিশ্চিত হতে না পারি, তা হলে এ অবস্থায় এ কথা বলা কি সম্ভব যে, এ শান্তিচুক্তি সম্পাদনের দিবস হিজরতের দশম বর্ষের রজব মাসের পূর্ববর্তী মাস লোর সাথে সংশ্লিষ্ট?

এ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেছে, মুবাহলার বছর নিশ্চিতভাবে হিজরতের দশম বর্ষ হতে পারে না। তবে আমরা যদি শান্তিচুক্তি সম্পাদনের মাস ও দিনের ব্যাপারে আমাদের মত পরিবর্তন করি, সে ক্ষেত্রে হয় তো হিজরতের দশম বর্ষকে মুবাহলার বছর বলা সম্ভব হবে।

অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করে এখন মুবাহালার মাস ও দিন নির্ধারণ করার সময় এসেছে। আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, আলেমগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে, মুবাহালার মাস যিলহজ্জ এবং এর দিবস যিলহজ্জের ২৪ বা ২৫ তারিখ এবং আরেক অভিমত অনুসারে এ মাসের ২১ বা ২৭ তারিখ।

এখন আমরা দেখব, এ অভিমত ইতিহাসের অপরাপর অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত ঘটনার সাথে খাপ খায় কি না। আমাদের পরবর্তী পর্যালোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, মুবাহালার ঘটনা কখনোই হিজরতের দশম বর্ষের যিলহজ্জে সংঘটিত হতে পারে না। কারণ মহানবী (সা.) হজ্জের বিধি-বিধান ও আচার-অনুষ্ঠান শিক্ষা দেবার জন্য হিজরতের দশম বর্ষে পবিত্র মায় গমন করেছিলেন এবং ১৮ যিলহজ্জ জুহফা^{৪৮৯} থেকে দু' মাইল^{৪৯০} দূরত্বে অবস্থিত গাদীরে খুম এলাকায় হযরত আলী (আ.)-কে তাঁর পরে ইমামত ও খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত করেন।

গাদীরে খুমের মহা ঘটনা ঐ ধরনের ঘটনা ছিল না, যার প্রভাব একদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে এবং মহানবীও যার পর তাৎক্ষণিকভাবে মদীনা অভিমুখে যাত্রা অব্যাহত রাখবেন। কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, হযরত আলী (আ.)-কে খিলাফতে অধিষ্ঠিত করার পর মহানবী আলী (আ.)-কে তাঁবুতে অবস্থানের আদেশ দেন, যাতে গাদীরে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তিন জন করে তাঁর কাছে গমন করে তাঁকে অভিনন্দন জানান। আর অভিনন্দন পর্বটি ১৯ যিলহজ্জের রাত পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অভিবাদন জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের শেষের দিকে উম্মুল মুমিনীনগণ (মহানবীর স্ত্রীগণ) হযরত আলীকে মুবারকবাদ জানিয়েছিলেন।^{৪৯১}

এ কারণে বলা সম্ভব নয়, মহানবী (সা.) ১৯ যিলহজ্জ মদীনার উদ্দেশে গাদীরে খুম অঞ্চলে, - বিশেষ করে উপরে উল্লিখিত স্থান, যা হচ্ছে মদীনা, মিশর ও ইরাকগামী কাফেলা লোর পরস্পর পৃথক হওয়ার স্থান, - ত্যাগ করেছিলেন। আর স্বভাবতই মিশর ও ইরাকগামী কাফেলা লো অবশ্যই মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিল। তাই এ অবস্থা নিঃসন্দেহে গাদীরে খুম এলাকায় মহানবীর অবস্থান দীর্ঘায়িত হবার কারণ হবে।

ধরুন, মহানবী (সা.) ১৯ যিলহজ্জই মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। এ পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করার ব্যাপারে ইতিহাস থেকে আমরা যে সব হিসাব পেয়েছি, সে সবার ভিত্তিতে কি বলা সম্ভব হবে যে, মহানবী ২৪ বা ২৫ যিলহজ্জ মদীনায় পৌঁছে মুবাহালার পূর্ব পদক্ষেপসমূহ আঞ্জাম দিয়েছেন এবং এর পরপরই তিনি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছেন?

এখন আমাদের দেখতে হবে, ঐ সময় কাফেলা মো পবিত্র ম া থেকে মদীনা পর্যন্ত দূরত্ব কত দিনে অতিক্রম করত। তবে এ ক্ষেত্রে স্বয়ং মহানবী (সা.)- এর মণ- বৃত্তান্ত ছাড়া আর কোন স্পষ্ট দলিল আমাদের হাতে নেই। মহানবী ম া থেকে মদীনায় হিজরতকালে ৯ দিনে এ দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন।^{৪৯২}

ঠিক একইভাবে মহানবী (সা.) হিজরতের অষ্টম বর্ষে এ দূরত্ব ১১ দিনে অতিক্রম করেছিলেন।^{৪৯৩} পার্থক্যের কারণ হচ্ছে এই, মহানবী (সা.) প্রথম সফরের ক্ষেত্রে (হিজরতের সময়) দু'জন সফরসঙ্গীসহ এ দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন। অথচ দ্বিতীয় সফরের সময় (ম া বিজয় অভিযানে) দশ হাজার সৈন্যের এক সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবে তিনি এ সফরে কিছুটা ধীর গতিতে এ দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন।

মহানবী (সা.) যদি ১৯ যিলহজ্জ গাদীরে খুম অঞ্চল ত্যাগ করে থাকেন, এ অবস্থায় আমরা যদি দূরত্ব অতিক্রম করার মোট সময়কাল ৯ দিন ধরি, তা হলে তিনি জুহফাহ থেকে মদীনা পর্যন্ত দূরত্ব ৬ দিনে অতিক্রম করে থাকবেন এবং সে মর্মে তিনি ২৪ যিলহজ্জ মদীনা নগরীতে প্রবেশ করে থাকবেন। আর পবিত্র ম া থেকে মদীনা নগরীর মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রম করার সময়কাল ১১ দিন ধরলে তিনি অবশ্যই এ দূরত্ব (জুহফাহ থেকে মদীনা) সাড়ে সাত দিনের মধ্যে অতিক্রম করে থাকবেন এবং নিয়মানুযায়ী তিনি ২৬ যিলহজ্জের মধ্যাহ্নে মদীনায় প্রবেশ করবেন। তাই এই হিসাব অনুসারে বলা সম্ভব হবে কি যে, ২৪, ২৫ বা ২৭ যিলহজ্জে মুবাহালার মহা ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল?

মুবাহালার ঘটনার মাস ও দিন সংক্রান্ত বিখ্যাত অভিমতটির অসারত্ব আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় যখন আমরা জানতে পারি, নাজরানের প্রতিনিধি দল বেশ কিছু আলোচনা ও তর্ক- বিতর্কের

পর মুবাহালা করার ব্যাপারে সম্মত হয়ে অবশেষে মুবাহালায় অসম্মতি জানায় এবং বেশ কিছু শর্তসাপেক্ষে শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে। কারণ নাজরানের প্রতিনিধি দল হাতের আঙ্গুলে সোনার আংটি পরে, গলায় ত্রুশ বুলিয়ে অত্যন্ত জমকালো ও দামী পোশাক পরে মদীনা নগরীতে আগমন করে সরাসরি মসজিদে নববীতে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) তাদের সাথে এমনভাবে মুখোমুখি হন যে, অসম্মতির চিহ্ন তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছিল।

এ ঘটনার পর নাজরানের প্রতিনিধি দল সেখান থেকে বের হয়ে হযরত আলী (আ.)-এর সাথে যোগাযোগ করে মহানবীর অসম্মত ও ত্রুদ্ধ হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করে। হযরত আলী (আ.) তাদেরকে বলেছিলেন : “আপনারা অবশ্যই রেশমী পোশাক এবং স্বর্ণালংকার বাদ দিয়ে সাদামাটা পোশাক পরিধান করে মহানবী (সা.)-এর কাছে যাবেন। তা হলে তিনিও আপনাদের উন্মুক্ত চিত্তে ও প্রশান্ত বদনে গ্রহণ করবেন।”

পরের বার নাজরানের প্রতিনিধি দল আড়ম্বরহীন অবস্থায় মহানবীর নিকট উপস্থিত হলে তিনিও তাদেরকে প্রশান্ত বদনে গ্রহণ করেন। এরপর তারা মহানবীর কাছে মসজিদে নববীতে নামায আদায় করার আবেদন জানালে তিনিও মসজিদে নববীতে তাদের নামায আদায় করার ব্যাপারে সম্মতি দান করেন। এরপর দু’পক্ষের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। দীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্কের পর উভয় পক্ষ মুবাহালা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উপরিউক্ত আলোচনাসমূহ মুফাসসিরগণ এবং ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।^{৪৯৪}

মুবাহালার দিন ঠিক করা হলো। অতঃপর ঐ দিন যখন মহানবী (সা.) কেবল হযরত আলী, কন্যা ফাতিমা (আ.) এবং তাঁর দু’সন্তান হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (আ.)-কে মুবাহালার ময়দানে এনেছিলেন, তখন তাঁর সরল ও আড়ম্বরহীন অবস্থা নাজরানের প্রতিনিধিদলকে মুবাহালা থেকে বিরত রেখেছিল এবং তারা জিযিয়া কর দিতে সম্মত হয়েছিল।

একের পর এক সংঘটিত এ সব ঘটনা, যেসব ‘মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ’ গ্রন্থের রচয়িতার অভিমত অনুসারে চার অধিবেশনের সময় পরিমাণ দীর্ঘ হয়েছিল, সেসব কি এক দিনে সমাপ্ত হতে পারে? নিশ্চিতভাবেই এক দিনে সে সব সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।

এসব হিসাব- নিকাশ থেকে প্রতীয়মান হয়, মুবাহালা অনুষ্ঠান এবং শান্তিচুক্তি হিজরতের দশম বর্ষের ২১, ২৪, ২৫ বা ২৭ যিলহজ্জে সম্পাদিত হয় নি।

এছাড়াও নাজরান হিজায় ও ইয়েমেনের মধ্যকার একটি সীমান্ত শহর। কাফেলা লোর আসা- যাওয়ার মাধ্যমে মদীনা নগরীর খবর আপনা- আপনি সেখানে পৌঁছে যেত। এ কারণে এটাই স্বাভাবিক যে, হজ্জ পালন করার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)- এর পবিত্র ম াভিমুখে যাত্রার সংবাদ নাজরানবাসীর কানে পৌঁছে থাকবে। এ অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মদীনায় মহানবীর প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে নিশ্চিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য মদীনার উদ্দেশ্যে নাজরানের প্রতিনিধি দলের যাত্রা একেবারেই অবাস্তব।

হিজরতের নবম বর্ষের যিলহজ্জ মাসে মুবাহালা

এখানে এ কথা হয় তো বলা সম্ভব, হিজরতের নবম বর্ষের যিলহজ্জ মাসই ছিল মুবাহালার সঠিক তারিখ ও সময়কাল। ঘটনাক্রমে কতিপয় ঐতিহাসিকও প্রথম বারের মতো এ ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।^{৪৯৫}

তবে ঐতিহাসিক হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতেও এ অভিমতের ভিত্তিহীনতা প্রমাণিত হয়। কারণ আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.), যিনি নিজেই মুবাহালার এ ঘটনার সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং শাস্তিচুক্তির মূল পাঠ লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তিনি হিজরতের নবম বর্ষের যিলহজ্জ মাসে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে সূরা তাওবার প্রথম কয়েক আয়াত মিনায় মুশরিকদের উদ্দেশে পাঠ করে শোনানোর দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে হিজরতের নবম বর্ষ ছিল হাজীগণের তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনার দায়িত্ব মুসলমানদের হাতে আসার দ্বিতীয় বছর। আর আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীও ঐ বছর আমীনুল হজ্জ (হাজীদের সচিব) মনোনীত হয়েছিলেন।

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট, হজ্জ অনুষ্ঠান যদি যিলহজ্জ মাসের ১২ তারিখে সমাপ্ত হয়, তবে আলী (আ.)-এর মতো ব্যক্তিত্ব, যিনি হাজীদের তত্ত্বাবধানকারী ছিলেন, মায় অনেক আশীর্বাদ স্বজন থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবে ১৩ যিলহজ্জ মাসে ত্যাগ করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হতে পারবেন না। কারণ, উল্লিখিত কারণ লো ছাড়াও ঐ যুগে হাজীগণ কখনো একাকী পথ চলতে ও সওয়ারী পশুর উপর আরোহণ করে পানি, লালতাবিহীন মরু-প্রান্তর পাড়ি দিতে সক্ষম ছিলেন না। বরং সেকালে তাঁদেরকে সামষ্টিকভাবে ও কাফেলাবদ্ধ হয়ে মদীনার উদ্দেশে পবিত্র মদীনায় ত্যাগ করতে হতো। তাই আলী (আ.) যত সম্ভব মদীনায় অন্তর্ভুক্তি দূরত্ব অতিক্রম করেও ২৪ যিলহজ্জের আগে কখনই পবিত্র মদীনা নগরীতে পৌঁছতে সক্ষম হবেন না। এ অবস্থায় তিনি কিভাবে মদীনায় নাজরানের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান এবং মহানবী কি কারণে তাদেরকে উষ্ণতার সাথে বরণ করেন নি, তার কারণ তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে এবং মুবাহালার এ মহা ঘটনার সাক্ষী হতে পারবেন?

এসব ঐতিহাসিক সাক্ষ্য- প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয়, মুবাহালার ঘটনার দিন, মাস ও বছর সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ অভিমত ততটা নির্ভরযোগ্য নয় এবং এ মহা ঘটনা যা পবিত্র কুরআন, তাফসীর ও হাদীসের আলোকে সন্দেহহীন বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত, তা ঘটনার সময়কাল নির্ধারণের জন্য অবশ্যই অনেক বেশি অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, সম্মানিত আলেমগণ কিভাবে মুবাহালার তারিখ, মাস ও বছরের ব্যাপারে এ ধরনের অভিমত গ্রহণ করেছেন?

উত্তরে অবশ্যই বলতে হয়, মরহুম শেখ তুসী মুসনাদ রূপে বর্ণিত এক হাদীসের ভিত্তিতে এ অভিমত গ্রহণ করেছিলেন। তবে এ হাদীসের সনদে এমন সব ব্যক্তি (রাবী) আছে, যাদেরকে রিজালবিদরা কখনোই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করেন নি। যেমন :

১. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মাখযুম : তাল আকবাবীর হাদীসের শিক্ষক ছিলেন। তবে তিনি (রিজালবিদগণ কর্তৃক) বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হন নি।^{৪৯৬}

২. হাসান ইবনে আলী আল আদভী : আল্লামা তাঁকে ‘যাঈফ’ (দুর্বল) বলে গণ্য করেছেন।^{৪৯৭}

৩. মুহাম্মদ ইবনে সাদাকাহ আল আস্থারী : শেখ তুসী তাঁকে ‘গালী’ (চরমপন্থী) বলেছেন।^{৪৯৮}

মরহুম সাইয়েদ ইবনে তাউস ‘ইকবালুল আমাল’ গ্রন্থে মুবাহালা সংক্রান্ত বেশ কিছু বিষয় আবুল ফযলের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং আমরা উল্লেখ করেছি, এ লোকটির জীবনের দু’টি অধ্যায় ছিল। তাঁর জীবনের একটি অধ্যায়ে তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন বা বিবেচিত হতেন এবং অপর অধ্যায়ের নির্ভরযোগ্যতা নেই। আর এটাও স্পষ্ট নয়, আবুল ফযল মুবাহালা সংক্রান্ত বিষয়াদি তাঁর জীবনের কোন্ অধ্যায়ে রচনা করেছিলেন এবং আলেমগণও তাঁর জীবনের কোন্ অধ্যায় হতে রেওয়ায়েত ও বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

আর ঠিক একইভাবে সাইয়েদ ইবনে তাউস মারফু সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসের ওপর নির্ভর করে ২৪ যিলহজ্জকে মুবাহালার দিবস সাব্যস্ত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে হাদীসের সনদ পূর্ণাঙ্গ নয়, তা- ই মারফু হাদীস। এ ধরনের হাদীস দাবী প্রমাণ করতে অক্ষম।

ষাটতম অধ্যায় : দশম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

মিনা ঘোষণা দানের পর

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) মহানবী (সা.)- এর পক্ষ থেকে যে কড়া সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা মিনায় পাঠ করেছিলেন, তাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল প্রতিমা পূজারী- মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্ট (এবং তাদের সাথে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কোন সম্পর্ক নেই) এবং তাদেরকে চার মাসের মধ্যে তাদের অবস্থা চূড়ান্ত করতে হবে; হয় তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করবে, নতুবা তাদেরকে সর্বা ক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এ ঘোষণা ব্যাপক ও ত্বরিত প্রভাব ফেলেছিল। কারণ আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব গোত্র শত্রুতা, আক্রোশ ও জেদের কারণে পবিত্র কুরআনের যুক্তি ও তাওহীদী ধর্মের কাছে মাথা নত করছিল না এবং নিজেদের মন্দ ও অবৈধ অভ্যাস এবং অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও পাথর- কাদামাটি নির্মিত প্রতিমার পূজা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে গোয়ারতুমি করে যাচ্ছিল, তারা নিজেদের প্রয়োজনেই ইসলাম ধর্মের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র মদীনা নগরীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে থাকে। প্রতিটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সা.)- এর সাথে আলোচনা করেছিল। ইবনে সা'দ আত তাবা'ত গ্রন্থে ৭২ জন প্রতিনিধির বৈশিষ্ট্য উদ্ধৃত ও বর্ণনা করেছেন।^{৪৯৯} মিনায় ঘোষণাপত্র পাঠ করার পরপর মদীনায় প্রতিনিধি দল লোর আগমন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যে, হিজরতের দশম বর্ষের সূচনাকালেই আরবের মুশরিকদের আর কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থল ও সুরক্ষিত দুর্গ অবশিষ্ট ছিল না। তা থাকলে তারা সেখানেই আশ্রয় নিত এবং একে অপরের সহযোগিতা নিয়ে পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করত।

(মিনায় ঘোষণা দানের) চার মাসের মধ্যেই হিজায়ের সকল অধিবাসী ইসলাম ধর্ম ও তাওহীদের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং হিজায়ের কোন এলাকায়ই প্রকাশ্যে কোন প্রতিমালয় এবং মূর্তিপূজা রইল না। এমনকি ইয়েমেন, বাহরাইন এবং ইয়ামামার কতিপয় অধিবাসীও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

মহানবী (সা.)- এর প্রাণনাশের ষড়য

আরবের গোত্র লোর মধ্যে বনী আমের গোত্রের নেতারা ঔদ্ধত্য এবং অপকর্ম ও দুর্বৃত্তপনার জন্য কুখ্যাত ছিল।। তাদের মধ্যে আমীর, আরবাদ ও জাব্বার নামের তিন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, তারা বনী আমের গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের প্রধান হয়ে মদীনা গিয়ে মহানবী (সা.)- এর সাথে আলোচনাসভায় মিলিত হবে এবং তাঁকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করবে। হত্যার ষড়যন্ত্র ছিল এরূপ : আমীর মহানবীর সাথে আলোচনায় রত হবে এবং সে যখন মহানবীর সাথে আলোচনায় মশ ল থাকবে, তখন আরবাদ তরবারীর আঘাতে মহানবীকে হত্যা করবে।

প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্য এ তিনজনের পরিকল্পনা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ওয়াকিবহাল ছিলেন না এবং তাঁদের সবাই ইসলাম ধর্ম ও মহানবী (সা.)- এর প্রতি তাঁদের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য ব্যক্ত করেন। কিন্তু আমীর মহানবী (সা.)- এর সামনে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবীকে অনবরত বলছিল : “নির্জনে আপনার সাথে আমাকে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে।” এ কথা বলার পর সে আরবাদের দিকে তাকায়। কিন্তু সে যতই তার চেহারার দিকে তাকাচ্ছিল, ততই সে তাকে শান্ত দেখতে পাচ্ছিল। মহানবী (সা.) তাকে বললেন, সে যতক্ষণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা (নির্জনে আলোচনা) সম্ভব হবে না। যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, তা আরবাদের পক্ষ থেকে বাস্তবায়িত হবার ব্যাপারে অবশেষে আমীর নিরাশ হয়ে গেল। আরবাদ যখনই তরবারি হাতে নিয়ে মহানবী (সা.)- কে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছিল, ঠিক তখনই যেন মহানবীর মহান ব্যক্তিত্ব, গাম্ভীর্য ও মর্যাদাজনিত ভীতি তাকে তার ইচ্ছা বাস্তবায়ন থেকে বিরত রাখছিল। আলোচনার শেষে আমীর তার স্থান থেকে উঠে দাঁড়ালো এবং মহানবীর বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রদর্শন করে বলল : “আমি আপনার বিরুদ্ধে অশ্ব ও সৈন্য দিয়ে মদীনা নগরী ভরে ফেলব।” মহানবী যে বিশেষ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অধিকারী ছিলেন, সে কারণে তার কথার উত্তর দিলেন না এবং মহান আল্লাহর কাছে এ দু’ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। তাঁর দু’আয় সাড়া দান করা হলো। আমীর পশ্চিমধ্যে গ রোগে আক্রান্ত হয়ে বনী সালুল গোত্রের এক মহিলার ঘরে শোচনীয় অবস্থায় প্রাণত্যাগ করে এবং আরবাদও মরু-

প্রান্তরে বজ্রপাতে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। মহানবীর শত্রুদের ভাগ্যে যে এ দুই অপ্ৰীতিকর ঘটনা ঘটেছিল, সে কারণে বনী আমের গোত্রের লোকদের অন্তরে ঈমানের বন্ধন মজবুত হয়েছিল।^{৫০০}

ইয়েমেনে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)

হিজায়ের অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণ এবং আরব গোত্র লোর পক্ষ থেকে মহানবী (সা.) যে নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়েছিলেন, সে কারণে হিজায়ের প্রতিবেশী দেশ লোয় ইসলাম ধর্মের শক্তি ও ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত করার সুবর্ণ সুযোগ এসে যায়। মহানবী প্রথম বারের মতো তাঁর এক জ্ঞানী সাহাবী হযরত মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়েমেনের অধিবাসীদের কাছে তাওহীদের আহ্বান এবং ইসলাম ধর্মের নীতিমালা ব্যাখ্যা করার জন্য সে দেশে প্রেরণ করেন। তিনি মুয়াযের প্রতি প্রদত্ত দীর্ঘ নির্দেশমালায় বলেছিলেন :

“ কঠোরতা অবলম্বন থেকে বিরত থাকবে। মুমিনদের জন্য খোদায়ী শুভ সংবাদ জনগণকে প্রদান করবে। ইয়েমেনে আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে। আর তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে : বেহেশতের চাবি কী? তখন তুমি তাদেরকে উত্তর দেবে : মহান আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের স্বীকারোক্তি।”

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ সংক্রান্ত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নের পর্যাণ্ড জবাব মুয়ায দিতে পারেন নি^{৫০১} বিধায় মহানবী (সা.) তাঁর আদর্শের শ্রেষ্ঠ অনুসারী আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- কে ইয়েমেনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন, যাতে তিনি নিরবচ্ছিন্ন প্রচার কার্যক্রম, যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য, দৈহিক ক্ষমতা এবং অতুলনীয় সাহস ও ঔদার্য দ্বারা সে দেশে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে সক্ষম হন।

এছাড়াও খালিদ ইবনে ওয়ালীদ হযরত আলী (আ.)- এর কিছু দিন আগে মহানবী (সা.)- এর পক্ষ থেকে ইয়েমেনে প্রেরিত হয়েছিলেন^{৫০২} যাতে তিনি ইয়েমেনে ইসলাম প্রসারের পথে বিদ্যমান সমস্যা লো নিরসন করেন। কিন্তু তিনিও এ সময়ের মধ্যে কোন কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম হন নি। এ কারণেই মহানবী (সা.) আলী (আ.)- কে ডেকে পাঠান এবং বলেন : “তোমাকে ইয়েমেনে প্রেরণ করব, যাতে তুমি ইয়েমেনবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান কর এবং তাদের কাছে মহান আল্লাহর বিধি- বিধান অর্থাৎ তাঁর হালাল ও হারামের বিধান বর্ণনা কর; আর মদীনায

প্রত্যাবর্তনকালে নাজরানের অধিবাসীদের সম্পদের যাকাত এবং সেখানকার অধিবাসীদের প্রদেয় কর উসূল করে বাইতুল মালে পৌঁছে দেবে।”

হযরত আলী (আ.) মহানবী (সা.)- এর কাছে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আরয করলেন : “আমি একজন যুবক; আমি আমার জীবনে এ পর্যন্ত বিচারকাজ করি নি এবং বিচারকের আসনে বসি নি।” মহানবী তাঁর বুকের উপর হাত রেখে তাঁর ব্যাপারে দুআ করলেন : “হে ইলাহী! আলীর অন্তঃকরণকে হিদায়েত (পরিচালনা) করুন এবং তাঁর জিহ্বাকে লন থেকে হেফাযত করুন।” এরপর তিনি বললেন, “আলী! কারো সাথে যুদ্ধ- বিগ্রহে লিপ্ত হয়ো না। জনগণকে যুক্তি ও সদ্ব্যবহারের দ্বারা সত্য পথে পরিচালিত করো। মহান আল্লাহর শপথ! মহান আল্লাহ যদি তোমার মাধ্যমে কাউকে সত্য পথে পরিচালিত করেন, তা হলে তা যা কিছু উপর সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হয়েছে, সে লোর চেয়ে উত্তম।”

শেষে তিনি হযরত আলীকে উপদেশ প্রদান করলেন :

“ দুআকে নিজের পেশায় (ধ্যান- ধারণা) পরিণত করবে; কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুআয় সাড়া দেয়া হয়। সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। কারণ কৃতজ্ঞতা নেয়ামত বৃদ্ধির কারণ। যদি কারো সাথে বা কোন গোষ্ঠীর সাথে চুক্তি করো, তা হলে সে চুক্তির প্রতি সম্মান করবে এবং ষড়যন্ত্র করা ও জনগণকে ধোঁকা দেয়া থেকে বিরত থাকবে। কারণ অসৎকর্ম সম্পাদনকারীদের ষড়যন্ত্র নিজেদের দিকেই ফিরে আসে।”

হযরত আলী (আ.) ইয়েমেনে অবস্থান কালে অনেক বিস্ময়কর বিচারকাজ সম্পাদন করেছিলেন, যেসবের বিবরণ ইতিহাস ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান।

মহানবী (সা.) এ পরিমাণ দিক- নির্দেশনা প্রদান করেই ক্ষান্ত হন নি, বরং তিনি ইয়েমেনবাসীর উদ্দেশেও একটি পত্র লিখেছিলেন। ঐ পত্রে তিনি ইয়েমেনের অধিবাসীদের তাওহীদী আদর্শের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি পত্রখানা হযরত আলী (আ.)- কে দিয়েছিলেন এবং তাঁকে এ পত্র ইয়েমেনবাসীর উদ্দেশে পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বাররা বিন আযিব, যিনি হযরত আলী (আ.)- এর সাথে সর্বদা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, বলেন : “হযরত আলী (আ.) যখন ইয়েমেনের প্রথম সীমান্ত অঞ্চলে এসে পৌঁছান, তখন খালিদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে যে সব মুসলিম সৈন্য আগে থেকে সেখানে মোতায়ন ছিল, তাদেরকে পুনঃসজ্জিত করে তাদের নিয়ে ফজরের নামায জামাআতে আদায় করেন। এরপর তিনি ইয়েমেনের সর্ববৃহৎ গোত্র বনী হামদানের সবাইকে একত্রিত করে তাদেরকে মহানবী (সা.)- এর বাণী শ্রবণ করার আহ্বান জানান। তিনি মহানবীর বাণী পাঠ করার আগে মহান আল্লাহর প্রশংসা করেন। এরপর তিনি মহানবীর বাণী তাদের পাঠ করে শুনান। সভার ভাবগাম্ভীর্য, ভাষার সৌন্দর্য এবং মহানবী (সা.)- এর বাণীর মহত্ব বনী হামদান গোত্রকে এতটা মোহিত ও প্রভাবিত করেছিল যে, সবাই একদিনের মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) পুরো ঘটনা মহানবী (সা.)- কে পত্রে অবহিত করেন। মহানবীও এ ব্যাপারে অবগত হয়ে এতটা আনন্দিত হন যে, তিনি সিজদা করার জন্য মাটিতে মাথা রেখে মহান আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বলেন : বনী হামদান গোত্রের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। কারণ এ গোত্রের দীন ইসলাম গ্রহণ করার কারণে ধীরে ধীরে ইয়েমেনের সকল অধিবাসী ইসলাম ধর্মে বাইআত হবে।”^{৫০৩}

একষট্টিতম অধ্যায় : দশম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

বিদায় হজ্ব

ইসলামের সামষ্টিক ইবাদতসমূহের মধ্যে হজ্ব বৃহত্তম এবং সবচেয়ে মহতী ও আড়ম্বরপূর্ণ ইবাদত, যা (প্রতি বছর) মুসলমানরা পালন করে থাকেন। কারণ মহতী এ অনুষ্ঠান, যা বছরে একবার পালন করা হয়, আসলে মুসলিম উম্মাহর জন্য ঐক্যের সর্ববৃহৎ বহিঃপ্রকাশ, ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদার মোহ থেকে মুক্ত হবার পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন, মানব জাতির সাম্যের বাস্তব নমুনা এবং মুসলমানদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক দৃঢ়ীকরণের মাধ্যম...। এখন আমরা মুসলমানরা যদি বিস্তৃত এ ইলাহী দস্তুরখান অর্থাৎ হজ্ব অনুষ্ঠান থেকে স্বল্প লাভ গ্রহণ করি এবং বার্ষিক এই ইসলামী মহাসমাবেশ- যা আসলেই আমাদের অনেক সামাজিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে এবং আমাদের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আনার উৎস হতে পারে, - যদি পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করা ছাড়া উদযাপিত হয়, তা হলে তা ইসলামী আইন ও শরীয়তের অপূর্ণাঙ্গতার নির্দেশক তো হবেই না, বরং তা মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের দোষ-ত্রুটি নির্দেশক বলেই গণ্য হবে, যারা এ ধরনের মহতী অনুষ্ঠানের সদ্যবহার করতে অক্ষম।

যেদিন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) পবিত্র কাবার ভিত্তি পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে মহান আল্লাহর বান্দাদেরকে এ ঘর যিয়ারত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেদিন থেকে এ অঞ্চল সকল আন্তিক জাতির অন্তরসমূহের কাবা ও তাওয়াক্বফের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে যায়। প্রতি বছর পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ এ ঘর যিয়ারত করার জন্য ছুটে আসে এবং যে আচার-অনুষ্ঠান হযরত ইবরাহীম (আ.) শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা সম্পন্ন করে।

কিন্তু কালক্রমে মহান নবীগণের নেতৃত্ব-ধারা থেকে হিজাবাসী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কুরাইশদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং সমগ্র আরব বিশ্বের চিন্তাজগতের ওপর প্রতিমা লোর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার কারণে হজ্বের আচার-অনুষ্ঠানও স্থান-কালের দৃষ্টিকোণ থেকে বিকৃত হয়ে যায় এবং সত্যিকার খোদায়ী রূপ হারিয়ে ফেলে।

এ সব কারণেই মহানবী (সা.) হিজরতের দশম বর্ষে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হন যে, তিনি নিজে ঐ বছর হজ্জ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মুসলিম উম্মাহকে ব্যবহারিকভাবে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের সাথে পরিচিত করাবেন এবং উপরিউক্ত কারণসমূহের জন্য এ হজ্জকে কেন্দ্র করে যে সব বিকৃতির উ ব ঘটেছিল, সে লোর মূলোৎপাটন করবেন এবং জনগণকে আরাফাত ও মিনার সীমানা এবং ঐসব স্থান থেকে বের হবার সঠিক সময়ও শিখিয়ে দেবেন।

মহানবী (সা.) ইসলামী বর্ষপঞ্জীর একাদশ মাস অর্থাৎ যিল দ মাসে নির্দেশ জারী করেন, তিনি ঐ বছর মহান আল্লাহর ঘর (কাবা শরীফ) যিয়ারত করতে যাবেন। এ ঘোষণা মুসলমানদের এক বিরীত অংশের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে এবং এর ফলে হাজার হাজার মানুষ মদীনার চারপাশে তাঁর স্থাপন করে মহানবীর হজ্জ যাত্রার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।^{৫০৪}

মহানবী (সা.) ২৬ যিল দে আবু দুজানাকে মদীনায় নিজের স্থলবর্তী নিযুক্ত করে ৬০টি কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে পবিত্র ম ার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান। তিনি যূল হুলাইফায়^{৫০৫} পৌঁছে দু'টি সেলাইবিহীন বস্ত্র পরে 'মসজিদে শাজারাহ' থেকে ইহরাম করেন এবং ইহরাম করার সময় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আহবানে সাড়া দানস্বরূপ প্রসিদ্ধ দুআ, ^{৫০৬} 'লাব্বাইকা' (لَبَّيْكَ)

আবৃত্তি করেন। আর যখনই তিনি কোন বহনকারী পশু (সওয়ারী) দেখতে পেয়েছেন বা উঁচু বা নীচু স্থানে উপনীত হয়েছেন, তখনই তিনি 'লাব্বাইকা' বলেছেন। তিনি পবিত্র ম ার নিকটবর্তী হয়ে 'লাব্বাইকা' উচ্চারণ বন্ধ করে দেন। ৪ যিলহজ্জ তিনি পবিত্র ম া নগরীতে প্রবেশ করেন এবং সরাসরি মসজিদুল হারামের পথ ধরে এগিয়ে যান। তিনি বনী শাইবার ফটক দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। ঐ অবস্থায় তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা করছিলেন এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ওপর দরুদ পাঠাচ্ছিলেন।

তাওয়াফের সময় তিনি হাজারে আসওয়াদের (কালো পাথর) মুখোমুখি হলে প্রথমে একে স্পর্শ করেন^{৫০৭} এবং এর উপর হাত বুলান এবং পবিত্র কাবা সাত বার প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করেন। এরপর তিনি তাওয়াফের নামায আদায়ের জন্য মাকাম-ই ইবরাহীমের পশ্চাতে গিয়ে দু'

রাকাআত নামায আদায় করেন। তিনি নামায সমাপ্ত করে সাফা- মারওয়ান^{৫০৮} মাঝখানে সাঈ শুরু করেন। অতঃপর তিনি হাজীদের উদ্দেশে বলেন :

“ যারা নিজেদের সাথে কুরবানীর পশু আনে নি, তারা ইহরাম ত্যাগ করবে এবং তাকসীর (অর্থাৎ চুল ছাটা বা নখ কাটা) করার মাধ্যমে তাদের জন্য ইহরামকালীন হারাম হয়ে যাওয়া বিষয় লো হালাল হয়ে যাবে। তবে আমি এবং যারা নিজেদের সাথে কুরবানীর পশু এনেছে, তারা অবশ্যই ইহরামের অবস্থায় থাকবে ঐ সময় পর্যন্ত, যখন তাদের কুরবানীর পশু লোকে তারা কুরবানী করবে।”

মহানবী (সা.)- এর এ কথা একদল লোকের কাছে খুব অসহনীয় বলে মনে হয়েছিল। তাদের যুক্তি ছিল : মহানবী (সা.) ইহরামের অবস্থায় থাকবেন, আর আমরা ইহরামমুক্ত থাকব- এ অবস্থাটা আমাদের কাছে কখনই প্রীতিকর লাগবে না।

কখনো কখনো তারা বলছিল : “এটা ঠিক নয় যে, আমরা বাইতুল্লাহ যিয়ারতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব, অথচ আমাদের মাথা ও ঘাড় থেকে গোসলের পানি ঝরতে থাকবে।” ^{৫০৯}

মহানবী (সা.)- এর দৃষ্টি তখনও ইহরামের অবস্থায় থাকা হযরত উমরের উপর পড়ে। তিনি হযরত উমরকে বললেন : “তুমি কি তোমার সাথে কুরবানীর পশু এনেছ?” তিনি জবাবে বললেন : “না।”

মহানবী তাঁকে বললেন : “তা হলে কেন তুমি ইহরামমুক্ত হও নি?” তখন হযরত উমর বললেন : “আমার কাছে এটা প্রীতিকর বোধ হচ্ছে না যে, আমি ইহরামমুক্ত থাকব, আর আপনি ইহরাম অবস্থায় থাকবেন।” মহানবী তাঁকে বললেন : “তুমি কেবল বর্তমানে নয়, বরং সব সময় এ বিশ্বাসের ওপরই থাকবে।”

মহানবী (সা.) জনগণের সন্দেহ ও দ্বিধা দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন :

لو كنت استقبلت من أمرى ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم

“ ভবিষ্যৎ যদি আমার কাছে অতীতের মতো স্পষ্ট হতো এবং তোমাদের দ্বিধা সম্পর্কে আমি জানতাম, তা হলে আমিও তোমাদের মতো কুরবানীর পশু নিজের সাথে না এনে মহান আল্লাহর ঘর যিয়ারত করতে আসতাম। তবে কী করব? কুরবানীর পশু নিজের সাথে নিয়ে এসেছি।

কুরবানীর পশু তার স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত (حتى يبلغ الهدى محله) - মহান আল্লাহর এ বিধান অনুসারে মিনার দিবসে (১০ যিলহজ্ব) কুরবানী দেয়ার স্থানে আমার কুরবানীর পশু যবেহ করা পর্যন্ত আমাকে অবশ্যই ইহরাম অবস্থায় থাকতে হবে। তবে যে ব্যক্তি নিজের সাথে কুরবানীর পশু আনে নি, তাকে অবশ্যই ইহরামমুক্ত হতে হবে এবং সে যা আঞ্জাম দিয়েছে, তা 'উমরাহ' বলে গণ্য হবে এবং পরে হজ্জের জন্য তাকে ইহরাম করতে হবে।” ৫১০

ইয়েমেন থেকে হযরত আলী (আ.)- এর প্রত্যাবর্তন

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) পবিত্র হজ্জে যোগদান করার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)- এর রওয়ানা হবার ব্যাপারে অবগত হলেন এবং তিনিও ৪২টি কুরবানীর পশু এবং নিজ সৈন্যদেরকে সাথে নিয়ে হজ্জে অংশগ্রহণের জন্য (ইয়েমেন থেকে) যাত্রা শুরু করেন। তিনি নাজরানবাসীর কাছ থেকে ইসলামী কর (জিযিয়া) হিসেবে যে সব বস্ত্র উসূল করেছিলেন, সে লোও সাথে নিলেন। হযরত আলী তাঁর অধীন এক সামরিক অফিসারের হাতে সৈন্যদের নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব অর্পণ করে পবিত্র মায়নামীর দিকে যাত্রা করে মহানবী সকাশে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) হযরত আলী (আ.)- কে দেখে খুব খুশী হন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : “তুমি (হজ্জের জন্য) কেমন নিয়ত করেছ?” তিনি জবাবে বলেন : “আমি ইহরাম করার সময় আপনি যে নিয়তে ইহরাম করেছেন, সেই নিয়ত করেছি এবং আমি বলেছি : اللهم إهلالا كإهلال نبيك - হে আল্লাহ! যে নিয়ত করে আপনার নবী ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও সেই নিয়তে ইহরাম বাঁধলাম।”^{৫১} এরপর তিনি কুরবানী করার জন্য যে সব পশু নিজের সাথে এনেছিলেন, মহানবী (সা.)- কে সে লো সম্পর্কে অবহিত করেন। মহানবী (সা.) তখন বললেন : “এ ক্ষেত্রে আমার ও তোমার শরীয়তগত দায়িত্ব একই এবং কুরবানীর পশু লো কুরবানী করা পর্যন্ত আমাদের অবশ্যই ইহরাম অবস্থায় থাকতে হবে।” এরপর মহানবী হযরত আলীকে তাঁর সৈন্যদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে পবিত্র মায়নামী নিয়ে আসার আদেশ দেন।

হযরত আলী (আ.) তাঁর সৈন্যদের কাছে ফিরে গিয়ে দেখতে পেলেন, নাজরানবাসীর কাছ থেকে মুবাহালা দিবসে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে যে সব বস্ত্র উসূল করা হয়েছিল, তা সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে এবং সবাই ঐসব বস্ত্র ইহরামের পোশাক হিসেবে পরিধান করেছে। আলী (আ.)- এর স্থলবর্তী ব্যক্তি তাঁর অনুপস্থিতিতে এ কাজ করায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন : “মহানবী (সা.)- এর হাতে বস্ত্র লো অর্পণ করার আগেই

কেন তুমি সৈন্যদের মধ্যে সে লো বিতরণ করেছ?” তখন সে বলেছিল : “তারা চাপ দিচ্ছিল যেন আমি আমানতস্বরূপ তাদেরকে বস্ত্র লো প্রদান করি এবং হজ্জের পর তাদের কাছ থেকে সে লো ফেরত নিই।” আলী (আ.) তাকে বললেন : “তোমাকে এ ধরনের ক্ষমতা প্রদান করা হয় নি।” অতঃপর তিনি তাদের কাছ থেকে সব বস্ত্র সংগ্রহ করে সে লো গাঁট বেঁধে রেখে দিলেন এবং পবিত্র মায় পৌঁছে তিনি মহানবীর কাছে সে লো হস্তান্তর করলেন।

একদল লোক, যাদের পক্ষে সব সময় ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলা মেনে চলা কষ্টকর ছিল এবং যারা চাইত, সব সময় তাদের ইচ্ছানুসারে সব কিছু হোক, তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে হযরত আলী (আ.) কর্তৃক বস্ত্রসমূহ ফেরত দেয়ার বিষয়কে কেন্দ্র করে নিজেদের অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছিল। মহানবী (সা.) তাঁর একজন সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন অভিযোগকারীদের মাঝে গিয়ে তাঁর পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দেন :

ارفعوا ألسنتكم عن عليّ فإنه خَشِيْتُ في ذاتِ الله غيرِ مداهنٍ في دينه

“ আলীর ব্যাপারে কটুক্তি করা থেকে তোমরা হাত উঠিয়ে নাও। কারণ সে মহান আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে কঠোর ও নির্ভীক এবং ধর্মের ব্যাপারে চাটুকারিতা পছন্দ করে না।”^{৫১২}

হজ্জের আনু ানিকতা শুরু

উমরার আমলসমূহ সমাপ্ত হয়। উমরা ও হজ্জের আমলসমূহ শুরু হওয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সময় কারো কাবায় (মসজিদুল হরাম ও ম া নগরীতে) অবস্থান করার ব্যাপারে মহানবী (সা.) সম্মত ছিলেন না। তাই তিনি ম ার বাইরে তাঁর তাঁবু স্থাপন করার নির্দেশ দিলেন।

৮ যিলহজ্জ বাইতুল্লাহ্ যিয়ারতকারীগণ পবিত্র ম া নগরী থেকে আরাফাতের ময়দানের দিকে যাত্রা শুরু করেন, যাতে তাঁরা ৯ যিলহজ্জ দুপুর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান (উ ফ) করতে পারেন। মহানবী (সা.) তারবীয়ার দিবসে (৮ যিলহজ্জ) মিনার পথে আরাফাতের ময়দানের দিকে যাত্রা করেন এবং ৯ যিলহজ্জের সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি মিনায় অবস্থান করেন। এরপর তিনি নিজ উটের উপর সওয়ার হয়ে আরাফাতের পথে অগ্রসর হন এবং ‘নামিরাহ্’ - এ অবতরণ করেন। উল্লেখ্য, এ স্থানেই মহানবী (সা.)-এর জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল। ঐ

মহতী মহাসমাবেশে মহানবী (সা.) উটের পিঠে আসীন অবস্থায় তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। আর এ ঐতিহাসিক ভাষণই ‘বিদায় হজ্জের ভাষণ’ নামে খ্যাতি লাভ করে।

বিদায় হজ্জে মহানবী (সা.)- এর ঐতিহাসিক ভাষণ

ঐদিন আরাফাতের ময়দানে এক মহতী মর্যাদপূর্ণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। হিজাযের অধিবাসীরা সে দিন পর্যন্ত এমন সমাবেশ কখনো প্রত্যক্ষ করে নি। একত্ববাদের ধ্বনি ও আহ্বান আরাফাতের ময়দানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। এই আরাফাতের ময়দানে মাত্র ক’ দিন আগেও মুশরিক ও পৌত্তলিকদের অবস্থানস্থল ও ঘাঁটি ছিল। এখন চিরতরে তা তাওহীদপন্থী ও মহান এক- অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদতকারীদের মজবুত ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। মহানবী (সা.) আরাফাতের ময়দানে এক লক্ষ মানুষের সাথে যুহর ও আসরের নামায আদায় করেন। এরপর তিনি উটের পিঠে আরোহণ করে ঐ দিন (৯ যিলহজ্ব ১০ হি.) তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও উচ্চকণ্ঠের অধিকারী তাঁর এক সাহাবী তাঁর ভাষণ পুনরাবৃত্তি করে দূরবর্তী লোকদের কর্ণগোচর করেছিলেন।

মহানবী (সা.) এভাবে তাঁর ভাষণ শুরু করেন :

“ হে লোকসকল! তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর। সম্ভবত এরপর তোমাদের সাথে এ স্থানে আমার আর সাক্ষাৎ হবে না। হে লোকসকল! তোমাদের ধন- সম্পদসমূহ ^{৫১৩}, যেদিন তোমরা মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ করবে, সেদিন পর্যন্ত আজকের এ দিন এবং এ মাসের ন্যায় সম্মানিত এবং এ লোর ওপর যে কোন ধরনের আগ্রাসন ও সীমা ল ন হারাম হবে।”

মহানবী (সা.) মুসলমানদের জান-মালের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার ব্যাপারে তাঁর বাণী (জনগণের অন্তরে) বদ্ধমূল হওয়া এবং এর গভীর প্রভাব বিস্তার সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য রবীয়াহ্ ইবনে উমাইয়াকে বললেন : “তাদের কাছে এ কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞেস কর এবং বল, “এটি কোন মাস?” তখন সবাই বলেছিলেন : “এটি হারাম মাস। এ মাসে যুদ্ধ ও রক্তপাত নিষিদ্ধ।” মহানবী (সা.) রবীয়াহ্কে বললেন : “তাদেরকে বল : যেদিন তোমরা এ জগৎ থেকে বিদায় নেবে, সেদিন পর্যন্ত মহান আল্লাহ্ তোমাদের ধন- সম্পদ তোমাদের একে অপরের জন্য হারাম এবং (তোমাদের পরস্পরের নিকট) সম্মানিত করে দিয়েছেন।”

তিনি পুনরায় নির্দেশ দিলেন : “তাদেরকে আবার জিজ্ঞেস কর : এ স্থান কেমন?” তখন সবাই বলেছিলেন : “এ হচ্ছে সম্মানিত স্থান এবং এখানে রক্তপাত ও সীমা ল ন নিষিদ্ধ।” মহানবী (সা.) (রবীয়াহকে) বললেন : “তাদেরকে জানিয়ে দাও, তোমাদের রক্ত (প্রাণ) ও ধন- সম্পদ এ স্থান ও অঞ্চলের মতো সম্মানিত এবং এ লোর ওপর যে কোন ধরনের আগ্রাসন ও সীমা ল ন নিষিদ্ধ।” মহানবী (সা.) পুনরায় আদেশ দিলেন : “তাদেরকে প্রশ্ন কর : আজ কোন্ দিবস?” তাঁরা বললেন : “আজ হজ্ব- ই- আকবার (বড় হজ্জের) দিবস।” তিনি নির্দেশ দিলেন : “তাদেরকে জানিয়ে দাও, আজকের মতো অর্থাৎ এ দিবসের ন্যায় তোমাদের রক্ত এবং ধন- সম্পদ সম্মানিত।”^{৫১৪}

“ হে জনতা! তোমরা জেনে রাখ, জাহিলীয়াতের যুগে যে সব রক্ত ঝরানো হয়েছে, সে লো অবশ্যই ভুলে যেতে হবে এবং সে লোর ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে না। এমনকি ইবনে রবীয়ার (মহানবীর এক আ ীয়) রক্তও (রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়টি) ভুলে যেতে হবে।

তোমরা শীঘ্রই মহান আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। ঐ জগতে তোমাদের ভাল ও মন্দ কাজ লোর বিচার করা হবে। আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি, যার কাছে কোন আমানত থাকে, তার উচিত অবশ্যই তা প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেয়া।

হে জনতা! তোমরা জেনে রাখ, ইসলাম ধর্মে সুদ হারাম। যারা নিজেদের ধন- সম্পদ সুদ অর্জন করার পথে ব্যবহার করে, তারা কেবল তাদের মূলধন ফেরত নিতে পারবে। না তারা অত্যাচার করবে, না তারা অত্যাচারিত হবে। যে লাভ (সুদ) আক্বাস ইসলামের আগে ঋণীদের কাছে তলব করত, তা এখন বাতিল এবং তা তলব করার অধিকার তার নেই।

হে লোকসকল! যেহেতু শয়তান তোমাদের ভূ- খণ্ডে আর পূজিত হবে না, সেহেতু সে এখন নিরাশ হয়ে গেছে। তবে তোমরা যদি ছোট ছোট বিষয়ে শয়তানের অনুসরণ কর, তা হলে সে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাই তোমরা সে শয়তানের অনুসরণ করো না। হারাম মাসসমূহে পরিবর্তন^{৫১৫} আনয়ন চরম পর্যায়ের কুফর, খোদাদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস থেকে উৎসারিত। আর যে সব কাফির ব্যক্তি হারাম মাসসমূহের সাথে অপরিচিত, তারা এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে

পথ ষ্ট হয়। আর এ ধরনের পরিবর্তন আনার ফলে হারাম মাস এক বছর হালাল মাসে এবং অন্য এক বছর তা হারাম মাস হয়ে যাবে। তাদের জানা উচিত, এ ধরনের কাজের দ্বারা তারা মহান আল্লাহর হারাম বিষয়কে হালাল এবং মহান আল্লাহর হালাল বিষয়কে হারাম করে দেয়।

অবশ্যই হালাল ও হারাম মাসসমূহ ঐ দিনের মতো হওয়া বাঞ্ছনীয়, যে দিন মহান আল্লাহ আকাশ, পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্য সৃষ্টি করেছিলেন। মহান আল্লাহর কাছে মাসসমূহের সংখ্যা বারো। এ বারো মাসের মধ্যে চার মাসকে মহান আল্লাহ হারাম করেছেন। এ চার মাস হচ্ছে যিল দ, যিলহজ্ব, মুহররম এবং রজব। যিল দ, যিলহজ্ব ও মুহররম- এ তিন মাস একের পর এক আগমন করে।

হে লোকসকল! তোমাদের ওপর তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার আছে। আর তাদের ওপরও তোমাদের অধিকার আছে। তোমাদের অধিকার হচ্ছে এই যে, তোমাদের অনুমতি ও সম্মতি ব্যতীত তারা (তোমাদের) ঘরে কাউকে বরণ ও আপ্যায়ন করবে না এবং কোন পাপ করবে না। এর অন্যথা হলে মহান আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সাথে এক শয্যায় শয়ন ত্যাগ এবং তাদের শাসন করার অনুমতি দিয়েছেন। আর যদি তারা সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন করে, তা হলে তাদের ওপর তোমাদের স্নেহ ও ভালোবাসার ছায়া প্রসারিত করবে এবং প্রাচুর্য সহকারে তাদের জীবন-যাপনের যাবতীয় উপকরণের আয়োজন করবে।

আমি এ স্থানে তোমাদের নিজ স্ত্রীদের প্রতি কল্যাণ ও সদাচরণের উপদেশ দিচ্ছি। কারণ তারা তোমাদের হাতে মহান আল্লাহর আমানতস্বরূপ এবং মহান আল্লাহর বিধানসমূহের দ্বারা তারা তোমাদের ওপর হালাল হয়েছে।

হে লোকসকল! তোমরা আমার কথা লোয় মনোযোগ দাও এবং এ লোর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা কর। আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা এ উভয়কে আঁকড়ে ধর, তা হলে তোমরা পথ ষ্ট হবে না : একটি মহান আল্লাহর কিতাব (পবিত্র কুরআন) এবং অন্যটি আমার সুন্নাহ (আমার বাণী)।” ৫১৬

১০ যিলহজ্জ মহানবী (মাশআর থেকে) মিনার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন এবং কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানী এবং তাকসীর^{৫১৭} ইত্যাদি সম্পন্ন করে হজ্জের অন্যান্য আচার- অনুষ্ঠান ও কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য পবিত্র মা'কা গমন করেন। আর এভাবে তিনি জনগণকে হজ্জের আচার- অনুষ্ঠান এবং বিধানসমূহ শিক্ষা দেন। কখনো কখনো হাদীসবিদ্যা ও ইতিহাসে মহানবী (সা.)-এর ঐতিহাসিক সফরকে ‘বিদায় হজ্জ’ , কখনো কখনো ‘হজ্জে বালাগ’ (মহান আল্লাহর শাস্বত বাণী পৌঁছে দেয়ার হজ্জ বা প্রচারের হজ্জ) এবং ‘হজ্জে ইসলাম’ (ইসলামের হজ্জ) নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এ সব নামের প্রতিটি এমন সব উপলক্ষের ভিত্তিতে রাখা হয়েছে, যেসবের অন্তর্নিহিত কারণ সূক্ষ্মদর্শী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কাছে কোন গোপনীয় বিষয় নয়। শেষে আমরা এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, হাদীসবিদগণের (মুহাদ্দিস) মধ্যে প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে এই যে, মহানবী (সা.) আরাফাতের দিবসে (৯ যিলহজ্জ) তাঁর এ ভাষণ প্রদান করেছিলেন। তবে কতিপয় মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন, মহানবী (সা.) ১০ যিলহজ্জ এ ভাষণ দিয়েছিলেন।^{৫১৮}

বাস্তবিকতম অধ্যায় : দশম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

ধর্মের পূর্ণতা বিধান

শিয়া আলেমদের দৃষ্টিতে খিলাফত একটি ইলাহী পদ যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে যোগ্য ও সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়। ‘ইমাম’ ও ‘নবী’র মধ্যকার স্পষ্ট পার্থক্যকারী সীমা- পরিসীমা হচ্ছে ‘নবী’ শরীয়তের প্রতিষ্ঠাতা, ওহীর অবতরণস্থল এবং ইলাহী গ্রন্থের ধারক বা আনয়নকারী। ‘ইমাম’ যদিও এ পদমর্যাদাসমূহের একটিরও অধিকারী নন, তবে হুকুমত (প্রশাসন), তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করার পদাধিকারী হওয়া ছাড়াও তিনি (ইমাম) ধর্মের ঐ অংশের ব্যাখ্যাকারী, যা সুযোগ- সুবিধার অভাবে এবং পরিবেশ- পরিস্থিতি প্রতি ল হওয়ার কারণে ‘নবী’ ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করতে সক্ষম হন নি এবং তা বর্ণনা করার দায়িত্ব তাঁর উত্তরাধিকারীদের (ওয়াসী) ওপর অর্পণ করেছেন।

অতএব, শিয়া মাযহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে খলীফা কেবল যুগের শাসনকর্তা এবং ইসলাম ধর্মের সার্বিক বিষয়ের কর্তৃত্বশীল, (শরীয়তের) বিধি- বিধান বাস্তবায়নকারী, অধিকারসমূহ সংরক্ষণকারী এবং ইসলামী রাে র অখণ্ডত্ব, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার রক্ষকই নন; বরং তিনি ধর্ম ও শরীয়তের জটিল ও দুরূহ বিষয়াদির স্পষ্ট ব্যাখ্যাকারী এবং বিধি- বিধানসমূহের ঐ অংশের পূর্ণতাদানকারী, যা বিভিন্ন কারণে ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা প্রদান করেন নি।

তবে আহলে সুন্নাতের আলেমদের দৃষ্টিতে ‘খিলাফত’ একটি গৌণ ও সাধারণ (লৌকিক) পদ এবং এ পদ সৃষ্টির লক্ষ্য মুসলমানদের বাহ্য অস্তিত্ব ও অবস্থা এবং তাদের জাগতিক বিষয়াদির সংরক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। যুগের খলীফা সর্বসাধারণের (মুসলিম জনতার) রায় ও অভিমতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং বিচারকাজ পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হন। আর অন্যান্য বিষয় এবং শরীয়তের ঐসব বিধান, যেসব রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর যুগে সংক্ষিপ্তসারে প্রণয়ন করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তাঁর যুগে বিভিন্ন কারণবশত তা ব্যাখ্যা করতে পারেন নি, সেই সব বিধানের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ মুসলিম আলেমদের সাথে সংশ্লিষ্ট, যাঁরা এ ধরনের সমস্যা ও জটিল বিষয় ইজতিহাদ প্রক্রিয়ায় সমাধান করেন।

এ ধরনের অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে খিলাফতের স্বরূপকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে দু'টি ধারার উৎপত্তি হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহ্ এ কারণে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। আর আজও এ মতভিন্নতা বিদ্যমান।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে 'ইমাম' কতিপয় দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে 'নবী'র সাথে শরীক এবং একই রকম। আর যে সব শর্ত ও অবস্থা নবীর জন্য অপরিহার্য, সেসব ইমামের ক্ষেত্রেও অপরিহার্য। এ সব শর্ত নিম্নরূপ :

১. নবী অবশ্যই মাসূম (নিষ্পাপ) হবেন অর্থাৎ তিনি তাঁর জীবনে কখনো পাপ করবেন না এবং শরীয়তের বিধি-বিধান এবং ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ও বাস্তব তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং জনগণের ধর্ম সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর জবাব দানের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি ও লনের শিকার হবেন না। আর ইমামও অবশ্যই এমনই হবেন এবং উভয় পক্ষের (অর্থাৎ নবী ও ইমামের নিষ্পাপ হবার) দলিল-প্রমাণ এক ও অভিন্ন।

২. নবী অবশ্যই শরীয়ত সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী হবেন এবং ধর্মের কোন বিষয়ই তাঁর কাছে গোপন থাকবে না। আর ইমামও যেহেতু শরীয়তের ঐ অংশের পূর্ণতাদানকারী ও ব্যাখ্যাকারী-যা নবীর ইহজীবনকালে বর্ণনা করা হয়নি, সেহেতু তিনি অবশ্যই ধর্মের যাবতীয় বিধান ও বিষয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জ্ঞানী হবেন।

৩. নবুওয়াত নির্বাচনভিত্তিক পদ নয়; বরং তা হচ্ছে নিয়োগ বা মনোনয়নভিত্তিক। আর মহান আল্লাহ নবীকে অবশ্যই (জনগণের কাছে) পরিচিত করান এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। কারণ একমাত্র মহান আল্লাহই নিষ্পাপ ব্যক্তিকে অনিষ্পাপ ব্যক্তিদের থেকে পৃথক করতে সক্ষম এবং কেবল তিনিই ঐ ব্যক্তিকে চেনেন যিনি খোদায়ী গায়েবী অনুগ্রহ এবং তত্ত্বাবধানে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছেন, যিনি দীন ও শরীয়তের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত।

এ তিন শর্ত যেমনভাবে নবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (অপরিহার্য), ঠিক তেমনি ইমাম ও নবীর স্থলবর্তীর ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

তবে দ্বিতীয় অভিমতের ভিত্তিতে নবুওয়াতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলীর একটিও ইমামের ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়। তাই না নিষ্পাপত্ব (ইসমাত), না ন্যায়পরায়ণতা (আদালত), আর না জ্ঞান (ইলম) অপরিহার্য, আর না শরীয়তের ওপর পূর্ণ দখল, না খোদায়ী নিয়োগ ও মনোনয়ন (অপরিহার্য) শর্ত বলে বিবেচিত, আর না গায়েবী জগতের সাথে সম্পর্ক এ ক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য। বরং এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি (ইমাম বা খলীফা) নিজের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার দ্বারা এবং মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করে ইসলাম ধর্মের সম্মান, মর্যাদা এবং বাহ্য অস্তিত্ব রক্ষা করবেন, শরীয়তের দণ্ডবিধি প্রয়োগ করে ইসলামী রা ও দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করবেন এবং মুসলমানদের জিহাদ করার প্রতি আহ্বান জানানোর মাধ্যমে ইসলামের রাজ্যসীমা সম্প্রসারিত করার প্রয়াস চালাবেন। আসলে ইমামত কি একটি মনোনয়নভিত্তিক পদ, নাকি নির্বাচনভিত্তিক পদ? এটা কি অপরিহার্য ছিল যে, মহানবী (সা.) নিজেই তাঁর উত্তরাধিকারী ও স্থলবর্তী (খলীফা) মনোনীত করবেন বা খলীফা মনোনীত করার দায়িত্ব উম্মতের ওপর ছেড়ে দেবেন?- আমরা এখন বেশ কতক লো সামাজিক মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে এসব প্রশ্নের সমাধান করার চেষ্টা করব এবং আপনারা স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারবেন, সার্বিক পরিবেশ- পরিস্থিতির আলোকে অবধারিত হয়ে গিয়েছিল যে, স্বয়ং মহানবী (সা.) তাঁর ইহজীবনকালে স্থলবর্তী ও উত্তরাধিকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান করবেন এবং তা উম্মাহর নির্বাচন ও মনোনয়নের ওপর ছেড়ে দেবেন না। এখন আমরা এ সংক্রান্ত আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করব।

খলীফা ও উত্তরাধিকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যায়ন

এতে কোন সন্দেহ নেই, ইসলাম বিশ্বজনীন ও সর্বশেষ (এবং চিরকালীন প্রেক্ষিত সহ চূড়ান্ত) দীন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মহানবী (সা.) জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত জনগণকে নেতৃত্বদান ও পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত। আর তাঁর ওফাতের পর নেতৃত্বের পদ অবশ্যই মুসলিম উম্মাহর যোগ্যতম ব্যক্তিদের কাছে অর্পিত হবে।

মহানবী (সা.)- এর পর নেতৃত্বের পদ কি মনোনয়নভিত্তিক, না তা নির্বাচনভিত্তিক পদ- এ ব্যাপারে দু'ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমত প্রচলিত আছে। শিয়ারা বিশ্বাস করে, নেতৃত্বের পদ আসলে মনোনয়নভিত্তিক এবং মহানবী (সা.)- এর স্থলবর্তীকে অবশ্যই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হতে হবে। অথচ আহলে সুন্নাহ বিশ্বাস করে, এ পদ নির্বাচনভিত্তিক এবং অবশ্যই মহানবীর পর উম্মাহ্ এক ব্যক্তিকে ইসলামী রায়ে সার্বিক বিষয় পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করবে। উভয় মাযহাবই নিজ নিজ অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে দলিলসমূহ পেশ করেছে, যেসব আকীদা- বিশ্বাস বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে বিদ্যমান। তবে এখানে যা উত্থাপন করা যেতে পারে, তা হলো মহানবী (সা.)- এর যুগে প্রভাব বিস্তারকারী পরিবেশ- পরিস্থিতির (সঠিক) ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ, যা এ দৃষ্টিভঙ্গিদ্বয়ের যে কোন একটিকে প্রমাণ করবে।

মহানবী (সা.)- এর যুগে ইসলামের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি পর্যালোচনা করলে এ বিষয়টি অবধারিত হয়ে যায় যে, মহান আল্লাহ মহানবী (সা.)- এর খলীফা কেবল মহানবীর মাধ্যমেই নিযুক্ত করবেন। কারণ তখনকার ইসলামী সমাজ এক ত্রিভুজীয় অক্ষশক্তির (রোম, পারস্য ও মুনাফিক চক্রের সমন্বয়ে গঠিত) পক্ষ থেকে সর্বদা যুদ্ধ, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, অশান্তি এবং অনৈক্যের মতো হুমকির সম্মুখীন ছিল। আর একইভাবে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এটি অত্যাবশ্যিক হয়ে যায় যে, মহানবী (সা.) রাজনৈতিক নেতা মনোনয়নের মাধ্যমে সমগ্র উম্মাহকে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে এক কাতারে দাঁড় করাবেন এবং শত্রুর আধিপত্য খর্ব করবেন।

কারণ উম্মাহর অভ্যন্তরীণ অনৈক্য তাদের মাঝে শত্রুর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এ ত্রিভুজীয় অক্ষশক্তির একটি বাহু ছিল রোমান সাম্রাজ্য। এ পরাশক্তি তখন আরব উপদ্বীপের উত্তরে অবস্থান করছিল এবং তা সবসময় মহানবীর চিন্তা-ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এমনকি তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত রোমীয়দের চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারছিলেন না। রোমের খ্রিষ্টীয় সেনাবাহিনীর সাথে মুসলমানদের প্রথম সামরিক সংঘাত হিজরতের অষ্টম বর্ষে ফিলিস্তিনে সংঘটিত হয়েছিল। এ সংঘর্ষে জাফর তাইয়্যার, যাইদ ইবনে হারিসাহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা নামের তিন সেনাপতি শাহাদাত বরণ করেন এবং মুসলিম সেনাবাহিনী পরাজিত হয়।

কুফরী সেনাশক্তির সামনে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদপসরণ কাইসার অর্থাৎ রোমান সম্রাটের সেনাবাহিনীর স্পর্ধার কারণ হয়েছিল এবং যে কোন সময় ইসলামের প্রাণকেন্দ্র (পবিত্র মদীনা নগরী) আক্রান্ত হওয়ার আশংকা বিরাজ করছিল। এ কারণেই মহানবী (সা.) হিজরতের নবম বর্ষে এক বিশাল ও অত্যন্ত ব্যয়বহুল সেনাবাহিনী নিয়ে শামের সীমান্তবর্তী এলাকা লোর দিকে যাত্রা করেন, যাতে তিনি নিজেই সেখানে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে পারেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কষ্টে পরিপূর্ণ এ অভিযানের মাধ্যমে ইসলামী বাহিনী তাদের পুরনো মর্যাদা ফিরে পেয়েছিল এবং নিজেদের রাজনৈতিক জীবনের নবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল।

এ আংশিক বিজয় মহানবী (সা.)-কে সন্তুষ্ট করতে পারে নি এবং তাঁর অসুস্থ হবার কয়েক দিন আগেও তিনি উসামা ইবনে যায়েদের নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনীকে শাম সীমান্তে গমন করে রণাঙ্গনে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

প্রা ক্ত ত্রিভুজীয় শত্রুশক্তির দ্বিতীয় বাহু ছিল পারস্য সাম্রাজ্য (ইরান)। কারণ পারস্য-সম্রাট খসরু প্রচণ্ড আক্রোশ সহকারে মহানবী (সা.)-এর প্রেরিত পত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছিল এবং মহানবীর দূতকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে মহানবী (সা.)-কে বন্দী বা প্রতিরোধ করলে হত্যার নির্দেশ দিয়ে ইয়েমেনের গভর্নরের কাছে চিঠি লিখেছিল।

খসরু পারভেয মহানবীর ইহজীবনকালে মৃত্যুবরণ করে। তবে ইয়েমেন অঞ্চল, যা দীর্ঘকাল পারস্য সাম্রাজ্যের উপনিবেশ ছিল, সেই ইয়েমেনের স্বাধীনতার বিষয়টি পারস্যের সম্রাটদের চিন্তা-ভাবনার বাইরে ছিল না। আর তীব্র অহংকারের কারণে পারস্য সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও শাসকশ্রেণী (আরব উপদ্বীপে) এ ধরনের শক্তির (মহানবীর নেতৃত্বে) অস্তিত্ব মোটেই মেনে নিতে পারছিল না।

তৃতীয় বিপদ ছিল মুনাফিকচক্রের পক্ষ থেকে, যারা সর্বদা ‘পঞ্চম বাহিনী’ হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার অপকর্ম ও (অশুভ) তৎপরতায় লিপ্ত ছিল। এমনকি তারা মহানবীর প্রাণনাশেরও চেষ্টা করেছিল অর্থাৎ তারা তাঁকে তাবুক ও মদীনার সড়কে হত্যা করতে চেয়েছিল। মুনাফিকদের মধ্যকার একটি দল নিজেদের মধ্যে গোপনে বলাবলি করত, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মৃত্যুর সাথে সাথে ইসলামী আন্দোলনেরও পরিসমাপ্তি হবে; আর তখন সবাই প্রশান্তিলাভ করবে।^{৫১৯}

মহানবী (সা.) এর ওফাতের পর আবু সুফিয়ান এক অশুভ পায়তারা করেছিল এবং হযরত আলীর হাতে বাইয়াত করার মাধ্যমে মুসলমানদের দু’দলে বিভক্ত করে পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত করাতে চেয়েছিল যাতে সে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু আলী (আ.) তাঁর বিচক্ষণতার কারণে আবু সুফিয়ানের নোংরা অভিপ্রায়ের কথা জেনে যান বলেই তিনি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন :

“ মহান আল্লাহর শপথ! ফিতনা ছাড়া তোমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। কেবল আজকেই (প্রথম বারের মতো) তুমি ফিতনার অগ্নি প্রজ্বলিত করতে চাচ্ছ না; বরং তুমি (এর আগেও) বারবার অনিষ্ট সাধন করতে চেয়েছ। তুমি জেনে রাখ, তোমার প্রতি আমার কোন প্রয়োজন নেই।”^{৫২০}

মুনাফিকদের ধ্বংসা কক্ষমতা এতটাই ছিল যে, পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মায়দাহ, সূরা আনফাল, সূরা তাওবা, সূরা আনকাবুত, সূরা আহযাব, সূরা হাদীদ, সূরা মুনাফিকীন এবং সূরা হাশরে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে।

গোপনে ওঁৎ পেতে থাকার এসব ক্ষমতাবান শত্রুর উপস্থিতি সত্ত্বেও এটা কি সঠিক হবে যে, মহানবী (সা.) নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজের ধর্মীয়- রাজনৈতিক নেতৃত্বে তাঁর কোন স্থলবর্তী নিযুক্ত করবেন না? সামাজিক মূল্যায়ন ও পর্যালোচনাসমূহ ব্যক্ত করে যে, মহানবী (সা.) অবশ্যই নেতা, প্রধান ও দায়িত্বশীল নিযুক্ত করে তাঁর (ওফাতের) পর সব ধরনের মতবিরোধের পথ রুদ্ধ এবং একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামী ঐক্যের নিশ্চয়তা বিধান করে যাবেন।

কেবল নেতা নিযুক্ত করা ছাড়া ভবিষ্যতে যে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঠেকানো এবং ‘নেতা অবশ্যই আমাদের মধ্য থেকে হবে’ - মহানবীর ওফাতের পর কোন গোষ্ঠীকে এ ধরনের কথা থেকে বিরত রাখা মোটেই সম্ভব ছিল না।

এ সব সামাজিক মূল্যায়ন আমাদেরকে মহানবীর পরে নেতৃত্ব যে মনোয়নভিত্তিক- এ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমতের সঠিক হওয়ার দিকেই পরিচালিত করে। সম্ভবত এ কারণ এবং অন্যান্য কারণেও মহানবী (সা.) বে’সাতের (নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়া) প্রথম দিন লো থেকে তাঁর জীবনের শেষ দিন লো পর্যন্ত তাঁর স্থলবর্তী নিযুক্ত করার বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর রিসালাতের শুরুতে এবং শেষে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে গেছেন।

১. নবুওয়াত ও ইমামত পরস্পর সংযুক্ত

খিলাফত সংক্রান্ত প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির সত্যতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণকারী সামাজিক মূল্যায়নসমূহের অনু লে বিদ্যমান বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক দলিল- প্রমাণ ছাড়াও মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহও শিয়া আলেমগণের দৃষ্টিভঙ্গির সত্যায়ন করে। মহানবী (সা.) তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালনকালে তাঁর উত্তরসূরি নিযুক্ত করার কথা বারবার ঘোষণা করেছেন এবং এভাবে তিনি ইমামত অর্থাৎ নেতৃত্বকে নির্বাচন তথা সর্বসাধারণের রায় ও অভিমতের মুখাপেক্ষী হওয়ার গণ্ডি থেকে বের করে এনেছেন।

মহানবী (সা.) কেবল তাঁর জীবনের শেষভাগে তাঁর উত্তরসূরি নিযুক্ত করেন নি; বরং রিসালাতের সূচনায় যখন মাত্র কয়েক শ’ লোক ছাড়া আপামর জনতা তাঁর প্রতি ঈমান আনে নি, সে

মুহূর্তেও তিনি জনগণের সামনে তাঁর ওয়াসী (নির্বাহী ও ওসিয়ত বাস্তবায়নকারী) ও উত্তরসূরিকে পরিচিত করিয়েছিলেন।

একদিন মহানবী (সা.) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নিকটায়ীদের (বনী হাশিম) মহান আল্লাহর আযাব থেকে সতর্ক করা এবং সাধারণ মানুষের প্রতি আহবান জানানোর পূর্বে তাদের তাওহীদী ধর্মের দিকে আহবান জানানোর জন্য আদিষ্ট হলেন। তিনি বনী হাশিমের ৪৫ জন নেতার উপস্থিতিতে আয়োজিত সভায় বলেছিলেন : “আপনাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করবে, সে আপনাদের মাঝে আমার ভাই, ওয়াসী এবং স্থলবর্তী হবে।” হযরত আলী (আ.) তাঁদের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর রিসালাতের স্বীকৃতি দিলে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিলেন : “এ যুবকই আমার ভাই, ওয়াসী এবং স্থলবর্তী (খলীফা)।”^{৫২১}

এ হাদীসই মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণের কাছে ‘হাদীসু ইয়াওমিদ দার’ (বাড়িতে আয়োজনকৃত সমাবেশ- দিবসের হাদীস) বা ‘হাদীসু বিদ ইদ দাওয়াহ’ (প্রচার কার্যক্রম শুরুর হাদীস) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

মহানবী (সা.) শুধু রিসালাতের সূচনায়ই নয়; বরং বিভিন্ন উপলক্ষে- কি সফরে, কি নিজ এলাকায় অবস্থান কালে হযরত আলী (আ.)-এর বেলায়েত (নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব) এবং স্থলবর্তী ও খলীফা হবার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। তবে এসবের মধ্যে কোনটিই মর্যাদা, তাৎপর্য, স্পষ্টতা, অকাট্যতা এবং সর্বজনীনতার দিক থেকে ‘হাদীসে গাদীরে খুম’ -এর (গাদীরে খুমের হাদীস) সমপর্যায়ের নয়।

২. গাদীরের মহা ঘটনা

হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলো। মুসলমানরা মহানবীর কাছ থেকে হজ্জের আমলসমূহ শিখে নেন। এ সময় মহানবী সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি পবিত্র মদীনার উদ্দেশে পবিত্র ম ১ ত্যাগ করবেন। মদীনা অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দেয়া হলো। কাফেলাসমূহ জুহফার তিন মাইলের মধ্যে অবস্থিত ‘রাবুঘ’ নামক স্থানে পৌঁছলে ওহীর ফেরেশতা হযরত জিবরীল আমীন (আ.) ‘গাদীরে খুম’ নামক স্থানে অবতরণ এবং নিয়োক্ত আয়াত দিয়ে মহানবী (সা.)- কে সম্বোধন করেন,

(بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ)

“ আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার করুন; আর যদি আপনি তা না করেন, তা হলে আপনি তাঁর রিসালতই (যেন) প্রচার করেন নি এবং মহান আল্লাহ আপনাকে জনগণের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন।” (সূরা মায়দাহ : ৬৭)

এ আয়াতের বাচনভঙ্গি থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, মহান আল্লাহ একটি অতি রুত্বপূর্ণ বিষয় মহানবী (সা.)- এর যিম্মায় অর্পণ করেছেন। লক্ষ মানুষের চোখের সামনে মহানবী (সা.) কর্তৃক আলী (আ.)- কে খিলাফত ও উত্তরাধিকারীর পদে নিযুক্ত করার ঘটনার চেয়ে কোন বিষয় অধিক রুত্বপূর্ণ হতে পারে? এ দৃষ্টিকোণ থেকেই যাত্রা বিরতির নির্দেশ প্রদান করা হলো। যাঁরা কাফেলার সম্মুখভাগে ছিলেন, তাঁদের থামানো হলো এবং যাঁরা কাফেলার পেছনে ছিলেন, তাঁরা এসে তাঁদের সাথে মিলিত হলেন। সেদিন দুপুর বেলা তীব্র গরম পড়েছিল। জনতা তাদের বহিরাবরণের একটি অংশ মাথার উপর এবং আরেকটি অংশ পায়ের নিচে রেখেছিল। যে চাদর গাছের উপর ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিল, তা দিয়ে মহানবী (সা.)- এর জন্য একটি শামিয়ানা তৈরি করা হলো। মহানবী জামাআতে যুহরের নামায আদায় করলেন। এরপর জনতা তাঁর চারপাশে সমবেত হলে তিনি একটি উঁচু জায়গার উপর গিয়ে দাঁড়ালেন যা উটের হাওদা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ভাষণ দিলেন।

গাদীরে খুমে মহানবী (সা.)- এর ভাষণ

মহান আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। তাঁর কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি এবং আমাদের যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে তাঁর কাছে আমরা আশ্রয় নিচ্ছি। তাঁর ওপর ভরসা করি। তিনি ছাড়া আর কোন পথপ্রদর্শক নেই। তিনি যাকে হিদায়েত করেন, তাকে কেউ পথ ষ্ট করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ (রাসূল)।

হে লোকসকল! অতি শীঘ্রই আমি মহান আল্লাহর আহবানে সাড়া দেব এবং তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেব। আমিও দায়িত্বশীল, তোমরাও দায়িত্বশীল (আমাকেও জবাবদিহি করতে হবে এবং তোমাদেরও জবাবদিহি করতে হবে)। তোমরা আমার ব্যাপারে কী চিন্তা কর? এ সময় উপস্থিত জনতা সত্যায়ন করে সাড়া দিলেন এবং বললেন : “আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং চেষ্টা করেছেন। মহান আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করুন।”

মহানবী (সা.) বললেন : “তোমরা কি সাক্ষ্য দেবে যে, বিশ্ব- জগতের মাবুদ এক- অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল; পরকালে বেহেশত, দোযখ এবং চিরস্থায়ী জীবনের ব্যাপারে কোন দ্বিধা ও সন্দেহ নেই?” তখন সবাই বললেন : “এসব সত্য এবং আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।”

অতঃপর তিনি বললেন : “হে লোকসকল! আমি দু’টি মূল্যবান জিনিস তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি। আমরা দেখব, তোমরা আমার রেখে যাওয়া এ দু’টি স্মৃতিচিহ্নের সাথে কেমন আচরণ করছ?” ঐ সময় একজন দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন : “এ দুই মূল্যবান জিনিস কী?” মহানবী বললেন : “একটি মহান আল্লাহর কিতাব (পবিত্র কুরআন), যার এক প্রান্ত মহান আল্লাহর হাতে এবং অপর প্রান্ত তোমাদের হাতে আছে এবং অপরটি আমার বংশধর (আহলে বাইত)। মহান আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন, এ দুই স্মৃতিচিহ্ন কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না।

হে লোকসকল! পবিত্র কুরআন ও আমার বংশধর থেকে অগ্রগামী হয়ো না এবং কার্যত এতদুভয়ের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করো না; এর অন্যথা করলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।”

এ সময় মহানবী (সা.) আলী (আ.)- এর হাত ধরে এতটা উঁচু করলেন যে, তাঁদের উভয়ের বগলদেশ জনতার সামনে স্পষ্ট দেখা গেল এবং তিনি আলী (আ.)- কে উপস্থিত জনতার কাছে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন : “মুমিনদের চেয়ে তাদের নিজেদের ওপর কে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত?” তখন সবাই বললেন : “মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।” মহানবী তখন বললেন : “মহান আল্লাহ আমার মাওলা এবং আমি মুমিনদের মাওলা; আর আমি তাদের নিজেদের ওপর তাদের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন। সুতরাং হে লোকসকল! আমি যার মাওলা, এই আলীও তার মাওলা।^{৫২২} হে আল্লাহ! যে তাকে সমর্থন করবে তাকে তুমিও সমর্থন কর; যে তার সাথে শত্রুতা করবে, তার সাথে তুমিও শত্রুতা কর; যে তাকে ভালোবাসবে, তাকে তুমিও ভালোবাস; যে তাকে ঘৃণা করবে, তাকে তুমিও ঘৃণা কর; যে তাকে সাহায্য করবে, তাকে তুমিও সাহায্য কর এবং যে তাকে সাহায্য থেকে বিরত থাকবে, তাকে তুমিও সাহায্য থেকে বিরত থাক এবং সে যedিকে ঘোরে, সত্যকেও তার সাথে sedিকে ঘুরিয়ে দাও।”

من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و أحبّ من أحبّه و أبغض من أبغضه و انصر من نصره و اخذل من خذله و أدر الحقّ معه حيث دار

গাদীরে খুমের মহা ঘটনার চির ায়িত্ব

মহান আল্লাহর পরম বিজ্ঞ ইচ্ছা এটাই যে, গাদীরে খুমের ঐতিহাসিক এ মহাঘটনা সর্বকাল ও সর্বযুগে এক জীবন্ত ইতিহাস রূপে বিদ্যমান থাকবে যা সবসময় মানুষের হৃদয়কে আকৃষ্ট করতে থাকবে। মুসলিম লেখক ও গ্রন্থ রচয়িতাগণ সব যুগে ও সব সময় তাঁদের প্রণীত তাফসীর, ইতিহাস, হাদীস ও কালামবিদ্যার গ্রন্থসমূহে এ ব্যাপারে আলোচনা রাখবেন এবং একে ইমাম আলী (আ.)- এর অন্যতম অনস্বীকার্য ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব বলে গণ্য করবেন। কেবল বক্তারাই নন; বরং কবি, আর্ন্তিকার ও প্রশংসাগীতিকারীরাও এ মহা ঘটনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এ

প্রসঙ্গে গভীর চিন্তা- ভাবনা করবেন এবং মহান ওয়ালী অর্থাৎ মাওলার প্রতি অধিক ভক্তি ও নিষ্ঠা পোষণ করার মাধ্যমে তাঁদের সাহিত্যিক প্রতিভা ও অভিরুচিকে বিকশিত করবেন এবং বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন আঙ্গিকে সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম রচনা করবেন।

এ কারণেই পৃথিবীতে গাদীরে খুমের এ মহাঘটনার সমপর্যায়ের খুব কম ঐতিহাসিক ঘটনাই মুহাদ্দিস, মুফাসসির, কালামবিদ, দার্শনিক, বক্তা, কবি, ঐতিহাসিক ও জীবনচরিত রচয়িতাগণের মতো বিভিন্ন শ্রেণীর মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং এ ব্যাপারে এতটা আগ্রহ, মনোযোগ ও রুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

এ মহা ঘটনার চিরস্থায়ী ও অবিস্মরণীয় হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, এ ঘটনা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের দু'খানা আয়াত^{৫২৩} অবতীর্ণ হওয়া। তাই যতদিন পবিত্র কুরআন থাকবে, সে পর্যন্ত এ ঐতিহাসিক ঘটনাও স্থায়ী থাকবে এবং মানুষের স্মৃতিপট থেকে তা কখনো মুছে যাবে না।

যেহেতু প্রাচীন কালের মুসলিম সমাজ এবং এখনও শিয়া মুসলিম সমাজ এ ঘটনাকে অন্যতম ধর্মীয় উৎসব হিসেবে গণ্য করে এবং যে অনুষ্ঠানমালা অন্যান্য ইসলামী উৎসবে পালন করা হয়, এ দিবসেও (গাদীরে খুম দিবস অর্থাৎ ১৮ যিলহজ্ব) সেসব পালন করা হয়, সেহেতু স্বভাবতই গাদীরে খুমের ঐতিহাসিক ঘটনা চিরস্থায়িত্ব লাভ করেছে এবং তা কখনোই মানুষের স্মৃতিপট থেকে মুছে যাবে না।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে খুব ভালোভাবে জানা যায়, ১৮ যিলহজ্ব মুসলমানদের মধ্যে 'ঈদে গাদীর (গাদীর উৎসব) দিবস' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কারণ ইবনে খাল্লিকান আল মুস্তালী ইবনে আল মুস্তানসির সম্পর্কে বলেছেন : "৪৮৭ সালে ঈদে গাদীরে খুম দিবসে অর্থাৎ যা হচ্ছে ১৮ যিলহজ্ব, সেই দিনে জনগণ তাঁর (আল মুস্তালীর) হাতে বাইয়াত করে।"^{৫২৪}

তিনি আল মুস্তানসির বিল্লাহ আল উবাইদী সম্পর্কে লিখেছেন : "তিনি ৪৮৭ হিজরীর যিলহজ্ব মাসের ১২ রাত অবশিষ্ট থাকতেই মৃত্যুবরণ করেন। আর এ রাতই ১৮ যিলহজ্ব অর্থাৎ ঈদে গাদীরের রাত।"^{৫২৫}

আবু রাইহান আল বীরুনী ‘আল আসার আল বাকীয়াহ’ (চিরস্থায়ী নিদর্শনসমূহ) গ্রন্থে মুসলমানরা যে সব ঈদ উদযাপন করতেন , ঈদে গাদীরকে সে সব ঈদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন।^{৫২৬}

কেবল ইবনে খাল্লিকান ও আবু রাইহান আল বিরুনীই এ দিনকে (১৮ যিলহজ্ব) ‘ঈদ’ বলে অভিহিত করেন নি বরং সায়ালেবীও এ রাতকে মুসলিম উম্মাহর মাঝে যে সব রজনী প্রসিদ্ধ, সেসবের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন।^{৫২৭}

এই ইসলামী উৎসবের মূল আসলে গাদীর দিবসের মধ্যেই প্রোথিত রয়েছে। কারণ সেদিন মহানবী (সা.) সকল মুহাজির ও আনসার, এমনকি তাঁর স্ত্রীগণকেও নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা যেন আলী (আ.)- এর কাছে গমন করে তাঁকে এ মহান মর্যাদার জন্য অভিনন্দন জানান।

যাইদ ইবনে আরকাম বলেন : “মুহাজিরগণের মধ্য থেকে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত তালহা এবং হযরত যুবাইর সর্বপ্রথম হযরত আলীর হাতে বাইয়াত করেন। আর অভিনন্দন এবং বাইয়াত অনুষ্ঠান সূর্যাস্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।”

এ মহা ঘটনার অবিস্মরণীয়তার অন্যান্য দলিল

এ ঐতিহাসিক ঘটনার রুত্ব তুলে ধরার ক্ষেত্রে এতটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, এ মহান ঐতিহাসিক ঘটনা মহানবী (সা.)-এর ১১০ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এ কথার অর্থ এটা নয় যে, অগণিত মানুষের মধ্য থেকে কেবল এ কয়েক ব্যক্তিত্ব এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বরং কেবল আহলে সুন্নাতের আলেমগণের গ্রন্থাদিতেই ১১০ জন রাবীর (বর্ণনাকারী) নাম পরিলক্ষিত হয়। এটা ঠিক, মহানবী (সা.) লক্ষ মানুষের সমাবেশস্থলে এ কথাসমূহ বলেছিলেন, তবে তাদের মধ্যকার এক বিরাট অংশ হিজায়ের দূরবর্তী এলাকা ও প্রত্যন্ত অঞ্চল লোর অধিবাসী ছিল, যাদের থেকে এ সংক্রান্ত কোন হাদীসই বর্ণিত হয় নি। তবে সেখানে উপস্থিত জনতার আরেকটি অংশ এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইতিহাসে তাঁদের সবার নাম লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় নি। আর লিপিবদ্ধ হয়ে থাকলেও তা হয় তো আমাদের হাতে পৌঁছায় নি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকে অর্থাৎ তাবেয়ীগণের যুগেও ৮৯ জন তাবেয়ী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী শতকসমূহে হাদীসে গাদীরের রাবীগণ সবাই আহলে সুন্নাতের আলেম। তাঁদের মধ্য থেকে ৩৬০ জন এ হাদীস তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন ও উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের অনেকেই এ প্রসঙ্গে বর্ণিত অনেক হাদীসের বিশুদ্ধতা ও সঠিক (সহীহ) হবার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

হিজরী তৃতীয় শতকে ৯২ জন আলেম, চতুর্থ শতকে ৪৩ জন, পঞ্চম শতকে ২৪ জন, ষষ্ঠ শতকে ২০ জন, সপ্তম শতকে ২১ জন, অষ্টম শতকে ১৮ জন, নবম শতকে ১৬ জন, দশম শতকে ১৪ জন, একাদশ শতকে ১২ জন, দ্বাদশ শতকে ১৩ জন, ত্রয়োদশ শতকে ১২ জন এবং চতুর্দশ শতকে ২০ জন আলেম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

একদল আলেম কেবল এ হাদীস বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হন নি; বরং এ হাদীসের সনদ এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়েও স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন।

প্রখ্যাত ইসলামী ঐতিহাসিক তাবারী ‘আল ওয়ালায়াহ ফী তুরুকি হাদীসিল গাদীর’ নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এ হাদীস মহানবী (সা.) থেকে ৭২টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে উকদাহ্ কুফী ‘বেলায়েত’ নামক সন্দর্ভে এ হাদীস ১০৫ জন রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে উমর বাগদাদী (যিনি ‘জামআনী’ নামে বিখ্যাত) এ হাদীস ২৫টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসবিদ্যার দিকপালদের মধ্য থেকে-

আহমাদ ইবনে হাম্মাল শাইবানী এ হাদীস ৪০টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে হাজার আসকালানী এ হাদীস ২৫টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

জায়ারী শাফেঈ এ হাদীস ২৫টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আবু সাঈদ সুজিস্তানী এ হাদীস ১২০টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আমীর মুহাম্মদ ইয়েমেনী এ হাদীস ৪০টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

নাসাঈ এ হাদীস ২৫০টি সনদ- সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আবুল আলা হামাদানী এ হাদীস ১০০টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আবুল ইরফান হিব্বান এ হাদীস ৩০টি সনদ- সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

যেসব ব্যক্তি এ মহান ঐতিহাসিক ঘটনার বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্রান্ত বই- পুস্তক রচনা করেছেন, তাঁদের সংখ্যা ২৬ এবং সম্ভবত আরো অনেকেই আছেন, যাঁরা এ মহা ঘটনা সম্পর্কে প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন, যাঁদের নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা হয় নি।^{৫২৮}

শিয়া আলেমগণ, বিশেষ করে এ ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে বেশ কিছুসংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে ঐতিহাসিক ‘আল গাদীর’ গ্রন্থ সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ, যা বিখ্যাত ইসলামী লেখক আল্লামা মুজাহিদ মরহুম আয়াতুল্লাহ্ আমীনী রচিত।

তখন তিনি বললেন : “হে লোকসকল! এখন ওহীর ফেরেশতা এ আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন :

(اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً)

- আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।” (সূরা মায়েরা : ৩)

এ সময় মহানবীর তাকবীর- ধ্বনি উচ্চকিত হলো। অতঃপর তিনি বললেন : “মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তিনি তাঁর দ্বীনকে পূর্ণতা প্রদান করেছেন এবং তাঁর নেয়ামত চূড়ান্ত করেছেন এবং আমার পর আলীর ওয়াসায়াত এবং বেলায়েতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন।” এরপর মহানবী উঁচু স্থান থেকে নিচে নেমে এসে হযরত আলীকে একটি তাঁবুর নিচে বসার জন্য বললেন, যাতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও রুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ তাঁর সাথে মুসাফাহা করে তাঁকে অভিনন্দন জানান।

সবার আগে শাইখাইন (হযরত আবু বকর ও হযরত উমর) হযরত আলীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং শুভেচ্ছা জানান এবং তাঁকে তাঁদের ‘মাওলা’ (নেতা) বলে অভিহিত করেন। হাসসান ইবনে সাবিত এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মহানবীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে (তৎক্ষণাৎ) একটি কবিতা রচনা করেন এবং তা মহানবীর সামনে আবৃত্তি করেন। আমরা এখানে এ কবিতার মাত্র দু’টি পঙ্ক্তির উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

فقال له: قم يا عليّ، فإنّي رضيتك من بعدى إماماً و هادياً
فمن كنت مولاه فهذا وليّهُ فكونوا له أتباع صدق موالياً

“ অতঃপর তিনি তাঁকে বললেন : হে আলী! উঠে দাঁড়াও।

কারণ আমি তোমাকে আমার পরে ইমাম (নেতা) ও পথপ্রদর্শক মনোনীত করেছি।

অতএব, আমি যার মাওলা (অভিভাবক ও কর্তৃপক্ষ), সেও তার ওয়ালী।

তাই তোমরা সবাই তার সত্যিকার সমর্থক ও অনুসারী হয়ে যাও।”

এ হাদীস সকল যুগে ও সবসময় মহানবী (সা.)- এর সকল সাহাবীর ওপর হযরত আলীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার সবচেয়ে বড় দলিল। এমনকি আমীরুল মুমিনীন আলী দ্বিতীয় খলীফার ইন্তেকালের পর নতুন খলীফা নিযুক্তকারী পরামর্শ সভার অধিবেশনে, হযরত উসমানের খিলাফতকালে এবং তাঁর নিজের খিলাফতকালে এ হাদীসের দ্বারা খিলাফত সংক্রান্ত তাঁর দাবী উত্থাপন এবং এ

সংক্রান্ত যুক্তি পেশ করেছিলেন। এছাড়াও বড় বড় মুসলিম মনীষী, হযরত আলীর রিরোধী ও খিলাফত সংক্রান্ত তাঁর অধিকার অস্বীকারকারীদের বিপক্ষে এ হাদীসের মাধ্যমে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন।

তেষাট্টিতম অধ্যায় : দশম হিজরীর ঘটনাগ্রবাহ

নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার এবং রোমানদের ব্যাপারে চিন্তা- ভাবনা

গাদীরে খুমে উত্তরসূরি ও স্থলবর্তী নিযুক্ত করার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবার পর শাম ও মিশরের যে সব অধিবাসী বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ করেছিল, তারা সবাই ‘জুহফাহ’ এলাকায় মহানবীর কাছ থেকে পৃথক হয়ে নিজ নিজ দেশের অভিমুখে যাত্রা শুরু করে।

যে সব লোক হাদ্রামাউত ও ইয়েমেন থেকে এসেছিল, তারাও এ অঞ্চল বা এ অঞ্চলের আগে একটি স্থানে মহানবীর হজ্জ কাফেলা থেকে বিদায় নিয়ে নিজ দেশের অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। তবে মদীনা নগরী থেকে দশ হাজার লোকের যে দলটি মহানবীর সাথে এসেছিল, তাঁদের সবাই তাঁর সাথে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন। হিজরতের দশম বর্ষ সমাপ্ত হবার আগেই তাঁরা পবিত্র মদীনা নগরীতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলাম ধর্মের প্রসার হওয়ায় এবং হিজায়ের সকল অঞ্চল থেকে শিরক ও মূর্তিপূজার প্রভাব নিশ্চিহ্ন করায় ইসলামের প্রভাব ও প্রসারের পথে বিদ্যমান সকল বাধা অপসারিত হয়েছিল এবং জনগণ তাওহীদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল, সেহেতু মহানবী (সা.) ও মুসলমানগণ সন্তুষ্ট ও খুশী হয়েছিলেন।

তখনও যিলহজ্জ মাস শেষ হয়নি; সে সময় ইয়ামামা থেকে দু’ব্যক্তি মদীনায় এসে মুসাইলিমার পক্ষ থেকে একটি পত্র মহানবী (সা.)-এর কাছে হস্তান্তর করে। উল্লেখ্য, এই মুসাইলিমা পরবর্তীকালে ‘মিথ্যাবাদী’ মুসাইলিমা (مسيلة الكذاب) নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।

মহানবী (সা.)-এর একজন সচিব এ পত্র খুলে তা মহানবীকে পাঠ করে শুনান। পত্র পড়ে বোঝা গেল, ইয়ামামা অঞ্চলে মুসাইলিমা নামের এক ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করেছে এবং সে নিজেকে মহানবীর অংশীদার বলে গণ্য করে। আর এ পত্র প্রদানের মাধ্যমে সে তার অবস্থা ও নবুওয়াতের পদে তার অংশীদারিত্বের কথা মহানবীকে জানাতে চেয়েছে।

মুসাইলিমার পত্রের মূল পাঠ জীবনচরিত ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে রয়েছে। পত্রের বাক্য গঠন পদ্ধতি থেকে বোঝা যায়, এ পত্রের লেখক পবিত্র কুরআনের বাচনভঙ্গি ও পদ্ধতির অনুকরণ করতে চেয়েছে। তবে এ অনুকরণ প্রচেষ্টা তার পত্রকে এতটা অন্তঃসারশূন্য করেছে যে, এর চেয়ে তার সাধারণ বক্তৃতা লোও অনেক ভালো।

সে তার পত্রে মহানবী (সা.)- এর কাছে লিখেছিল^{৫২০} :

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَدْ أَشْرَكْتُ فِي الْأَمْرِ مَعَكَ وَ أَنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ وَ لِقَرِيْشٍ نِصْفَ الْأَرْضِ وَ لَكِنَّ قَرِيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُونَ
 “ অতঃপর নবুওয়াতের ব্যাপারে আমাকে তোমার শরীক করা হয়েছে। পৃথিবীর অর্ধেকাংশ আমাদের এবং বাকী অর্ধেকটা কুরাইশদের। তবে কুরাইশ গোত্র আসলেই সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় (অর্থাৎ তারা ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করে না)।

মহানবী (সা.) পত্রের বিষয়বস্তু অবগত হবার পর যারা ঐ পত্র এনেছিল, তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : “যদি তোমরা দূত না হতে, তা হলে তোমাদেরকে হত্যা করার আদেশ দিতাম। কারণ তোমরা অতীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলে এবং তাওহীদবাদ ও আমার রিসালত মেনে নিয়েছিলে। কেন এবং কোন্ যুক্তিতে তোমরা এ ধরনের বিচার-বুদ্ধিহীন ব্যক্তির অনুসরণ করে পবিত্র ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছ?”

মহানবী (সা.) তাঁর সচিবকে ডেকে একটি ছোট অথচ তাৎপর্যমণ্ডিত ও কড়া পত্র মুসাইলিমার উদ্দেশে লিখান। পত্রের পাঠ :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مَسِيْلِمَةَ الْكَذَّابِ السَّلَامِ عَلِيٍّ مِنْ أَتْبَعِ الْهَدْيِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَرْضَ
 اللَّهُ يُوْرثُهَا مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

“ পরম করুণাময় ও চিরদয়ালু আল্লাহর নামে। মহান আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মিথ্যাবাদী মুসাইলিমার প্রতি। যারা হিদায়াতের পথ অনুসরণ করে, তাদের ওপর সালাম। অতঃপর (জেনে রাখ) সমগ্র পৃথিবী মহান আল্লাহর। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে এ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। আর খোদাভীরু বান্দাদের জন্য রয়েছে চূড়ান্ত পরিণতি।” ^{৫৩০}

মুসাইলিমার সংক্ষিপ্ত জীবনী

মুসাইলিমা ঐসব ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত, যারা হিজরতের দশম বর্ষে পবিত্র মদীনা নগরীতে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তবে সে তার জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে নবুওয়াতের দাবী করে এবং একদল সরলমনা এবং কখনো কখনো গোঁড়া সাম্প্রদায়িক লোকও তার আহ্বানে সাড়া দেয়। ইয়ামামা অঞ্চলে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব আসলে তার প্রকৃত ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক ছিল না। তবে একদল লোক তাকে মিথ্যাবাদী জেনেও তার চারপাশে সমবেত হয়েছিল। তাদের যুক্তি ছিল : হিজায়ের সত্যবাদীর (রাসূলুল্লাহ) চেয়ে ইয়ামামার মিথ্যাবাদীও (মুসাইলামা) উত্তম! এ কথাটা মুসাইলিমার একজন সমর্থক ঐ সময় বলেছিল, যখন সে মুসাইলিমাকে জিজ্ঞেস করেছিল : “তোমার ওপর কি কোন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন?” তখন সে বলেছিল : “হ্যাঁ, ‘রহমান’ নামের এক ফেরেশতা।” আবার সে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল : “ঐ ফেরেশতা কি আলোতে থাকেন, না অন্ধকারে?” সে জবাবে বলেছিল : “তিনি অন্ধকারে থাকেন।” তখন ঐ লোকটি বলেছিল : “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি মিথ্যাবাদী। তবে ইয়ামামার রবীয়াহ গোত্রের মিথ্যাবাদী হিজায়ের মোযের গোত্রের সত্যবাদী (মহানবী) অপেক্ষা শ্রেয়।”

তবে যে বিষয়টি সন্দেহাতীত, তা হলো এ লোকটি নবুওয়াত দাবী এবং নিজের চারপাশে একটি গোষ্ঠীকে জড়ো করেছিল। তবে এ বিষয়টি কখনো প্রমাণিত হয় নি যে, সে পবিত্র কুরআনের মোকাবেলায় লিপ্ত হয়েছিল। আর যে সব বাক্য ও পঙ্ক্তি ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে পবিত্র কুরআনের মোকাবেলা করার জন্য তার থেকে বর্ণিত হয়েছে, আসলে সে লো মুসাইলিমার মতো বাকপটু ও প্রাজ্ঞলভাষী লোকের উক্তি হতে পারে না। কারণ তার স্বাভাবিক কথা, উক্তি ও বাক্য লো চূড়ান্ত পর্যায়ের দৃঢ়তাসম্পন্ন ও বলিষ্ঠ। তাই বলা যায়, যা কিছু তার নামে বলা হয়েছে ও সম্পর্কিত করা হয়েছে, আসলে তা ঐসব উক্তির তুল্য, যে লো মুসাইলিমার সমসাময়িক আসওয়াদ ইবনে কা’ব আল আনসীর^{৫০১} সাথে সম্পর্কিত বলে প্রচার করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, মুসাইলিমা যখন নবুওয়াত দাবী করেছিল তখন আসওয়াদ ইবনে কা’ব আল আনসীও

ইয়েমেনে নবুওয়াত দাবী করেছিল। তাই অসম্ভব নয় যে, এ সব কিছু বাড়তি অলংকার ও সজ্জাসদৃশ যা বিভিন্ন কারণে তাদের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

কারণ পবিত্র কুরআনের মহত্ত্ব ও অনন্য অনুপম বাচনভঙ্গি ও বাক- অলংকার এতটাই যে, কোন ব্যক্তির পক্ষে তা মোকাবেলা করার সাহস হবে না। আর প্রত্যেক আরব খোদাপ্রদত্ত স্বভাব-প্রকৃতির (ফিতরাত) দ্বারা জানত যে, পবিত্র কুরআনের এ বর্ণনারীতি, এর চিত্তাকর্ষক প্রভাব এবং এ বাক্যসমূহের তাৎপর্যের মহত্ত্ব ও দৃঢ়তা মানুষের সামর্থ্যের বাইরে।

মহানবী (সা.)- এর ওফাতের পর আরবের মুরতাদদের (ধর্মত্যাগীদের) মোকাবেলা করা ছিল ইসলামী খিলাফতের প্রথম কর্মসূচী। এ কারণেই মুসাইলিমার প্রভাবাধীন এলাকা ইসলামী সেনাবাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। যখন অবরোধ তীব্র করা হয় এবং এ মিথ্যাবাদীর অবশ্যস্তাবী পরাজয় স্পষ্ট হয়ে পড়ে, তখন কতিপয় সরলমনা ব্যক্তি তাকে বলেছিল : “তুমি আমাদের যে গায়েবী সাহায্যের ব্যাপারে আশাবাদী করেছিলে, তার কী হলো?” মুসাইলিমা জবাবে বলেছিল : “গায়েবী সাহায্যের কোন খবর নেই এবং তা ছিল একটা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, যা আমি তোমাদের দিয়েছিলাম। তবে তোমাদের উচিত তোমাদের বংশীয় কৌলিন্য ও মর্যাদা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা।”

তবে বংশীয় কৌলিন্য ও মর্যাদা রক্ষার উদ্যোগ কোন ফল দিল না। সে এবং তার কতিপয় সঙ্গী একটি উদ্যান প্রাঙ্গনে নিহত হয়। আর এভাবে তার মিথ্যা নবুওয়াতেরও যবনিকাপাত ঘটে।

সার সংক্ষেপে বলা যায়, সে আসলে বাকপটু, প্রাঞ্জলভাষী ও বাগ্মী ছিল। তাই সে কখনোই ঐসব শীতল ও অন্তঃসারশূন্য বাণীর রচয়িতা ছিল না, যে লো ইতিহাসে ‘পবিত্র কুরআনের মোকাবেলা’ - শিরোনামে তার সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে এবং প্রচার করা হয়েছে।^{৫৩২}

রোমানদের ব্যাপারে চিন্তা- ভাবনা

আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারদের আবির্ভাব সে দেশের ধর্মীয় ঐক্যের জন্য হুমকি হওয়া সত্ত্বেও রোমানদের ব্যাপারেই মহানবী (সা.) সবচেয়ে বেশি ভাবতেন। শামদেশ ও ফিলিস্তিন তখন রোমানদের উপনিবেশ ও শাসনাধীন ছিল। কারণ তিনি জানতেন, ইয়ামামাহ ও ইয়েমেনের যোগ্য শাসনকর্তারা খুব ভালোভাবে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদারদের পরাস্ত করতে পারবেন। মহানবী (সা.)- এর ওফাতের একদিন আগে তাঁর যুগের নবুওয়াতের দ্বিতীয় ভণ্ড দাবীদার আসওয়াদ আনাসী ইয়েমেনের শাসনকর্তার গৃহীত পদক্ষেপের কারণে নিহত হয়।

মহানবী (সা.) নিশ্চিত ছিলেন, শক্তিশালী রোমান সরকার- যা ইসলামী রাে র ক্রমবর্ধমান প্রভাব- প্রতিপত্তি প্রত্যক্ষ করছে, তা- যেহেতু মহানবী আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদীদের বহিষ্কার এবং একদল খ্রিষ্টান অধিবাসীকেও ইসলামী রাে র করদাতায় পরিণত করেছেন, - সেহেতু খুব ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। তিনি অনেক দিন ধরেই রোমানদের হুমকি ও বিপদকে খুব রুতর বিবেচনা করে আসছিলেন এবং এজন্যই তিনি হিজরতের অষ্টম বর্ষে জাফর ইবনে আবী তালিব, যাইদ ইবনে হারিসাহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী রোমান শাসনাধীন অঞ্চলের দিকে প্রেরণ করেছিলেন। এ যুদ্ধে এ তিন সেনাপতি শাহাদাত বরণ করেন এবং ইসলামী সেনাবাহিনী খালিদ ইবনে ওয়ালীদেদের পরিকল্পনায় বিজয় অর্জন না করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে।

হিজরতের নবম বর্ষে হিজায় আক্রমণের জন্য রোমানদের প্রস্তুতি গ্রহণের সংবাদ মদীনা নগরীতে প্রচারিত হলে মহানবী (সা.) নিজেই ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তাবুক অভিযানের উদ্দেশ্যে বের হন এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ ছাড়াই তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই মহানবীর কাছে রোমানদের পক্ষ থেকে বিপদের সম্ভাবনা অস্বাভাবিকভাবে রুতর বিবেচিত হয়েছিল। এজন্যই বিদায় হজ্জ থেকে মদীনায় ফিরে এসে মহানবী (সা.) আনসার ও মুহাজিরগণকে নিয়ে একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন। হযরত আবু বকর, হযরত

উমর, হযরত আবু উবাদাহ, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াস প্রমুখের ন্যায় অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বও এ সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সা.) একইভাবে মুহাজিরগণের মধ্যে যারা অন্যদের আগে মদীনায় হিজরত করেছিলেন, তাঁদের সবাইকে এ সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।^{৫৩৩}

মহানবী (সা.) মুহাজিরগণের ধর্মীয় আবেগ- অনুভূতি জাগ্রত করার জন্য নিজের হাতে একটি পতাকা বেঁধে তা উসামাহ ইবনে যাইদের হাতে দিলেন^{৫৩৪} এবং নির্দেশ দিলেন :

“ মহান আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। প্রত্যুষে উনবার^{৫৩৫} অধিবাসীদের ওপর আক্রমণ চালাবে। আর (রণাঙ্গনের) এ দূরত্বটা এত ত অতিক্রম করবে যে, ঐ এলাকায় তোমাদের অগ্রযাত্রার সংবাদ পৌঁছানোর আগেই তুমি এবং তোমার সৈন্যরা সেখানে পৌঁছে যাবে।”

উসামাহ এ পতাকা বুরাইদার হাতে অর্পণ করেন এবং জুরফ^{৫৩৬} এলাকায় সেনা ছাউনী স্থাপন করেন যাতে মুজাহিদগণ দলে দলে সেখানে উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত সময়ে যাত্রা করতে সক্ষম হন।

মহানবী (সা.) যেহেতু একজন নবীন যুবককে এই সেনাবাহিনীর অধিনায়কের দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তাঁর অধীন করেছিলেন, সেহেতু এ ক্ষেত্রে তাঁর দু'টি লক্ষ্য ছিল :

প্রথমত তিনি উসামার ওপর যে মুসীবত আপতিত হয়েছিল, তা এ পথে নিরসন করতে এবং তাঁর ব্যক্তিত্বকে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। কারণ উসামা রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে তাঁর পিতা যাইদ ইবনে হারিসাকে হারিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত তিনি 'ব্যক্তিত্ব' ও 'যোগ্যতার' ভিত্তিতে দায়িত্ব ও পদ বণ্টনের নিয়মকে জীবিত ও প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সামাজিক পদমর্যাদা ও অবস্থান যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই চায় না এবং তা কখনোই বয়সের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। আর তা এজন্য যে, যে সব যুবক যোগ্যতাসম্পন্ন, তারা যেন কতক লো কঠিন সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণের জন্য

নিজেদের প্রস্তুত করে এবং তাদের জানা থাকা প্রয়োজন, ইসলামে বয়সের সাথে নয়, বরং যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সাথে পদ, অবস্থান ও মর্যাদার সরাসরি সম্পর্ক আছে।

ইসলাম আসলে মহান আল্লাহর মহান শিক্ষামালার বরাবরে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা। আর সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলিম, যে রণাঙ্গনের সৈনিকের মতো মহান আল্লাহর আদেশ-নির্দেশসমূহের সামনে আ সমর্পণ করে এবং মনে-প্রাণে সেসব গ্রহণ করে- তা তার স্বার্থানু লেই থাক বা তার ক্ষতির কারণ হোক বা তার অভ্যন্তরীণ প্রবণতা ও আকাঙ্ক্ষা লোর অনু লে থাকুক বা প্রতি লে।

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) ছোট অথচ খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত এক বাণীতে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ এভাবে ব্যক্ত করেছেন : الإسلام هو التسليم “ইসলাম (মহান আল্লাহর বিধানাবলীর সামনে) আ সমর্পণ ছাড়া আর কিছুই নয়।” ৫৩৭

যারা ইসলামের বিধানসমূহ পালনের ক্ষেত্রে বৈষম্যের পথ বেছে নেয় এবং যেখানে ইসলামকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ চাওয়া- পাওয়ার পরিপন্থী দেখতে পেয়ে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে এবং বিভিন্ন ধরনের বাহানা করে দায়িত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করে, তারাই ইসলামী শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতাবোধশূন্য এবং এরা আসলে প্রকৃত আ সমর্পণের মনোবৃত্তি রাখে না; অথচ প্রকৃত আ সমর্পণই হচ্ছে ইসলাম ধর্মের ভিত্তি।

২০ বছরের^{৫৩৮} অনধিক অল্পবয়স্ক তরুণ অধিনায়ক উসামাহ ইবনে যাইদ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের জীবন্ত সাক্ষী। কারণ, তাঁর অধিনায়কত্ব তাঁর চেয়ে কয়েক ৭ বয়সের একদল সাহাবীর জন্য মেনে নেয়া অত্যন্ত কষ্টকর ও দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল। তারা প্রতিবাদ ও নিন্দা করতে থাকে এবং এমন সব কথা বলতে থাকে, যা থেকে প্রতীয়মান হয়, মুসলিম সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মহানবী (সা.)- এর প্রতি আ সমর্পণের মনোবৃত্তি এবং (রণাঙ্গনে উপস্থিত) সৈনিকের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা তাদের মাঝে ছিল না। তাদের বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল এটাই যে, মহানবী (সা.) প্রবীণ সাহাবীগণের উপর একজন অল্পবয়স্ক তরুণকে সেনাপতি নিযুক্ত

করেছেন।^{৫৩৯} তারা মহানবীর এ কাজের রত্নপূর্ণ দিক ও কল্যাণসমূহ সম্পর্কে অমনোযোগী ছিল এবং তারা তাদের নিজেদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সব কিছু মূল্যায়ন করত।

মহানবী (সা.) এ সেনাবাহিনী সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন- নিকট থেকে এ বিষয়টি তারা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও কতিপয় অদৃশ্য ও রহস্যজনক হাতের ইশারায় ‘জুরফ’ সেনাছাউনী থেকে এ সেনাবাহিনীর যাত্রা বিলম্বিত হতে থাকে এবং গোপনে তা ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টাও চলতে থাকে।

যেদিন মহানবী (সা.) উসামার জন্য পতাকা বেঁধে দিয়েছিলেন, সে দিনের পরের দিন তিনি তীব্র মাথা ব্যথা ও প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাঁর এ অসুস্থতা বেশ কয়েক দিন অব্যাহত থাকে। অবশেষে তিনি এ রোগেই ইন্তেকাল করেন।

মহানবী (সা.) অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী থাকাবস্থায় জানতে পারলেন, সেনাছাউনী থেকে সেনাবাহিনীর যাত্রা করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং একদল লোক উসামাকে সেনাপতি নিযুক্ত করার ব্যাপারে সমালোচনা করছে। এ ধরনের পরিস্থিতির কারণে মহানবী খুবই রাগান্বিত হয়েছিলেন। মাথায় পিঁ বেঁধে এবং কাঁধে তোয়ালে রেখে নিকট থেকে জনতার সাথে কথা বলা এবং এ ধরনের বিরুদ্ধাচরণের বিপদ সম্পর্কে তাদের সতর্ক করার জন্য তিনি মসজিদের দিকে গমন করেন। তিনি প্রচণ্ড জ্বর নিয়েই মিম্বারের উপর আরোহণ করে মহান আল্লাহর প্রশংসা করার পর বলেন :

“ হে লোকসকল! সেনাবাহিনীর যাত্রায় দেরী হওয়ার দরুন আমি অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ। উসামার নেতৃত্ব তোমাদের মধ্যকার একটি গোষ্ঠীর কাছে ভারী হয়ে গেছে এবং তোমরা সমালোচনা করছ। কিন্তু তোমাদের সমালোচনা এবং অবাধ্যতা নতুন কোন বিষয় নয়। তোমরা এর আগেও তার পিতা যাইদের অধিনায়কত্বের সমালোচনা করেছিলে। মহান আল্লাহর শপথ! তার পিতাও যেমন এ পদের জন্য যোগ্য ছিল, তেমনি সেও এ পদের জন্য যোগ্য। আমি তাকে খুব ভালোবাসি। হে লোকসকল! তার সাথে তোমরা সদাচরণ কর এবং অন্যদেরও তার সাথে সদাচরণের উপদেশ দাও। সে তোমাদের পুণ্যবানদের একজন।”

মহানবী (সা.) এখানেই তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করেন এবং মিস্বার থেকে নিচে নেমে আসেন। তীব্র জ্বর ও অচল দেহ নিয়ে তিনি বিছানায় পড়ে যান। সাহাবীগণের মধ্য থেকে বড় বড় ব্যক্তিত্ব, যাঁরাই তাঁকে দেখতে আসতেন, তাঁদেরকেই তিনি নির্দেশ দিতেন : **أَفْذُوا بِعِثِ أُسَامَةَ** “তোমরা উসামার সেনাদলকে যাত্রা করাও।” ^{৫৪০}

মহানবী (সা.) উসামার সেনাবাহিনীর রণাঙ্গনের উদ্দেশে যাত্রার ব্যাপারে এতটা তাকীদ দিতেন যে, রোগশয্যায় শায়িত থেকেও যখন তিনি তাঁর সাহাবীগণকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন ‘উসামার সেনাবাহিনীকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত কর’ , তখন যারা উসামার সেনাদল থেকে পৃথক হয়ে মদীনায় থেকে যেতে চাচ্ছিল, তাদেরকে তিনি লানত দিতে থাকেন।^{৫৪১}

মহানবীর এ সব আদেশের কারণে আনসার ও মুহাজিরগণ বিদায় নেয়ার জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হতে থাকে এবং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মদীনা থেকে বের হয়ে জুরফের সেনাছাউনীতে অবস্থানরত উসামার সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে থাকে।

ঐ দু’তিন দিন উসামাহ্ যখন সেনাবাহিনীর রণাঙ্গনের যাত্রার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত ছিলেন, তখনই মদীনা থেকে তাঁদের কাছে মহানবী (সা.)-এর শারীরিক অবস্থার অবনতির খবর আসতে থাকে, যার ফলে যাত্রার ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্ত শিথিল হয়ে যায়। আর এ শৈথিল্য ঐ সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, যখন সেনাবাহিনীর অধিনায়ক বিদায় নেয়ার জন্য মহানবীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে তাঁর মুখমণ্ডলে আরোগ্যের লক্ষণসমূহ প্রত্যক্ষ করেন।

মহানবী (সা.) তাঁকে বললেন : “তুমি তোমার গন্তব্যস্থলের দিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাত্রা কর।” উসামাহ্ সেনাছাউনীতে ফিরে রণাঙ্গনের উদ্দেশে যাত্রা করার আদেশ দিলেন। সেনাবাহিনী জুরফ থেকে রণাঙ্গনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে নি, এমন সময় সেখানে মদীনা থেকে সংবাদ এসে পৌঁছায়, মহানবী (সা.) মুমূর্ষু অবস্থায় আছেন। যারা না যাওয়ার অজুহাত সন্ধান করছিল এবং বিভিন্ন উপায়ে সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রাকে ১৬ দিন পিছিয়ে দিয়েছিল, তারা পুনরায় মহানবীর শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়াকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে মদীনায় ফিরে যায় এবং তাদের পিছে পিছে সেনাবাহিনীর বাকী সদস্যরাও মদীনার পথ ধরে। আর ঠিক এভাবে

সেনাবাহিনীর কতিপয় নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তির উচ্ছৃংখলা ও অবাধ্যতার কারণে মহানবী (সা.)- এর একটি মহান আকাঙ্ক্ষা তাঁর জীবনকালে আর বাস্তবায়িত হলো না।^{৫৪২}

অর্থোক্তিক অজুহাত

কতিপয় ব্যক্তি, যাঁরা পরবর্তীতে খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজেদের মহানবী (সা.)- এর খলীফা বলে অভিহিত করেছিলেন, তাঁদের পক্ষ থেকে এ ধরনের ভুলের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। কিন্তু আহলে সুন্নাতের কতিপয় আলেম বিভিন্নভাবে তাঁদের এ অন্যায় ও আইন অমান্য করার বিষয় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তবে যতই তাঁরা এ ব্যাপারে চেষ্টা করুন না কেন, ঐসব আইন অমান্যকারীর পক্ষে কোন অজুহাত দাঁড় করাতে পারেন নি।^{৫৪৩}

জান্নাতুল বাকী কবরবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

জীবনচরিত রচয়িতারা লিখেছেন : “যে দিন মহানবী (সা.) তীব্র জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন, সে দিনের মধ্যরাতে তিনি তাঁর খাদেম আবু মুওয়াইহিবাকে^{৫৪৪} সাথে নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে গিয়েছিলেন।”

কিন্তু শিয়া ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন, যেদিন মহানবী (সা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন, সেদিন তিনি হযরত আলীর হাত ধরে জান্নাতুল বাকী গোরস্তানের দিকে গমন করেন। একদল লোক তখন তাঁর পেছনে পেছনে আসছিলেন। যাঁরা তাঁর সাথে ছিলেন, তাঁদের তিনি বলেছিলেন : “মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কবরবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।” বাকী গোরস্তানে প্রবেশ করে তিনি কবরবাসীকে সালাম করে এভাবে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন : “হে ঐসব ব্যক্তি, যারা মাটির নীচে শায়িত! তাদের উপর আমার সালাম। যখন তোমরা এ অবস্থার মধ্যে আছ, তখন তা তোমাদের জন্য মুবারক ও আনন্দঘন হোক। ঘন আঁধার রাতের বলয় বা টুকরো লোর মতো ফিতনা দেখা দিয়েছে এবং একটির সাথে আরেকটি সংযুক্ত হয়েছে।” এরপর তিনি গোরস্তানবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। পরে হযরত আলীর দিকে^{৫৪৫} মুখ করে বললেন : “আমার কাছে পৃথিবীর সমুদয় ষ্ট ধনভাণ্ডার এবং দীর্ঘ পার্থিব জীবন পেশ করা হয়েছিল এবং আমাকে এ লো এবং রবের সাথে সাক্ষাৎ ও বেহেশতে প্রবেশের মধ্যে যে কোন একটি বাছাই করার স্বাধীনতা দেয়া হলে আমি মহাপ্রভু আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ এবং বেহেশতে প্রবেশকেই প্রাধান্য দিয়েছি।

ওহীর ফেরেশতা প্রতি বছর একবার আমার কাছে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতেন; কিন্তু এ বছর তিনি আমার কাছে দু’বার পবিত্র কুরআন উপস্থাপন করেছেন; তাই আমার মৃত্যুক্ক্ষণ ঘনিয়ে আসা ছাড়া এর আর কোন কারণ থাকতে পারে না।” ^{৫৪৬}

যারা বস্তুবাদী দৃষ্টি নিয়ে এ সৃষ্টিজগতের দিকে তাকায় এবং অস্তিত্বের বলয়কে কেবল বস্তু এবং এর সমুদয় নিদর্শন ছাড়া আর কিছু জানে না, সম্ভবত তারা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে নিজেদের বলতে পারে যে, আঁার সাথে কিভাবে কথা বলা সম্ভব? আঁার সাথে কিভাবে

যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব? কখন সে মৃত্যুবরণ করবে, তা কিভাবে মানুষ অবগত হয়? কিন্তু যারা বস্তুবাদের প্রাচীর ভেঙে ফেলেছে এবং বস্তুগত এ দেহ থেকে মুক্ত ও অজড় আঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস পোষণ করে, তারা কখনোই আঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি অস্বীকার করে না^{৫৪৭} এবং তা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব ও বাস্তব বলে মেনে নেয়। ওহী জগৎ এবং আরো অন্যান্য অবস্তুগত ও ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত জগতের সাথে যে নবীর যোগাযোগ আছে, মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে তিনিই কেবল নিশ্চিতভাবে তাঁর অন্তিম মুহূর্ত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম।

চৌষট্টিতম অধ্যায় : একাদশ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

অলিখিত পত্র

মহানবী (সা.)-এর জীবনের শেষ দিন লো ইসলামের ইতিহাসের অত্যন্ত সংবেদনশীল অধ্যায়সমূহের অন্তর্গত। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্ ঐ দিন লোয় অত্যন্ত বেদনাদায়ক মুহূর্ত অতিবাহিত করছিল। উসামাহ্ ইবনে যাইদের নেতৃত্বে সেনাদলে অংশগ্রহণের ব্যাপারে কতিপয় সাহাবীর প্রকাশ্য বিরোধিতা ও অবাধ্যতা তাদের কতক লো গোপন তৎপরতা এবং মহানবীর ওফাতের পর প্রশাসন (রাণীয় ক্ষমতা), নেতৃত্ব ও ইসলামের রাজনৈতিক বিষয়াদি কুক্ষিগত করা এবং মহানবীর আনুষ্ঠানিক উত্তরাধিকারী, যিনি গাদীয়ে খুমের দিবসে নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁকে পিছু হটিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তাদের দৃঢ় সিদ্ধান্তের কথাই ব্যক্ত করে।

মহানবীও সার্বিকভাবে তাদের দুরভিসন্ধির ব্যাপারে জ্ঞাত ছিলেন। এ কারণেই তাদের অপতৎপরতা প্রশমিত করার জন্য তিনি উসামার সেনাদলে সকল সাহাবী যোগদান করে রোমানদের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মদীনা ত্যাগ করার ব্যাপারে রুত্বারোপ করছিলেন। তবে যারা রাজনীতির মঞ্চে অভিনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল তারা তাদের নীলনকশা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অজুহাত সৃষ্টি করে উসামার সেনাবাহিনীতে যোগদানের ক্ষেত্রে অপারগতা প্রকাশ করেছিল। এমনকি মহানবী (সা.) যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সেদিন পর্যন্ত তারা সেনাবাহিনীর যাত্রাও ঠেকিয়ে রেখেছিল। অবশেষে ১৬ দিন যাত্রাবিরতি ও বেকার বসে থাকার পর মহানবী (সা.)-এর ওফাতের সংবাদ প্রচারিত হবার ফলে পুনরায় তারা মদীনায় ফিরে আসে। মহানবীর মূল লক্ষ্য ছিল, তাঁর ওফাতের দিনে মদীনা নগরী ঐসব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও অসুবিধা সৃষ্টিকারী লোক থেকে খালি হয়ে যাবে, যারা তাঁর প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী ও স্থলবর্তীর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক তৎপরতায় লিপ্ত হতে পারে। অথচ তাঁর এ লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয় নি। তারা শুধু মদীনা নগরীতেই অবস্থান করে নি; বরং তারা মহানবীর প্রত্যক্ষ ওয়াসী আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)-এর অবস্থান দৃঢ়ীকরণ সংক্রান্ত যে কোন ধরনের

উদ্যোগে বাধা দেয়া এবং বিভিন্ন উপায়ে মহানবীকে এ ব্যাপারে কথা বলা থেকে বিরত রাখারও চেষ্টা করেছে।

মহানবী (সা.), তাঁদের কতিপয় কন্যা, যাঁরা তাঁর স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁদের ঘণ্য ও গোপন তৎপরতা সম্পর্কে অবগত হলে প্রচণ্ড জ্বর নিয়েই মসজিদে উপস্থিত হন এবং মিস্বারের পাশে দাঁড়িয়ে এতটা উচ্চকণ্ঠে জনগণের উদ্দেশে কথা বলতে থাকেন যে, তাঁর কণ্ঠস্বর মসজিদের বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছিল। তিনি তখন বলছিলেন :

أَيُّهَا النَّاسُ سَعَرَتِ النَّارُ، وَ أَقْبَلَتِ الْفِتْنُ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمَظْلَمِ وَ إِنِّي وَ اللَّهُ مَا تَمْسُكُونَ عَلَيَّ بِشَيْءٍ، إِنِّي لَمْ أُحَلِّ إِلَّا مَا أَحَلَّ الْقُرْآنُ وَ لَمْ أُحَرِّمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ الْقُرْآنُ

“ হে লোকসকল! (ফিতনার) অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে; ফিতনা আঁধার রাতের বলয় লোর মতো আবির্ভূত হয়েছে এবং আমার বিপক্ষে তোমাদের কোন প্রমাণ নেই। নিশ্চয়ই পবিত্র কুরআন যা হালাল করেছে, তা ছাড়া আর কিছুই আমি হালাল করি নি এবং পবিত্র কুরআন যা হারাম করেছে, তা ছাড়া আর কিছুই আমি হারাম করি নি।” ৫৪৮

এ বাক্য লো তাঁর ওফাতের পর ইসলাম ধর্মের ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাঁর তীব্র উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কথাই ব্যক্ত করে। (ফিতনার) যে অগ্নি প্রজ্বলিত হবার কথা তিনি বলেছেন, তার অর্থ কী? তা কি অনৈক্যের আ ন নয়, যা মুসলমানদের জন্য ওঁৎ পেতে বসেছিল এবং মহানবীর ওফাতের পর প্রজ্বলিত হয়েছিল এবং এখনো তার স্ফুলিঙ্গ লো নিভে তো যায়ই নি; বরং প্রজ্বলিতই রয়ে গেছে?

‘ দোয়াত ও কলম নিয়ে এসো, যাতে আমি তোমাদের জন্য একটি পত্র লিখে
দিতে পারি’

খিলাফত কুক্ষিগত করার জন্য তাঁর ঘরের বাইরে যে সব তৎপরতা চলছিল, সে ব্যাপারে মহানবী (সা.) সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। এ কারণে তিনি মতবিরোধের উ ব ঠেকানো এবং তাঁর মূল ধারা থেকে বিচ্যুতি ঘটানোর আগেই তা রোধ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) এবং তাঁর আহলে বাইতের খিলাফতের ভিত্তি লিখিত আকারে মজবুত করবেন এবং খিলাফত প্রসঙ্গে একখানা জীবন্ত দলিল রেখে যাবেন।

এ কারণেই যেদিন নেতৃত্বাঙ্কনীয় সাহাবীগণ তাঁকে দেখার জন্য আসেন, সেদিন তিনি মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। অতঃপর তিনি তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন : “আমার জন্য কাগজ ও দোয়াত নিয়ে এসো, যাতে আমি তোমাদের জন্য কিছু বিষয় লিখে দিতে পারি যে, এরপর তোমরা পথ ষ্ট হবে না।” ৫৪৯

ইবনে আব্বাস এ ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন : “এটাই ছিল ইসলামের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ যে একদল সাহাবীর মত- পার্থক্য ও ঝগড়া-বিবাদ মহানবী (সা.)-এর কাঙ্ক্ষিত পত্র লেখার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ালো।” ৫৫০

বলার অপেক্ষাই রাখে না যে, এর অর্থ ছিল তিনি পত্রের বিষয়বস্তু মুখে বলবেন এবং তাঁর একজন লেখক তা লিপিবদ্ধ করবেন। আর তা না হলে মহানবী (সা.) তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কখনো কলম হাতে নেন নি এবং এক লাইনও লিখেন নি। অধিক স্পষ্ট হওয়ার জন্য আমার প্রণীত ‘দার মাকতাবে ওয়াহী’ গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন।

এ ঐতিহাসিক ঘটনা একদল সুন্নী ও শিয়া হাদীসবিদ ও ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসবিদ্যার নীতিমালার দৃষ্টিকোণ থেকে তা নির্ভরযোগ্য ও সহীহ বর্ণনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। একটি বিষয় আছে। আর তা হলো, আহলে সুন্নাতের মুহাদ্দিসগণ প্রধানত হযরত উমরের উক্তি অর্থগতভাবে উদ্ধৃত করেছেন অর্থাৎ তাঁরা তাঁর ধৃষ্টতামূলক উক্তির মূল পাঠ ব্যক্ত করেন নি। বলার অপেক্ষা রাখে না, হযরত উমরের উক্তি উদ্ধৃত করা থেকে বিরত থাকা এজন্য নয় যে,

ধৃষ্টতার কথা উল্লেখ করা আসলে মহানবী (সা.)- এর প্রতি এক ধরনের ধৃষ্টতা প্রদর্শন; বরং দ্বিতীয় খলীফার মর্যাদা রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তাঁর উক্তি হাত দেয়া হয়েছে এবং পরিবর্তন করা হয়েছে, পাছে যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম তাঁর অবমাননাকর উক্তি শুনে তাঁর ব্যাপারে হতাশ না হয় (এবং কুধারণা পোষণ না করে)।

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ‘আস সাকীফাহ্’ গ্রন্থের রচয়িতা আবু বকর জওহারী যখন তাঁর গ্রন্থে এ অধ্যায়ে উপনীত হন, তখন তিনি হযরত উমরের উক্তিটি এভাবে বর্ণনা করেন :

و قال عمر كلمة معناها أنّ الوجد قد غلب علي رسول الله

“এবং হযরত উমর একটি কথা বলেন, যার অর্থ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহর ওপর রোগ- যন্ত্রণা প্রবল হয়েছে।” ৫৫১

তবে আহলে সুন্নাহের হাদীসবেত্তাদের মধ্য থেকে যখন কেউ কেউ দ্বিতীয় খলীফার উক্তির মূল পাঠ হুবহু উদ্ধৃত করতে চান, তখন তাঁরা তাঁর সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ থেকে বিরত থাকেন এবং এতটুকু লিখেন : فقالوا هجر رسول الله “অতঃপর তারা বলল : রাসূলুল্লাহ রোগের কারণে প্রলাপ বকেছেন।” ৫৫২

নিশ্চিতভাবে এ ধরনের অশালীন ও জঘন্য উক্তি যে কোন ব্যক্তিরই হয়ে থাকুক না কেন, তা কখনো ক্ষমার যোগ্য নয়। কারণ পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য অনুসারে মহানবী (সা.) সব ধরনের ভুল- স্ফীতি থেকে সংরক্ষিত এবং তিনি ওহী ছাড়া কোন কথা বলেন না।

নিষ্পাপ নবীর সান্নিধ্যে সাহাবীদের বিবাদ এতটা বিরক্তিকর ও মনোকষ্টের কারণ হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর কয়েকজন স্ত্রী পর্দার অন্তরাল থেকে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন : “কেন আপনারা মহানবীর নির্দেশ অমান্য করছেন?” দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর তাঁদেরকে চুপ করানোর জন্য বলেছিলেন : “আপনারা হযরত ইউসুফের সঙ্গীদের স্ত্রীদের সদৃশ। যখন মহানবী অসুস্থ হন, তখন আপনারা তাঁর জন্য নিজেদের নয়ন লোয় চাপ দেন (অশ্রুপাত করেন) এবং যখন তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন, তখন আপনারা তাঁর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।” ৫৫৩

কতিপয় গোঁড়া ব্যক্তি বাহ্যত দ্বিতীয় খলীফার বিরুদ্ধাচরণের পক্ষে কিছু অজুহাত দাঁড় করিয়েছেন।^{৫৫৪} তবে যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে আসলে তাঁরা তাঁকে এ কাজের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত করে ফেলেছেন এবং حسبنا كتاب الله (মহান আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ পবিত্র কুরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট)- তাঁর এ উক্তিকে তাঁরা অসার গণ্য করেছেন এবং সবাই স্বীকার করেছেন, ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে মহানবী (সা.)- এর সুনাত এবং পবিত্র কুরআন কখনোই উম্মতকে মহানবীর হাদীস ও বাণীসমূহের ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী করে নি।

তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, ‘মুহাম্মদের জীবনী’ গ্রন্থের রচয়িতা ড. হাসানা ইন হাইকাল ইশারা- ইঙ্গিতে দ্বিতীয় খলীফার এ কাজ সমর্থন করে লিখেছেন : “এ ঘটনার পর ইবনে আব্বাস বিশ্বাস করতেন, মহানবী (সা.) যে বিষয়টি লিখে দিতে চাচ্ছিলেন, তা লেখার ক্ষেত্রে বাধা দান করে মুসলমানরা আসলেই একটি রত্নপূর্ণ জিনিসকে হারিয়েছে। কিন্তু হযরত উমর তাঁর বিশ্বাসের ওপর বহাল থেকেছেন। কারণ মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন :

(ما فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ)

“আমরা পবিত্র কুরআনে কোন কিছুই উপেক্ষা করি নি (অর্থাৎ সবকিছু এ গ্রন্থে বর্ণনা করেছি)।”^{৫৫৫}

তিনি যদি এ আয়াতের আগের ও পরের অংশের দিকে দৃষ্টি দিতেন, তা হলে তিনি কখনোই এ আয়াতের এ রকম অপব্যাখ্যা করতেন না এবং নিষ্পাপ মহানবীর বিপরীতে হযরত উমরের এ কাজ সমর্থন করতেন না। কারণ আয়াতে উল্লিখিত কিতাব বা গ্রন্থের অর্থ বলতে গ্রন্থবৎ প্রকৃতিজগৎ এবং অস্তিত্বের পত্রসমূহকে বোঝানো হয়েছে। আর এ অস্তিত্বজগতের প্রতিটি সৃষ্টি আসলে সৃষ্টিগ্রন্থের এক একটি পৃষ্ঠা এবং সমগ্র সৃষ্টি এ সৃষ্টিগ্রন্থের সমুদয় পৃষ্ঠাতুল্য।

(و ما من دابة في الأرض و لا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم

يُحْشَرُونَ)

“ পৃথিবীতে (বিচরণকারী) প্রতিটি জীব- জন্তু এবং (আকাশে) স্বীয় ডানা মেলে উড্ডয়নকারী প্রতিটি বিহঙ্গ তোমাদের মতোই এক একটা প্রজাতি (أمم), আমরা (সৃষ্টি) গ্রন্থে কোন কিছুই

উপেক্ষা করি নি (অর্থাৎ আমরা এ সৃষ্টিলোকে যা যা সৃষ্টি করা সম্ভব, সে লো সবই সৃষ্টি করেছি) এবং সব কিছুই তাদের প্রভুর কাছে প্রত্যাভর্তন করবে।” (সূরা আনআম : ৩৮)

যেহেতু ‘আমরা এ গ্রন্থের মধ্যে কোন কিছুই উপেক্ষা করি নি’ - এ বাক্যের আগের বাক্য ‘জীব ল ও পক্ষী ল’ সৃষ্টি করার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এর পরের বাক্য কিয়ামত দিবসে পুনরুজ্জীবিত করণ প্রক্রিয়া বা হাশরের সাথে সম্পর্কিত, সেহেতু নিশ্চিত করে বলা যায়, আয়াতে উল্লিখিত ‘গ্রন্থ’ যার মধ্যে কোন কিছুই উপেক্ষা করা হয় নি, তা বলতে গ্রন্থবৎ প্রকৃতিজগৎ (সৃষ্টিগ্রন্থ) এবং অস্তিত্বের পত্রকেই বোঝানো হয়েছে।

অধিকন্তু আমরা যদি মেনেও নিই যে, আয়াতের ‘গ্রন্থ’ শব্দ আসলে পবিত্র কুরআন, তা হলে পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট উক্তি অনুসারে এ গ্রন্থ বোঝার জন্য মহানবী (সা.)- এর ব্যাখ্যা ও দিক-নির্দেশনা আবশ্যিক।

(و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)

“ আর আমরা আপনার কাছে এ ‘স্মরণ’ অর্থাৎ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি জনগণের কাছে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করেন।” (সূরা নাহল : ৪৪)

এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ এ আয়াতে لتقرأ অর্থাৎ ‘যাতে আপনি পাঠ করেন’ বলেন নি, বরং তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন لتبين অর্থাৎ ‘যাতে আপনি ব্যাখ্যা করেন’। সুতরাং মহান আল্লাহর গ্রন্থই যদি মুসলিম উম্মাহর জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে, তবুও মহানবী (সা.) প্রদত্ত ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের প্রতি এ গ্রন্থের তীব্র প্রয়োজন রয়েছে।^{৫৫}

উম্মাত যদি এ ধরনের দিক-নির্দেশনা সম্বলিত পত্রের মুখাপেক্ষী না-ই হতো, তা হলে যখন ইসলাম ধর্মের প্রখ্যাত বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ইবনে আব্বাস (রা.)- এর গণ্ডদেশ বেয়ে মুক্তার মতো অশ্রবিন্দু ঝরতে থাকত, তখন কেন তিনি বলতেন :

يوم الخميس و ما يوم الخميس ثم جعل تسيل دموعه حتى رؤيت علي خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال رسول الله :
يتوني بالكتف و الدواة أو اللوح و الدواة اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ابداً فقالوا...

“ হায় বৃহস্পতিবার! হায় বৃহস্পতিবার! এরপর তাঁর অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল; আর তাঁর গণ্ডদেশদ্বয়ের উপর তা মুক্তার মতো দেখা যাচ্ছিল। তিনি বললেন : মহানবী (সা.) বলেছেন : আমার কাছে তোমরা কাঁধের হাড় ও দোয়াত বা কাগজ ও দোয়াত নিয়ে এসো। তা হলে আমি তোমাদের জন্য এমন একটি পত্র (নির্দেশনামা) লিখে দেব যে, এরপর তোমরা কখনোই পথ ঠু হবে না। অতঃপর একদল লোক বলল : রাসূলুল্লাহ (সা.)”^{৫৫৭} . . .

এ ধরনের তীব্র শোক যা ইবনে আব্বাস প্রকাশ করেছেন, তা সত্ত্বেও এবং মহানবী (সা.) নিজেই যে তাকীদ দিয়েছেন তার ভিত্তিতে কিভাবে এ কথা বলা সম্ভব যে, পবিত্র কুরআন মহানবী (সা.)- এর এ পত্রের প্রতি মুসলিম উম্মাহকে অমুখাপেক্ষী করেছে?

এখন যখন মহানবী (সা.) এ ধরনের একটি নির্দেশনামা লিপিবদ্ধ করাতে পারলেন না, তখন অকাট্য সাক্ষ্য- প্রমাণ ও দলিলের ভিত্তিতে কি ধারণা করা সম্ভব যে, এ নির্দেশনা লেখানোর পেছনে মহানবীর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

এ পত্রের বিষয়বস্তু ও উৎস কী ছিল?

পবিত্র কুরআন তাফসীর করার ক্ষেত্রে নতুন অথচ দৃঢ় পদ্ধতি, - যা বর্তমানে সকল গবেষক ও আলেমের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, - হচ্ছে কোন একটি বিষয়ে অবতীর্ণ আয়াতের দ্ব্যর্থবোধকতা ও সংক্ষিপ্ততা ঐ একই বিষয়ে অবতীর্ণ অপর কোন আয়াতের মাধ্যমে দূর করা হয়, যা অর্থ নির্দেশের ক্ষেত্রে প্রথমটির চেয়ে অধিকতর স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। আর পারিভাষিক অর্থে আমরা এভাবে পবিত্র কুরআনের আয়াতকে অপর এক আয়াতের সাহায্যে তাফসীর (ব্যাখ্যা) করি।

এ পদ্ধতি পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ ব্যাখ্যার সাথেই একান্তভাবে শুধু সংশ্লিষ্ট নয়, বরং হাদীসসমূহের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। তাই এক হাদীসের সাহায্যে অনুরূপ আরেক হাদীসের সংক্ষিপ্ততা ও দ্ব্যর্থবোধকতা দূর করা যায়। কারণ আমাদের মহান ইমামগণ সংবেদনশীল ও দৃষ্টি আকর্ষণীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে রুত্ব আরোপকারী ও পুনরাবৃত্তিমূলক অনেক বক্তব্য ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যার সবই অর্থ ও লক্ষ্য নির্দেশের ক্ষেত্রে একই ধাঁচের ও একই পর্যায়ের নয়; কখনো কখনো সেসব অর্থ ও লক্ষ্য নির্দেশ করার ক্ষেত্রে পরিষ্কার; আবার কখনো কখনো পরিবেশ- পরিস্থিতির কারণে কাঙ্ক্ষিত অর্থ ও লক্ষ্য ইশারা- ইঙ্গিতে বর্ণনা করতে হয়েছে।

বলা হয়েছে, মহানবী (সা.) রোগশয্যায় শায়িতাবস্থায় একটি বিষয় লিখে দেয়ার জন্য সাহাবীগণকে কাগজ- কলম আনার নির্দেশ দেন এবং তিনি তাঁদের স্মরণ করিয়েও দেন, এ নির্দেশনামার কারণে তারা কখনো পথ স্ততা ও বিচ্যুতির মধ্যে পড়বে না।^{৫৫৮} অতঃপর মহানবীর সান্নিধ্যে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে মতবিরোধের কারণে তিনি ঐ চিঠি বা প্রয়োজনীয় দিক- নির্দেশনা সম্বলিত পত্র লেখানো থেকে বিরত থাকেন।

এ ক্ষেত্রে কেউ হয় তো প্রশ্ন করতে পারে, যে পত্র মহানবী (সা.) লেখাতে চেয়েছিলেন, তা কী প্রসঙ্গে ছিল। এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট। কারণ আলোচনার শুরুতে আমরা যে মূলনীতি উল্লেখ করেছি, তার আলোকে অবশ্যই বলা যায়, আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর ওয়াসায়াত

এবং খিলাফত দৃঢ়ীকরণ এবং তাঁর আহলে বাইতকে অনুসরণ করার অপরিহার্যতা তুলে ধরা ছাড়া মহানবীর আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আর এ বিষয় হাদীসে সাকালাইন বিবেচনায় আনলে স্পষ্ট হয়ে যায়। উল্লেখ্য, হাদীসে সাকালাইনের ব্যাপারে শিয়া- সুন্নী সকল হাদীসবিশারদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। কারণ মহানবী (সা.) যে পত্র লিখতে চেয়েছিলেন, সে ব্যাপারে বলেছেন : “যাতে তোমরা আমার পরে পথ ষ্ট না হও, সেজন্য আমি এ পত্রটি লিখাচ্ছি।” আর হাদীসে সাকালাইনেও তিনি হুবহু এ বাক্যই (অর্থাৎ আমার পরে তোমরা কখনো পথ ষ্ট হবে না) বলেছেন এবং কিতাব ও তাঁর আহলে বাইতকে অনুসরণ করার কারণ তিনি এটাই বিবেচনা করেছেন যে, এ দুই মূল্যবান ও ভারী বিষয়ের অনুসরণই হচ্ছে পথ ষ্ট না হবার কারণ।

ابن تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا : كتاب الله و عترتي اهل بيتي

“ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে দু’টি অতি মূল্যবান জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন পর্যন্ত এ দু’টি তোমরা আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা কখনো পথ ষ্ট হবে না। এ দুই অতি মূল্যবান জিনিস হচ্ছে : মহান আল্লাহর কিতাব এবং আমার বংশধর (ইতরাত)।”

এ দুই হাদীসের^{৫৫} শব্দমালা এবং এদের মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্য বিবেচনায় আনলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা সম্ভব নয় কি যে, কাগজ ও কলম চাওয়ার পেছনে মহানবীর উদ্দেশ্য ছিল হাদীসে সাকালাইনের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু বা এর অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর চেয়েও উন্নত কিছু লিপিবদ্ধ করা; আর তা ছিল মহানবীর প্রত্যক্ষ ওয়াসী ও উত্তরাধিকারীর বেলায়েত (নেতৃত্ব) এবং ওয়াসায়াত দৃঢ়ীকরণ যা ১৮ যিলহজ্ব ইরাক, মিশর ও হিজায়ের হাজীগণের পৃথক হবার স্থান গাদীরে খুমের মহাসমাবেশে মৌখিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল?

এছাড়াও যে ব্যক্তি মহানবীর ওফাতের পরপর সাকীফায়ে বনী সায়েদায় খিলাফতের জন্য শূরা বা পরামর্শসভার আয়োজন করে নিজের পুরনো বন্ধুকে বিশেষ অবস্থার মধ্য দিয়ে খিলাফতের জন্য প্রার্থী করেছিলেন এবং তাঁর বন্ধু নিজের মৃত্যুকালে তাঁকে তাঁর সেবার নগদ পুরস্কারও দিয়েছিলেন এবং তাঁকে সকল মূলনীতির বিপরীতে খিলাফতের জন্য মনোনীত করেছিলেন, সেই ব্যক্তির দুর্দমনীয় বিরোধিতা এ বিষয়ের সাক্ষী যে, মহানবী (সা.)- এর কথাবার্তা এবং তাঁর কাছে

সাহাবীগণের এ সমাবেশে এমন কিছু প্রমাণ বিদ্যমান ছিল, যা থেকে প্রতীয়মান হয়, মহানবী (সা.) খিলাফত ও মুসলিম উম্মাহর সার্বিক বিষয় পরিচালনার দায়িত্বভারের ব্যাপারে কিছু কথা লিখতে চাচ্ছেন। এ কারণেই তিনি (হযরত উমর) কাগজ- কলম আনার ব্যাপারে বিরোধিতা করেন। আর তা না হলে এতটা জবরদস্তির কোন কারণ থাকত না।

মহানবী (সা.) কেন এ পত্র লেখার ব্যাপারে আর তাকীদ দিলেন না?

মহানবী (সা.) যিনি তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজ সচিবকে ডেকে এ পত্র লেখাতে পারতেন, তিনি কেন (ঐ পত্র লেখানোর ক্ষেত্রে) শক্তি প্রয়োগ থেকে বিরত থাকলেন? এ প্রশ্নের উত্তরও সুস্পষ্ট। কারণ মহানবী (সা.) যদি এ পত্র লেখার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতেন, তা হলে যারা বলেছিলেন যে, ‘রোগযন্ত্রণা মহানবীর ওপর প্রবল হয়েছে’ , তারাই মহানবীর সাথে আরো বেয়াদবীর চরম স্পর্ধা প্রদর্শন করত এবং তাদের সমর্থকরাও জনগণের মধ্যে তা রটনা করে তাদের দাবী প্রমাণ করার চেষ্টা করত। এ অবস্থায় মহানবীর শানে বেয়াদবীপূর্ণ আচরণের মাত্রা যেমন বৃদ্ধি পেত ও অব্যাহত থাকত, তেমনি মহানবীর পত্রের কার্যকারিতাও আর থাকত না। এ কারণেই কেউ কেউ যখন তাদের বেয়াদবী ও মন্দ আচরণ লাঘব করার জন্য মহানবীর কাছে বলেছিলেন : “আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, আমরা কাগজ- কলম নিয়ে আসি?” তখন তাঁর চেহারা প্রচণ্ড উদ্ভায় ফেটে পড়ছিল, তা রক্তিম হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি তাদের বলেছিলেন : “এতসব কথা- বার্তার পর তোমরা কাগজ- কলম আনতে চাচ্ছ? কেবল এতটুকু তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি যে, আমার বংশধরদের সাথে সদাচরণ করবে।” এ কথা বলে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং আলী, আব্বাস ও ফযল ব্যতীত তারা সবাই সেখান থেকে উঠে চলে যায়।^{৫৬০}

অন্তিম পত্র লিখতে না পারার ক্ষতিপূরণ প্রচেষ্টা

কতিপয় সাহাবীর প্রকাশ্য বিরোধিতা যদিও মহানবীকে পত্র লেখার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল, তবুও তিনি ভিন্ন এক পদ্ধতিতে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন এবং ইতিহাসের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মহানবী (সা.) রোগযন্ত্রণায় প্রচণ্ড কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও এক হাত আলীর কাঁধে এবং অন্য হাত মায়মুনার কাঁধের উপর রেখে মসজিদের দিকে গমন করেন এবং প্রাণশক্তি নিঃশেষকারী তীব্র কষ্ট সহ্য করেও তিনি মিস্বারে আরোহণ করেন। জনতার নয়ন অশ্রুজলে ভিজে গিয়েছিল এবং মসজিদে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সুমসাম নীরবতা বিরাজ করছিল। জনতা তখন মহানবীর সর্বশেষ বাণী ও উপদেশাবলী শোনার অপেক্ষা করছিল। মহানবী (সা.) সভাস্থলের নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন : “আমি তোমাদের মাঝে দু’টি মূল্যবান জিনিস রেখে যাচ্ছি।” ঐ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল : “ঐ দুই মূল্যবান জিনিস কী?” (উস্মায়) মহানবীর মুখমণ্ডল প্রজ্বলিত হয়ে উঠল এবং তিনি বললেন : “আমি নিজেই এর ব্যাখ্যা দেব; তাই প্রশ্ন করার কোন কারণ নেই।” অতঃপর তিনি বললেন : “এক হচ্ছে পবিত্র কুরআন এবং অন্যটি আমার বংশধর।” ৫৬১

ইবনে হাজার আসকালানী ক্ষতিপূরণের বিষয়টি আরেকভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এ দু’টি বর্ণনাই^{৫৬২} সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই। তিনি লিখেছেন : “মহানবী (সা.) যখন অসুস্থ তখন কোন একদিন যখন সাহাবীগণ তাঁর বিছানার চারপাশ ঘিরে রেখেছিলেন, তখন তিনি তাঁদের দিকে মুখ করে বলেছিলেন : হে লোকসকল! আমার অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে এবং খুব শীঘ্রই আমি তোমাদের মধ্য থেকে বিদায় নেব। তোমরা জেনে রাখ, আমি তোমাদের মধ্যে মহান আল্লাহর কিতাব এবং আমার বংশধরদের রেখে যাচ্ছি। এরপর তিনি হযরত আলীর হাত ধরে তা উঁচুতে তুলে বললেন :

هذا على مع القرآن و القرآن مع على لا يفترقان

- এই আলী পবিত্র কুরআনের সাথে এবং পবিত্র কুরআন আলীর সাথে আছে। এরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না।” ৫৬৩

মহানবী (সা.) যদিও তাঁর অসুস্থ হওয়ার আগে একাধিক উপলক্ষে^{৫৬৪} হাদীসে সাকালাইন বিভিন্ন আঙ্গিক ও ভাষাগত অবয়বে বর্ণনা করেছিলেন এবং এ দুই অতি মূল্যবান বিষয়ের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তবু যেহেতু তিনি রোগশয্যায় শায়িত হয়ে আবারও পবিত্র কুরআন ও তাঁর বংশধরদের (ইতরাত) আঁকড়ে ধরে থাকার ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করেছেন এবং যেসব ব্যক্তি তাঁর অস্তিম পত্র লেখার ব্যাপারে বিরোধিতা করেছিল, তাদেরই উপস্থিতিতে তিনি পবিত্র কুরআন ও ইতরাতের রত্ন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সেহেতু ধারণা করা যায়, হাদীসে সাকালাইনের পুনরাবৃত্তিই ছিল ঐ অস্তিম পত্রের শূন্যতা পূরণ করা, যা তিনি লিখতে পারেন নি।

দীনার বণ্টন

‘ বাইতুল মাল’ সংক্রান্ত মহানবী (সা.)- এর নীতি ও পদ্ধতি এই ছিল যে, উপযুক্ত সময় ও সুযোগে প্রথমেই তিনি বাইতুল মালের সম্পদ দুঃস্থ, অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন এবং বাইতুল মালে দীর্ঘদিন সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। এ কারণেই রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় তাঁর এক স্ত্রীর কাছে কিছু দীনার গচ্ছিত থাকার কথা তাঁর স্মরণে আসামাত্রই তিনি তাঁর সামনে সে লো নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। দীনার লো তাঁর সামনে রাখা হলে তিনি সে লো হাতে নিয়ে বলেছিলেন : ما ظنَّ مُحَمَّدٌ بِاللَّهِ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ وَ هَذِهِ عِنْدَهُ : “মহান আল্লাহ সম্পর্কে মুহাম্মদ কী ভাবছে, যখন সে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে, অথচ তার কাছে এ লো এখনও রয়ে গেছে?” এরপর তিনি আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- কে ঐ দীনার লো দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। ৫৬৫

ঔষধ সেবন করানোর জন্য মহানবী (সা.)- এর তীব্র অসন্তোষ

আসমা বিনতে উমাইস মহানবী (সা.)- এর স্ত্রী মাইমুনার একজন নিকটায় ছিলেন। হাবাশায় (আবিসিনিয়া) অবস্থানকালে তিনি কয়েকটি উঁ দের নির্যাস থেকে এক ধরনের ঔষধ প্রস্তুত করার পদ্ধতি শিখেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, মহানবীর অসুস্থতা ফুসফুস ও বক্ষগহুরের আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ- ঘটিত ব্যাধি (অর্থাৎ তিনি পুরিসি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন) এবং হাবাশায় এ ধরনের রোগের জন্য এ ঔষধ ব্যবহার করা হতো। আসমা মহানবীর অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন দেখতে পান এবং মহানবী তীব্র বেদনায় অচেতন হয়ে পড়লে তিনি ঐ ঔষধ বা সিরাপের কিছু অংশ মহানবীর মুখে ঢেলে দেন। জ্ঞান ফেরার পর মহানবী (সা.) ব্যাপারটি বুঝতে পারেন এবং রাগান্বিত হয়ে বলেন : “মহান আল্লাহ কখনোই তাঁর রাসূলকে এ ধরনের রোগে আক্রান্ত করেন না।” ৫৬৬

সাহাবীগণের সাথে শেষ বিদায়

মহানবী) সা (.অসুস্থাবস্থায় কখনো কখনো মসজিদে যেতেন এবং মুসল্লীগণের সাথে নামায আদায় করতেন ও তাদেরকে কতিপয় বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতেন।

তাঁর অসুস্থতার কোন একদিন মাথায় একটি কাপড় দিয়ে পিঁ বাঁধা অবস্থায় আলী) আ (.ও ফযল ইবনে আব্বাস তাঁর বগলদ্বয়ের নিম্নদেশ ধরে রেখেছিলেন এবং তাঁর পদদ্বয় মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। ঐ অবস্থায় তিনি মসজিদে প্রবেশ করে মিস্বারে আরোহণ করেন এবং ভাষণ শুরু করেন : “হে লোকসকল !তোমাদের মধ্য থেকে আমার যাবার সময় চলে এসেছে। আমি যদি কাউকে কোন অঙ্গীকার করে থাকি, তা হলে তা পালন করার ব্যাপারে আমি প্রস্তুত। আর আমার কাছে যদি কারো পাওনা থেকে থাকে, তা হলে সে যেন তা আমাকে বলে এবং আমি তা প্রদান করব।” ঐ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল : “কিছু দিন আগে আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমি যদি বিয়ে করি, তা হলে আপনি আমাকে কিছু পরিমাণ অর্থ সাহায্য করবেন।” মহানবী) সা (.তৎক্ষণাৎ ফযলকে ঐ ব্যক্তির কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং মিস্বার থেকে নেমে ঘরে চলে গেলেন। এরপর মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে শুক্রবার মহানবী) সা (.মসজিদে এসে ভাষণ দিলেন। তিনি ভাষণের মাঝে বললেন : “আমার ওপর যদি কারো কোন হক) অধিকার (থেকে থাকে, তা হলে সে দাঁড়িয়ে তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করুক। কারণ এ পৃথিবীতে কিসাস) প্রতিশোধ (গ্রহণ আমার কাছে আখেরাতে কিসাস গ্রহণের চেয়ে অধিকতর প্রিয়

(الفصاص في دار الدنيا احب الي من الفصاص في دار الآخرة)

এ সময় সাওয়াদাহ ইবনে কাইস দাঁড়িয়ে বলল : “তায়্যেফের জিহাদ থেকে ফেরার পথে আপনি একটি উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন। ঐ সময় আপনার হাতের চাবুক উটের উপর আঘাত করার জন্য উঠিয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ করে আমার পেটে ঐ চাবুকের আঘাত লেগেছিল। আমি এখন আমার কিসাস নেওয়ার জন্য প্রস্তুত।”

মহানবী (সা.)- এর আহবান নিছক ভদ্রতামূলক সৌজন্য ছিল না, বরং তিনি এমনকি এ ধরনের অধিকার লো, যা কখনো জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে না^{৫৬৭} সে লো পর্যন্ত আদায় করার

ক্ষেত্রে আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করতেন। মহানবী (সা.) তাঁর পরণের জামা উঠালেন যাতে করে সাওয়াদাহ্ তার কিসাস গ্রহণ করে। মহানবীর সাহাবীগণ দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ও অশ্রুসজল চোখে, কাঁধ প্রসারিত করে এবং প্রাণ বিদীর্ণকারী কান্না বিজড়িত কণ্ঠে প্রতীক্ষা করছিলেন, এ ঘটনা কোথায় গিয়ে সমাপ্ত হয়! আসলেই কি সাওয়াদাহ্ প্রতিশোধ (কিসাস) গ্রহণ করবে? হঠাৎ সবাই দেখতে পেল, সাওয়াদাহ্ অনিচ্ছাকৃতভাবে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মহানবী (সা.)-এর পেট ও বক্ষদেশ চুম্বন করছে। এ সময় মহানবী (সা.) সাওয়াদাহ্‌র জন্য দুআ করে বললেন : “হে আল্লাহ! সাওয়াদাহ্ যেভাবে নবীকে ক্ষমা করে দিয়েছে সেভাবে তাকে আপনিও ক্ষমা করে দিন।” ৫৬৮

পঁয়ষড়্টিতম অধ্যায় : একাদশ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ

জীবনের শেষ শিক্ষা

অস্থিরতা ও উদ্বেগ- উৎকর্ষা সমগ্র মদীনা নগরীকে গ্রাস করেছিল। মহানবী (সা.)- এর সাহাবীগণ অশ্রুসজল নয়নে এবং দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে মহানবীর অসুস্থতার পরিণতি সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর ঘরের চারপাশে সমবেত হয়েছিলেন। ঘরের ভেতর থেকে বাইরে আসা খবর মহানবীর স্বাস্থ্যের অবনতি ও সংকটজনক অবস্থার কথাই ব্যক্ত করছিল এবং তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও আরোগ্য সংক্রান্ত সব ধরনের আশা মিটিয়ে দিচ্ছিল এবং নিশ্চিত করছিল, মহানবীর জীবন প্রদীপের সর্বশেষ শিক্ষা নির্বাপিত হবার আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা অবশিষ্ট আছে।

মহানবী (সা.)- এর একদল সাহাবী নিকট থেকে তাঁদের মহান নেতাকে দেখা ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তাঁর অবস্থার অবনতি হতে থাকলে যে কক্ষের মধ্যে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, সেখানে তাঁর আহলে বাইত ব্যতীত আর কারো পক্ষে যাতায়াত করা সম্ভব ছিল না।

মহানবী (সা.)- এর একমাত্র কন্যাসন্তান হযরত ফাতিমা (আ.) পিতার শয্যার পাশে বসেছিলেন এবং তাঁর উজ্জ্বল মুখমণ্ডলের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তিনি যখন পিতার কপাল ও মুখমণ্ডলের উপর মুক্তার দানার মতো মৃত্যু- ঘামের বারিবিন্দুসমূহ ঝরে পড়তে দেখলেন, তখন তিনি ভগ্ন হৃদয়ে, অশ্রুসিক্ত নয়নে এবং রুদ্ধকণ্ঠে মহানবী (সা.)- এর শানে হযরত আবু তালিব রচিত এ কবিতাংশ মৃদু স্বরে আবৃত্তি করছিলেন :

و ابيض يستسقى الغمام بوجهه ثم اليتامي عصمة للارامل

“ ঐ উজ্জ্বল মুখমণ্ডল, যাঁর মর্যাদার উসীলায় মেঘমালার বারিবিন্দুর জন্য প্রার্থনা করা হয়; তিনি অনাথদের আশ্রয়স্থল এবং বিধবা নারীদের রক্ষক।”

এ সময় মহানবী (সা.) চোখ মেলে তাকালেন এবং নিচু স্বরে কন্যার উদ্দেশে বললেন :

“ এ কবিতা আবু তালিব আমার শানে আবৃত্তি করেছেন। তবে এর স্থলে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত উত্তম^{৫৬৯} :

(و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفأن مات أو قُتل انقلبتم علي أعقابكم و من ينقلب علي عقبه

فلن يضرب الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين)

- মুহাম্মদ শুধু আল্লাহর রাসূল, তাঁর আগে রাসূলগণ প্রস্থান করেছেন। অতএব, যদি তিনি ইত্তেকাল করেন বা নিহত (শহীদ) হন, তা হলে কি তোমরা তোমাদের পেছন দিকে (পূর্বপুরুষদের ধর্মের দিকে) প্রত্যাবর্তন করবে? আর যারা তাদের দিকে ফিরে যাবে, তারা কখনোই মহান আল্লাহর ন্যূনতম ক্ষতিও করতে পারবে না। আর তিনি কৃতজ্ঞ বান্দাদের পুরস্কৃত করবেন।” (সূরা আলে ইমরান : ১৪৪)

হযরত ফাতিমা (আ.)- এর সাথে মহানবী (সা.)- এর কথোপকথন

অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, নিজ সন্তানদের প্রতি বড় বড় মনীষী ও ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্বদের আবেগ- অনুভূতি অধিক চিন্তা- ভাবনা ও কর্মব্যস্ততার দরুন নিস্প্রভ হয়ে পড়ে। কারণ মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সর্বজনীন চিন্তা- ভাবনা তাঁদেরকে এতটা আ মগ্ন করে রাখে যে, এর ফলে সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ও আবেগ- অনুভূতি তাঁদের মাঝে বিকশিত হতে পারে না। তবে মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গ এ নিয়মের ব্যতিক্রম। সবচেয়ে মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বিশ্বজনীন ধ্যান- ধারণা ও আদর্শের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী এবং তাঁদের অন্তরা া মহান। আর এ কারণেই জীবনের একটি দিকে ব্যস্ত হওয়া কখনো তাঁদেরকে জীবনের অপর দিক থেকে নির্লিপ্ত করে না।

একমাত্র কন্যাসন্তানের প্রতি মহানবী (সা.)- এর প্রগাঢ় টান ও ভালোবাসা প্রকৃতপক্ষে মানবীয় আবেগ- অনুভূতির সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ। তাই মহানবী কন্যার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে কখনোই সফরে বের হতেন না এবং সফর থেকে ফিরে এসে সর্বাগ্রে তিনি তাঁর সাথে দেখা করার জন্য ছুটে যেতেন। নিজের স্ত্রীগণের সামনে তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং সাহাবীগণকে বলতেন : “ফাতেমা আমার দেহের টুকরা। যা তাকে সন্তুষ্ট করে, তা আমাকেও সন্তুষ্ট করে; আর তার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি আমারই ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি।” ৫৭০

হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.)- এর সাক্ষাৎ মহানবী (সা.)- কে বিশ্বের সবচেয়ে পবিত্রা ও মমতাময়ী নারী হযরত খাদীজার কথা স্মরণ করিয়ে দিত, যিনি তাঁর স্বামীর পবিত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথে বিস্ময়কর সব দুঃখ- কষ্ট বরণ করে নিয়েছিলেন এবং এ পথে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি ব্যয় করেছিলেন।

যে কয়েকটি দিন মহানবী (সা.) শয্যাশায়ী ছিলেন, সে ক’টি দিন হযরত ফাতিমা (আ.) পিতার শয্যা পাশে বসে থাকতেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও পিতার কাছে থেকে দূরে সরেন নি। হঠাৎ মহানবী (সা.) ইঙ্গিতে বোঝালেন, তিনি তাঁর সাথে কথা বলবেন। নবীকন্যা একটু ঋজু হয়ে

মহানবীর কাছে মাথা নিয়ে গেলেন। তখন মহানবী (সা.) তাঁর সাথে আস্তে আস্তে কথা বললেন। যাঁরা তাঁর শয্যাপাশে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের কেউ মহানবী ও তাঁর কন্যার কথোপকথনের বিষয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অবগত হতে পারেন নি। মহানবী কথা বলা শেষ করলে হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.) কাঁদলেন এবং তাঁর দু'চোখ বেয়ে বন্যার স্রোতের মতো অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। এ অবস্থায় মহানবী (সা.) তাঁকে আবার ইশারা করে কাছে ডেকে তাঁর সাথে আস্তে আস্তে কথা বললেন। এবার হযরত যাহরা (আ.) হাসিমুখে মাথা উঠালেন। একই সময় পরস্পর বিপরীত এ দুই আচরণ উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বিস্মিত করেছিল। তাঁরা নবীকন্যার কাছে অনুরোধ করলেন যেন তিনি তাঁর সাথে মহানবীর যে কথা হয়েছে, তা তাঁদের জানান এবং এ দুই অবস্থার উ বের কারণও তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু যাহরা (আ.) বললেন : “আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর রহস্য ফাঁস করব না।”

মহানবী (সা.)- এর ওফাতের পর হযরত যাহরা (আ.) হযরত আয়েশার পীড়াপীড়িতে তাঁদেরকে ঘটনার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত করেন এবং বলেন : “আমার পিতা প্রথমে তাঁর ইন্তেকালের কথা জানিয়ে বলেন : আমি এ অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করব না। এ কারণেই আমার তখন কান্না পেয়েছিল। তবে পরে তিনি আমাকে বললেন : আমার আহলে বাইতের মধ্য থেকে তুমিই প্রথম, যে আমার সাথে মিলিত হবে। এ সংবাদ আমাকে আনন্দিত করল এবং আমিও বুঝতে পারলাম, অল্প কিছুদিন পরেই আমি পিতার সাথে মিলিত হব।” ৫৭১

দাঁত মুবারক মিসওয়াক

মহানবী (সা.) রাতের বেলা ঘুমানোর আগে এবং ঘুম থেকে জাগার পর মিসওয়াক করতেন। মহানবীর মিসওয়াক আরাক কাঠের ছিল, যা দাঁতের মাড়ি মজবুত করা এবং ময়লা ও খাদ্যকণা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর। একদিন হযরত আয়েশার ভাই আবদুর রহমান একটি সবুজ ও তাজা ডাল হাতে নিয়ে মহানবী (সা.)-কে দেখতে আসেন। হযরত আয়েশা মহানবীকে ঐ ডালটির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বুঝতে পারলেন, তিনি ডালটি দিয়ে মিসওয়াক করতে চাচ্ছেন। তাই তিনি তা নিয়ে মহানবীর হাতে রাখলেন। আর তখন মহানবী খুব যত্নের সাথে দাঁত মিসওয়াক করলেন।^{৫৭২}

মহানবী (সা.)- এর অন্তিম ওসিয়ত

মহানবী (সা.) অসুস্থ থাকার দিন লোয় প্রয়োজনীয় বিষয়াদি স্মরণ করিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি রুত্ব দিতেন এবং তাঁর অসুস্থতার শেষ দিন লোয় নামায এবং দাস- দাসীদের সাথে সদাচরণ করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন : “তোমরা দাস- দাসীদের সাথে সদাচরণ করবে, তাদের খাবার ও পোশাক- পরিচ্ছদের দিকে খেয়াল রাখবে, তাদের সাথে কোমল ভাষায় কথা বলবে এবং মানুষের সাথে সুন্দরভাবে মেলামেশা ও জীবন যাপন করবে।”

একদিন কা’ব আল আহবার দ্বিতীয় খলীফাকে জিজ্ঞেস করলেন : “মহানবী (সা.) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার অবস্থায় কী বলেছিলেন?” দ্বিতীয় খলীফা সভায় উপস্থিত আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : “আপনি তাঁকে জিজ্ঞেস করুন।” আলী (আ.) বললেন : “মহানবী (সা.)- এর মাথা যখন আমার কাঁধের উপর রাখা ছিল, তখন তিনি বলছিলেন: (الصَّلوة) নামায, নামায।” এ সময় কা’ব বললেন : “পূর্ববর্তী নবীগণও এ পদ্ধতির ওপর বহাল ছিলেন (অর্থাৎ তাঁরাও ওফাতকালে নামাযের ব্যাপারেই তাঁদের উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছিলেন)।”^{৫৭৩}

জীবনের অন্তিম মুহূর্ত লোয় মহানবী (সা.) চোখ খুলে বললেন : “আমার ভাইকে ডাক যাতে সে এসে আমার শয্যার পাশে বসে।” সবাই বুঝতে পারলেন, তাঁর এ কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছেন আলী। আলী (আ.) তাঁর শয্যার পাশে এসে বসলেন। তিনি অনুভব করলেন, মহানবী (সা.) বিছানা থেকে উঠতে চাচ্ছেন। আলী (আ.) মহানবীকে বিছানা থেকে উঠালেন এবং নিজের বুকুর সাথে তাঁকে হেলান দিয়ে ধরে রাখলেন।^{৫৭৪}

আর ঠিক তখনই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার লক্ষণ লো মহানবী (সা.)- এর পবিত্র দেহে প্রকাশ পেল। এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেছিল : “মহানবী (সা.) কার বুকু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন?” তখন ইবনে আব্বাস বলেছিলেন : “মহানবী (সা.) আলীর কোলে মাথা রেখে

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।” ঐ লোকটি আবার বলল : “হযরত আয়েশা দাবী করেন, মহানবী তাঁর বুকে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।” ইবনে আব্বাস হযরত আয়েশার কথা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন : “মহানবী (সা.) হযরত আলীর কোলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আর আলী ও আমার ভাই ফযল তাঁকে গোসল দিয়েছেন।” ৫৭৫

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) তাঁর এক ভাষণে এ বিষয় স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছেন :

و لقد فُبِضَ رسول الله و إنّ رأسه لعليّ صدرى... و لقد ولىت غسله و الملائكة أعوانى

“ মহানবী (সা.) আমার বুকে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন... আমি তাঁকে গোসল দিয়েছি এবং ঐ অবস্থায় ফেরেশতারা আমাকে সাহায্য করেছেন।” ৫৭৬

কতিপয় মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে সর্বশেষ যে কথা বলেছিলেন, তা ছিল مع الرفيق الأعلى (না, বরং সবচেয়ে মহান বন্ধুর সাথে) যেন ওহীর ফেরেশতা তাঁর রুহ কবজ করার সময় তাঁকে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে এ পার্থিব জগতে প্রত্যাবর্তন বা ফেরেশতা কর্তৃক তাঁর রুহ কবজ করা ও অন্য জগতে (বারযাখে) ত চলে আসার মধ্যে যে কোন একটি বেছে নেয়ার এখতিয়ার দিলে তিনি এ বাক্য বলে ফেরেশতাকে জানিয়েছিলেন, তিনি মৃত্যুপরবর্তী জগতে চলে যেতে এবং সেখানে নিয়োক্ত আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের সাথে বসবাস করতে চান।

(فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصّديقين و الشّهداء و الصّالحين و حسن أولئك رفيقا)

“ তাঁরা ঐ ব্যক্তিদের সাথে আছেন যাঁদের ওপর মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; আর এসব অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ হচ্ছেন নবী, পরম সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মশীল বান্দাগণ এবং তাঁরা কত (উত্তম) ভালো বন্ধু!” ৫৭৭

মহানবী (সা.) এ বাক্য বললেন এবং সাথে সাথে তাঁর দু’চোখ ও ওষ্ঠ বন্ধ হয়ে গেল। ৫৭৮

মহানবী (সা.)- এর ওফাত দিবস

রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর পবিত্র মহান আ ১ ২৮ সফর সোমবার দুপুর বেলা চিরস্থায়ী আবাসস্থলের দিকে উড়ে যায়। তখন তাঁর পবিত্র দেহ একটি ইয়েমেনী চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় এবং অল্প সময়ের জন্য কক্ষের এক কোণে রেখে দেয়া হয়। মহানবী (সা.)- এর স্ত্রীগণের বিলাপ এবং নিকটীয়গণের ক্রন্দনধ্বনি শুনে বাইরে অবস্থানরত জনতা নিশ্চিত হন যে, মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মহানবী (সা.)- এর ওফাতের সংবাদ সমগ্র মদীনা নগরীতে ছড়িয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর কতিপয় কারণবশত ঘরের বাইরে চিৎকার করে বলেছিলেন : “মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন নি এবং তিনি মূসা (আ.)- এর মতো মহান আল্লাহর কাছে গেছেন” এবং এ ব্যাপারে তিনি মাত্রাতিরিক্ত তাকীদ দিতে লাগলেন এবং তিনি একদল জনতাকে তাঁর অভিমতের সমর্থকও প্রায় বানিয়ে ফেলেছিলেন। ইত্যবসরে মহানবী (সা.)- এর একদল সাহাবী^{৫৭৯} নিম্নোক্ত আয়াত হযরত উমরকে পাঠ করে শোনালেন^{৫৮০} :

(و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفأن مات أو قُتل انقلبتم علي أعقابكم)

“ মুহাম্মদ কেবল আল্লাহর রাসূল; তাঁর আগে রাসূলগণ গত হয়ে গেছেন। যদি তিনি ইন্তেকাল করেন বা নিহত হন, তা হলে কি তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে?”

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) মহানবী (সা.)- এর পবিত্র দেহ মুবারক গোসল দেন এবং কাফন পরান। কারণ মহানবী (সা.) বলেছিলেন : “আমার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি আমাকে গোসল দেবে।”^{৫৮১} আর এ ব্যক্তি আলী ব্যতীত আর কেউ ছিলেন না। যা হোক, এরপর তিনি মহানবীর পবিত্র মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করলেন। তখন তাঁর দু’নয়ন বেয়ে াবনের মতো অশ্রু ঝরছিল। তিনি তখন এ কথাসমূহ বলছিলেন : “আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন। আপনার ওফাতের মাধ্যমে নবুওয়াতের সূত্র ছিন্ন এবং মহান আল্লাহর ওহী ও আকাশের (উর্ধ্ব জগতের) খবরা- খবর বন্ধ হয়ে গেল, যা অন্য কারো মৃত্যুতে কখনো বন্ধ হয় নি। আপনি যদি আমাদের

অপ্রীতিকর অবস্থায় ধৈর্যধারণ করার আহবান না জানাতেন, তা হলে আমি আপনার বিচ্ছেদে এতটা কাঁদতাম ও অশ্রু ঝরাতাম যে, এর ফলে আমি অশ্রুর উৎসই শুষ্ক করে ফেলতাম। তবে এ পথে আমাদের দুঃখ ও শোক সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। আপনার পথে এ পরিমাণ শোক আসলে নগণ্য এবং এছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন। আমাদেরকে আপনি পরলোকে স্মরণ করুন এবং স্মরণে রাখুন।”^{৫৮২}

সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর জানাযার নামায আদায় করেন, তিনি আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ দলে দলে এসে তাঁর জানাযার নামায আদায় করলেন। আর এ অনুষ্ঠান মঙ্গলবারের দুপুর পর্যন্ত চলতে থাকে। অতঃপর সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, মহানবী (সা.) যে কক্ষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, সেখানেই তাঁকে দাফন করা হবে। তাঁর কবর আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ এবং যাইদ ইবনে সাহল প্রস্তুত করেছিলেন। হযরত আলী (আ.), ফযল ও আব্বাসের সহায়তায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাফন কাজ সম্পন্ন করেন।

পরিণামে, যে ব্যক্তিত্ব তাঁর নিরলস আত্মত্যাগের মাধ্যমে মানব জাতির ভাগ্যে পরিবর্তন এনেছিলেন এবং তাদের সামনে সভ্যতার এক নতুন ও উজ্জ্বল অধ্যায়ের অবতারণা করেছিলেন, তাঁর ইহজীবন-সূর্য অস্ত গেল। তাঁর ওফাতের সাথে সাথে তাঁর মহতী রিসালতী মিশন অব্যাহত রাখা এবং তাঁর মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে অনেক বাধা ও সমস্যার উদ্ভব হয়, যে লোর মধ্যে সবচেয়ে প্রকট সমস্যা ছিল খিলাফত ও মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব বিষয়ক সমস্যা। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের আগেই মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ ও বিভক্তির লক্ষণ লো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

ইসলামের ইতিহাসের অত্যন্ত সংবেদনশীল ও রুত্বপূর্ণ এ অধ্যায়^{৫৮৩} আমাদের এ আলোচনার বিষয়বস্তুর [ইসলামের আজীমুশশান নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনচরিত ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ] গণ্ডির বাইরে। তাই আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ করছি এবং এ মহান নেয়ামতের জন্য মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সমাপ্ত

তথ্যসূচী

১. তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০২
২. তাবাকাতে কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৬
৩. খলীফার নিষেধাজ্ঞা শিয়া মনীষিগণের উপর ক্ষুদ্রতম প্রভাবও ফেলে নি, যাঁরা হযরত আলীর ইচ্ছা ও মনোভাব অনুসরণ করতেন। তাঁরা পূর্ণ আগ্রহে, এমনকি হাদীস লিপিবদ্ধ করা যখন নিষেধ ছিল, তখনও হাদীস লেখা অব্যাহত রাখেন এবং মহানবী (সা.)-এর আহলে বাইতের কাছ থেকে অনেক জ্ঞানভাণ্ডার সংরক্ষণ করেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য তাসীসুশ্ শিয়া গ্রন্থ দেখুন।
৪. সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ এর শাদুস সারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১
৫. ওয়াফিয়াতুল আয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৬
৬. নাজ্জাশী তাঁর ‘ফিহরিস্ত’ (তালিকা) গ্রন্থে তাঁকে ইমাম বাকের ও সাদেক (আ.)-এর শিষ্য বলে গণ্য করেছেন। আয যারিয়া, ১১তম খণ্ড, পৃ. ২৮১-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর ‘সীরাহ্’ গ্রন্থের এক কপি মাদ্রাসা-ই-উস্তাদ মুতাহহারী’র গ্রন্থশালায় সংরক্ষিত আছে।
৭. খাদ্য-সামগ্রীর মূল্য বাবদ কা’ব মুসলমানদের তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের বন্ধক রাখার যে প্রস্তাব দিয়েছিল, তাতে তার হৃদয়ের নিষ্ঠুরতা ও নির্লজ্জতার মাত্রা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর এ ব্যাপারটি স্পষ্ট যে, এ ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন লোক মুসলিম সমাজে স্বাধীনভাবে বসবাস করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুদের উত্তেজিত করে যাবে এবং তার কাব্য-যা আরবদের মনের ওপর অতীত প্রভাব বিস্তার করত, তা বিদ্যমান পরিবেশ-পরিষ্কৃতি আরো গোলযোগপূর্ণ করে তুলবে- তা হতে দেয়া মোটেই ঠিক নয়।
৮. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১ ও ৫৮; আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪, ১৯০
৯. আল কামিল ফিত্ তারীখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০১
১০. কুরাইশ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যার ব্যাপারে তাফসীরকার ও ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন আলামুল ওয়ারায় আলী ইবনে ইবরাহীম ও তাবারসী এবং ইবনে হিশামের বর্ণনা। তবে বর্ণিত পরিসংখ্যানটি সত্যের অধিক কাছাকাছি।
১১. আল ওয়াকিদী প্রণীত মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৩; একদল সীরাত লেখক মনে করেন, পত্রবাহক এমন সময় পত্রটি মদীনায় পৌঁছে দেয় যখন মহানবী (সা.) মসজিদেই অবস্থান করছিলেন। তখন উবাই ইবনে কা’ব পত্রটি তাঁকে পড়ে শোনান। আল ওয়াকিদীও তাঁর আল মাগাযী গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২০৪ পৃষ্ঠায় এ বিষয়

উল্লেখ করেছেন। যেহেতু পুরো ইতিহাসে মহানবী (সা.) কোন পত্র পড়েছেন বলে দেখা যায় নি, কাজেই প্রথম অভিমত বাস্তবতার কাছাকাছি বলে প্রতীয়মান হয়।

১২. বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ১১১; এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্যে আমার প্রণীত গ্রন্থ ‘ওহীর মাকতাব’ পড়ার পরামর্শ রইল। এ গ্রন্থে বিষয়টি কুরআন, হাদীস ও ইতিহাসের নিরীখে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১৩. এ প্রসঙ্গে ‘কুরআন ও নাহজুল বালাগার দৃষ্টিতে পরামর্শ’ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এ গ্রন্থে পর্যাপ্ত ও ব্যাপক জ্ঞান এবং ভুল- স্মৃতি থেকে মুক্ত থাকার গ্যারান্টি সত্ত্বেও মহানবী (সা.) কেন পরামর্শ করতেন, তার একটা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১৪. নাহজুল বালাগাহ, ১ম খুতবাহ

১৫. আল ওয়াকিদী প্রণীত মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১১। আমরা ‘ইসলামের ইতিহাসে মুনাফিক’ শীর্ষক গ্রন্থে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছি, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের অভিমত শঙ্কামুক্ত ছিল না। কেননা এটাও অসম্ভব ছিল না যে, শত্রুবাহিনী শহরের ভেতর প্রবেশ করার পর মুনাফিকদের বাড়ি- ঘর বাস্কার হিসেবে ব্যবহার করত এবং মদীনার ভেতরে বসবাসকারী ইহুদীরাও শত্রুবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করত।

১৬. বিহারুল আনওয়ার, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫

১৭. আল ওয়াকিদী প্রণীত মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪; আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮

১৮. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫

১৯. কারণ সূরা ফাতহ- এর ১৮ নম্বর আয়াত অনুযায়ী অন্ধ, খোঁড়া ও অসুস্থদের ওপর জিহাদ ফরজ নয়।

ليس علي الأعمى حرج و لا علي الأعرج حرج و لا علي المريض حرج

২০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯

২১. বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৫৭

২২. সূরা নূর : ৬২

২৩. انضح عَنَّا الخيل بالنَّيل لا يأتون من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك

২৪. فاستفتحوا أعمالكم بالصبر علي الجهاد و التمسوا بذلك ما وعدكم الله

২৫. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২১- ২২২

২৬. من يأخذ هذا السيف و يودي بحقه

২৭. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬
২৮. প্রা জ, পৃ. ৬৮- ৬৯
২৯. প্রা জ, পৃ. ১২
৩০. শেখ মুফীদ প্রণীত কিতাব আল ইরশাদ, পৃ. ৪৩
৩১. আল্লামা মাজলিসী বিহারুল আনওয়ারের ২য় খণ্ডের ৫১ পৃষ্ঠায় হযরত আলীর হাতে (কুরাইশ বাহিনীর) ৯ জন পতাকাবাহীর নিহত হওয়ার বিশদ বর্ণনা করেছেন।
৩২. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৮; তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৪
৩৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩
৩৪. তারীখে কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৯
৩৫. সূরা আলে ইমরান : ১৫৪
৩৬. ১২১- ১৮০ আয়াত
৩৭. إِذْ تَصْعَدُونَ وَ لَا تَلْوُونَ عَلَيَّ أَحَدًا وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَيْكُمْ - সূরা আলে ইমরান : ১৫৩
৩৮. সূরা আলে ইমরান : ১৫৫
- إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعَانِ إِتْمَا اسْتَرْهَمَ الشَّيْطَانُ بَبْعُضِ مَا كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ
৩৯. সূরা আলে ইমরান : ১৪৪
৪০. ইবনে আবিল হাদীদ প্রণীত শারহু নাহজিল বালাগাহ্, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ২৩- ২৪
৪১. মানুষের সমুখ সারির দাঁত ও ছেদক দাঁত লোর মাঝখানে অবস্থিত দাঁত লোকে ‘রুবাঈ’ বলা হয়। ডান ও বাম পাশে সে লোর সংখ্যা হচ্ছে চারটি।
৪২. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪, আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৪
৪৩. كَيْفَ يَفْلَحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالْذَّمِّ وَ هُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ
৪৪. তারিখে কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৭
৪৫. ইবনে আবীল হাদীদ প্রণীত শারহু নাহজিল বালাগাহ্, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ২১
৪৬. তারিখে কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৭
৪৭. সিহাহ্ সিভাহ্ : আহলে সুন্নাতের বিখ্যাত ছয় হাদীস গ্রন্থ যার অর্থ হচ্ছে সহীহ হাদীস গ্রন্থষষ্ঠক।
৪৮. ইবনে আবীল হাদীদ প্রণীত শারহু নাহজিল বালাগাহ্, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ২৫১

৪৯. খিসাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৮
৫০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১
৫১. বিহারুল আনওয়ার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪
৫২. নাসেখ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৭
৫৩. و يحك غيب عني وجهك فلا أرينك
৫৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯- ৭২
৫৫. অতঃপর তিনি হেসে ফেললেন, এমনকি তাঁর পেছনের সারির দাঁতসমূহ প্রকাশিত হয়ে পড়ল। অথচ মহানবী (সা.)- এর হাসি ছিল মৃদু অর্থাৎ হাসার সময় তাঁর দাঁত দেখা যেত না।
৫৬. এই আ ত্যাগী মহিলার বীরত্ব ও সেবা এখানেই শেষ হয় নি; পরবর্তীতে নিজ সন্তানসহ মুসাইলিমা কায্যাবের ফিতনার সময় যুদ্ধে গমন করেছিলেন এবং সে যুদ্ধে তিনি তাঁর একখানা হাত হারিয়েছিলেন।
৫৭. ইবনে আবিল হাদীদ প্রণীত শারহু নাহজিল বালাগাহ, ১৪তম খণ্ড পৃ. ২৬৫- ২৬৭; উসদুল গাবাহ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৫
৫৮. বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৪৪- ৪৫
৫৯. সূরা নাহল : ১২৬
৬০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৮; বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ১৩১
৬১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫
৬২. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৯
৬৩. ইরাকের পক্ষ থেকে ইসলামী ইরানের ওপর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে আ ত্যাগী নারীদের বহু বিরল দৃষ্টান্ত দেখা গেছে, ইতিহাসে যার নযীর শুধু মহানবী (সা.)- এর যুগের নারীগণের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। সত্যিই বিশ্ব পুনর্বীর ঈমানের বিস্ময়কর প্রভাব দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে!
৬৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৯
৬৫. নাহজুল বালাগাহর ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ২৬২- এ ইবনে আবিল হাদীদের বর্ণনা অনুযায়ী মহিলা এ আয়াত তেলাওয়াত করেন :

ورد الله الَّذِينَ كَفَرُوا بِغِيظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَ كَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا

অতঃপর তিনি লিখেছেন, নিশ্চয়ই তিনি আয়াতের প্রথম অংশের অর্থ পড়েছেন, সম্পূর্ণ আয়াত পড়েন নি।

কেননা এই আয়াত উল্লেখ যুদ্ধের পর খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।

৬৬. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫

৬৭. কাশফুল গাম্মাহ, পৃ. ৫৪

৬৮. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০১

৬৯. শত্রু বাহিনীকে ধাওয়া করার জন্য মহানবীর ‘হামরাউল আসাদ’ পর্যন্ত যাওয়াকে একদল ঐতিহাসিক স্বতন্ত্র গায়ওয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে কেউ কেউ একে উহুদ যুদ্ধের পরম্পরা বলেও মূল্যায়ন করেছেন।

৭০. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯

৭১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৪। আমরা পাদটীকাসমূহে রুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি লোর সূত্র উল্লেখ করেছি। সম্মানিত পাঠকগণ বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নের তথ্যসূত্র লো দেখতে পারেন। এ গ্রন্থ লেখার সময় লেখক এসব সূত্রের সাহায্য নিয়েছেন। তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬- ৪৯; আল ওয়াকিদী প্রণীত মাগাযী, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৩৪০; ইবনে আবিল হাদীদ প্রণীত শারহু নাহজিল বালাগাহ, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ১৪- ২১৮ এবং ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৬০; বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ১৪- ১৪৬

৭২. আল ওয়াকিদী প্রণীত মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪০- ২৪৬। উল্লেখ্য, হিজরতের চৌত্রিশতম মাসে হিজরী তৃতীয় সাল শেষ হয়। কাজেই পঁয়ত্রিশতম মাসের ঘটনাবলী হিজরী চতুর্থ সালের সাথেই সম্পৃক্ত।

৭৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯

৭৪. তাবাকাতে ইবনে সা’দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯

৭৫. এ প্রতিনিধিরা রাসূলের কাছে বলে :

ان فينا إسلاما فاشيا فابعث معنا نفرا من اصحابك يقرئونا القرآن و يفقهوننا في الإسلام

- আল ওয়াকিদী প্রণীত মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৪

৭৬. ‘তানঈম’ ম ার একটি স্থান যেখান থেকে হারাম এলাকা শুরু হয়। উমরা-ই- মুফরাদার জন্য এখানে পৌঁছে ইহরাম বাঁধতে হয়।

৭৭. মাগাযী গ্রন্থে আল ওয়াকিদী বলেন, উভয় বন্দীকে একই দিনে ফাঁসি কাঠে ঝুলানো হয়।- মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮

৭৮. আল ওয়াকিদী প্রণীত মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮

৭৯. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭০

৮০. সাফিনাতুল বিহার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭২

৮১. ওয়াকিদী প্রণীত মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪- ৩৬৯

৮২. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬- এর বর্ণনায় লোকটির নাম মুনিফির ইবনে মুহাম্মদ।
৮৩. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭
৮৪. মাগাযীর বর্ণনায় মহানবী বনী নাযীরের সর্দারদের বৈঠকে যোগদান করেন।- মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪
৮৫. আল ওয়াকিদী প্রণীত মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫
৮৬. চুক্তির মূল পাঠ ও বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ১১০- ১১১
৮৭. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯১
৮৮. সূরা হাশর : ৬
৮৯. শেখ মুফীদ প্রণীত কিতাবুল ইরশাদ, পৃ. ৪৭ ও ৪৮
৯০. ১৩৩৯ ফার্সী সালে (১৯৬০ ইংরেজি) আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল ড. অরশে তুনক ইরান আসেন। 'ইসলাম মাদকদ্রব্য সেবনকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে'- এ কথা জানার পর তিনি অত্যন্ত খুশী হন। তিনি মাদকদ্রব্যের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হবার জন্য শিয়া মাযহাবের তৎকালীন প্রধান আয়াতুল্লাহ আল উযমা বুরুজাদীর সাথে কোমে সাক্ষাতে আগ্রহী হন। এ কারণে ইসফাহানের জনৈক প্রসিদ্ধ ডাক্তারের সাথে তিনি কোমে আসেন। আয়াতুল্লাহ বুরুজাদীর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণের পর তাঁর বাসভবনে একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়।
- ঐ বৈঠকে উস্তাদ আল্লামা তাবাতবায়ী উপস্থিত ছিলেন। এই লেখক এবং তাঁর পিতা হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন জনাব হাজী মীর্জা মুহাম্মদ হুসাইন খেয়াবানীও অতিথিদের আসার আগে আয়াতুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন। এ কারণে অনেকটা বাধ্য হয়ে ঐ বৈঠকে থাকার সুযোগ হয়। সেক্রেটারী জেনারেলের প্রথম প্রশ্ন ছিল : ইসলাম কেন মাদকদ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ করেছে? মদ হারাম হবার যত লো কারণ ও যুক্তি আছে, তন্মধ্যে একটি মাত্র কারণ আয়াতুল্লাহ উল্লেখ করেন। আর তা ছিল মাদকদ্রব্য মানুষের জ্ঞান- বুদ্ধি হরণ করে। আর এই জ্ঞান- বুদ্ধি হচ্ছে অন্যান্য জীব এবং মানুষের মধ্যে পার্থক্যের উপাদান।
৯১. সূরা বাকারা : ২১৯
৯২. সূরা মায়িদাহ : ৯০
৯৩. মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৩; রুহুল মাআনী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৫
৯৪. সূরা মায়িদাহ : ৯০
৯৫. সূরা বাকারা : ২১৯

৯৬. সূরা আরাফ : ৩৩

৯৭. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৫; মাজমাউল বায়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৩

৯৮. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৮- ২০৯

৯৯. আল ওয়াকিদী প্রণীত মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯০- ৪০৫; হিজরতের পঁয়তাল্লিশতম মাসে এ ঘটনা সংঘটিত হয়।

১০০. তারিখুল খামীস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৭

১০১. প্রা ভূ

১০২. ইমতাউল আসমা, পৃ. ১৮৭; তারিখুল খামীস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৫

১০৩. তারিখুল খামীস গ্রন্থের রচয়িতা এ ঘটনার তারিখ ৫ম হিজরীর যিলকদ মাসে বলে মনে করেন। কিন্তু সামাজিক হিসাব- নিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে এ মতটি সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা মহানবী (সা.) পঞ্চম হিজরীর ২৪ শাওয়াল হতে ১৯ যিলহজ্ব পর্যন্ত পরিখার যুদ্ধ ও বনী কুরাইযার যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে এ রকম একটি বিয়ে সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। যায়নাবের সাথে বিয়ের ঘটনা যদি ৫ম হিজরীতে হয়ে থাকে, তা হলে অবশ্যই উল্লিখিত ঘটনাবলীর আগে সংঘটিত হয়ে থাকবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা এ ঘটনা পরিখার যুদ্ধ ও বনী কুরাইযা অভিযানের আগে উল্লেখ করলাম।

১০৪. উসদুল গাবাহ, ইস্তিআব ও আল ইসাবাহ গ্রন্থের ‘যাইদ’ অধ্যায়

১০৫. ৩৮ ও ৩৯ তম আয়াত :

ما كان علي النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل و كان أمر الله قدرا مقدورا الذين
يبلغون رسالات الله و يخشونه و لا يخشون أحدا إلا الله و كفي بالله حسيبا

“যাঁরা (যে সকল নবী) তাঁর (সা.) আগে গত হয়ে গেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নীতি যা ছিল, তিনি তাঁর ক্ষেত্রেও তা অবধারিত করেছেন। তাই এ ক্ষেত্রে এ নবীর পক্ষে তা পালন করতে কোন আপত্তি নেই। আর মহান আল্লাহর বিধান স্পষ্ট নির্ধারিত বিষয়। তাঁর পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণ মহান আল্লাহর বাণী (জনগণের কাছে) প্রচার করতেন এবং একমাত্র তাঁকেই ভয় করতেন; আর তাঁরা একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করেন না। আর মহান আল্লাহই হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট।”

১০৬. তারিখে কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২১

১০৭. আল্লামা রাযী প্রণীত মাফাতীহুল গাইব, ২৫তম খণ্ড, পৃ. ২১২; রুহুল মাআনী, ২২তম খণ্ড, পৃ.

২৩- ২৪

১০৮. ফখরুদ্দীন রাযী প্রণীত মাফাতীহুল গাইব, ২৫তম খণ্ড, পৃ. ২১২; রুহুল মাআনী, ২২তম খণ্ড, পৃ. ২৩- ২৪
১০৯. ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে এ গায়ওয়ার তারিখ হিজরতের পঞ্চম বর্ষের শাওয়াল বলে উল্লেখ করেছেন এবং যেহেতু আহযাবের যুদ্ধ ২৪ যিল দ সমাপ্ত হয়েছিল এবং মদীনা নগরী অবরোধকাল ছিল এক মাস, সেহেতু বলতে হয় যে, এ যুদ্ধ সম্ভবত ২৪ শাওয়াল সংঘটিত হয়ে থাকবে।
১১০. দাওমাতুল জান্দাল দামেশকের কাছে একটি এলাকা এবং অতীত কালের যানবাহন ব্যবহার করে পাঁচ দিনে দামেশক ও এ এলাকার দূরত্ব অতিক্রম করতে হতো। আর মদীনা থেকে এ এলাকার দূরত্ব ১৫ অথবা ১৬ দিনে অতিক্রম করা হতো।- তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪
১১১. ইবনে সা'দ প্রণীত তাবাকাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪; সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৩
১১২. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪১
১১৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৪; তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৩
১১৪. হায়াতু মুহাম্মদ, পৃ. ২৯৭
১১৫. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৩
১১৬. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৪
১১৭. আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৫
১১৮. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২০ এবং আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৩
১১৯. আল ওয়াকিদী প্রণীত মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৬; সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৪
১২০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮
১২১. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৫- ৪৫৬
১২২. বিহার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ২২৩
১২৩. দু'টি গোত্রের নাম যারা ইসলামের প্রচার সৈনিকদের তাদের নিজ ভূ- খণ্ডে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল এবং এরপর তারা তাদের হত্যা করেছিল।
১২৪. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮- ৪৫৯
১২৫. সীরাতে হালাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৫
১২৬. সীরাতে হালাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৫
১২৭. আল ইমতা, পৃ. ২৪০
১২৮. সীরাতে হালাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৯

১২৯. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯
১৩০. আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭০
১৩১. বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ২২৭
১৩২. বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ২১৬ এবং আল হাকিম সংকলিত আল মুস্তাদরাক, ৩০তম খণ্ড, পৃ. ৩০- ৩২
১৩৩. আল হাকিম প্রণীত আল মুস্তাদরাক, ৩০তম খণ্ড, পৃ. ৩২
১৩৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৩; বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ২৫২
১৩৫. কারণ নিঃসন্দেহে যুদ্ধ হচ্ছে ছিল- চাতুরী (فإنَّ الحربَ تُدعى)
১৩৬. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৯- ২৩১; তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪২- ২৪৩
১৩৭. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪
১৩৮. এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪০৫- ৪০৮ পৃষ্ঠা
১৩৯. মহানবীর পক্ষ থেকে আহ্বানকারী এ কথা বলেছিলেন : من كان سامعا مطيعا فلا يُصَلِّينَ العصرَ إلاَّ بيِّنِي قريظة “যে এ ঘোষণা শুনতে পাবে এবং আনুগত্যশীল থাকবে, তার উচিত হবে বনী কুরাইযার মহল্লায় আসরের নামায় আদায় করা।”
১৪০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪; তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৫- ২৪৬
১৪১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫
১৪২. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৭
১৪৩. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০১
১৪৪. শেখ মুফীদ প্রণীত কিতাবুল ইরশাদ, পৃ. ৫০
১৪৫. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১০
১৪৬. এ চুক্তির মূলভাষ্যে বনী কুরাইযাহ গোত্রের প্রধান কা’ব ইবনে আসাদ স্বাক্ষর করেছিলেন যা এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।
১৪৭. তাওরাত, সিফরে তাসনীয়াহ, ২০তম অধ্যায়
১৪৮. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫০
১৪৯. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫০- ২৫৪

১৫০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯১, প্রকাশকাল ১৩৫৫ হিজরী- এর বর্ণনা মতে সাল্লামকে হত্যার ঘটনা পঞ্চম হিজরীর শেষ দিকে ঘটেছিল। কিন্তু যেহেতু বনী কুরাইযাহ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীর ১৯ যিলহজ্জ সংঘটিত হয়েছিল, সেহেতু তার হত্যার ঘটনা ঐ বছর ঘটে নি।

১৫১. মহানবী (সা.) খায়রাজ গোত্রের ওপর এ কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন এ কারণে যে, ইতোপূর্বে আউস গোত্র তাদের শত্রু কা'ব আশরাফকে হত্যায় সক্ষম হয় এবং এজন্য তারা গর্বিত ছিল। খায়রাজ গোত্রও যেন এরূপ রক্তপূর্ণ কোন শত্রুকে হত্যার কৃতিত্ব পায়, সে সুযোগ দানের জন্যই তিনি তাদেরকে প্রেরণ করেন।

১৫২. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৪- ২৭৫

১৫৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৬- ২৭৭

১৫৪. আল ওয়াকিদী প্রণীত মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৫; তারিখে তাবাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৪

১৫৫. এ স্থানটি বনী গাতফান গোত্রের বসতির নিকটে অবস্থিত পুকুরের পার।

১৫৬. তারিখে তাবাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫; আল ওয়াকিদী প্রণীত মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৭- ৫৪৯

১৫৭. কোন ইচ্ছা পূরণের ফলে আল্লাহর নামে শপথ করে কোন কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া

১৫৮. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮১- ২৮৯; আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩

১৫৯. তারিখে তাবাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬০;

১৬০. কোন কোন ঐতিহাসিক 'জাহজাহ্ ইবনে মাসউদ' বলেছেন।

১৬১. সীরাতে ইবনে হিশামের সংযুক্তিতে সুহাইলী হতে বর্ণিত হয়েছে।

১৬২. দ্বিতীয় খলীফার জীবনী অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, তিনি কখনোই যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব দেখাতে পারেন নি এবং পেছনের সারিতে ছিলেন। কিন্তু যখনই মুসলমানরা কোন শত্রুসেনাকে বন্দী করত, তখন তিনি সবার সামনে এগিয়ে রাসূলকে পরামর্শ দিতেন ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করার। এরূপ কয়েকটি নমুনা হলো :

ক. আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যার জন্য বলা।

খ. ম া বিজয়ের পটভূমিতে হাতেব ইবনে আবি বালতাআকে হত্যার পরামর্শ দান, যিনি তাঁর নিকটায়ীদের রক্ষার ইচ্ছায় ম ায় গোপনে পত্র দিয়েছিলেন।

গ. রাসূলের চাচা আব্বাস আবু সুফিয়ানকে (ম া বিজয়ের সময়) আশ্রয়দানের লক্ষ্যে মুসলমানদের শিবিরে নিয়ে এলে তিনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দানের নির্দেশ দেয়ার পরামর্শ দেন। এরূপ অন্যান্য ঘটনা আপনারা এ গ্রন্থের পূর্ববর্তী অধ্যায় লোয় দেখেছেন বা পরবর্তী অধ্যায় লোয় লক্ষ্য করবেন।

১৬৩. তারিখে তাবাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬১- ২৬২; তাফসীরে মাজমাউল বায়ান, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৯২- ২৯৫

১৬৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৫; তাফসীরে কুমী, পৃ. ৬৮১; তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৪
১৬৫. এরূপ বিশেষণ ব্যবহার করার কারণ হলো ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কিত আয়াতের দু'ধরনের শানে নুযূল (অবতীর্ণের কারণ) বর্ণিত হয়েছে। লেখকের নিকট কোনটিই সঠিক প্রমাণিত নয়। বিষয়টি অপ্রমাণিত হওয়ার সপক্ষে দলিলসমূহ এ অধ্যায়ে আলোচিত হবে। তবে এ সম্পর্কিত আয়াত ও রেওয়ায়েত হতে এটুকু জানা যায়, ঐ সমাজে বাসকারী একজন সম্মানিতা নারীর বিষয়ে এরূপ অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই নারী কে, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।
১৬৬. উটের উপর বসার জন্য পালকীর ন্যায় ছোট কক্ষ, যা বিশ্রামের সময় নামিয়ে রাখা হয়।
১৬৭. সহীহ বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০২- ১০৩ এবং ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৮ সূরা নূরের তাফসীর
১৬৮. সা'দ ইবনে মায়ায় আউস গোত্রের প্রধান এবং সা'দ ইবনে উবাদা খায়রাজ গোত্রের প্রধান ছিলেন। এ দুই গোত্রের মধ্যে পূর্বে দ্বন্দ্ব ছিল এবং মুনাফিক আবদুল্লাহ খায়রাজ গোত্রভুক্ত ছিল।
১৬৯. হাদীসও হতে পারে
১৭০. সহীহ বুখারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৮; ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০২- ১০৩
১৭১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫০
১৭২. মাজমাউল বায়ান, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২৬
১৭৩. যে চার মাসে যুদ্ধ করা হারাম বলে আরবরা জানত এবং ইসলামও তা সমর্থন করেছে।
১৭৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৯
১৭৫. রওজাতুল কাফি, পৃ. ৩২২
১৭৬. মাজমাউল বায়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৮
১৭৭. দু'টি মূর্তির নাম।
১৭৮. বিহারুল আনওয়ার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩০
১৭৯. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭০- ২৭২
১৮০. অবশ্য তাবারীর বর্ণনামতে (২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৬) সে সাকাফীর পরে প্রেরিত হয়।
১৮১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৪; তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৪- ২৭৫
১৮২. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮
১৮৩. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮- ২৭৯

১৮৪. শেখ মুফিদ প্রণীত কিতাব আল ইরশাদ, পৃ. ৬০; আলামুল ওয়ারা, পৃ. ১০৬; বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৩৬৮। তাবারী এ ক্ষেত্রে বর্ণনায় ভুল করে বলেছেন : “মহানবী (সা.) স্বহস্তে নিজের নাম সেখানে লিখেন।” আমরা ‘মাকতাবে ওয়াহী’ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।
১৮৫. ইবনে আসির প্রণীত তারিখে কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮; বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩
১৮৬. ইবনে আসির প্রণীত তারিখে কামিল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬২
১৮৭. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪
১৮৮. বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩
১৮৯. মাজমাউল বায়ান, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১১৭
১৯০. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫- ২৬
১৯১. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২; বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৩১২
১৯২. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮১; বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩; সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮
১৯৩. এ বিষয়ে আমরা অষ্টম হিজরীতে ম া বিজয়ের ঘটনা পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করব।
১৯৪. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সীরাতে ইবনে হিশাম, ‘হৃদয়বিয়ার সন্ধি’ অধ্যায়। প্রতিবাদীদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)- এর নবুওয়াতের বিষয়েও সন্দেহ করে মন্তব্য করেছিলেন।
১৯৫. ‘যুল হুলাইফা’ মদীনার ছয় বা সাত মাইল দূরের একটি গ্রাম, যেখানে প্রতি বছর একদল হাজী হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে থাকেন।
১৯৬. ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৪; তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৪
১৯৭. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৩
১৯৮. ইসলাম ধর্মের বড় বড় জ্ঞানী- নী আলেম মহানবী (সা.)- এর সকল পত্র যথাসাধ্য সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিস্তারিত ও সামগ্রিক তথ্য লাভ এবং গবেষণাধর্মী অধ্যয়ন করার জন্য নিম্নোক্ত দু’টি গ্রন্থ অত্যন্ত মূল্যবান :
- ক. প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফেসর মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ হায়দারাবাদী প্রণীত আল ওয়াসাইকুস্ সিয়াসীয়াহ্ (রাজনৈতিক দলিলসমূহ)
- খ. আলী আশ্ফদী প্রণীত মাকাতীবুর রাসূল (সা.) [রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর পত্রাবলী]

১৯৯. এ স্থানে অবশ্যই দু'টি বিষয়কে পরস্পর থেকে পৃথক করতে হবে : ক. মহানবী (সা.)- এর বিশ্বজনীন রিসালত এবং খ. তাঁর ধর্মের সর্বশেষ ধর্ম হওয়া (খতমে নবুওয়াত)। প্রথম ক্ষেত্রে তাঁর ধর্মের বিশ্বজনীনতা অথবা বিশ্বজনীন না হওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়ে থাকে অর্থাৎ তিনি কি একমাত্র আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদের কাছেই প্রেরিত হয়েছেন অথবা সমগ্র মানব জাতীর জন্য প্রেরিত হয়েছেন। অথচ দ্বিতীয় বিষয়টির ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসেবে মহানবী (সা.)- এর সর্বশেষ নবী হওয়ার বিষয়টি উত্থাপিত হয়। সম্ভবত কেউ কেউ বলতে পারেন যে, মুহাম্মদ (সা.)- এর ধর্ম বিশ্বজনীন, তবে তিনি সর্বশেষ নবী নন অথবা তাঁর ধর্ম সর্বশেষ ধর্ম নয়। তাঁর পরে অন্য কোন নবী অথবা অন্য কোন শরীয়ত আসবে। আর এ কারণেই নবুওয়াত-ই খাসসাহ্ (বিশেষ নবুওয়াত) শীর্ষক অধ্যায়ে অবশ্যই এ দু'টি বিষয়কে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা উচিত এবং আমরা মাফাহীমুল কুরআন গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে এ দু'টি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি (খতমে নবুওয়াত) সংক্রান্ত আলোচনাটি ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠকবৃন্দ এর মূল আরবী পাঠ অথবা ফার্সী অনুবাদ অধ্যয়ন করতে পারেন।

২০০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০৬; ইবনে সা'দ প্রণীত আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৪ এবং সীরাতে হালাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪০

২০১. আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫; সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭১

২০২. বুসরা হাওরান প্রদেশের রাজধানী ছিল, যা তখন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের একটি উপনিবেশ বলে গণ্য হতো। হারিস ইবনে আবি শিমর এবং সার্বিকভাবে গাসসানী রাজাগণ কায়সারের তাঁবেদার শাসক হিসেবে এ অঞ্চলের শাসনকাজ পরিচালনা করতেন।

২০৩. 'আরীসী' শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভিন্নতা আছে। আন নিহায়াহ্ গ্রন্থে ইবনে আমীর (১ম খণ্ড, পৃ. ৩১) লিখেছেন, এ শব্দের অর্থ দরবারের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। তবে কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে কৃষকগণ। কারণ, তখনকার অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী ছিল। আর যে বিষয়টি এ অভিমতের সমর্থক তা হচ্ছে, কতিপয় পাণ্ডুলিপিতে (আল কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫) 'আরীসীন' শব্দের স্থলে আ 'রীন্ (أرئین) শব্দের উল্লেখ আছে এবং আ 'র (أرئ) শব্দের অর্থ হচ্ছে কৃষক। কখনো কখনো এ

সম্ভাবনাও দেয়া হয় যে, আরীস হচ্ছে একটি গোত্র বা সম্প্রদায়ের নাম, যারা রোমে বসবাস করত।

২০৪. পত্রটির আরবী পাঠ :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى هِرْقَلِ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَيَّ مِنْ أَتْبَعِ الْهُدَى. أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّقِ
أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ، أَسْلَمَ تَسْلَمُ يَأْتِيكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ. فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَأَتَاكَ عَلَيْكَ أَثْمٌ ((الْأُرَيْسِينَ)) وَ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

২০৫. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯০ এবং বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮- ৩৮০
২০৬. আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৯; সীরাতে হালাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৭; আল কামিল
ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪ এবং বিহারুল আনওয়ার, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯
২০৭. ইবনে সা'দ আত তাবাকাতুল কুবরায় (১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫) দূতগণকে প্রেরণ করার তারিখ হিজরতের
সপ্তম বর্ষের মুহররম মাস বলে উল্লেখ করেছেন।
২০৮. আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০; তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৫- ২৯৬; আল
কামিল ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫; বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯
২০৯. প্রাচীন পারস্যের কিয়ান বংশীয় এক প্রসিদ্ধ বাদশার নাম। এখানে দুর্দান্ত প্রতাপশালী রাজাধিরাজ অর্থে
২১০. আত তাবাকাতুল আল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০
২১১. মহানবী (সা.)- এর প্রেরিত পত্রের মূল পাঠ
২১২. আসলে মহানবীর পত্রসমূহ সে সময়ের জালেম শাসনকর্তাদের দুঃশাসনের পতন- ঘণ্টা বাজিয়েছিল,
যেন সেসব তাদের গর্দান ঝড়িয়ে দিয়েছিল।
২১৩. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২ - وَأَمْرُ اللَّهِ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ
২১৪. মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬
২১৫. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮
২১৬. ইবনে আসির প্রণীত আল কামিল ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬
২১৭. আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০; বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৩৮২
২১৮. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৯; আদ দুররুল মানসুর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০; আইয়ানুশ শিয়া,
১ম খণ্ড, পৃ. ১৪২
২১৯. উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২
২২০. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫০
২২১. সীরাতে জাইনী দাহলান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭১

২২২. আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০
২২৩. বর্তমান ফিলিস্তিন সীমান্ত
২২৪. সীরাতে জাইনী দাহলান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭০
২২৫. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৯
২২৬. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৯; আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৯
২২৭. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৯; আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৯
২২৮. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৪; বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৩৯২
২২৯. আলামুল ওয়ারা, পৃ. ৩১
২৩০. উসদুল গাবাহ্ ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২
২৩১. তাবারী পুত্রের নাম 'বারহা' বলেছেন।
২৩২. আল কামিল ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬; আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬২
২৩৩. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬; তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬
২৩৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩০
২৩৫. শেখ তুসী প্রণীত আমালী, পৃ. ১৬৪; ইবনে হিশাম তাঁর আস্ সিরাতুন্ নাবাতীয়া গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৮) ইসলামী সেনাদের খাইবরমুখী যাত্রার সময় মুহররম মাস বলেছেন। কিন্তু ইবনে সা'দ তাঁর আত তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭) খাইবর অভিমুখে যাত্রার সময় সপ্তম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাস বলেছেন। যেহেতু বিভিন্ন দেশের রা প্রধান ও গোত্রপতিদের প্রতি পত্র প্রেরণ মুহররম মাসে ঘটেছিল, সেহেতু দ্বিতীয় বর্ণনা অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। বিশেষত মহানবীর প্রেরিত দূত আমর ইবনে উমাইয়্যা নাজ্জাশীর দরবারে পত্র নিয়ে যাওয়ার পর আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানরা খাইবরে মহানবীর সাথে মিলিত হন বিধায় এ বর্ণনা সঠিক বলে মনে হয়। কারণ রাসূলের দূত আবিসিনিয়ায় গিয়ে মুহাজিরগণকে নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং পরে খাইবরের দিকে যাত্রা করেন। তাই মুহররম মাস হতে কয়েক মাস সময় লেগেছে।
২৩৬. আল কামিল ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭
২৩৭. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮
২৩৮. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯
২৩৯. উসদুল গাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৪
২৪০. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০

২৪১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪২
২৪২. খন্দকের যুদ্ধে নিহত।
২৪৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৫
২৪৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩২ ও ৩৫০
২৪৫. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০০
২৪৬. মাজমাউল বায়ান, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২০; সীরাতে হালাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭; সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৪
২৪৭. বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিক ইবনে আবিল হাদীদ দু'জন শীর্ষস্থানীয় নেতার যুদ্ধ হতে পলায়নের ঘটনায় এতটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, এক বিখ্যাত কাসিদায় বলেছেন :

و ما انس لا انس اللذين تقدموا و فرّهما والفر، قد علما

যদি সব কিছু ভুলে যাই, কখনোই এ দুই সেনাপতির পলায়নের ঘটনা ভুলে যাব না। কারণ তাঁরা তরবারি হাতে যুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং জানতেন, যুদ্ধ হতে পলায়ন হারাম। তথাপি তাঁরা শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়েছিলেন।

و للراية العظيمة و قد ذهبها و ملابس ذل فوقها، و جلابيب

তাঁরা মহান পতাকা বহন করে শত্রুর দিকে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাঁরা অপমানের পোশাক দ্বারা তা আবৃত করেছিলেন।

يشلّهما من آل موسي شمردل طويل نجاد السيف، اجيد يعبوب

মূসার বংশধর হতে এক সাহসী যুবক তাদের ধাওয়া করছিল; সে দীর্ঘাঙ্গ যুবকটি দ্রুতগামী অশ্বের উপর আরোহণ করে উন্মুক্ত তরবারি হাতে তেড়ে আসছিল।

২৪৮. হযরত আলী (আ.) তাঁবুর মধ্য থেকে মহানবীর বক্তব্য শুনে পরম আশা নিয়ে বললেন :

اللهم لا معطى لما منعت و لا مانع لما أعطيت

“হে আল্লাহ! আপনি যাতে বাধ সাধেন, তা কেউ দিতে সক্ষম নয় এবং আপনি যা দিতে চান, কেউ তা ফিরিয়ে রাখতে পারে না।”- সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫

২৪৯. তাবারীর ভাষায় : فتناول ابوبكر و عمر

২৫০. বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ২৮

২৫১. সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫; সহীহ বুখারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮, ফাজায়েলে আলী ইবনে আবী তালিব

২৫২. ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে মারহাবের কবিতাটি অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন।

২৫৩. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪; সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৯

২৫৪. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬; ইয়াকুবী দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের জন্য অন্য একক ব্যবহার করেছেন, যা উক্ত মাপের অনুরূপ।

২৫৫. শেখ মুফিদ প্রণীত আল ইরশাদ, পৃ. ৫৯

২৫৬. বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ২১

২৫৭. সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৮

২৫৮. প্রা ক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫

২৫৯. প্রা ক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৯

২৬০. সহীহ মুসলিম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১২০

২৬১. কারা সত্যপন্থী তা প্রমাণের জন্য এ দুআ করা যে, অসৎপন্থীরা আল্লাহর লানতে ধ্বংস হোক।

২৬২. নাসিখুত তাওয়ারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৯

২৬৩. প্রা ক্ত, পৃ. ৪০

২৬৪. তারিখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০২

২৬৫. সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৭; বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ৩৩

২৬৬. ওয়াসায়েলুশ্ শিয়া, ‘জিহাদে নাফস’ অধ্যায়, হাদীস নং ৪

২৬৭. সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৯

২৬৮. শেখ সাদুক প্রণীত আল খিসাল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬; ফুরুয়ে কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৯

২৬৯. বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ৩২

২৭০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১

২৭১. প্রা জ, পৃ. ৩৫৬
২৭২. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৫; ফুরুয়ে কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৫
২৭৩. অনেকের বর্ণনা মতে মহানবী (সা.) তাঁর মৃত্যুশয্যা বলেছিলেন : “আমার এ অসুস্থতা ঐ ইহুদী নারীর দেয়া খাদ্যের বিক্রিয়ায় ঘটেছে যা খাইবরের বিজয়ের পর সে দিয়েছিল।” অর্থাৎ ঐ বিষ এতটা মারাক ছিল যে, তা তাঁর লালার সাথে পেটে যায় ও রক্তে ধীরে ধীরে বিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।
২৭৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৯; বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ৩৩
২৭৫. সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৯-৩৭০
২৭৬. ইহুদীদের সীমা লনের ঘটনা এ দু’টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় ষড়যন্ত্র করেছে এবং তাদের মারাক ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে। খলীফা হযরত উমরের শাসনামলে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ একদল ইহুদীর সাথে চুক্তি করার উদ্দেশ্যে গেলে তারা তাঁকে আহত করে। খলীফা ঘটনা জানতে পেরে সমাধানের পথ খুঁজতে থাকেন। এ ধরনের সীমা লন অব্যাহত থাকায় রাসূলের এক হাদীসের ভিত্তিতে তিনি তাদেরকে আরব ভূখণ্ড থেকে বহিস্কার করেন।
২৭৭. যে মিথ্যা সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। এটির সঙ্গে স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মিথ্যা বলার পার্থক্য রয়েছে।
২৭৮. বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ৩৪
২৭৯. মারাসিদুল ইত্তেলা’ নামক গ্রন্থে كذّب ‘ফাদাক’ ধাতু দেখুন।
২৮০. সূরা হাশর ৬ ও ৭ নং আয়াত; এ বিষয়টি ফিকহী গ্রন্থসমূহের জিহাদ অধ্যায়ে ‘ফাই ও আনফাল’ শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
২৮১. সূরা ইসরা : ২৬
২৮২. মাজমাউল বায়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১১ এবং শারহু নাহজিল বালাগাহ, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২৪৮
২৮৩. আদ দুররুল মানসূর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৬
২৮৪. মাজমাউল বায়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১১; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪৫
২৮৫. ইবনে আবীল হাদীদ প্রণীত শারহু নাহজিল বালাগাহ, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ২১৭
২৮৬. নাহজুল বালাগাহ, পত্র ৪৫
২৮৭. ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪৩

২৮৮. “হে আহলে বাইত! নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাদের থেকে (সব ধরনের) পঙ্কিলতা দূর করে আপনাদের পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান” (إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا) সূরা আহযাব :

৩৩

২৮৯. ইবনে আবীল হাদীদ প্রণীত শারহু নাহজিল বালাগাহ, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪

২৯০. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০০

২৯১. আমরা এ অধ্যায়ের শুরুতে মারাসিদুল ইত্তেলা গ্রন্থ থেকে ফাদাক ভূখণ্ডের উর্বরতার বিষয়টি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি।

২৯২. ইবনে আবীল হাদীদ প্রণীত শারহু নাহজিল বালাগাহ, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২৩৬

২৯৩. প্রা জ্ঞ, পৃ. ২৭৮

২৯৪. সূরা মারিয়াম : ৬

২৯৫. সূরা নামল : ১৬

২৯৬. আত তাবারী প্রণীত ইহতিজাজ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫, নাজাফ থেকে মুদ্রিত।

২৯৭. তারিখে কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫০

২৯৮. উমরা কতক লো বিশেষ আমলের সমষ্টি যা বছরের সকল দিবসেই আঞ্জাম দেয়া যায়। উমরার বিপরীত হচ্ছে হজ্জের আমলসমূহ যেসব অবশ্যই যিলহজ্ব মাসেই আঞ্জাম দিতে হয়। মহানবী (সা.) হিজরতের সপ্তম বর্ষের ৬ যিল দ সোমবার উমরা পালনের জন্য পবিত্র মার উদ্দেশে যাত্রা করেন।

২৯৯. পবিত্র মার নগরী ও এর চারদিকের কিয়দংশকে হারাম বলা হয়।

৩০০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭

৩০১. হারওয়ানা হচ্ছে এক বিশেষ ভঙ্গিতে হাঁটা যার গতি স্বাভাবিক হাঁটার চেয়ে ততর, আবার দৌড়ানোর চেয়ে কম গতিসম্পন্ন।

৩০২. সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২- ১৪ এবং তারিখুল ইসলাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২- ৬৫

৩০৩. ওয়াকিদী তাঁর আল মাগাযী গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৭৪৩- ৭৪৫ পৃষ্ঠায় ইসলাম ধর্মের প্রতি এ সেনাপতির ঝুঁকে পড়ার মূল কারণ অন্যভাবে লিখেছেন।

৩০৪. আত তাবাকাতুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫১- ২৬১

৩০৫. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮

৩০৬. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৭- ৫৫৮

৩০৭. দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে তিনি বলেছেন :

حيّ يقال إذا مروا علي جسدی أرشده الله من غاز وقد رشدا

অর্থাৎ যখন অন্যেরা আমার কবর অথবা রক্তে রঞ্জিত লাশ দেখবে, তখন তারা আমার প্রাণপণ সংগ্রাম করার জন্য প্রশংসা এবং আমার জন্য দুআ করবে।- বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ৬০ এবং আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮

৩০৮. সূরা মারিয়াম : ৭১

৩০৯. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৪

৩১০. উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭

৩১১. এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি বীরত্বগাঁথা আছে যা ইবনে মুযাহিম তাঁর ওয়াকয়াতু সিফফীন (সিফফীনের যুদ্ধ) গ্রন্থে (পৃ. ৪৯) উদ্ধৃত করেছেন :

لو ان عدى يابن حرب جعفرأ أو حمزة القوم الممام الأزهرا

رأت قریش نجم ليل ظهر

“হে হারব্ তনয়! যদি থাকত আমার জাফর অথবা

জাতির সেই উজ্জ্বলতম সাহসী বীর হামযাহ,

তা হলে কুরাইশরা* দেখতে পেত দ্বি- প্রহরে রাতের তারা।”

(* এখানে কুরাইশ বলতে মুআবিয়া, বনী উমাইয়্যা ও তাদের দলকে বোঝানো হয়েছে, যারা হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। জাফর ও হামযাহ জীবিত থাকলে এ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর অবস্থা এতটা শোচনীয় হতো যে, তাদের দিন আঁধার রাতে পরিণত হতো। আঁধার রাতে আকাশে তারা দৃষ্টিগোচর হয়। সেজন্য আলী (আ.) বলেছেন : কুরাইশরা দেখতে পেত দ্বি- প্রহরে রাতের তারা।”- অনুবাদক)

৩১২.

فلا يبعدن الله قتلي تتابعوا بموته منهم ذو الجناحين جعفر

و زيد و عبد الله حين تتابعوا جميعا واسباب المنية تحظر

আপনারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, تتابعوا শব্দটি এ বিষয়ের জীবন্ত সাক্ষী যে, এ তিন সেনাপতি ও সর্বাধিনায়কের মৃত্যু একের পর এক সংঘটিত হয়েছে এবং প্রথমে জাফর শাহাদাত লাভ করেন। এ শব্দের অর্থ এখানে তাঁরা সকলে একের পর এক অধিনায়ক হয়েছেন এভাবে যে, জাফরের পরে যাইদ, যাইদের পরে আবদুল্লাহ...

৩১৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৪- ৩৮৭

৩১৪. ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬০ এবং সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৫

৩১৫. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৮

৩১৬. প্রা জু, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮১, ৩৮৮ ও ৩৮৯

৩১৭. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৩

৩১৮. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮২- ৩৮৩ এবং সীরাতে হালাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯

৩১৯. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৯

৩২০. বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ৫৪- ৫৫ এবং ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৬

৩২১. নাহজুল বালাগাহ্ চিঠি- পত্রের অধ্যায়, ৩৩ ও ৪৫ নং পত্র। ইসলামী হুকুমতে (সরকার) গোয়েন্দাবৃত্তি ও তথ্য- উপাত্ত সংগ্রহ সংক্রান্ত ব্যবস্থা ‘ইসলামী হুকুমতের মূল ভিত্তি ও মূলনীতিসমূহ (২য় খণ্ড)’ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩২২. তাফসীরে আলী ইবনে ইবরাহীম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৪, সূরা আল আদিয়াত

৩২৩. ওয়াদী আর রামল (বালুর উপত্যকা), ওয়াদী ইয়াবিস (শুষ্ক উপত্যকা) হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৩২৪. শেখ আল মুফীদ প্রণীত কিতাব আল ইরশাদ, পৃ. ৮৬

৩২৫. প্রা জু, পৃ. ৮৪

৩২৬. তাফসীরে ফুরাত, পৃ. ২২২- ২২৬ এবং মাজমাউল বায়ান, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫২৮

৩২৭. পবিত্র কুরআনের শপথসমূহ এবং সেসবের রক্ত অনুধাবন করার জন্য ‘সৌগান্দহয়ে কুরআন’ (পবিত্র কুরআনের শপথসমূহ) নামক গ্রন্থ, যা আমাদের একজন প্রিয়ভাজন বন্ধু আবুল কাসিম রাযযাকী রচিত এবং আমার পক্ষ থেকে ভূমিকাসহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে, তা অধ্যয়ন করুন।

৩২৮. তারিখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০; সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯০- ১৯১ এবং ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৯- ৭৭৪
৩২৯. বনি বকর বিন আবদে মানাত বিন কিনানাহ্, কিনানাহ্ গোত্রের একটি শাখা
৩৩০. বুদাইল খুযাআহ্ গোত্রের একজন প্রবীণ ব্যক্তিত্ব যিনি পবিত্র ম া নগরীতে বসবাস করতেন এবং তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। দেখুন : শেখ তুসী প্রণীত আল আমালী, পৃ. ২৩৯
৩৩১. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯২
৩৩২. মদীনার পথে পবিত্র ম ার দুই মজিল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থানের নাম।
৩৩৩. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮০- ৭৯৪; সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৯- ৩৯৭ এবং বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ১০২
৩৩৪. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭৯- ৮০০
৩৩৫. বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ১৩৬
৩৩৬. হাতিব من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَرِيدُكُمْ فَخُذُوا حِذْرَكُمْ : চিঠির মূল পাঠ
- ইবনে আবী বালতাআর নিকট থেকে ম ার অধিবাসীদের প্রতি : নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত, তাই তোমরা অস্ত্র- শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিজেদেরকে রক্ষা কর।
৩৩৭. ইবনে হিশামের বর্ণনানুসারে খালীকাহ্ নামের একটি অঞ্চলে
৩৩৮. সূরা মুমতাহিনাহ্ : ১ এবং এ প্রসঙ্গে যে সব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, সেসব হচ্ছে এ সূরার ১ম আয়াত থেকে ৯ম আয়াত পর্যন্ত এ নয় আয়াত।- সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৯ এবং মাজমাউল বায়ান, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৬৯- ২৭০
৩৩৯. ওয়াসাইলুশ্ শিয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১২৪ এবং সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯০
৩৪০. ইংল্যান্ডবাসী টমাস কার্লাইলের Heros & Hero's Worship
৩৪১. সূরা ইসরার ৯০- ৯৩ নং আয়াতসমূহে তার অযৌক্তিক আবদার উল্লেখ করা হয়েছে। মাজমাউল বায়ান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯; উসদুল গাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১৩- ২১৪
৩৪২. আল ইসাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯০
৩৪৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০২
৩৪৪. বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ১১৪

৩৪৫. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০০-৪০৪; মাজমাউল বায়ান, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৪-৫৫৬; ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১৬-৮১৮ এবং ইবনে আবীল হাদীদ প্রণীত শারহু নাহজিল বালাগাহ, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ২৮৬

৩৪৬. বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক আল ওয়াকিদী তাঁর আল মাগাযী গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৮০০-৮০১ এবং ৮১৯ পৃষ্ঠায় নির্ভুলভাবে সেনাবাহিনীর ইউনিট এবং সেসবের সাথে সংশ্লিষ্ট সৈন্যদের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে আবীল হাদীদও তাঁর প্রণীত গ্রন্থে (১৭তম খণ্ড, পৃ. ২৭০-২৭১) তা উল্লেখ করেছেন।

৩৪৭. ইমতাউল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯

৩৪৮. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৮; ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৮২৫-৮২৬ পৃষ্ঠার বর্ণনা মতে ২৮ জন নিহত হয়েছিল।

৩৪৯. ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩৩

৩৫০. এ ঐতিহাসিক ফযীলতের দলিল- প্রমাণ আল গাদীর গ্রন্থের ৭ম খণ্ডের ১০- ১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

৩৫১. ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩৫ এবং বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ১০৭- ১৩২

৩৫২. বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ১০৭

৩৫৩. প্রা ক্ত, পৃ. ১১১

৩৫৪. ভাষণের এ সব উল্লেখযোগ্য অংশ বর্ণনা করা সংক্রান্ত আমাদের দলিল লো হচ্ছে রওয়াতুল কাফী, পৃ.

২৪৬, সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১২, ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩৬, বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ১০৫ এবং ইবনে আবীল হাদীদ প্রণীত শারহু নাহজিল বালাগাহ, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ২৮১

৩৫৫. ইবনে হিশাম বলেছেন : এ দু' ব্যক্তি ছিল হারিস ইবনে হিশাম ও যুহাইর ইবনে আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরা।

৩৫৬. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৭

৩৫৭. হিজরতের পূর্বে অনুষ্ঠিত আকাবার বাইআতে সত্তরের চেয়ে কিছু বেশি সংখ্যক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে বাইআত করেছিলেন, যাঁদের মধ্যে দু'জন নারীও ছিলেন।

৩৫৮. সূরা মুমতাহিনা : ১২

৩৫৯. এজন্য মুআবিয়ার মাকে 'আকিলাতুল আকবাদ' (কলিজা ভক্ষণকারিণী) এবং মুআবিয়া ও ইয়াযীদকে 'আবনাউ আকিলাতুল আকবাদ' (কলিজা ভক্ষণকারিণীর সন্তান বা বংশধর) বলা হয়।- অনুবাদক

৩৬০. মুক্ত নারী বলতে যে নারী দাসী নয় তাকে বোঝানো হয়েছে।
৩৬১. ‘এবং তারা ব্যভিচার করবে না’।
৩৬২. মাজমাউল বায়ান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৬
৩৬৩. বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ১৪০
৩৬৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২০
৩৬৫. শেখ সাদুক প্রণীত আল খিসাল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫
৩৬৬. শেখ তুসী প্রণীত আমালী, পৃ. ৩১৮
৩৬৭. শেখ সাদুক প্রণীত আল আমালী, পৃ. ১০৫
৩৬৮. ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে হযরত আবু বকরের শাসনের প্রথম বছরের ঘটনাবলী সংক্রান্ত অধ্যায়ে মালিক ইবনে নুওয়াইরার কাহিনী বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। আমরা এ ঘটনা সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করেছি। তবে এ ঘটনার বিশ্লেষণ ক ইতিহাস সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন আন নাস ওয়াল ইজতিহাদ, পৃ. ৬১- ৭৫
৩৬৯. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭
৩৭০. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫০
৩৭১. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৯৭
৩৭২. ওয়াকিদী আল মাগাযী গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৬০২ পৃষ্ঠায় আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর প্রাণপণ সংগ্রামের একটি দিক বর্ণনা করেছেন।
৩৭৩. ইবনে হিশাম তাঁর সীরাতে গ্রন্থে মুসলমানদের নিহতের সংখ্যা চার বলে উল্লেখ করেছেন; তবে এ ধরনের ব্যাপক যুদ্ধে অবশ্যই নিহতের সংখ্যা অধিক হবে।
৩৭৪. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, পৃ. ৯১৫- ৯১৬
৩৭৫. বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ১৬২
৩৭৬. সীরাতে হলাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩২
৩৭৭. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮
৩৭৮. সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৬; তিনি বলেন, সর্বপ্রথম মিনজানিক ব্যবহার করেন স্বয়ং মহানবী (সা.)
৩৭৯. সীরাতে হলাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪
৩৮০. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭
৩৮১. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২৮

৩৮২. এ বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে যে, মহানবী (সা.) ৫ শাওয়াল পবিত্র মাসে ত্যাগ করেন এবং তায়েফ নগরী অবরোধকাল ছিল বিশ দিন এবং শাওয়াল মাসের অবশিষ্ট পাঁচ দিন পথ চলা ও হুনাইন যুদ্ধে অতিবাহিত হয়েছিল। অবরোধকাল যে বিশ দিন ছিল তা ইবনে হিশাম উদ্ধৃত একটি রেওয়াজের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। তবে ইবনে সা'দ তাঁর আত তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৫৮ পৃষ্ঠায় অবরোধের সময়কাল চল্লিশ দিন বলে উল্লেখ করেছেন।

৩৮৩. আত তাবাকাতুল আল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২

৩৮৪. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪৯-৯৫৩

৩৮৫. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩-১৫৪; সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯০; এবং ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ বাস্তবায়িত হলো :

من عمل صالحا من ذكر أو أنثي و هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة و لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
যে কোন ব্যক্তি-সে পুরুষ বা নারী হোক, ঈমান সহকারে কাজ (পুণ্য) করবে, আমরা অবশ্যই তাকে একটি পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। (সূরা নাহল : ৯৭)

শেখ সা'দীর ভাষায় :

تونيكي مي كن و در دجله انداز خدایت در بیابان می دهد باز

“যদি পুণ্য করে তুমি তা নিক্ষেপ কর দজলার নীরে,

তা হলে স্রষ্টা তোমায় তা ফিরিয়ে দেবেন উষর মরুপ্রান্তরে।”

৩৮৬. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯১

৩৮৭. ‘মুআল্লাফাতুল কুলূব’ হচ্ছে ঐ সব ব্যক্তি যাদের অন্তঃকরণকে অর্থ প্রদান করে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং পরিণতিতে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।- অনুবাদক

৩৮৮. আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩

৩৮৯. খুমস : এক-পঞ্চমাংশ

৩৯০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৬; ওয়াকিদী আল মাগাযীতে বলেন, “মহানবী (সা.) তার ব্যাপারে বলেছেন :

إنَّ له أصحابا يُحقر أحدهم صلاته مع صلاته و صيامه مع صيامهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يُمِرَّقون من الدِّين كما يَمِرَّق السَّهم من الرَّمِيَّة

তার বেশ কিছু সঙ্গী-সাথী থাকবে যাদের ইবাদত-বন্দেগীর কাছে তোমাদের নামায ও রোযা তুচ্ছ মনে হবে। তারা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর উর্ধ্বে উঠবে না (অর্থাৎ তাদের হৃদয়সমূহে প্রবেশ করবে না)। তীর যেভাবে ধনুক থেকে বের হয়ে যায়, তারাও তদ্রূপ দীন থেকে বের হয়ে যাবে।”

৩৯১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৩- ১৪৪

৩৯২. প্রা ক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০০

৩৯৩. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৭

৩৯৪. তাঁর ঝুলন্ত কাব্যের শুরুতে এ পঙ্ক্তিটি ছিল :

أَمِّنْ أُمَّ أَوْفَى دَمْنَةَ لَمْ تَكْلَمْ بِجِرْمَانَةَ الدَّرَجِ الْمَتَلَّمِ

৩৯৫. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪২

৩৯৬. প্রতিটি পঙ্ক্তির শেষে আরবী ‘লাম’ হরফ বিদ্যমান।

৩৯৭. বলা হয়েছে, কা’ব من سيوف المهند এর জায়গায় سيوف المهند এ ছত্র আবৃত্তি করেছিলেন এবং মহানবী উপরিউক্ত আকারে তা পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।- নাসিখুত তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, অংশ ৩; যখন কা’ব কবিতা আবৃত্তি শেষ করেন তখন মহানবী (সা.) তাঁকে একটি জামা উপহার দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মুআবিয়া তাঁর কাছ থেকে দশ হাজার দীনার মূল্যে ঐ জামা ক্রয় করতে চাইলে তিনি তা বিক্রি করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর মুআবিয়া তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে জামাটি বিশ হাজার দীনার দ্বিগুণ ক্রয় করেন। তখন থেকে ঐ জামা উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় খলীফাদের আনুষ্ঠানিক পোশাকে পরিণত হয়, যা তাঁরা কখনো কখনো পরতেন।

৩৯৮. কোন কোন শিয়া ঐতিহাসিক ও গবেষক আলেমের মতে হযরত ফাতিমা (আ.)- ই মহানবী (সা.)- এর একমাত্র কন্যাসন্তান ছিলেন। তাই এসব ঐতিহাসিক ও গবেষক আলেমের মতে হযরত যায়নাব, হযরত রুকাইয়া ও হযরত উম্মে কুলসুম বলে মহানবীর যে কন্যাসন্তানগণের কথা ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা মহানবী (সা.) ও তাঁর স্ত্রী খাদীজা (আ.)- এর পালিতা কন্যা ছিলেন। তাঁরা খুব সম্ভবত হযরত খাদীজার অনাথ তুপ্পুত্রী বা বোনের কন্যা হয়ে থাকবেন, যাঁদেরকে মহানবী ও হযরত খাদীজা নিজ কন্যাসন্তানের মতো প্রতিপালন করেছিলেন।- অনুবাদক

৩৯৯. তারিখুল খামীস, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩১

৪০০ . ‘উফুদ’ (وفود), ‘ওয়াফদ’ (وفد) শব্দের বহুবচন, যার অর্থ প্রতিনিধিদল

৪০১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৭

৪০২. এ প্রতিনিধি দলের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য, তাদের ও রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর মাঝে যেসব আলোচনা হয়েছিল, সেসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া এবং মহানবী তাদের ব্যাপারে যে অনুগ্রহ ও ভালোবাসা পোষণ করেছিলেন সেসবের বিবরণ প্রদান এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। বিখ্যাত সীরাতে রচয়িতা মুহাম্মদ ইবনে সা'দ তাঁর গ্রন্থে এ প্রতিনিধি দলের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি ৭৩টি প্রতিনিধি দলের নাম উল্লেখ করেছেন যারা দলে দলে হিজরতের নবম বর্ষ জুড়ে বা এর চেয়ে একটু বেশি সময় ধরে মহানবীর নিকট উপস্থিত হয়েছিল।-

আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১- ২৯৫

৪০৩. সূরা নাসর : ১- ৩

৪০৪. সারিয়াহ হুছে কাফির- মুশরিক ও বিধর্মীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মুসলমানদের ঐ যুদ্ধ যাতে মহানবী (সা.) উপস্থিত থাকতেন না।

৪০৫. গায়ওয়াহ হুছে কাফির- মুশরিক ও বিধর্মীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ঐ সব যুদ্ধ যেসব মহানবী (সা.) নিজে উপস্থিত থেকে পরিচালনা করেছেন।- অনুবাদক

৪০৬. রু সী হুছে খ্রিষ্টধর্ম ও সাবেঈনদের মাঝামাঝি একটি ধর্ম

৪০৭. ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৮৭- ৯৮৮; সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ.

৫৭৮- ৫৮১ এবং আদ দারাজাত আর বাফীআহ ফী তারাকাতিশ্ শিয়াহ আল ইমামীয়াহ, পৃ. ৩৫২- ৩৫৪

৪০৮. **إِتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ** - সূরা তাওবা : ৩১

৪০৯. মাজমাউল বায়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪

৪১০. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫

৪১১. প্রা জ

৪১২. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০০৩

৪১৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১৭

৪১৪. সূরা তাওবা : ১১৮

৪১৫. **أَمَّا تَرْضِي أَنْ تَكُونَ مَثَلًا لِمَنْ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي** - সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড,

পৃ. ৫২০; বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ২০৭; এ হাদীস যে মহান ওলীদের নেতা আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)- এর ইমামত (নেতৃত্ব) প্রমাণ করে, সে সম্পর্কে জানার জন্য আমার প্রণীত 'ইসলামের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব' নামক গ্রন্থটির পৃ. ২৫১- ২৮৪ অধ্যয়ন করুন।

৪১৬. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯০

৪১৭. বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ২৪৪

৪১৮. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২০; ওয়াকিদীও আল মাগাযী গ্রন্থে সামান্য পার্থক্যসহ এ কাহিনীটি আবদুল্লাহ ইবনে খাইসামার সাথে সম্পর্কিত করে উল্লেখ করেছেন।

৪১৯. সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫২

৪২০. আধুনিক সামরিক পরিভাষায় এ দলকে ‘মিলিটারী পুলিশ’ বলা হয়।

৪২১. . . . عالم الغيب فلا يُظهر علي غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول - অর্থাৎ মহান আল্লাহ কেবল নবী-

রাসূল ছাড়া আর কারো কাছে তাঁর গায়েব প্রকাশ করেন না...। (সূরা জ্বিন : ২৬- ২৭)

৪২২. দেখুন আমার প্রণীত গ্রন্থ ‘তৃতীয় জ্ঞান’

৪২৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৩

৪২৪. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০০০

উল্লেখ্য, তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের প্রশাসন ও অর্থনীতি এবং বনী উমাইয়্যার প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সীমাহীন দুর্নীতির তীব্র সমালোচনা করার কারণে তৃতীয় খলীফা আবু যারকে রাবযার মরু- প্রান্তরে নির্বাসিত করেছিলেন।- অনুবাদক

৪২৫. উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০২; আত তাবাকাতুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৩ এবং হুলায়তুল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০২

৪২৬. ঐতিহাসিকগণ হযরত আবু যারের মৃত্যুবরণ ও দাফন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিবরণ পার্থক্য সহ বর্ণনা করেছেন। কতিপয় ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে মনে হয়, এ কাফেলার আগমনকালেও হযরত আবু যার জীবিত ছিলেন এবং তাঁরা তাঁর সাথে কথোপকথন করেছেন। তবে অন্যান্য ঐতিহাসিক বলেন, কাফিলার আগমনের মুহূর্তে হযরত আবু যার মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আরো কিছু ঐতিহাসিক বিবরণে উল্লিখিত আছে, হযরত আবু যারের স্ত্রী ও সন্তানরাই তাঁর লাশ রাস্তার পাশে বহন করে এনে রেখেছিলেন। আর আরো কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ অনুসারে তাঁরা দু’জন (আবু যারের স্ত্রী ও সন্তান) রাস্তার পাশে বসেছিলেন। কাফিলা সেখানে আগমন করলে তাঁরা দু’জন তাঁদেরকে হযরত আবু যারের লাশের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।- আত তাবাকাতুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.

৩৪- ২৩২ এবং আদ দারাজাতু রাফীআহ্, পৃ. ৫৩

৪২৭. কতিপয় ঐতিহাসিকের মতে, মালিক আশতার তাঁর জানাযার নামায পড়ান।

৪২৮. আল ওয়াকিদী ‘আল মাগাযী’ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১০১৪- ১০১৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : মহানবী (সা.) তাবুক অঞ্চলে ২০ দিন অবস্থান করেছিলেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, তিনি একদিন ফজরের ফরয নামায আদায় করার পর একটি দীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও শিক্ষণীয় খুতবা প্রদান করেছিলেন। এরপর তিনি মহানবীর খুতবা উদ্ধৃত করেছেন।

৪২৯. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬১

৪৩০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৬; সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬০ এবং বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ১৬০

৪৩১. আল ওয়াকিদী তাঁর আল মাগাযী গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১০২৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন : দাওমা মদীনার ১০ মাইল দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত।

৪৩২. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪ এবং বিহারুল আনওয়ার, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৪

৪৩৩. সিরিয়া শামদেশের অন্তর্ভুক্ত একটি অঞ্চলের নাম। সিরিয়া ছাড়াও জর্দান, লেবানন ও ফিলিস্তিন বৃহৎ শামদেশের অন্তর্ভুক্ত।- অনুবাদক

৪৩৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫২৭ এবং ইবনে সা’দ স্বীয় গ্রন্থ আত তাবাকাতুল কুবরার ২য় খণ্ডের ১৬৮ পৃষ্ঠায় তাবুক প্রান্তরে মহানবীর অবস্থানকাল বিশ দিন বলে উল্লেখ করেছেন)

৪৩৫. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৪২- ১০৪৩; বিহারুল আনওয়ার, ১১তম খণ্ড, পৃ. ২৪৭ এবং সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬২

৪৩৬. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩ এবং বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ২১৯

৪৩৭. এ বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থ পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে উৎকলিত ও গৃহীত :

(حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ)

এমনকি পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের জীবনও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। (সূরা তাওবা : ১১৮)

তাফসীরসমূহে তাদের তওবার প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠকবৃন্দ তাফসীরের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করুন।

৪৩৮. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫ এবং বিহারুল আনওয়ার, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১১৯, সংখ্যাস্বল্প মতলববাজদের বিপক্ষে মহানবীর এ ধরনের ভিন্নতর সংগ্রাম আমাদের জন্য এক বিরাট শিক্ষাস্বরূপ। নিষ্ঠা, দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও ঐকমত্য ছাড়া আর কিছুই এ ধরনের সংগ্রামের জন্য অপরিহার্য নয়। এ তিনজন সম্পর্কে আমরা যা বর্ণনা করেছি, আল ওয়াকিদী তার চেয়েও ব্যাপকভাবে লিখেছেন। দেখুন আল মাগাযী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৪৯- ১০৫৬

৪৩৯. আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৪৬
৪৪০. মসজিদে যিরার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে সূরা তাওবার ১০৭- ১১০ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।
৪৪১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩০ এবং বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ২৫৩
৪৪২. তায়েফ দুর্গ অবরোধের কাহিনী ‘হিজরতের অষ্টম বর্ষের ঘটনাপ্রবাহ’ শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
৪৪৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪২- ৫৪৪; সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩; উসদুল গাবাহ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২১৬ পৃষ্ঠায় সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের কথা আমরা যেভাবে উপরে উল্লেখ করেছি, তার চেয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
৪৪৪. এ প্রসঙ্গে অধিক অবগতির জন্য দেখুন আমার প্রণীত মানশূরে জভীদ, ৩য় খণ্ড
৪৪৫. আল ওয়াকিদী তাদের সংখ্যা ৩০০ জন বলে উল্লেখ করেছেন, আল মাগাযী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৭৭
৪৪৬. لا يُؤدِّيها عنك إِلَّا أنت أو رجل منك (একমাত্র আপনি অথবা আপনার পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তি ব্যতীত মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ আর কেউ প্রচার করতে পারবে না।) এবং কতিপয় রেওয়াজেতে বর্ণিত হয়েছে : أو رجل من أهل بيتك (অথবা আপনার আহলে বাইতভুক্ত কোন ব্যক্তি ব্যতীত...)।-
- সীরাতে ইবনে হিশাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৪৫ এবং বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ২৬৭
৪৪৭. কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৬
৪৪৮. শেখ মুফীদ প্রণীত কিতাবুল ইরশাদ, পৃ. ৩৩
৪৪৯. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৬
৪৫০. রুহুল মাআনী, সূরা তাওবার তাফসীর
৪৫১. “আর আমরা আপনাকে কেবল জগৎসমূহের রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।” (সূরা আশ্বিয়া : ১০৭)
৪৫২. تبكى العين و يحزن القلب و لا نقول ما يُسخط الرب - সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৭;
- বিহারুল আনওয়ার, ২২তম খণ্ড, পৃ. ১৫৭
৪৫৩. বিহারুল আনওয়ার, ৩৩তম খণ্ড, পৃ. ১১৪
৪৫৪. আল মাহাজ্জাতুল বাইদা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৬
৪৫৫. বিহারুল আনওয়ার, ২২তম খণ্ড, পৃ. ১৬৬; তবে কিছু কিছু শিয়া আলেম ধারণা করেন, হযরত খাদীজার গর্ভে তাঁর দুই পুত্রসন্তানের জন্ম হয়েছিল। - বিহারুল আনওয়ার, ২২তম খণ্ড, পৃ. ১৫১

৪৫৬. বিহারুল আনওয়ার, ২২তম খণ্ড, পৃ. ১৫১

৪৫৭. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৮

৪৫৮. বিহারুল আনওয়ার, ২২তম খণ্ড, পৃ. ১৫৬ এবং সীরাতে হালাবীর বর্ণনামতে রাসূল (সা.)-এর পিতৃব্যপুত্র ফযল ইবনে আব্বাস ইবরাহীমের লাশের গোসল দিয়েছিলেন ও কাফনের কাপড় পরিয়েছিলেন।

৪৫৯. আল মাহাসিন, পৃ. ৩১৩ এবং সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৮

৪৬০. ইয়াকুত হামাভী তাঁর মু'জামুল বুলদান গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ২৬৬- ২৬৭ পৃষ্ঠায় নাজরানবাসীদের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার কারণ লো বর্ণনা করেছেন।

৪৬১. ‘উসকুফ’ বা ‘আর্চ বিশপ’ শব্দটি গ্রীক ‘ইপেসকোপ’ শব্দ থেকে উৎসারিত, যার অর্থ হচ্ছে প্রতিদ্বন্দী, তদারককারী, পর্যবেক্ষক ও নিয়ন্ত্রক। আর এখন এ শব্দটি ধর্মযাজক বা পাদ্রীর চেয়ে উর্ধ্বতন পর্যায়ের খ্রিষ্টধর্মীয় বা আধ্যাতিক পদ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৪৬২. বিহারুল আনওয়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫

৪৬৩. আপনি বলে দিন : হে আহলে কিতাব! আমাদের ও তোমাদের মাঝে যে বিষয়টি অভিন্ন, সেই বিষয়ের দিকে তোমরা সবাই ফিরে আস। (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)- এ আয়াতের মর্মার্থ, বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ২৮৭

৪৬৪. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬

৪৬৫. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯

৪৬৬. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বুলুল ইবনে হুমাম ইবনে মুত্তালিব (জন্ম ২৯৭ হিজরী এবং মৃত্যু ৩৮৭ হিজরী)

৪৬৭. দেখুন ইকবালুল আমাল, পৃ. ৪৯৬- ৫১৩

৪৬৮. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯

৪৬৯. সূরা আলে ইমরানের ৫৯তম আয়াত :

(إِنَّ مِثْلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)

“নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর কাছে ঈসার উপমা হচ্ছে আদমের উপমা সদৃশ; আদমকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং এরপর তিনি তাকে বলেছিলেন : ‘হয়ে যাও’, আর সে হয়ে যায়।”

৪৭০. বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ৩২; তবে মুবাহালার সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াত এবং সীরাতে হালাবী থেকে প্রতীয়মান হয়, মুবাহালা করার প্রস্তাব স্বয়ং মহানবীই দিয়েছিলেন। ঠিক একইভাবে تعالوا ندع

أبنائنا... (এসো, আমরা আমাদের সন্তানদের আহ্বান করি এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদের আহ্বান করো...)- এ আয়াত থেকেও এ বক্তব্যের সমর্থন মেলে।

৪৭১. ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২- ২৮৩

৪৭২. মাফাতিহুল গাইব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭১ ও ৪৭২

৪৭৩. ২য় খণ্ড, পৃ. ১১২

৪৭৪. কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : মহানবী (সা.), ইমাম হুসাইন (আ.)- এর হাত ধরে রেখেছিলেন; আলী (আ.) মহানবীর সামনে এবং হযরত ফাতিমা (আ.) তাঁর পেছনে গমন করছিলেন। বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ৩৩৮

৪৭৫. ইকবালুল আমাল গ্রন্থে বর্ণিত আছে : মুবাহালার দিবসে যে স্থানে মুবাহালা অনুষ্ঠিত হবে, সে স্থানের চারপাশে বহুসংখ্যক আনসার ও মুহাজির সাহাবী উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) বাড়ি থেকে কেবল ঐ চারজনকেই সাথে নিয়ে বের হয়েছিলেন। আর মুবাহালার ময়দানে এই পাঁচ জন ছাড়া অন্য কোন মুসলমান উপস্থিত ছিলেন না। মহানবী (সা.) মুবাহালার ময়দানে প্রবেশ করে কাঁধ থেকে নিজ চাদর খুলে পরস্পর কাছাকাছি অবস্থিত দু'টি বৃক্ষের উপর ছুঁড়ে দেন এবং তিনি যে চারজন সহ বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন তাঁদেরকে এ চাদরের ছায়াতলে স্থান দেন এবং নাজরানের প্রতিনিধি দলকে মুবাহালা করার আহ্বান জানান।

৪৭৬. ফুতহুল বুলদান, পৃ. ৭৬

৪৭৭. সূরা আলে ইমরান : ৫৯

৪৭৮. অধিকতর অবগতির জন্য দেখুন নূরুস সাকালাইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১- ২৯২

৪৭৯. কতিপয় রেওয়ায়েতেও এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন : আল কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ.

৫১৩- ৫১৪

৪৮০. সমকালীন বহু সূত্রে ও পরস্পরায় বর্ণিত যার মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

৪৮১. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫ এবং আদ দুররে মানসূর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮

৪৮২. মিসবাহুল মুজতাহিদ, পৃ. ৭০৪

৪৮৩. ইকবালুল আমাল, পৃ. ৭৪৩

৪৮৪. প্রা ক্ত

৪৮৫. মরহুম সাইয়্যেদ ইবনে তাউস আবুল ফযল মুহাম্মদের বংশ পরিচয় সঠিকভাবে বর্ণনা করেন নি। তবে নাজ্জাশীর বর্ণনা মতে তাঁর বংশনামা হচ্ছে : মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে

বুহলুল ইবনে মুত্তালিব। তাই তাঁর উর্ধ্বতন প্রপিতামহের নাম আবদুল মত্তালিব নয়, বরং মুত্তালিব। আর মুত্তালিব তাঁর উর্ধ্বতন পঞ্চম পিতৃপুরুষ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, নাজ্জাশীর দৃষ্টিতে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর জীবনের দু’টি অধ্যায় ছিল। তাঁর জীবনের একটি অধ্যায় নির্ভরযোগ্য এবং আরেকটি অধ্যায় নির্ভরযোগ্য নয়। আর এ কারণেই তিনি বলেছেন : “বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য (মুওয়াসসাক) ব্যক্তির তর জীবনের যে অধ্যায়ে তিনি দৃঢ়পদ ছিলেন, সেই সময়কালে তার থেকে যে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন, সে লো ব্যতীত আমি তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকেছি।” (নাজ্জাশী প্রণীত ফেহরেস্ত, পৃ. ২৮১- ২৮২) শেখ নাজ্জাশী তাঁর রিজালবিদ্যার ৫১১ পৃষ্ঠায় বলেছেন : “তিনি অধিক অধিক হাদীস বর্ণনাকারী; তবে একদল রিজালবিদ তাঁকে ‘যাঈফ’ (দুর্বল) বলেছেন।”

৪৮৬. তাঁর নাম ‘সাহীফা-ই-সাজ্জাদিয়া’র সনদসমূহে বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি ‘শাইখুত তায়িফা’র শায়খগণের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর মৃত্যুসাল ৪৬০ হিজরী। তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ শাইবানী থেকে মুবাহলা গ্রন্থের হাদীসসমূহ উদ্ধৃত করেছেন। দেখুন : আয যারীয়াহ, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪

৪৮৭. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০২- ৬০৩ এবং শেখ আল মুফীদ প্রণীত কিতাব আল ইরশাদ, পৃ. ৮৯

৪৮৮. আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮ এবং শেখ আল মুফীদ প্রণীত কিতাব আল ইরশাদ, পৃ. ৮৭

৪৮৯. জুহফাহ পবিত্র ম া থেকে তিন মঞ্জিলের দূরত্বে এবং মদীনা থেকে সাত মঞ্জিলের দূরত্বে অবস্থিত। আর লোহিত সাগর থেকে এ স্থানের দূরত্ব প্রায় ৬ মাইল (দুই ফারসাখ)। বর্তমানে এ অঞ্চলটি রাবুগ, যা ম া থেকে মদীনা অভিমুখী সড়কের উপর অবস্থিত, এর নিকটবর্তী।- নাভাভীর তাহরীর গ্রন্থ এবং আত তাহযীব।

ইয়াকুত তাঁর গ্রন্থ ‘মারাসিদুল ইত্তিলা’র ১০৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : ম ার চার মঞ্জিলের দূরত্বে অবস্থিত জুহফাহ শাম ও মিশরবাসীদের মীকাত। গাদীরে খুম থেকে এ অঞ্চলের দূরত্ব দু’ মাইল এবং লোহিত সাগর থেকে এ অঞ্চলের দূরত্ব প্রায় ৬ মাইল। তবে এখন গাদীরে খুম ম ার ২২০ কি.মি. দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত। আল্লামা মাসউদীও ‘আত তানবীহ ওয়াল ইশরাফ’ গ্রন্থের ২২১- ২২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : গাদীরে খুম ‘খাররার’ নামে খ্যাত একটি জলাশয়ের অদূরে অবস্থিত।

৪৯০. এক মাইল তিন হাজার হাত এবং এক ফারসাখ নয় হাজার হাত; আরেক অভিমত অনুসারে এক মাইল চার হাজার হাত এবং এক ফারসাখ বারো হাজার হাত। যা হোক এক মাইল আসলে এক ফারসাখের এক-তৃতীয়াংশ এবং তিন মাইলে এক ফারসাখ।

৪৯১. অভিনন্দন জানানোর বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য আল গাদীর গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৪৫- ২৫৭ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

৪৯২. মহানবী (সা.) রবী মাসের চতুর্থ রাতে মদীনার উদ্দেশে পবিত্র ম া ত্যাগ করেছিলেন এবং ঐ মাসের ১২ তারিখে মধ্যাহ্নের কাছাকাছি সময় মদীনার কুবা মহল্লায় প্রবেশ করেন। বিদ্যমান সাক্ষ্য- প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহের ভিত্তিতে বলা যায়, মহানবী (সা.) ম া- মদীনার অন্তর্বর্তী দূরত্ব কুরাইশদের পশ্চাদ্ধাবনের কারণে তগতিতে অতিক্রম করেছিলেন।- সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৯ এবং আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫

৪৯৩. বিহারুল আনওয়ার, ২২তম খণ্ড, পৃ. ১৯

৪৯৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৫ এবং মাজমাউল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১০

৪৯৫. মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ গ্রন্থের রচয়িতা এ গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : এ ঘটনাটি মুফাসসিরগণ সূরা তাওবার তাফসীরে রেওয়াজেত করেছেন এবং আল গাদীর গ্রন্থে (৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩১৮- ৩২১) আহলে সুন্নাতে ৭২ জন ব্যক্তিত্ব থেকেও এ ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, এ বছরের (হিজরতের নবম বর্ষে) শেষে নাজরানের খ্রিষ্টানদের সাথে মহানবীর মুবাহালার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কারণ, বর্ণিত হয়েছে যে, এ ঘটনা যিলহজ্জ মাসে ম া বিজয়ের পর সংঘটিত হয়েছিল এবং বিদায় হজ্জের যিলহজ্জ অর্থাৎ হিজরতের দশম বর্ষের যিলহজ্জ মাসে অবশ্যই তা সংঘটিত হয় নি। স্মার্তব্য, গাদীরে খুমের ঘটনাও বিদায় হজ্জের যিলহজ্জ মাসে সংঘটিত হয়েছিল। অতএব, মুবাহালার ঘটনা আগের বছরের (হিজরতের নবম বর্ষে) যিলহজ্জ মাসে অবশ্যই ঘটে থাকবে।

৪৯৬. যদিও মামাকানী তানকীহুল মাকাল গ্রন্থে হাদীস শিক্ষক হবার কারণে তাঁকে ‘সিকাহ’ (বিশুদ্ধ) বলে গণ্য করেছেন।

৪৯৭. তানকীহুল মাকাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪

৪৯৮. তূসীর রিজাল, পৃ. ৩৯

৪৯৯. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩০- ২৯১

৫০০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৮- ৫৬৯

৫০১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯০

৫০২. সহীহ আল বুখারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩

৫০৩. আল- কামিল ফীত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৫ এবং বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ৩৬০- ৩৬৩

৫০৪. সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৯

৫০৫. ঐ স্থানের নাম, যেখানে মসজিদে শাজারাহ অবস্থিত।

৫০৬. لَيْبِكُ اللَّهُمَّ لَيْبِكُ، لَيْبِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْبِكُ، إِنَّ الْحَمْدَ وَ التَّعْمَةَ لَكَ وَ الْمَلِكُ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْبِكُ

৫০৭. হাজরে আসওয়াদের উপর হাত বুলানোর (ইস্তিলাম) অর্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাবা পুনঃনির্মাণকালে এ পাথর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পায়ের নিচে থাকত এবং তিনি এর মাধ্যমে পবিত্র কাবার প্রাচীর উঁচু করেছেন; তাই এ পাথরের উপর হাত রাখা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে এক ধরনের প্রতিজ্ঞার নামান্তর। আর তা হলো : আমরা ইবরাহীম (আ.)-এর মতো তাওহীদী আদর্শের পথে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাব। মহানবী (মদীনায়) দশ বছর অবস্থান কালে দু'বার পবিত্র উমরা পালন করেছিলেন। প্রথম বার হিজরতের সপ্তম বর্ষে এবং দ্বিতীয় বার অষ্টম বর্ষে ম + বিজয়ের পরপরই। এটি ছিল মহানবী (সা.)-এর তৃতীয় উমরা, যা তিনি হজ্বের আমলসমূহের সাথে আঞ্জাম দিয়েছিলেন।- আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪

৫০৮. সাফা ও মারওয়াহ মসজিদুল হারামের অদূরে অবস্থিত দু'টি পাহাড়ের নাম। এ দু' পাহাড়ের মধ্যকার দূরত্ব অতিক্রম করাই হচ্ছে সাঈ (سعى)। এ সাঈ সাফা পাহাড় থেকে শুরু হয়ে মারওয়াহ পাহাড়ে গিয়ে শেষ হয়।

৫০৯. এ কথাটি আসলে স্ত্রী সহবাস ও জানাবাতের গোসলকে বুঝিয়েছে। কারণ ইহরামের হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয় লোর একটি হচ্ছে স্ত্রী সহবাস। আর তাকসীর করার মাধ্যমে স্ত্রী সহবাস হালাল হয়ে যায়।

৫১০. বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ৩১৯; এ ঘটনা মহানবী (সা.)-এর স্পষ্ট নির্দেশসমূহের বিপক্ষে একদল সাহাবীর এক ঐমিপূর্ণ অবস্থান গ্রহণের বিষয়টি ব্যক্ত করে। ইসলামের ইতিহাসে এ ব্যাপারে অনেক প্রমাণ রয়েছে এবং মরহুম শারায়ুদ্দীন আমিলী এ ব্যাপারে 'আন নাস ওয়াল ইজতিহাদ' অর্থাৎ 'পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধানসমূহের বিপরীতে ইজতিহাদ' নামক একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন।

৫১১. শেখ মুফীদ প্রণীত আল ইরশাদ, পৃ. ৯২; হযরত আলীর কাজ এবং তাতে রাসূলের সম্মতি প্রদান থেকে বোঝা যায়, ইজমালীভাবে (মোটের উপর বা সারসংক্ষেপে) যে কোন আমলের নিয়্যত করা যথেষ্ট এবং নিয়্যতকারীর জন্য কখনই নিজ কাজের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচিত থাকা আবশ্যিক নয়।

৫১২. বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ৩৮৫

৫১৩. এবং সম্মান (দেখুন : শেখ সাদুক প্রণীত আল খিলাল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪)

৫১৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০৫

৫১৫. পবিত্র কাবার মুতাওয়াল্লীরা, যে সব গোত্র হারাম মাস লোয় যুদ্ধ ও রক্তপাত করার অভিপ্রায় পোষণ করত, তাদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে হারাম মাস লো পরিবর্তন করে ফেলত এবং এ সব মাসের স্থলে বছরের অন্যান্য মাসকে হারাম মাস হিসেবে ঘোষণা করত।

৫১৬. মহানবী (সা.) এ ঐতিহাসিক ভাষণে জনগণকে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার উপদেশ দিয়েছেন। আর তিনি গাদীরে খুমের ভাষণে এবং তাঁর ওফাতের পূর্ববর্তী দিন লোয় মহান আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর বংশধর অর্থাৎ ইতরাতের (আহলে বাইত) ওসিয়ত করেছেন। এ হাদীসদ্বয় দু'টি ভিন্ন ঘটনা উপলক্ষে বর্ণিত হয়েছে এবং উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ মহানবী (সা.) একটি ক্ষেত্রে সুন্নাহকে পবিত্র কুরআনের সমকক্ষ বলেছেন এবং আরেক ক্ষেত্রে তাঁর পবিত্র আহলে বাইত ও স্থলবর্তীদের ব্যাপারে ওসিয়ত করেছেন এবং তাঁদেরকে অনুসরণ করার ব্যাপারে রক্ত আরোপ করেছেন- এতে কোন অসুবিধা নেই। আহলে বাইতকে অনুসরণের অর্থই হচ্ছে তাঁর ও তাঁর পবিত্র সুন্নাহরই অনুসরণ। আহলে সুন্নাহের কতিপয় আলেম, যেমন শেখ শালতুত তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ধারণা করেছেন, মহানবী (সা.) কেবল একটি ঘটনার ক্ষেত্রেই সাকালাইন (দু'টি ভারী ও মূল্যবান জিনিস) সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন; তাই তিনি পাদটীকায় ইতরাত (অর্থাৎ রক্তজ বংশধর) শব্দটি نسخه بدل হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অথচ এ ধরনের সংশোধনের আসলে কোন প্রয়োজনই নেই। কারণ মূলনীতিগতভাবে এ দুই রেওয়াজের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, যার ফলে আমাদের এ পথে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে হবে।

৫১৭. তাকসীর : গোঁফ, চুল- দাঁড়ি ছাটা (ছোট করা) এবং হাত ও পায়ের আঙুলের নখ কাটা।

৫১৮. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৪

৫১৯. সূরা তূর : ৩০

৫২০. আল কামিল ফীত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২০ এবং আল ইকদুল ফরীদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৯

৫২১. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৬ এবং আল কামিল ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১০

৫২২. বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য মহানবী (সা.) এ বাক্য তিন বার বলেছিলেন যাতে পরে কোন ভুলের উ ব না হয়।

৫২৩. সূরা মায়দার ৩ ও ৬৭ নং আয়াত

৫২৪. ওয়াফিয়াতুল আয়ান (ইবনে খাল্লিকান প্রণীত), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০

৫২৫. প্রা জ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৩

৫২৬. আল আসার আল বাকীয়ার অনুবাদ, পৃ. ৩৯৫ এবং আল গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭

৫২৭. সিমারুল কুলুব, পৃ. ৫১১

৫২৮. এ সংক্রান্ত সার্বিক তথ্য ও পরিসংখ্যান আল গাদীর গ্রন্থের ১ম খণ্ড থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ গ্রন্থের এ অধ্যায় রচনা করার ক্ষেত্রে এসব তথ্য ও পরিসংখ্যান থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে।

৫২৯. সে চরম অজ্ঞতাবশত মহান আল্লাহর নামে তার পত্র শুরু করে নি। এমনকি এক্ষেত্রে জাহিলীয়াতের যুগের মুশরিকদের মতোও সে বোধশক্তির অধিকারী ছিল না।

৫৩০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০০-৬০১। এ পত্রদ্বয়ের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে পত্র লেখকদ্বয়ের ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়।

৫৩১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৯

৫৩২. কারণ আরবীভাষী বাগ্মীরা বেশ ভালো করেই বুঝত যে, পবিত্র কুরআনের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তাই তারা কখনো পবিত্র কুরআনের মোকাবেলার চিন্তা করত না।- অনুবাদক

৫৩৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪২ এবং আন নাস ওয়াল ইজতিহাদ, পৃ. ১২

৫৩৪. আহলে সুন্নাতে সূত্রসমূহে পতাকা বেঁধে দেয়ার তারিখ ২৬ সফর বলে উল্লিখিত হয়েছে। আর যেহেতু তাঁরা মহানবীর ওফাত ১২ রবিউল আউয়াল হয়েছিল বলে জানেন, সেহেতু এসব ঘটনা, যা পাঠকবর্গের কাছে বর্ণনা করা হবে, সেসব ১৬ দিনের মধ্যে ঘটে থাকতে পারে। তবে যেহেতু শিয়া আলেমগণ মহানবীর বংশধরগণের অনুসরণ করে তাঁর ওফাত দিবসকে ২৮ সফর বলে বিশ্বাস করেন, সেহেতু বাধ্য হয়েই এসব বাড়তি ঘটনা ২৮ সফরের আগের দিন লোতে অবশ্যই ঘটেছে বলে মেনে নিতে হবে।

৫৩৫. সিরিয়াস্থ ‘বালকা’ নামের একটি অঞ্চলের অংশবিশেষ। এ স্থান মুতার কাছে আসকালান ও রামলার মাঝখানে অবস্থিত।

৫৩৬. মদীনার তিন মাইলের মধ্যে শামের দিকে অবস্থিত বিস্তীর্ণ এক এলাকার নাম।

৫৩৭. নাহজুল বালাগাহ্, সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভমূলক বাণীসমূহ, বাণী নং ১২৫

৫৩৮. হালাবীর মতো কতিপয় জীবনচরিত রচয়িতা তাঁর বয়স ১৭ বছর বলেও উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ তাঁর বয়স ১৮ বছর লিখেছেন। তবে অবশেষে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ঐ সময় তাঁর বয়স ২০ অতিক্রম করে নি।

৫৩৯. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২

৫৪০. প্রা ক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯০; আবার কখনো কখনো তিনি বলতেন : جَهَرُوا جيش أسامة “উসামার

সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত কর” অথবা أرسلوا بعث أسامة “উসামার সেনাবাহিনীকে প্রেরণ কর।”

৫৪১. শাহরিস্তানী প্রণীত আল মিলাল ওয়ান নিহাল, ৪র্থ ভূমিকা, পৃ. ২৯; ইবনে আবিল হাদীদ প্রণীত শারহু নাহজিল বালাগাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০
৫৪২. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯০
৫৪৩. তাদের অজুহাত ও ব্যাখ্যা লোর ব্যাপারে অধিক অবগতির জন্য দেখুন আল মুরাজায়াত, পৃ. ৩০- ৩১ এবং আন নাস ওয়াল ইজতিহাদ, পৃ. ১৫- ১৯
৫৪৪. কেউ কেউ বলেছেন : আবু রাফে অথবা হযরত আয়েশার খাদেম বারীরাহকে (বুরাইরাহ) সাথে নিয়ে মহানবী (সা.) জান্নাতুল বাকী গোরস্তানে গিয়েছিলেন। দেখুন আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৪
৫৪৫. আত তাবাকাত গ্রন্থসমূহের রচয়িতাগণ এবং অন্যদের বর্ণনা অনুযায়ী আবু মুওয়াইহিবর দিকে মুখ করে বললেন...
৫৪৬. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৪ এবং বিহারুল আনওয়ার, ২২তম খণ্ড, পৃ. ৪৬৬
৫৪৭. আ ার সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন সংক্রান্ত আলোচনাসমূহে যা বলা হয়েছে, তদনুযায়ী এ প্রসঙ্গে যে কোন দাবীদারের কথায় কর্ণপাত করা অনুচিত এবং প্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্য অনুসারে ‘যে কেউ আয়না তৈরি করতে পারলেও সেকান্দারী বিদ্যা জানে না’। অবস্তুগত (গায়েবী) জগৎ এবং আ াজগতের সাথে যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য ‘তৃতীয় জ্ঞান এবং পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে আ ার মৌলিকত্ব’ সংক্রান্ত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করুন।
৫৪৮. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫৪ এবং আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৬
৫৪৯. ايتوني بدواة و صحيفة اكتب لكم كتابا لا تضلون بعده
৫৫০. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২ এবং ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪; সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪; মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৫ এবং আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪
৫৫১. ইবনে আবীল হাদীদ প্রণীত শারহু নাহজিল বালাগাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০
৫৫২. সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪ এবং মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৫
৫৫৩. কানযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮ এবং আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪
৫৫৪. মরহুম মুজাহিদ আল্লামা সাইয়েদ শারাহুদ্দীন তাঁর ‘আল মুরাজায়াত’ গ্রন্থে তাঁদের সকল অজুহাত উল্লেখ করে সে লো আকর্ষণীয়ভাবে খণ্ডন করেছেন।
৫৫৫. মুহাম্মদের জীবনী, পৃ. ৪৭৫

৫৫৬. মহানবী (সা.) প্রদত্ত ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের প্রতি পবিত্র কুরআনের মুখাপেক্ষিতার সীমা বর্ণনা করা আমাদের এ আলোচনার গণ্ডির বাইরে। আমরা ‘পবিত্র কুরআনের জটিল আয়াতসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা’ এবং মানসূরে জভীদ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এ সংক্রান্ত আলোচনা করেছি।

৫৫৭. মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৫

৫৫৮. اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ابداً আমি তোমাদের একটি পত্র লিখে দেব যার পরে তোমরা কখনোই

পথ ষ্ট হবে না। আপনারা যদি লক্ষ্য করেন, তা হলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, মহানবী (সা.) لن تضلوا (তোমরা

আর কখনোই পথ ষ্ট হবে না)- এ বাক্যের দ্বারা তাঁর পত্র লেখার কারণ ব্যক্ত করেছেন।

৫৫৯. হাদীসে সাকালাইন ও কাগজ- কলমের হাদীস

৫৬০. বিহারুল আনওয়ার, ২২তম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯ এবং শেখ মুফীদ প্রণীত কিতাব আল ইরশাদ এবং তাবারসী প্রণীত আলামুল ওয়ারা

৫৬১. বিহারুল আনওয়ার, ২২তম খণ্ড, পৃ. ৪৭৬

৫৬২. প্রথম বর্ণনা ও রেওয়াজেত বিহারুল আনওয়ারের ২২তম খণ্ডের ৪৭৬ পৃ. থেকে উদ্ধৃত এবং দ্বিতীয় বর্ণনা ইবনে হাজার আসকালানী বর্ণিত।

৫৬৩. আসসাওয়ায়েক আল মুহরিকাহ, ৯ম অধ্যায়, পৃ. ৫৭ এবং কাশফুল গাম্মাহ, পৃ. ৪৩

৫৬৪. হাদীসে সাকালাইন শিয়া- সুন্নী হাদীসবিদগণ যে সব হাদীস ও রেওয়াজেতের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, সেসবের অন্তর্ভুক্ত। এ হাদীস ৬০টিরও অধিক সূত্রে মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে হাজার আসকালানী আস সাওয়ায়েক আল মুহরিকাহ গ্রন্থের ১৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : “মহানবী (সা.) বিভিন্ন উপলক্ষ, যেমন আরাফাতের দিবসে, গাদীরে খুমের দিবসে, তায়েফ নগরী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, এমনকি রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায়ও পবিত্র কুরআন ও তাঁর ইতরাতের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।”

মরহুম মীর হামেদ হুসাইন হিন্দী তাঁর গ্রন্থের একটি অংশে হাদীসে সাকালাইনের সনদসমূহ এবং এর অর্থের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রেখেছেন এবং এসবের সমগ্র সম্প্রতি ৬ খণ্ডে ইসফাহান থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। মিশরের ‘দারুত তাকরীব’ সংস্থার (ইসলামী মাযহাবসমূহকে নিকটবর্তী করার সংস্থা) পক্ষ থেকে ১৩৭৪ হিজরীতে এ হাদীস সংক্রান্ত একটি সন্দর্ভ প্রকাশ করা হয়েছিল। এ সন্দর্ভে সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে এ হাদীসের

রুত্ব এবং সকল শতকে এ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের বিশেষ দৃষ্টি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

৫৬৫. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮
৫৬৬. প্রা ক্ত, পৃ. ২৩৬
৫৬৭. এছাড়াও সাওয়াদার পেটে চাবুকের আঘাত ইচ্ছাপ্রণোদিত ছিল না, এ দৃষ্টিকোণে সাওয়াদার কিসাসের অধিকার ছিল না; বরং দিয়াহ দিয়ে দিলেই তা পূরণ হয়ে যেত। এ সত্ত্বেও মহানবী (সা.) সাওয়াদার অভিমতের নিরাপত্তা বিধান করতে চেয়েছিলেন।
৫৬৮. মানাকিবে আলে আবী তালিব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪
৫৬৯. শেখ আল মুফীদ প্রণীত কিতাবুল ইরশাদ, পৃ. ৯৭
৫৭০. সহীহ বুখারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১
৫৭১. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৭ এবং আল কামিল ফীত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৯
৫৭২. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪ এবং সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫৪
৫৭৩. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৪
৫৭৪. প্রা ক্ত, পৃ. ২৬৩
৫৭৫. প্রা ক্ত
৫৭৬. নাহজুল বালাগাহ্
৫৭৭. সূরা নিসা : ৬৯
৪৭৮. আ'লামুল ওয়ারা, পৃ. ৮৩
৫৭৯. বুখারীর বর্ণনামতে হযরত আবু বকর ছিলেন।
৫৮০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫৬
৫৮১. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭
৫৮২. নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা : ২৩
৫৮৩. রাসূলের ওফাতোত্তর খলীফাগণের যুগ

সূচীপত্র

বত্রিশতম অধ্যায় : তৃতীয় হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	7
উহুদ যুদ্ধ	8
কুরাইশ বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা	14
উহুদ প্রান্তর	15
প্রতিরক্ষা কৌশল সম্পর্কে পরামর্শ	16
শাহাদাতের জন্য লটারী	18
শূরা বা পরামর্শ সভার ফলাফল	20
মহানবী (সা.)- এর মদীনার বাইরে গমন	22
দু'জন আে ৷ৎসর্গী সৈনিক	23
দুই বাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতি	28
সেনা মনোবল শক্তিশালী করণ	29
মনস্তাত্ত্বিক উৎসাহ	31
যুদ্ধের সূচনা	33
প্রবৃত্তির কামনা চরিতার্থ করতে লড়ছিল যে জাতি	36
বিজয়ের পর পরাজয়	38
মহানবী (সা.)- এর নিহত হবার সংবাদ	41
কুরআনের আয়াতে সত্যের উন্মোচন	43
মহানবী (সা.)- কে হত্যার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পাঁচ ব্যক্তি	47
সাফল্যজনক প্রতিরক্ষা লড়াই ও পুনঃ বিজয়	50

উহুদ যুদ্ধ- পরবর্তী ঘটনাবলী	60
যুদ্ধ শেষ	63
মহানবী (সা.)- এর মদীনায় প্রত্যাবর্তন	67
ঈমানদার মহিলার বিস্ময়কর স্মৃতি	68
তেরিশতম অধ্যায় : চতুর্থ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	75
প্রচার- সৈনিকদের ট্র্যাভেজী	76
ধর্ম প্রচারকগণের হত্যার গভীর ষড়যন্ত্রের নীল নকশা	77
ইসলামের মুবাঞ্জিগগণের নির্ধূর হত্যাকাণ্ড	78
প্রাচ্যবিদদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অবস্থান	83
চৌত্রিশতম অধ্যায় : চতুর্থ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	85
বনী নাযীরের যুদ্ধ	86
মুনাফিক দলের ভূমিকা	91
পঁয়ত্রিশতম অধ্যায় : চতুর্থ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	94
মদ ও নেশাকর পানীয় নিষিদ্ধকরণ	95
যাতুর রিকা অভিযান	101
দ্বিতীয় বদর	104
ছত্রিশতম অধ্যায় : পঞ্চম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	106
াস্ত কুসংস্কার মূলোচ্ছেদের প্রয়োজনে	107
মহানবী (সা.)- এর ফুপাতো বোনকে যাইদ- এর বিয়ে	109
আরেক ভুল প্রথা বিলুপ্ত করার জন্য বিয়ে	112

প্রাচ্যবিদগণ এবং হযরত য়ায়নাব বিনতে জাহাশের বিয়ে	115
সাঁইত্রিশতম অধ্যায় : পঞ্চম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	121
আহযাব অর্থাৎ জোটবদ্ধ দলসমূহের যুদ্ধ	122
গায়ওয়া- ই- দাওমাতুল জান্দাল	123
খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ	124
মুসলমানদের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক	128
সালমান ফার্সী সম্পর্কে মহানবী (সা.)- এর প্রসিদ্ধ উক্তি	131
আরব ও ইহুদী যৌথ বাহিনীর মদীনা অবরোধ	132
মুখোমুখি ঈমান ও কুফর	138
আরব বাহিনীর কতিপয় বীর যোদ্ধার পরিখা অতিক্রম	141
হযরত আলী (আ.)- এর তরবারির এ আঘাতের মূল্য	146
আলী (আ.)- এর মহানুভবতা	147
সম্মিলিত আরব বাহিনীর ছত্রভঙ্গ ও ব্যর্থতার কারণ	150
আটত্রিশতম অধ্যায় : পঞ্চম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	154
ফিতনার সর্বশেষ ঘাঁটি	155
দুর্গের অভ্যন্তরে ইহুদীদের পরামর্শ সভার আয়োজন	157
আবু লুবাবার বিশ্বাসঘাতকতা	161
পঞ্চম বাহিনীর পরিণতি	164
উনচল্লিশতম অধ্যায় : ষষ্ঠ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	171
ইসলামের শত্রুদের ওপর কড়া নজর	172

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কুরাইশগণের হাবাশার (আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া) দিকে যাত্রা	174
তিল্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হওয়ার জন্য পদক্ষেপ	176
যি কাবাদের যুদ্ধ	178
চল্লিশতম অধ্যায় : ষষ্ঠ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	180
বনী মুস্তালিকের বিদ্রোহীরা	181
বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ	182
দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য দায়ী মুনাফিক	184
এক বরকতময় বিয়ে	188
পাপাচারীর মুখোশ উন্মোচিত	189
একচল্লিশতম অধ্যায় : ষষ্ঠ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	190
রুতর পাপের অভিযোগ	191
পবিত্র এক ব্যক্তি বা নারীর নামে মুনাফিকদের অপবাদ	193
বিয়াল্লিশতম অধ্যায় : ষষ্ঠ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	202
একটি ধর্মীয়- রাজনৈতিক সফর	203
মহানবী (সা.)- এর প্রতিনিধি প্রেরণ	210
বাইয়াতে রিদওয়ান	212
হৃদয়বিয়ার সন্ধি- শর্ত	216
সন্ধিচুক্তি বলবৎ রাখার সর্বা ক চেষ্টা	219
হৃদয়বিয়ার সন্ধি : পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন	222
কুরাইশদের নিকট মুসলিম নারীদের ফিরিয়ে না দেয়া	228

তেতাল্লিশতম অধ্যায় : সপ্তম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	229
মহানবী (সা.) ও তাঁর বিশ্ব- রিসালতের ঘোষণা.	230
মহানবী (সা.)- এর বিশ্বজনীন রিসালত	232
পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চল ও দেশসমূহে রিসালতের দূতগণ	235
রিসালত প্রচারের যুগে বিশ্ব- পরিস্থিতি	237
রোমান সাম্রাজ্যে ইসলামের বার্তাবাহী দূত	239
পারস্য- সম্রাটের দরবারে মহানবী (সা.)- এর দূত	245
ইয়েমেনের শাসনকর্তার প্রতি খসরু পারভেজের নির্দেশ	249
মিশরে ইসলামের দূত	252
মহানবীর প্রতি মুকুকেসের পত্র	256
স্মৃতিবহুল আবিসিনিয়ায় মহানবীর দূত	259
মহানবীর প্রতি নাজ্জাশীর পত্র	263
রা প্রধানদের প্রতি মহানবীর পত্র প্রেরণের রুত্ব	264
গাসসানী শাসকের প্রতি মহানবীর পত্র	267
মহানবীর ষষ্ঠ দূতের ইয়ামামায় গমন	270
চুয়াল্লিশতম অধ্যায় : সপ্তম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	273
খাইবরের দুর্ভেদ্য দুর্গ (আশংকার কেন্দ্র)	274
একে একে দুর্গের পতন	283
খাইবরের মহা বিজয়	286
আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর গলায় শ্রেষ্ঠত্বের তিন পদক	292

বিজয়ের কারণ	293
যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমত) বণ্টন	298
স্মৃতিময় আবিসিনিয়া থেকে কাফেলার প্রত্যাবর্তন	300
যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা	301
ইহুদীদের এক াঁয়ে আচরণ	304
কল্যাণমূলক মিথ্যা	307
পঁয়তাল্লিশতম অধ্যায় : সপ্তম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	309
ফাদাকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	310
মহানবী (সা.)- এর ওফাতের পরে ফাদাকের ইতিহাস	315
আইনের মানদণ্ডে ফাদাক	320
ওয়াদিউল কুরা বিজয়	321
ছেচল্লিশতম অধ্যায় : সপ্তম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	322
উমরাতুল কাযা	323
পবিত্র ম া নগরীতে মহানবী (সা.)- এর প্রবেশ	326
মহানবী (সা.)- এর ম া নগরী ত্যাগ	329
সাতচল্লিশতম অধ্যায় : অষ্টম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	331
মুতার যুদ্ধ	332
প্রথম অধিনায়কের ব্যাপারে মত- পার্থক্য	337
মুসলিম ও রোমান সেনাবাহিনীর রণঙ্গনে অবস্থান গ্রহণ	340
দিশাহারা মুসলিম বাহিনী	344

ইসলামের সৈনিকদের মদীনায় প্রত্যাবর্তন	346
ইতিহাসের বদলে কল্পকাহিনী	347
জাফরের ইন্তেকালে মহানবী (সা.)- এর আকুল কান্না	349
আটচল্লিশতম অধ্যায় : অষ্টম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	350
যাতুস্ সালাসিলের গাফ্‌ওয়া	351
আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) সেনা অধিনায়ক মনোনীত	355
এ যুদ্ধে আমীরুল মুমিনীনের বিজয় ও সাফল্যের অন্তর্নিহিত কারণ	356
উনপঞ্চাশতম অধ্যায় : অষ্টম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	360
ম ৷ বিজয়	361
মহানবী (সা.)- এর সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্দিগ্ন কুরাইশরা	365
এক গুচর আটক	368
মহানবী (সা.)- এর যাত্রা	373
ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা প্রদর্শন	375
ইসলামী সেনাবাহিনীর আকর্ষণীয় রণকৌশল	379
মহানবী (সা.) সকাশে আবু সুফিয়ান	383
পবিত্র ম ৷র রক্তপাতহীন আ সমর্পণ	385
ম ৷র পথে আবু সুফিয়ান	389
পবিত্র ম ৷ নগরীতে ইসলামী সেনাবাহিনীর প্রবেশ	391
মূর্তি ভাঙ্গা ও পবিত্র কাবা ধোয়া	394
মহানবী (সা.)- এর কাঁধে হযরত আলী (আ.)	397

মহানবী (সা.)- এর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা	401
আণীয়- স্বজনদের প্রতি মহানবী (সা.)- এর নসীহত.	403
মসজিদুল হারামে মহানবী (সা.)- এর ঐতিহাসিক ভাষণ	404
মার মহিলাদের মহানবী (সা.)- এর বাইআত (আনুগত্য)	411
মা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের প্রতিমালয় লোর ধ্বংস সাধন	414
পঞ্চাশতম অধ্যায় : অষ্টম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ.	417
হুনাইনের যুদ্ধ.	418
মুসলমানদের যুদ্ধের উপকরণ ও সাজ- সরঞ্জাম	422
অবিচল মহানবী (সা.) এবং একদল ত্যাগী জানবাজ যোদ্ধা.	423
যুদ্ধের গনীমত	425
একাত্তম অধ্যায় : অষ্টম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ.	426
তায়েফ যুদ্ধ	427
দু'চাকা বিশিষ্ট (পশু চালিত) যুদ্ধযানের মাধ্যমে দুর্গ- প্রাচীরে ফাটল সৃষ্টি	430
অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক আঘাত	431
ইসলামী সেনাবাহিনীর মদীনায় প্রত্যাবর্তন	433
যুদ্ধোত্তর ঘটনাবলী.	435
গনীমত বণ্টন.	440
ষাটতম অধ্যায় : অষ্টম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ.	444
কা'ব ইবনে যুহাইরের বিখ্যাত কাসীদাহ	445
কা'ব ইবনে যুহাইর ইবনে আবী সালামার ঘটনা	447

তে ান্নতম অধ্যায় : নবম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	451
তাঈ গোত্রের আবাসভূমিতে হযরত আলী (আ.)	452
প্রতিমালয় ও মন্দিরের ধ্বংস সাধন	455
মদীনার উদ্দেশে আদী ইবনে হাতেম- এর যাত্রা	460
চুয়ান্নতম অধ্যায় : নবম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	463
তাবুক যুদ্ধ	464
সৈন্য সংগ্রহ এবং যুদ্ধের ব্যয়ভার মেটানোর ব্যবস্থা	466
যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরতরা বা বিরোধীরা	467
মদীনায় গোপন গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক আবিষ্কৃত	469
এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে হযরত আলী (আ.)- এর বিরত থাকা	472
তাবুকের দিকে ইসলামী সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা	474
সফরের কষ্ট	477
সতর্কতামূলক নির্দেশাবলী	478
মহানবী (সা.)- এর গায়েব সংক্রান্ত জ্ঞান ও তথ্য	479
তাবুক অঞ্চলে ইসলামী সেনাবাহিনীর প্রবেশ	483
দাওমাতুল জান্দাল অঞ্চলে খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে প্রেরণ	486
তাবুক অভিযান মূল্যায়ন	488
মহানবী (সা.)- কে মুনাফিকদের হত্যার ষড়যন্ত্র	490
নেতিবাচক সংগ্রাম ও প্রতিরোধ	494
মসজিদে যিরারের ঘটনা	497

পঞ্চদশতম অধ্যায় : নবম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	499
মদীনায় সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল	500
প্রতিনিধি দলের শর্তাবলী	504
ছা ানতম অধ্যায় : নবম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	507
মিনা দিবসের ঘোষণাপত্র	508
এ ঘটনার ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণে অন্যায্য ও পক্ষপাতদুষ্ট গোঁড়ামি	515
সাতানতম অধ্যায় : দশম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	517
পুত্র ইবরাহীমের ইন্তেকালে মহানবী (সা.)- এর শোক	518
একটি ান্ত ও অবান্তর আপত্তি	520
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম	522
আটানতম অধ্যায় : দশম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	524
মদীনায় নাজরানের প্রতিনিধি দল	525
মুবাহালার জন্য মহানবী (সা.)	530
মুবাহালা থেকে নাজরানের প্রতিনিধি দল বিরত	533
সন্ধিপত্রের মূল পাঠ	534
শ্রেষ্ঠত্বের সনদ	536
উনষাটতম অধ্যায় : দশম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	538
মুবাহালার সাল, মাস ও দিন	539
হিজরতের নবম বর্ষের যিলহজ্ব মাসে মুবাহালা	547
ষাটতম অধ্যায় : দশম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	549

মিনা ঘোষণা দানের পর	550
মহানবী (সা.)- এর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র	551
ইয়েমেনে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)	553
একষষ্টি তম অধ্যায় : দশম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	556
বিদায় হজ্ব	557
ইয়েমেন থেকে হযরত আলী (আ.)- এর প্রত্যাবর্তন	561
বিদায় হজ্জে মহানবী (সা.)- এর ঐতিহাসিক ভাষণ	564
বাসষ্টি তম অধ্যায় : দশম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	568
ধর্মের পূর্ণতা বিধান	569
খলীফা ও উত্তরাধিকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যায়ন	572
২. গাদীরের মহা ঘটনা	577
গাদীরে খুমে মহানবী (সা.)- এর ভাষণ	578
এ মহা ঘটনার অবিস্মরণীয়তার অন্যান্য দলিল	582
তেষষ্টি তম অধ্যায় : দশম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	586
মুসাইলিমার সংক্ষিপ্ত জীবনী	588
রোমানদের ব্যাপারে চিন্তা- ভাবনা	590
জান্নাতুল বাকী কবরবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা	596
চৌষষ্টি তম অধ্যায় : একাদশ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	598
অলিখিত পত্র	599
দোয়াত ও কলম নিয়ে এসো, যাতে আমি তোমাদের জন্য একটি পত্র লিখে দিতে পারি	601

এ পত্রের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য কী ছিল?	606
মহানবী (সা.) কেন এ পত্র লেখার ব্যাপারে আর তাকীদ দিলেন না?	609
অন্তিম পত্র লিখতে না পারার ক্ষতিপূরণ প্রচেষ্টা	610
দীনার বণ্টন	612
ঔষধ সেবন করানোর জন্য মহানবী (সা.)- এর তীব্র অসন্তোষ	613
সাহাবীগণের সাথে শেষ বিদায়	614
পঁয়ষিঁ তম অধ্যায় : একাদশ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ	616
জীবনের শেষ শিখা	617
হযরত ফাতিমা (আ.)- এর সাথে মহানবী (সা.)- এর কথোপকথন	619
দাঁত মুবারক মিসওয়াক	621
মহানবী (সা.)- এর অন্তিম ওসিয়ত	622
মহানবী (সা.)- এর ওফাত দিবস	624
তথ্যসূচী	627